বৈশাখ, ১৩২০ [১ম সংখ্যা

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

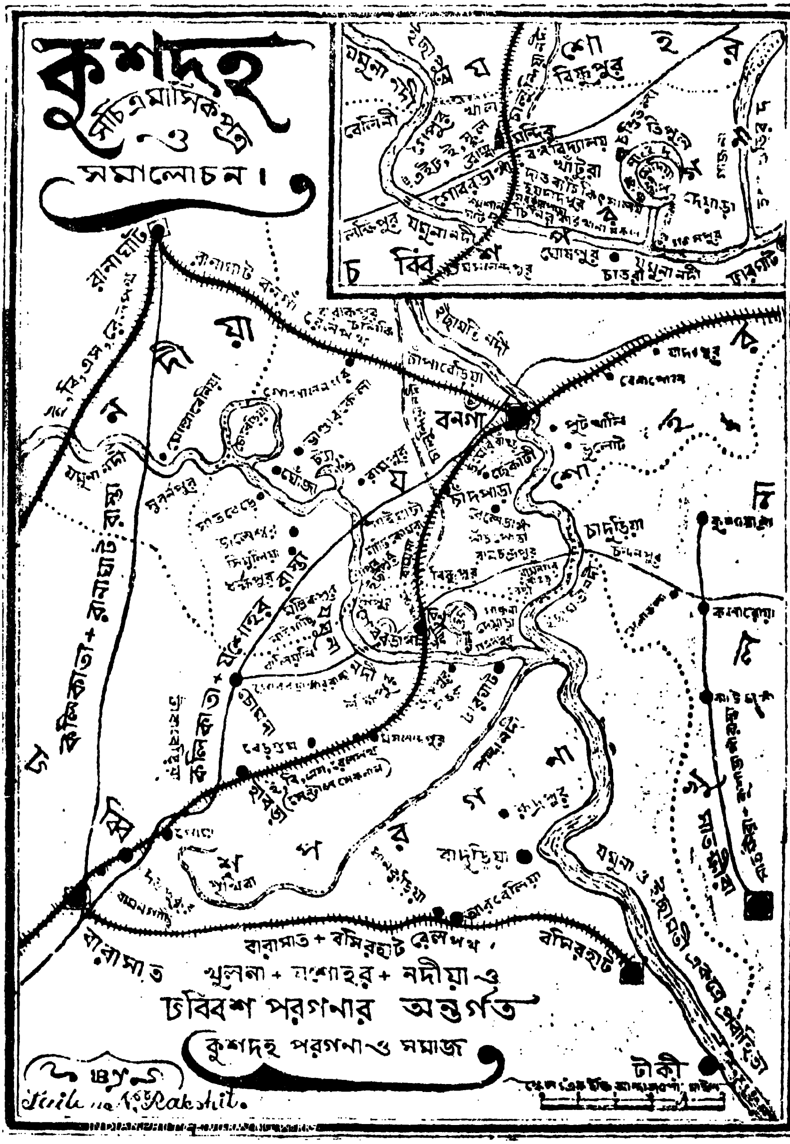
কার্য্যালয়
১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য
সাধারণ সংস্করণ ৵১০ আনা
উৎকৃষ্ট „ ।০ „

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কুশদহ-মানচিত্র



কুশদহ
সচিত্র মাসিক পত্র
ও
সমালোচনা
বিষ্ণুপুর
খাঁটুরা
গোবরডাঙ্গা
যমুনা নদী
ঘোষপুর
বনগাঁ
চাঁদপাড়া
বারাসাত + বসিরহাট রেলপথ
বসিরহাট
বারাসাত
খুলনা + যশোহর + নদীয়া ও
চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত
কুশদহ পরগনা ও সমাজ
টাকী

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৩২০ সাল হইতে "কুশদহ"র কার্য্যাধ্যক্ষের দায়ীত্ব শ্রীমান্ সরলকুমার কুণ্ডুর প্রতি অর্পিত হইল। তাঁহার স্বাক্ষরিত বিলের প্রদত্ত টাকা এবং কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কথা কাজ-গ্রাহ্য হইবে।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু
স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

কুশদহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। ১৩২০ সালের "কুশদহ" সচিত্র মাসিক পত্র ডিমাই আট পেজী ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা আকারে অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা মায় ডাকমাশুল ১৲ এক টাকা মাত্র। আইভুরি ফিনিস কাগজে ছাপা. উৎকৃ সংস্করণ জন্য ২৲ দুই টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য সাধারণ সংস্করণ ৵১০ এবং উৎকৃষ্ট সংস্করণ ।০ আনা। নমুনার জন্য ৵১০ আড়াইআনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। কেবল পোষ্টকার্ড লিখিলে বা আধ আনার টিকিট পাঠাইলে কোনোরূপ নমুনা পাঠানো যায় না।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ ২রা ও ৩রা কাগজ পান কি না লক্ষ্য রাখিবেন। ১০ই পর্য্যন্ত কাগজ না পৌছিলে আমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ই এর পর আমরা দায়ী হইতে পারিব না, অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য ৵১০ মূল্য লাগিবে। যথাসময়ে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দেওয়ায় কাগজ খোয়া গেলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধের কারণ দেখানো অথবা ফেরত দেওয়া কিম্বা অধিক দিন কাপী রাখা হয় না। ফেরত পাইতে হইলে ৴১০ টিকিট পাঠাইতে হয়। মনোনীত প্রবন্ধ কোন্ মাসে বাহির হইবে, তাহা অগ্রে বলা যায় না।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনো পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৫। কুপনে পরিষ্কাররূপে পুরা নাম ও ঠিকানা না দিলে হিসাবে গোল হইবে, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন।

৬। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্রিকাদি, সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে, মনিঅর্ডার ও অন্যান্য বিষয়ের পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

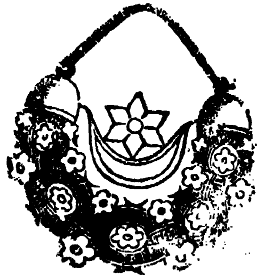
"কুশদহ" এক্ষণে ১১০০ এগারো শত ছাপা হয়।

কুশদহ-কার্য্যালয়
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসরলকুমার কুণ্ডু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

নূতন জুয়েলারি ক্যাটলগ।





এ বৎসর আমাদের ৩ প্রকার ক্যাটলগ ছাপানো হইয়াছে। ১নং সুবৃহৎ ক্যাটলগের মূল্য ৫৲ টাকা। পুরাতন গ্রাহকগণ মায় মাশুলাদি ১৫০ সিকায় পাইবেন। ২নং মাশুলাদি সহ ।।৵০ ৩নং ৵০ আনা মূল্যে পাইবেন।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৪০নং গরাণহাটা, কলিকাতা।

গভর্ণমেণ্ট গ‍ইতে রেজেষ্টারি করা।

৪০ বৎসরের আবিষ্কৃত লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত, বিশ্ববিখ্যাত

মায়াপুর রসায়ন।

বিনামূল্যে "মায়াপুর রসায়নের"

ব্যবস্থাপত্র ও "বৃহৎ ভা ত সঙ্গীত"

পুস্তক বিনামাশুলে পাইবেন।

৵১০ টিকিট পাঠাইলে ।০ আনা মূল্যের "বৃহৎ কবিরাজী শিক্ষা" বিনামূল্যে পাইবেন!

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ম্যানেজার—আর ব্যানার্জ্জি

১১৪ নং গৌরলা । ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রার্থনা

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২০ | প্রথম সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা

প্রভু পরমেশ্বর! আজ সর্ব্ব প্রথমে তব নাম স্মরণ করিয়া আবার একটি বৎসরের জন্য তোমার প্রদত্ত এই 'সেবাব্রত' পালনে প্রবৃত্ত হইতেছি; দেখো প্রভু যেন ইহার মধ্যে আমার আমিত্ব-অভিমান প্রকাশ পাইয়া তোমার কার্য্যের এবং তোমার সন্তান-সন্ততিগণের বিঘ্ন না জন্মায়। এই কার্য্য যেন তোমার প্রেরণা-শক্তি দ্বারাই সর্ব্বথা সাপন্ন হয়, এবং তদ্দ্বারা যেন দেশের কল্যাণ হয়। প্রভু, তুমিই একমাত্র লজ্জানিবারণ বিঘ্নবিনাশন; দেখো যেন দাসের লজ্জা নিবারণ হয়। সকল প্রকার অভাব অনাটনে তুমিই দাতা দয়ালু; ইহা যেন না ভুলি। তোমার নাম ধন্য হউক—তোমার মহিমা গৌরবান্বিত হউক। তব চরণে দাসের ইহাই নিবেদন।

নূতন পাকা খাতা

কাগজের খাতায় সংসারের জমা-খরচ, দেনা-পাওনার হিসাব লিখিত হইয়া থাকে। এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ করিয়া বারো মাসে এক বৎসর পূর্ণ হইলে, সে খাতা পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নূতন খাতা আরম্ভ হয়। পুরাতন খাতার হিসাব নিকাশ করিয়া প্রয়োজন মতো হিসাব দেখিবার জন্য তাহা যত্নপূর্ব্বক সকলে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল তত্ত্ব ব্যবসায়ী কর্ম্মী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন। কিন্তু নিজ জীবনী-খাতার জমা-খরচ কি সকলে বুঝিয়া দেখেন? বিধাতার বাঁধা এই জীবনী-খাতা পার্থিব অনিত্য বস্তু নয়। ইহার একটি পৃষ্ঠাও বৃথা শূন্য নহে। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কর্ম্ম-মসী এবং ঘটনা-লেখনী দ্বারা দৈনিক যে সকল জমা-খরচ লিখিত হয়, তাহা কাগজের খাতায় লিখিত সাংসারিক জমা-খরচের ন্যায় নহে। জীবনী-খাতায় স্বর্গীয় অক্ষয় বিষয়ের হিসাব লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই খাতা দুই প্রকারের হয়। এক কাঁচা খাতা, আর পাকা খাতা। সামান্য সাধারণ কারবারে কাঁচা খাতাই যথেষ্ট। তাহার হিসাব-প্রণালী শুদ্ধ নহে। লেখা তো পরিষ্কার নহেই—তা ছাড়া প্রতি দিনের কৈফিয়ৎ-কাটা তহবিলের মিলও থাকে না। সাধারণ সাংসারিক লোকের জীবনও তদ্রূপ কাঁচা খাতা বিশেষ। তাঁহারা কেবল সাংসারিক বিষয় লইয়াই ব্যস্ত; যাঁহার প্রদত্ত এই জীবন, তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া, তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহারই আদিষ্ট কার্য্য করাই যে মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, এ হিসাবে তাঁহারা তেমন করিয়া রাখেন না। এজন্য তাঁহাদের জীবন-যাত্রায় গরমিল ঘটিয়া সতত অশান্তি দুঃখ তাপের উৎপত্তি হয়।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তের জীবন নিয়মিত সংযত এবং ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্যে নিবিষ্ট, নির্ম্মল শান্তি-পূর্ণ। ইহাই পাকা খাতা বিশেষ। তাহা প্রণালী পূর্ব্বক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত এবং তাহাতে দস্তুর মতো কৈফিয়ৎ-কাটা তহবিলেরই মিল থাকে। পাকা খাতায় যেমন লাভ-লোকসানের হিসাব ঠিক বুঝিতে পারা যায়, বিশ্বাসী ভক্তের জীবনে পাপ পুণ্যের বোধ-শক্তিও তদ্রূপ স্পষ্ট। পাকা খাতায় যেমন তহবিলের মিল থাকে, তদ্রূপ ভক্তের জীবন ভগবানের আলোকে কর্ত্তব্য কার্য্যেরও একটা মিল থাকে। সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা অপচয় দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু কাঁচা খাতা হইতে

যেমন পাকা খাতা প্রস্তুত হয়—তদ্রূপ সাধারণ জীবনের ভিতর দিয়াই উচ্চ জীবন লাভ করিতে হয়।

যে সকল কারবারী কোনো দিন পাকা খাতা প্রস্তুত করিল না, চিরদিনই কাঁচা খাতায় যেমন-তেমন করিয়া হিসাব লিখিয়া নেন, তাঁহাদের লাভ লোকসানের হিসাব তেমন ঠিক নয়। অনুমানের উপর নির্ভর করে মাত্র। ইহা যেমন হিসাব-পত্রের প্রকৃত অবস্থা নহে, তদ্রূপ মানব জীবনও কেবল সাধারণ সাংসারিক বিষয়ের জন্য নহে। শারীরিক জীবনের যতটুকু কর্ত্তব্য তাহাও ঈশ্বরাদিষ্ট ভাবের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। কাঁচা খাতা আর কিছুই নহে, তাহা কেবল পাকা খাতা প্রস্তুত করিবার প্রথম অবস্থা মাত্র।

নববর্ষে নূতন খাতা পত্তন করিয়া পুরাতন খাতা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাই বলিয়া হিসাব-পত্রের পক্ষে, পুরাতন খাতা যেমন অল্প প্রয়োজনীয় নহে, তেমনি আমরা প্রতিদিন যে নূতন জীবনে অগ্রসর হই, তাহার গঠন-কল্পে পুরাতন জীবনও অল্প প্রয়োজনীয় নহে। পুরাতন হিসাবে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন কার্য্য না করিলে যেমন নূতন দেনা-পাওনায় সতর্ক হওয়া যায় না, তেমনি নবজীবন গঠনে পুরাতন জীবন আমাদের সম্পূর্ণ অনুকূল। পুরাতন হইতেই নূতনে অবতরণ করি।

তিনিই ধন্য, যিনি পাকা খাতা প্রস্তুত করিয়াছেন। পুরাতন খাতার হিসাব সূক্ষ্ম রূপে দেখিয়া নূতন খাতার গতি নির্ণয় করেন। আজ আসুন 'কুশদহ'র পাঠক-পাঠিকাগণ আমরা জীবনদাতা পিতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার সাধুভক্ত সন্তানগণের চরণে প্রণত হইয়া নূতন বৎসরে জীবনের নূতন পাকা খাতায় হিসাব রক্ষা করিতে সচেষ্ট হই। দাস—

বাহ্য বন্ধু

চুম্বক পাহাড় বলে, "ও জাহাজ ভাই,
বড় ভালবাসি তোরে বুকে টানি তাই।"
পোত বলে, "অযাচিত স্নেহ লহ ফিরে ;
অকালে হারাই প্রাণ, তব স্নেহ তরে।"

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু

কুশদহের ইতিহাস

কুশদহের প্রাচীন নাম কুশদ্বীপ। কতদিন এই নাম চলিয়া আসিতেছে তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই। নামটি এত পুরাতন যে ইহার নামকরণের কাল অবধারণ করিতে চেষ্টা করিলে ফললাভের সম্ভাবনা অল্প।

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূভাগ অর্থাৎ গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূমি সাধারণতঃ গঙ্গার ব দ্বীপ নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ভূভাগ সাধারণতঃ গাঙ্গ্যভূমি নামেই বৈদেশিকগণ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ সেকন্দার সাহের ভারতাগমনকালে বঙ্গদেশ প্রাচ্য ভূমি ও গঙ্গারাঢ় নামে পরিচিত ছিল। আমাদের পুরাণ ও মহাভারতে বঙ্গ নাম দৃষ্ট হয়। কালিদাসের রঘুবংশেও বঙ্গনামের উল্লেখ আছে। কিন্তু কতদিন হইতে বঙ্গনাম চলিয়া আসিতেছে তাহা জানিবার উপায় নাই। বঙ্গ প্রভৃতি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা বৃথা। মনুসংহিতা রচনাকালেও এসকল ভূভাগ ব্রাহ্মণগণের বাসভূমি ছিল না। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভের বহু পূর্ব্বে আর্য্যগণ এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনার্য্য সাঁওতালগণের হস্ত হইতে এদেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে জঙ্গলভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন ইহাই ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে সাঁওতালেরা যে, বোঙ্গা নামে অপদেবতাগণের পূজা করিত সেই অপদেবতার বোঙ্গা নাম হইতে "বঙ্গ" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কথাটা নিতান্ত অসার কিনা জানিবার উপায় নাই। তবে সাঁওতালেরা যে জলে স্থলে, পাহাড়ে জঙ্গলে নদীতে ও কূপে সকলস্থানেই বোঙ্গার অবস্থিতি কল্পনা করিয়া থাকে ইহা নিশ্চিত। তাহারা এখনও মেরুবঙ্গা, বুরুবঙ্গা, দাবঙ্গা, দাধিবঙ্গা, পাহাড়ি বঙ্গা প্রভৃতি বঙ্গীয় পূজা করিয়া থাকে। সেই জন্য পুরাবিদ্‌গণের মত যে আর্য্যগণ সাঁওতালদের "অপদেবতার দেশ" আখ্যায় এ দেশের নাম বঙ্গ রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই বঙ্গ নামের সহিত গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাঢ় ও প্রাচ্যভূমি নামদ্বয়ও প্রচলিত হইয়াছিল। এদুটি যে বিশুদ্ধ আর্য্যনাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গঙ্গারাঢ় বা রাঢ় বলিলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগ বুঝাইত

ও প্রাচ্যভূমি নামে চট্টগ্রাম হইতে বেহার পর্য্যন্ত ভূভাগ বুঝাইত। সাধারণতঃ এই সকল নাম দেশ-বাচক হইলেও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাইবার পৃথক পৃথক নাম ছিল। তন্মধ্যে দ্বীপান্ত নামই অধিক। এখনও "দহ" "দিয়া" "ডী" প্রভৃতি যে সকল জনপদের নামের শেষে সংযুক্ত দেখা যায়, সেগুলি "দ্বীপ" শব্দেরই অপভ্রংশ। এরূপ নামের সংখ্যা অল্প নহে। আমাদের কুশদহও এরূপ একটি দ্বীপ। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রচীনকালে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূভাগ ছিল। এমন কি ইহাকে "মহাদ্বীপ" বলিত এবং "নবদ্বীপ"ও ইহার অন্তর্গত ছিল। পরে মোগল শাসনকালে রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় ইহার প্রধান ভাগ "উখড়া" নামে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র একটি পরগণায় পরিণত হইয়াছে। "উখড়া" নবদ্বীপ হইতে যমুনার প্রায় শেষসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ঐতিহাসিক যুগে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে সমতট নামে সমৃদ্ধি-শালী জনপদ ছিল। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপিতে সমতটের উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও সমতট সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

বাংলার পাল রাজগণের—অধিকার-কালেও সমতট শ্রীহীন হয় নাই। মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের তাম্রশাসন-লেখক আপনাকে সমতট-নিবাসী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু সেনরাজগণের কোনো শাসন-লিপিতে এ পর্য্যন্ত সমতটের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং সেনরাজগণের সময়ে সমতট শ্রীভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক সমতট কোথায় অবস্থিত ছিল ইহাই জানা আবশ্যক। বিখ্যাত পুরাবিৎ কানিংহাম সাহেব প্রাচীন কালের জনপদ সমূহের অবস্থিতি-স্থান নির্ণয় করিয়া নিজ নাম অমর করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কোনো পণ্ডিতই পুরাতত্ত্ব-চর্চ্চায় সাফল্যলাভ করেন নাই। তাঁহার মতে আধুনিক জেলা যশোহরের নিকটবর্ত্তী "মূরলী" নামক স্থানেই প্রাচীন সমতট অবস্থিত ছিল। কিন্তু কানিংহাম সাহেবের এ মতটি সর্ব্বত্র সমাদৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, কপোতাক্ষীতীরে কপিলমুনির নিকটে, কাহারও মতে বেত-কাশীর আবাদে, কেহ বলেন, হরিণঘাটার মোহনার নিকটে সমতট অবস্থিত ছিল। এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু দেখা যায়। কিন্তু চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং সমতট সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ তমোলিপ্তি হইতে ইহার দূরত্বের যে পরিমাণ দিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় আমাদের কুশদহের মধ্যে সমতট অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ

জলেশ্বর বা তাহার নিকটে সমতট ছিল। কেবলমাত্র তমোলিপ্তি আধুনিক তমলুক হইতে সমতটের দূরত্ব অনুসারে একথা বলিতেছি না। জলেশ্বর হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত ক্রোশব্যাপী স্থানে যে সকল ইষ্টকস্তূপ ও মৃত্তিকা-প্রোথিত গৃহাদির ভিত্তি দেখা যায়, তাহাতে জলেশ্বরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তৎপরে জলেশ্বর বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। যমুনা দিয়া বৃহৎ বাণিজ্যপোত দেশ বিদেশে গমনাগমন করিত বলিয়া প্রবাদ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সংক্ষেপে যে সকল কারণে জলেশ্বরকে সমতট বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল তাহাতে সাধারণের সন্তোষ জন্মিতে পারে না। কিন্তু আমার ধারণা যে অমূলক ইহা প্রমাণিত হইলে আমি সন্তোষলাভ করিব। বিষয়টির সুমীমাংসা হইলে সাধারণের উপকার হইবে এই আশায় এ বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

কুশদহের মধ্যে সমতট অবস্থিত না হইলেও সমতটের সমৃদ্ধিতে এক সময় কুশদহ সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গঙ্গাতীরস্থ জনপদ সমূহের সহিত সমতটের বাণিজ্য কুশদহের মধ্য দিয়া যমুনা বাহিয়া যাইত। সেইজন্য চারঘাট জলেশ্বর সুবর্ণপুর (লাওপালা) শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু যে যমুনা বাহিয়া এক সময়ে বড় বড় বাণিজ্যপোত দেশ বিদেশে যাতায়াত করিত, এখন তাহা বাহিয়া অতি ক্ষুদ্র নৌকাও অতিকষ্টে বর্ষা ভিন্ন অন্যকালে গঙ্গায় যাইতে পারে না। যমুনার শোচনীয় দশা কুশদহকে শ্রীহীন করিয়াছে। প্রাচীন গ্রামগুলি প্রায় জনশূন্য হইয়া অধিকাংশ হিংস্র জন্তুর আবাসস্থানে পরিণত হইতেছে। (ক্রমশ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিধবা

—:*:—

(গল্প)

মা বাপের আদরের মেয়ে হাস্যমুখী উমা বারো বছর বয়সে যে দিন বিধবা হইল, সে দিন সে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনকে তারই জন্য আর্ত্তনাদ করিতে দেখিলেও সে নিজে বুঝিল না তার কি হইয়াছে। তার কপাল ভাঙ্গিয়াছে শুনিল, কিন্তু বুঝিল না কেমন করিয়া তার কপাল ভাঙ্গিল! এই সেদিন

বাঁশী বাজাইয়া, আলো, ফুল, আত্মীয়-স্বজনের আনন্দের মধ্যে কোন্ এক নূতন মানুষের হাতে তাকে সঁপিয়া দিয়া পিতা-মাতা অশ্রুজল ফেলিলেন। সে এই নূতন মানুষের সঙ্গে, সে এক কোন নূতন ঘরে নূতন লোকজনের মধ্যে এই আটদিন সে মাথায় ঘোমটা দিয়া জড়ো-সড়ো হইয়া একঘরে বসিয়া থাকিয়া দিন কাটাইয়া দিয়াছে। সে নূতন মানুষটিকে বড় ভয় করিত। সে কথা বলিতে আসিলে উমা দূরে সরিয়া যাইত। কি জানি, যদি দাদার মতো সে তাকে মারে! কাজেই উমার সঙ্গে তার আর পরিচয় হইল না। বাপের বাড়ি আসিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পিতৃ-গৃহের খেলা-ধূলা, হাসি-কান্না, আদর-আবদারের মধ্যে আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। সেই অপরিচিত, ভীতি-উৎপাদক লোকটি এ সংসারে নাই বলিয়া তার কপাল কেন ভাঙিল বুঝিল না। উমা বরং প্রথমত কথাটা শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া ভাবিয়াছিল, সে বাড়িতে আর যাইতে হইবে না, ভালোই হইল। কিন্তু মাকে কাঁদিতে দেখিয়া তার চোখও জলে ভরিয়া আসিল। সে মার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল! অশ্রু ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

এখনো যে তার গায়ে সেই উৎসবের দিনের সুবাস লাগিয়া রহিয়াছে, এখনো যে তার ফুলের গহনা ম্লান হয় নাই, এখনো যে সেইদিনের মঙ্গল সিন্দুর সিঁথি লাল করিয়া আছে! সকল মঙ্গল কাজে যোগ দিবার অধিকার এই যে সে দিন পাইয়াছে; আর এরি মধ্যে সে হতভাগিনী, সে অমঙ্গলের মূর্ত্তি হইয়া গেল কি করিয়া? কোনো শুভ কার্য্যে হাত দিবার আর তার অধিকার নাই! উৎসবের দিনে, মঙ্গলের দিনে, তাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে! সে শুধু ম্লানমুখে সজলনেত্রে চাহিয়া দেখিবার অধিকারী,—আর কিছুর নহে!

আজ হইতে তার ক্ষীণ তনুখানি শাদা কাপড়ে ঢাকিয়া স্বল্পাহারে জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইতে হইবে। যে দিন তারও নশ্বর দেহ চিতায় জ্বলিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত কোনো আচারের, কোনো নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইবার যো নাই! আত্মীয়-স্বজন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন এই কথা বলিতেছিলেন, সে তখন ছল ছল নেত্রে তাহাদের দিকে আর্ত্তভাবে চাহিয়াছিল। বুঝিল না কেন তার এমন দুর্দ্দশা হইল।

চির স্নেহময়ী মাতার তপ্ত বুকে মাথা রাখিয়া উমা এক রকম সুখেই দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু সত্যই তার ভাঙা কপাল! এ সুখও তার সহিল না। অকূল দুঃখ-সাগরে ডুবাইয়া বিধবা উমার মুখের দিকে না চাহিয়া তিনি

এ সংসার ছাড়িয়া কোন অজানিত দেশে চলিয়া গেলেন। উমা এতদিনে বুঝিল দুঃখ কাহাকে বলে। মানুষ প্রিয়জনকে কত ভালোবাসে! প্রিয়জন জনমের মতো বিদায় লইলে কেমন বেদনা হয়। অন্তর কেমন করিয়া হাহাকার করিয়া মরিতে থাকে।

অনাহারে অনিদ্রায় মায়ের পরিত্যক্ত শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া উমার দিন কাটিতে লাগিল। কেহ দেখিল না, তার দিন কেমন করিয়া যাইতেছে! কেহ জানিতে আসিল না, তার হৃদয় কতখানি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে! অসহায়া, নিরাশ্রয়া দুঃখিনী বিধবার কেহ খোঁজ লইল না! এ সংসারের লোকে আপনাদের সুখ দুঃখ লইয়াই অস্থির, কে কার খোঁজ লয়!

সময়ের গুণে শোকের তীব্রতা সকলেরই কমিয়া আসিল। কেবল উমা অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া মরিতে লাগিল। সে মা ছাড়া আর কাহাকেও যে জানিত না! তার যে আর কেহ নাই, কিছু নাই! বালবিধবার সকল দুঃখ, সকল বেদনা মা যে অতল স্নেহ-স্পর্শে একেবারে মুছাইয়া দিতেন। তাঁর স্নেহ-শীতল ছায়ার তলে থাকিয়া ভাগ্যহীনা হইয়াও সে যে একদিনের জন্যও সে কথা বুঝিবার অবসর পায় নাই! মা যে তার বুক কতখানি শূন্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন! তাহা সে নিজেই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। পৃথিবী যে তার কাছে অন্ধকার!

কিন্তু তাদের শূন্যঘর আবার ভরিয়া উঠিল। পিতা এবং আত্মীয়-স্বজন আবার হাসিমুখে সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সব দেখিয়া কেবলই তার চোখ জলে ভরিয়া উঠিত। তার হাসি, আনন্দ, সুখের উৎস চিরকালের জন্য শুকাইয়া গিয়াছে! নূতন মা আসিলে উমা শুনিল, তার এ বাড়িতে আর থাকা হইবে না। শ্বশুর-বাড়ি ছাড়িয়া মেয়ে কি চিরকাল বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিবে নাকি! বিশেষত তার শ্বশুর শাশুড়ী যখন সকলেই আছেন। সেই তো তার নিজের ঘর, বাপ যখন বিবাহ দিয়াছেন তখন সেখানে থাকিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করাই উচিত। স্বামীর সেবা করার ভাগ্য লইয়া সে জন্মায় নাই বলিয়াই কি তার বাড়িটাই এমনি করিয়া ত্যাগ করিতে হয়? কথাগুলি শুনিয়া উমা মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। রাত্রে শুইয়া শুইয়া চোখের জলে আপ্লুত হইয়া স্বর্গগতা মাতাকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"মা, আমাকে তুমি সেই লোকে নিয়ে যাও, আমার কী দুর্দ্দশা হ'তে যাচ্ছে একবার দেখ।" কিন্তু কোথায় তার মা? ঘরের অন্ধকার রাশি জমাট বাঁধিয়া তার বুকের উপর

যেন পাষাণ চাপাইয়া দিল! বাল্যকাল হইতে যে দুঃখের আরম্ভ হইয়াছে, জীবন ব্যাপিয়াই কি তার দারুণ তাপ বহন করিতে হইবে না?

আকুল অনুনয়, প্রার্থনা, অশ্রুজল সব ব্যর্থ হইল। পরাধীনা অসহায়া বিধবা এতদিনে স্বামীর পরিত্যক্ত সংসারে প্রবেশ করিল। এতদিনে উমা ভালো করিয়া বুঝিয়াছে, তিনি থাকিলে আজ তার ভাগ্য আর একরূপ হইত! একমাত্র তাঁরই বিহনে তার এমন দুর্দ্দশা, এত বেদনা! তাঁকে যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। তার মতো দুর্ভাগিনীর জীবনে যে একবার উৎসবের দিন আসিয়াছিল, সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে।

মলিন শাদা বস্ত্রে শীর্ণ দেহ ঢাকিয়া উমা যখন শ্বশুর-বাড়ির উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, শাশুড়ী তখন রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "সব খেয়ে দেয়ে শেষে এখানে এলে! কে জান্‌ত যে মেয়ে এমন অপয়া! ভাগ্যে এমন সোনার চাঁদ দুদিনও টিক্‌লো না। কপাল মন্দ তাই এমন রাক্ষসীকে ঘরে এনেছিলুম। সংসারে আবার কি অমঙ্গল হয় বলে, এতদিন তো কোনো খোঁজই আমরা নি নেই, তা বাপ আর কতদিন বসে বসে খাওয়াবে? ওঁর হাতে পায়ে ধরে এখানে দিয়ে গেল!"

নির্ম্মম নিষ্ঠুর বাক্য! উমার সমস্ত দেহ থর থর কপিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে নিকটের মাটি ধরিয়া বসিয়া পড়িল। বুক ফাটিয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হায়, তার কী দোষ! বিধাতা তাকে কেন এ সংসারে পাঠাইয়া এত অপমানের কারণ করিলেন! এ নির্ম্মম আঘাতে তার পঞ্জর যে ভাঙিয়া যাইতেছে, তা দেখিবার কি কেহ নাই?

সংসারের কাজ করিবার জন্য বিনা বেতনে দাসী পাওয়া গেল মনে করিয়া শাশুড়ী আর কিছু বলিলেন না। শুধু দুটি অন্ন-বস্ত্রের জন্য উমা সকল গঞ্জনা, সকল লাঞ্ছনা মাথা পাতিয়া লইয়া এ সংসারে আশ্রয় লইল। সুখে হোক্ দুঃখে হোক্ দিন এক রকম করিয়া চলিয়া যায়। উমারও দিন যাইতে লাগিল। এই অপার দুঃখের মধ্যেও সে একটু সুখের, একটু আনন্দের স্বাদ পাইল। তার ননদের দু বছরের ছেলেটি তাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল যে, সেও তার ভগ্ন হৃদয়ের বেদনা-জড়িত প্রেমের সবটুকুই তাকে দিয়া তৃপ্তি পাইল। এমন তৃপ্তি উমা জীবনে কখনো অনুভব করে নাই! তার সন্তপ্ত বুকে এই স্বর্গের শিশু অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিল! কিন্তু ইহাতেও সকলের অসন্তোষ! বিরক্তি—শিশুকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া সে হাত করিতে চাহে, একদিন

ননদের মুখ হইতে এমন কথা শুনিয়া সে মর্ম্মাহত স্তম্ভিত হইয়া রহিল! শিশু মার কোল হইতে দুটি ছোট ছোট হাত বাড়াইয়া তার দিকে ঝুঁকিয়া আসিলে উমা পাষাণ-প্রতিমার মতো দাঁড়াইয়া রহিল! হাত বাড়াইয়া আদর করিয়া তাকে কোলে হইতে গেল না। তার পর অশ্রু ঝরিয়া পড়িবার আগেই হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

একদিন বাড়িতে হুলস্থূল ব্যাপার। শিশুর গলার হার হারাইয়াছে। কেমন করিয়া হারাইল কেহ জানে না। কখন হারাইয়াছে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কর্ত্তা-গৃহিণী মহা ক্রুদ্ধ, বাহিরের লোক যারা ছিল তাহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল। কেহ কিছুই জানে না। চাকর দাসীরাও দেখে নাই। গৃহিণী ও তার কন্যা রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া একেবারে উমার ঘরে উপস্থিত। উমা তখন ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিতেছিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া সে এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা আসিয়াই উমার বাক্স খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "ছেলের হার হারালো এ তো ভালো কথা নয়! কোথাও রেখে থাক তো বের করে দাও। এই জন্যে বুঝি ওর এত আদর করতে!" বাক্স খুঁজিয়া হার না পাইয়া তাঁরা আরো রাগিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার সময় বলিলেন,—

"ওকি আর বাক্সর মধ্যে রেখেছে যে আমরা পাব? কা'কে দিয়ে বের করে দিয়েছে, কে জানে।" নির্ম্মম কশাঘাতে উমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে মলিন শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কাতর স্বরে শুধু বলিল, "ভগবান, তুমি এ অপবাদ ঘুচাও।"

পরদিন প্রাতে নিরূপিত কাজে যাইবার জন্য উমা শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বুকে অসহ্য বেদনা, মাথায় নিদারুণ জ্বালা। কেবল একটি কাতর শব্দ "মা মা!"

বেলা হইয়া গেল, সংসারের কাজ কিছুই হয় নাই দেখিয়া শাশুড়ী উমার ঘরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তাকে তখনো শয্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "কাজ না করবার এ একটা ছল মাত্র।"

গভীর নিশীথে উমার একটু জ্ঞান হইল। ধীরে ধীরে সে নিমিলিত চক্ষু মেলিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের দিকে চাহিতে চাহিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সচকিতে সে রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিল। হঠাৎ ঝড়ের মতো বাতাস আসিয়া সজোরে দ্বার খুলিয়া ফেলিল! ঘরে যে মৃণ্ময় দীপ জ্বলিতেছিল,

তাহা নিভিয়া গেল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দুই শীর্ণ বাহু বাড়াইয়া মর্ম্মভেদী যাতনার স্বরে সে বলিয়া উঠিল,—"মা এত দিনে কি মনে পাড়ল।"

উত্তপ্ত মস্তক বালিশের উপর লুটাইয়া পাড়ল। সে আর চক্ষু মেলিল না।

শ্রী—

কৃষ্ণার্জ্জুন

সময় সময় এক জনের সঙ্গে অন্য জনের শুভদৃষ্টি হইয়া থাকে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ এক একটি হৃদয় অতর্কিতভাবে সহসা অন্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, এবং চিরদিন অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। দ্বাপর যুগে দুইটি হৃদয়ে অকস্মাৎ শুভ সম্মিলন হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসৃ-তনয়। তাই কৃষ্ণ বলরাম পাণ্ডব-ভবনে ভ্রাতৃগণ ও পিতৃস্বসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শিষ্টাচার ও প্রণাম বিনিময়ের পরে, ক্রীড়ামত্ত অর্জ্জুনের নিকট পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। অর্জ্জুন ক্রীড়াভঙ্গে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, আর সে চক্ষু ফিরিল না! সে আলিঙ্গনে কি সুধা, সে চক্ষুতে কি অমৃত, সে সম্বোধনে কি মধু রহিয়াছে। অর্জ্জুন মুগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কৃষ্ণ বলিলেন, "আমি তোমার ভাই, কৃষ্ণ।" "কৃষ্ণ! সেই মার কাছে যাঁর কথা শুনেছি, সেই কৃষ্ণ? মাতুল মহাশয়ের পুত্র? কৃষ্ণ, আহা কি মধুর নাম। কৃষ্ণ, আর তোমাকে কোথাও দেখেছি কি? স্বপ্নে তোমার সহিত স্বর্গে মর্ত্ত্যে কি বিহার করেছি?" অর্জ্জুন যেন কৃষ্ণের গায়ে ঢলিয়া পড়িল, কৃষ্ণ তাহাকে কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন। উভয়ের উদ্বেলিত হৃদয় কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন, "সখে, আমায় চিনেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি তোমাকে আগেই জানিতাম, মায়ের নিকট তোমার কথা শুনেই মনে হয় যেন তোমাকে দেখেছি।" অর্জ্জুন মনে মনে মায়ের বাক্য মিলাইতে লাগিলেন। ইনি তো সেই কৃষ্ণ, তাহার কথা কি এমন মধুর, বুদ্ধি কি এমন প্রখর, চরিত্র কি এমন আকর্ষণময়, মূর্ত্তি কি এত সুন্দর! অর্জ্জুন চিন্তার ভাবের সহিত, কথার সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত কত কথা বলিলেন। মধুর মনোহর সুন্দর উপন্যাস-গল্প-মধ্যে

ধর্ম্ম ও নীতির কথা, অর্জ্জুন কাহারো নিকট এমন শুনে নাই। অর্জ্জুন ভাবিতেছিলেন ইনি কে? মনের কথা যেন সব টানিয়া বাহির করিতে পারেন। যাহা আমি ভালোবাসি ইনি আগেই তাহা শিখিয়া আসিয়াছেন। ইনি কে? প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গেল, অদর্শন হইলেও আর বিচ্ছেদ নাই। অর্জ্জুন নামক প্রবল নদ কৃষ্ণ-সাগরে ডুবিয়া গেল! অর্জ্জুন কৃষ্ণ-প্রেমে মজিল, অর্জ্জুন মরিল। অর্জ্জুনের অর্জ্জুনত্ব দূর হইল। অর্জ্জুনে কৃষ্ণ, কৃষ্ণে অর্জ্জুন। মানবে মানবে এমন প্রেম কি কখনো হইতে পারে! প্রেমের ভাষা, গতি, প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমের পরিণতি—এ অতি গভীর শাস্ত্র। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সোপান বান্ধিয়া যায়। মানব ঈশ্বরে, ঈশ্বর মানবে, আবার মানব মানবে—মানব মানবীতে—শিশু বৃদ্ধে বৃদ্ধ শিশুতে কি এক অদৃশ্য অজ্ঞাত অচ্ছেদ্য বন্ধন। অর্জ্জুন আজি সেই বন্ধন অনুভব করিলেন, মুগ্ধ হইলেন। আবেশে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদিলেন। মনোমধ্যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া আবার অর্জ্জুন চাহিলেন। সেই দিব্য মূর্ত্তি যেন জল স্থল অন্তরীক্ষে। হৃদয়ে কৃষ্ণ, বাহিরে কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের জীবনে এমন কখনো হয় নাই! অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ তাই বলিলেন, "সখে, তুমি কে?"

কৃষ্ণ অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া অর্জ্জুনকে পাইয়াছেন। সরলহৃদয়—সাধু চরিত্র—নির্ম্মল ব্যবহার; তেজোময় অমৃতময় কৃষ্ণের একটি অস্ত্রের দরকার ছিল। আজি মিলিল। সে আর কিছু নয় সন্দেহহীন—তর্কহীন নির্ভয়যুক্ত প্রেম—যাহা বলে না, কেন? যাহা জিজ্ঞাসা করে না, কি জন্যে? অথচ যাহা সর্ব্বসিদ্ধির শক্তিময়। অপার তেজ, অসীম শক্তি, অথচ সেই তেজের সঙ্গে সৌদামিনী, অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিলেন। কৃষ্ণ যেন তাহার মুখে খাণ্ডব-দাহন, কুরুক্ষেত্র, বিশ্ববিজয়ী শক্তি দেখিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, সে শৌর্য্য কংস বা জরাসন্ধের মত অত্যাচারী নহে, তাহা দুর্য্যোধনের ন্যায় স্বার্থপর নহে, তাহা ভীমের ন্যায় হৃদয়হীন নহে। শৌর্য্য ও মনস্বীতা, তেজ ও পুণ্য, শক্তি ও বিবেক। কৃষ্ণ ভাবিলেন, এতদিনে মনের মানুষ মিলিল। এই শক্তি বলে জগতীতলে কৃষ্ণ ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের স্থাপন করিবেন। এই শক্তি বলে ধর্ম্মের জয় পাপের ক্ষয় হইবে। কৃষ্ণ দেখিলেন অর্জ্জুনের চক্ষে সেই জ্যোতি, যাহার তেজ ধর্ম্মের আধার, সেই দৃঢ়তা যাহা প্রাণ গেলেও কখনো পাপ করিতে জানে না। সেই উন্নত প্রশস্ত কপাল যাহার রাজ-টিকা শত রাজার রাজ-সিংহাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুনের ওষ্ঠ যাহা জগতের

সকল শক্তির নিকট অদম্য! অর্জ্জুনের হাসি যাহা পুণ্য জ্যোতিঃ। শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ, তুমি কি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে?" কৃষ্ণ বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু তোমার হৃদয়ে চিরদিন থাকিব।" এইরূপে দুইটি হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল যাহা জগতে পবিত্র ব্রত সাধনের জন্য বিধাতার বিচিত্র বিধানে যুগে যুগে এই শুভ সম্মিলন অশেষ কার্য্য উদ্ধার করিয়া থাকে। ত্রেতাযুগে রাম লক্ষ্মণ, দ্বাপরে কৃষ্ণার্জ্জুন। একজন পবিত্রতার আদর্শ, অন্য সেবার পরাকাষ্ঠা—আত্ম-ত্যাগী সংযতেন্দ্রিয়, পবিত্র নিষ্ঠায়, অসীম বীর্য্যবহ্নি। একজন নেতা—অন্য কর্ম্মী, একজন আদেশ করেন না অথচ চালান, আর জন সমুদ্র কান্তারে, বিজন গহনে অনিল অনলে সর্ব্বত্রই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন। উভয়ের শুভ সম্মিলন জগতের অপার মঙ্গলময় দৃশ্য। আজি কথায় নহে, প্রতিজ্ঞায় নহে, কোনো প্রকাশ্য বন্ধনে নহে কিন্তু এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে দুই হৃদয় যুক্ত হইল। যাহা জীবনে-মরণে পরস্পরকে জড়াইয়া রাখিবে। হায়! কোথায় এই বন্ধন! জগৎ খুঁজিয়াও এখন প্রাণের মানুষ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ অসুর বধ করিয়াছেন, শৈশবে নানা ঘটনায় নানা লোকের সহিত মিশিত হইয়াছিলেন। যদুবংশ সমুদ্রোপম, সহোদর মহাবীর অথচ অনুগত—কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় মনের মানুষ কোথাও পান নাই। লোকে বলে জানি না তাহা সত্য কি না বোধ হয় স্মৃতিই এই প্রীতির শুভ সংযোজয়িতা। কৃষ্ণের হৃদয়ে বৃন্দাবনের একটি মধুর স্মৃতি ছিল। যাহা আপনা ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল। অতি মধুর অপ্রাপ্য ভালোবাসা। তাই কৃষ্ণ আজি অর্জ্জুনকে পূর্ণ আলিঙ্গন করিলেন। এখানে কোনো বাধা নাই।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

জন্মেজয়ের সর্পসত্র

অর্জ্জুনের পৌত্র ভারত-সম্রাট পরীক্ষিত মৃগয়াশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া শমীক মুনির আশ্রমে আসিয়া আহার-পানীয় প্রার্থনা করেন। মুনি তখন মৌনব্রতী সুতরাং রাজার প্রার্থনার কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থা অনুভব করিতে না পারিয়া রাজা মুনি কর্ত্তৃক উপেক্ষিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন! এবং সম্মুখে এক মৃতসর্প পাইয়া ক্রোধবশে

উপেক্ষার প্রতিশোধ স্বরূপ মুনির গলদেশে তাহা লম্বিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া পিতার এই দশা দর্শনে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং পিতার অপমানকারী সপ্তাহ মধ্যে সর্পদংশনেই প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া অভিশাপ দিলেন। মৃতসর্প তক্ষক-জাতীয় কি না তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু তক্ষকই যে রাজহন্তা হইবে ব্রহ্মশাপে তাহার উল্লেখ ছিল। সর্পাঘাতে রাজার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ইহা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, সম্রাটের কর্ণেও পৌঁছিল। তিনি অতি সাবধানে পাত্র-মিত্র সহ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। নাগরাজ তক্ষক সর্প-রাজ বাসুকির সহোদর। কুরু পাণ্ডব-দিগের রাজধানী হস্তিনাপুরের উপকণ্ঠেই খাণ্ডববন তাঁহার রাজ্য ছিল, এবং হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্র, প্রভৃতি সমস্তই খাণ্ডব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরের সন্নিকটে খাণ্ডবপ্রস্থের একাংশ অধিকার করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। একে একে অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য এই তক্ষকাধিকৃত খাণ্ডব প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ লাভ করেন। হৃতরাজ্য তক্ষক ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের প্রতি জাতদ্বেষি হইয়া উঠেন। তিনি দেব-রাজ ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং মধ্যে মধ্যে সুযোগ ক্রমে শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। অনার্য্যের এই ধৃষ্টতায় কৃষ্ণার্জ্জুন প্রমুখ আর্য্যগণ অগ্নিশর্ম্মা হইয়াই ছিলেন। গৃহ পার্শ্বে এমন প্রবল শত্রু থাকিতে নিরাপদে রাজ্য করা যায় না এই ভাবিয়া নাগ-রাজ তক্ষকের অনুপস্থিতি-কালে একদা কৃষ্ণার্জ্জুন সহসা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া অগ্নি সংযোগে তাহা ভস্মসাৎ করত বহুদিন-পোষিত ক্রোধাগ্নির তৃপ্তি সাধন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র মিত্ররাজ্য উদ্ধার-মানসে ঘোর সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু চক্রী ও গাণ্ডীবের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। সেই আহবে নাগরাজ-মহিষী অর্জ্জুনের শরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। খাণ্ডববন দগ্ধ হইলে তক্ষক দগ্ধ হৃদয় শীতল করিবার কোনো উপায় না দেখিয়া জীবনমৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে শৃঙ্গীমুনির প্রসাদে এই স্ত্রীহন্তা, রাজ্যনাশী, আততায়ীর মহাপ্রস্থানের পর তাঁহারই বংশধরকে বিনাশ করিয়া দগ্ধ হৃদয় কতকটা শীতল করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। অনার্য্য-রাজ আর্য্যমুনির সহায়তায় এইরূপে স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম ছয় দিন তক্ষক কিছুই করিতে পারিলেন না। এ কয়দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিলে সপ্তম দিনে রাজা পরীক্ষিত আপনাকে

নিরাপদ ভাবিয়া প্রফুল্ল হইলেন এবং হয়ত কিঞ্চিৎ অসাবধানও হইয়াছিলেন। শত চেষ্টাতেও নাগ-রাজ রাজ-প্রাসাদে প্রবেশাধিকার না পাইয়া সপ্তম দিবসে ছদ্মবেশে গুপ্ত হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে রাজ দরবারে প্রবেশ করিলেন এবং পরীক্ষিতের হস্তে একটি রাজভোগ্য ফল দিবার ছলে তাঁহাকে হত্যা করিয়া অদৃশ্য হইলেন। পুরাণে আছে সপ্তম দিবসে একজন একটি সুখাদ্য ফল তাঁহাকে ভক্ষণার্থ দান করিলে তিনি তাহা ছেদন করিতেই তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্ম দেহধারী তক্ষক নির্গত হইয়া রাজাকে দংশন করিল। যেমন করিয়াই হউক ঋষি-বাক্য সফল হইল। তখন যুবরাজ জন্মেজয় শিশু। এই শিশুপুত্র রাজসিংহাসন অধিকার করিলে প্রাচীন মন্ত্রিগণ তাঁহাকে তাঁহার দেশের ও বংশের ইতিহাস শুনাইতেন এবং তাঁহার নিকট পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিতেন। এইরূপ কথা-প্রসঙ্গে একদা জন্মেজয় তক্ষক কর্ত্তৃক পিতৃহত্যার কথা শুনিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হন। এবং অভিশাপকারী মুনিকুমারের কৈফিয়ৎ না লইয়াই তক্ষক-বংশ এবং শুদ্ধ তক্ষক কেন সমুদয় নাগ-বংশ ধ্বংস করিতে মনস্থ করেন। তক্ষকের জ্যেষ্ঠ সহোদর বাসুকি বা অনন্ত বা শেষ, নাগদিগের সম্রাট। ইনি বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক এবং আর্য্যানার্য্য মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহে পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি স্বয়ং ষোড়শমাতৃকার অন্যতমা তুষ্টিদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ভগিনী মনসাকে জরৎকারু মুনির হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণপণে সহায়তা করিয়া দেবতাদের সহিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং যখন দেবাসুরের সম্মিলিত শক্তিতে সমুদ্র মন্থিত হইয়াছিল তখন ইনি সমস্ত শক্তি নিয়োগে রত্নোদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণের নিকট দৈত্যগণ যেমন বঞ্চিত হন, নাগরাজও তদ্রূপ রত্নামৃত লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ দেবগণ স্বকার্য্যসাধন করিলেন বটে, কিন্তু স্বার্থের মাশুল স্বরূপ দৈত্য ও নাগ জাতির হস্তে প্রায়ই বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যেই তাহাদের বিদ্রোহ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া ভস্মীভূত হইতেন। আর্য্যগণের নিকট পরাভূত ও হৃতরাজ্য হইয়া অনার্য্যরাজ বাসুকি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপঃসিদ্ধ হইয়া আর্য্য অনার্য্যের জীবন-যজ্ঞে পুনরায় দেখা দিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সেই ভাবী সংঘর্ষের পরিণাম চিন্তা করিয়া মধ্যস্থ হইয়া আর্য্যগণের হস্তে পুরাতন পৃথিবীর অধিকার দিয়া নাগ প্রমুখ অনার্য্য-

জাতিকে পাতাল সাম্রাজ্যের (আমেরিকার ?) অধীশ্বর করিলেন। পাতালের বিভব আর্য্যাধিকৃত পৃথিবী অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ঐ স্থান সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বরত্ন বিভূষিত। উহা আটটি দেশে বিভক্ত। এক একটি দেশ নানা বিভাগ ও এক এক বিভাগ বহু উপবিভাগে বিভক্ত। তথায় সকল ঋতু বিরাজিত এবং তথায় প্রার্থনীয় কোনো বস্তুরই অভাব নাই। তথায় প্রাসাদ সকল স্ফটিকনির্ম্মিত এবং নানা রত্নেভূষিত। তথাকার স্তম্ভ ও দ্বারসমূহ রত্নখচিত। তথায় সহস্র সহস্র নাগকন্যা এবং নাগ ও রাক্ষসগণ বাস করে তথাকার অধিকারী নাগগণের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহাদের নাম নমুচি, শঙ্কুকর্ণ, মহানাদ, অনন্ত, কুলিক এবং এলাপত্র। রাক্ষসগণের মধ্যে শূলদন্ত, রক্তাক্ষ এবং বিকট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। ইহারা সকলেই সুখী এবং দুঃখ রহিত। ইহাদের দেবীভক্তি অচলা।" ইহা আভাস নামক পাতালের বর্ণনা। দ্বিতীয় বল্লতাল প্রদেশ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "এখানকার মৃত্তিকা পদ্মরাগময়, মন্দিরসমূহ রত্নখচিত এবং ইন্দ্রনীলমণি-ভূষিত, হর্ম্ম্যাবলী অতি উচ্চ। দ্বারদেশে রৌপ্য নির্ম্মিত তোরণ এবং উহা প্রবাল ও মুক্তাদি দ্বারা শোভিত। তথায় বহু কোটী সংখ্যক রাক্ষস, অসুর এবং সর্পগণ বাস করে। প্রহ্লাদ, অগ্নিজিহ্ব এবং অনুহ্রাদ এই তিন জন অসুর। বাসুকি, শঙ্খপাল এবং ধৃতরাষ্ট্র এই তিন জন নাগ। বিদ্যুন্মালী, বিদ্যুজ্জিহ্ব এবং হিরণ্যাক্ষ এই তিন জন রাক্ষস তথায় বাস করে। তাহাদের বিস্তৃত কটাক্ষ, হাব-ভাব, বিশ্রব্ধ আলাপ এবং হাস্য প্রফুল্লতা দেখিলে বোধ হয় যেন কন্দর্প প্রাণত্যাগ করিয়া এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ময়ূরের কেকা ধ্বনি, চাতকের কলনাদ, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং কোকিলের কূজন শ্রবণ করিলে, দুঃখিত ব্যক্তিরও মনে আনন্দ উদ্দীপিত হয়। তথায় অসুরগণ বিবিধ মদ্য এবং পানদ্রব্য পান করিয়া স্ব স্ব ভাবে দেবীর পূজা করে। তৃতীয় প্রদেশ শর্কর। এখানে তারাক্ষ, শিশুপাল ও অমর এই তিন অসুর; কম্বল, ত্র্যম্বক ও পদ্ম এই তিন নাগ, যমদণ্ড, উগ্রদণ্ড এবং বিশালাক্ষ এই তিন রাক্ষস বাস করে। চতুর্থ প্রদেশ গভস্তিক। এই প্রদেশের দৈত্যগণ মহিষের ন্যায়; কালপৃষ্ঠ, কর্কোট এবং শঙ্কুকর্ণ এই তিন জন নাগ। মহাদেব, মহাকায় এবং মহাভুজ এই তিন রাক্ষস বাস করে। পঞ্চম প্রদেশ মহাতল। অমর, তারাক্ষ ও শুম্ভ অসুর, সুপর্ণ, কুলিক ও ধনঞ্জয় এই তিন নাগ; অস্থিভদ্র, বিরূপাক্ষ, উগ্রপাশ, এই তিন রাক্ষস বাস করে। ষষ্ঠ প্রদেশ সুতল। এখানে

কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ ও নিশুম্ভ অসুর ; ৭ম প্রদেশ পাতালে পৌণ্ড্রীক, শ্বেত, ভদ্র, এই তিন জন নাগ, পিঙ্গাক্ষ, মেঘনাদ ও অঘোর এই তিন রাক্ষস এবং ৮ম প্রদেশ রসাতলে জরাসন্ধ এবং বলী প্রভৃতি কোটী কোটী অসুরগণ বাস করে। তথায় ঐরাবত, পিঙ্গ ও অশ্বতর এই তিনজন নাগ ; মরীচি, কুম্ভকর্ণ এবং মাল্যবান এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। ত্রিষষ্ঠী ভুবনের মধ্যে সপ্তপাতাল শ্রেষ্ঠ। পাতালসকল বৃত্তাকার এবং শতকোটী যোজন বিস্তৃত। উহার মধ্যে দৈত্য, নাগ, এবং রাক্ষসগণের তিনটি বিভাগ আছে। অষ্টম উপপাতাল সুবর্ণময়। তথায় ভগবান অর্দ্ধনারীশ্বর বাস করেন এবং ব্রহ্মাদি তথায় নিত্য ক্রীড়া করেন। ঐ স্থানে বিবিধ মনোহর ভোগ্যবস্তু, দেখিলে দ্বিতীয় কৈলাসপুরী বলিয়া বোধ হয়। যে স্থানে ভগবান্ হাটকেশ্বর বরদরূপে অবস্থান করেন, ঐ স্থান স্বর্ণময় এবং বজ্র বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি দ্বারা চিত্রিত। তথায় বিচিত্র ধাতু সকল স্থানে স্থানে বিন্যস্ত হইয়া ঐ স্থানের পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছে। উহা দেবাসুর প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করিতে সক্ষম, তথায় সুগন্ধ ফলপুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ ও ব্রততী সমূহ সকল ঋতুতেই মনোহর শোভা ধারণ করে। সুগন্ধ সুশীতল বায়ু বহমান হইয়া সর্ব্বদা লোকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করে তথাকার উদ্যান ও কানন সমূহ বিচিত্র বৃক্ষমালায় পরিবেষ্টিত এবং তাহার চতুর্দ্দিক স্বর্ণপ্রাচীর বেষ্টিত। সরিৎ তড়াগ এবং দীর্ঘিকাসমূহ দ্বারা ঐ পুরী শোভিত। দীর্ঘিকা সমূহের সোপানাবলী স্ফটিক নির্ম্মিত এবং মধ্যে মধ্যে মুক্তাফল বিগুম্ফিত। জলমধ্যে নীল রক্ত এবং শ্বেত বর্ণ পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছে। ঐ সমস্ত জলাশয়ের পদ্ম-রাজী এবং তটস্থিত বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রস্তর এবং পক্ষিগণ পর্য্যন্তও সুবর্ণময়। তথাকার বিলাসিনীগণ মদোন্মত্তা হইয়া উদ্যান, কন্দর, বন, উপবন ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ক্রীড়া করে। কখন কখন দীর্ঘিকা এবং সরোবর-মধ্যে জলক্রীড়া এবং কখন উদ্যানাদি স্থানে দোলান্দোলনাদি ক্রীড়ারসে মত্ত হইয়া সর্ব্ব দুঃখ শূন্য হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে। ঐ সমস্ত বিলাসিনী সর্ব্বাভরণা হইয়া মহাভাগ্যধর ব্যক্তিগণের সহিত বিচরণ করে। কখন বিবিধ বেশবিন্যাস কখন কবরী-বন্ধন এবং কখন বা লম্বিত বেণী পৃষ্ঠদেশে দোলাইতে দোলাইতে বিচরণ করে। তাহাদের কেহ কেহ মস্তকে বিচিত্র পুষ্পস্রবা পরিধান করে এবং উহা লম্বমান হইয়া পৃষ্ঠদেশে পতিত হয়। কেহ শাখা, কেহ পত্র, কেহ ললাটে তিলক ধারণ করে, কেহ কেহ ললাটদেশে চন্দ্রাকার,

কেহ বা সূর্য্যাকার পত্র রচনা করে। কেহ কর্ণে পত্র এবং কেহ বা কুণ্ডল পরিধান করে। বিলাসিনীগণের লোচন ভয়-চকিত হরিণীর ন্যায় আয়ত ও চঞ্চল এবং শ্বেতাভা মিশ্র উজ্জ্বল—নীলিমা-জড়িত।”

এহেন দেবদুর্লভ পাতালপুরীর মধ্যে ভোগবতীতে নাগরাজের রাজধানী স্থাপিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে পণ্ডিচেরী, চন্দননগর মাহী প্রভৃতির ন্যায় ইক্ষুমতী তীরবর্ত্তী কুরুক্ষেত্র, গোমতীর উপকণ্ঠে নৈমিষারণ্য, গান্ধার উত্তর কূলবর্ত্তী নিষদের পার্ব্বত্যদেশ প্রভৃতি আর্য্য সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকার বজায় রহিল। (মহাভারত—১, ৭৯৯, ৮০৩ ; ৩।১২৩৮৬, ১২৩৪১৯ ; ৬।২৪৬ ; ৮।৪৬৩৩ ; ১২।১৩৮০০)। বাসুকি উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব দূর করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ্যে কালযাপন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐরাবতাদি নাগবংশীয় মহা পরাক্রান্ত সামন্ত রাজারাও তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্যের সহায় দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে নাগরাজ তক্ষকের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধুত্ব হয় (মহা—১।৮০৮৯)। চির শত্রু অর্জ্জুনকে নাগ বংশের অনুকূল করিবার জন্য ঐরাবত বংশীয় কৌরব্য নামক নাগরাজ স্বীয় কন্যা উলুপীকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করেন। কথিত আছে যখন অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসর বনবাস ভ্রমণ করেন তখন এই নাগরাজ-কুমারী তাঁহার মন হরণ করেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে নাগ-লোকে গিয়া বিবাহ করেন। অর্জ্জুন এথানে অবস্থান করিয়া নাগজাতির নিকট ভালো যুদ্ধ শিক্ষা করেন এবং ঐ বিদ্যায় অজেয় হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উলুপী কিন্তু অর্জ্জুনকে জ্ঞাতি হিংসার প্রতিশোধ স্বরূপ উপযুক্ত শিক্ষা দিতে বিস্মৃত হন নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন মণিপুরে উপস্থিত হইয়া চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করিলে বভ্রুবাহন তাহা প্রথমে উপেক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু নাগকন্যা উলুপী তথায় উপস্থিত হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সপত্নীপুত্রকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে অর্জ্জুন, পুত্র-হস্তে পরাজিত হতগর্ব্ব ও মূর্চ্ছিত হইলে উলুপী নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ আনিয়া তদ্দ্বারা পতির চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং এইরূপে অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে অর্জ্জুন যে নাগজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন নাই। ওদিকে ইন্দ্রের সখা ও সারথি মাতলি স্বীয় কন্যা গুণকেশীকে ঐরাবত বংশীয় আর্য্যক নাগের পুত্র সুমুখের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে

গরুড়ের সহিত ইহার শত্রুতা ছিল। গরুড় তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময় মাতলি জামাতাকে লইয়া ইন্দ্রালয়ে যান এবং বিষ্ণুকে সমস্ত জ্ঞাত করেন। বিষ্ণু সুমুখকে অভয়দান করিলেন কিন্তু গরুড় তাহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুরই সমক্ষে ইন্দ্রের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তখন বিষ্ণু গরুড়ের উদ্ধত্য ও গর্ব্ব খর্ব্ব করিলে লজ্জিত গরুড় সুমুখের সহিত কোলাকুলি করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল।

কথিত আছে ভৃগুমুনির সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে ভৃগু-পত্নীকে পুলোম নামক রাক্ষস বিবাহ করিয়াছিলেন (মহা ১।৮৯৭) অর্জ্জুন যেমন নাগবালা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ভীম তেমন রাক্ষসী হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যক্ষ এবং রক্ষ উভয়েই দেবগণের সৈন্যভুক্ত ছিল। পুষ্পক পিশাচবাহন; কুরু পাণ্ডবীয় সংগ্রামে কুরুপক্ষে অনেক অসুর যুদ্ধ করিয়াছিল। এইরূপে; দেখা যায় অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যগণের ক্রমেই সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছিল। নাগগণ বহুলাংশে আর্য্যসভ্যতা অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইত। তাহারা সুরূপ ও সুবেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা আর্য্যগণের ন্যায় রত্নকুণ্ডল কানে ধারণ করিত (মহা—১।৭৯৭। ১২।১৩৮২৫)। তাহারা বহুবংশে বিস্তৃত ছিল। তাহাদের অনেকেই সন্তানগণের আর্য্যনাম অনুযায়ী নাম রাখিত। অর্ব্বুদ অথসেন, আর্য্যক, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, নহুষ, পদ্মনাভ, শ্রুতসেন প্রভৃতি নাম তাহার নিদর্শন। নাগগণ আপনাদের হৃতরত্ন লাভ এবং আর্য্যগণের হস্ত হইতে নষ্ট ধন পুনরুদ্ধার মানসে বহু কৌশল অবলম্বন ও শক্তি নিয়োগ করিত। মধ্যে মধ্যে তাহাদের প্রাণান্ত সংগ্রাম হইত কিন্তু অধিকতর শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী আর্য্যদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। পোষ্যরাজ পত্নীর কুণ্ডলের প্রতি নাগরাজ তক্ষকের লোলুপদৃষ্টি এবং ছদ্মবেশে তাহা সুযোগক্রমে হরণ করায় ঈপ্সিত রত্নাধিকারী আর্য্যগণের অপেক্ষা তাহাদের বলহীনতাই প্রকাশ পায়। এবং ঐ রত্ন হরণ করিয়া উতঙ্কমুনিকে যেরূপ নাকাল করিয়াছিলেন তাহাতে এবং ছদ্মবেশে গুপ্তাঘাতে পরীক্ষিতের যেরূপে প্রাণনাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের আর্য্যবিদ্বেষই সূচিত করে। উভয়ের মধ্যে শত্রুতার যেরূপ প্রবল স্রোত চলিয়াছিল তাহার পরিণাম যে অনতিদূর ভবিষ্যতে অতি শোচনীয়ভাবে প্রকাশ পাইবে দূরদর্শী নাগসম্রাট বাসুকি তাহা উপলব্ধি করিয়াই স্বীয় ভগিনীকে অন্য কাহার হস্তে—দেব দানব গন্ধর্ব্বাদির হস্তে সমর্পণ না করিয়া রাজা প্রজা উভয়েরই পূজ্য

তপঃতেজঃপ্রভব আর্য্যঋষির সহিত ভগিনী মনসার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। জরৎকারু মুনির ঔরসজাত ও মনসার গর্ভসঞ্জাত আস্তিকমুনি মাতুলালয়েই অবস্থান করিতে থাকেন। অতঃপর জন্মেজয়ের সর্পসত্ররূপ নাগবংশের সর্ব্বনাশকাল সমুপস্থিত হইলে এবং তক্ষক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত উতঙ্ক-মুনি তক্ষকসহ নাগবংশ লোপকল্পে উৎসাহ ও পরামর্শদাতা হইলে বাসুকি মহা চিন্তাকুল হইলেন। এদিকে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন হইল। সেই মহাহবে দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শত শত নাগ প্রজ্বলিত হুতাশনে বিসর্জ্জিত হইল। মধ্য যুগের ইনকুইজিশয়ের বিচারে দণ্ডিত বন্দীর মত তক্ষক আনীত হইলে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন কিন্তু খাণ্ডব-দাহনকালে দেবরাজ যেমন শরণাগতা তক্ষক-পত্নীকে রক্ষা করিতে পারেন নাই এবারে তদ্রূপ শরণাগত বন্ধুকে বাঁচাইতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন! তক্ষক হতজ্ঞান হইয়া তখন অগত্যা যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইতে যাইতেছেন এমন সময় নাগবংশের পরিত্রাতারূপে আস্তিকমুনি আসিয়া মাতুলের প্রাণরক্ষা করিলেন। বাসুকি সর্পসত্রের সংবাদ পাইবামাত্র মনসাদেবীর দ্বারা তৎপুত্র আস্তিকমুনিকে নাগকুল রক্ষার জন্য যজ্ঞস্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে মুনিবর উপস্থিত হইয়া প্রবোধবচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করত যজ্ঞ রহিত করিয়া দেন। তক্ষক প্রমুখ নাগগণ তখন অব্যাহতি লাভ করেন। ইহারই পর হইতে অনার্য্য নাগজাতির মধ্যে প্রথম মনসা পূজার সূত্রপাত হয় এবং আর্য্যদিগের মধ্যেও মনসা পূজা প্রচার লাভ করিয়া আর্য্যানার্য্যের মধ্যে সন্ধির সূচনা করে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সরমা

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

একটা কথা আছে, "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ"। বিলাসপুরের বিখ্যাত জমিদার মুকুন্দলাল রায়চৌধুরী ভগবানের কৃপায় সেই লক্ষ্মীলাভ হইতে বঞ্চিত হ'ন নাই। তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর প্রভূত আয়! তাঁহার একমাত্র পুত্র সরল ও কন্যা লীলা বড় আদরের—বড় স্নেহের! তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদ জ্ঞাতি কুটুম্বে ভরিয়া গিয়াছে—সকাল-সন্ধ্যা এক শ' করিয়া পাতা পড়ে। লোকলস্কর

গাড়ি-ঘোড়া কিছুর অভাব নাই। তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মণ। দানে মুক্তহস্ত। তাঁহার দেবালয়, তাঁহার অতিথিশালা তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। চৌধুরী মহাশয়ের এত বড় সংসারটি তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নী বিমলার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। তিনি প্রত্যহ সকলের সংবাদ লইয়া থাকেন ও নিজে তাহাদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দেন, পরে সকলের আহার শেষে তিনি আহারে প্রবৃত্ত হন।

প্রভাতে যখন সরল ও বিজয়কে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন বিমলা ভাবিল বুঝি কোথাও বেড়াইতে গিয়াছে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যখন তাহাদের আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখনো ফিরিয়া আসিল না— তখন এ সংবাদ চৌধুরী মহাশয়ের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি মুখ হইতে সটকাটি নামাইয়া বিস্মিত ভাবে কহিলেন,—"তাইত গেল কোথা!"

বিমলা ছল্ ছল্ নেত্রে বলিল,—"কি জানি!"

চৌধুরী মহাশয় আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া যেখানে যেখানে উহাদের যাতায়াতের সম্ভাবনা আছে, সেই সমস্ত স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন একে একে সকলে নৈরাশ্যের বোঝা লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন বিমলা শয্যাশায়ী হইল। বাড়িতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক ছুটিল— কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল, কেহই সরল ও বিজয়ের উদ্দেশ পাইল না। সে দিন সকলের আহারাদি বন্ধ হইয়া গেল। বিমলা ঠাকুর ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিল। লীলা অশ্রু সজলনেত্রে কহিল,—"বাবা, দাদা কোথায় গেল?"

চৌধুরী মহাশয় লীলার অশ্রু মুছাইয়া সস্নেহে বলিল—"কেঁদ না মা, কোথায় গিয়েছে এখুনি আস্‌বে।"

"মা, তবে কেন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলেন?"

চৌধুরী মহাশয়ের হৃদয়ের উপর কে যেন একখানা পাষাণ চাপাইয়া দিল। তিনি বেদনা কাতর-হৃদয়ে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তা কি করে জানব— ঠাকুর যদি দয়া করেন—" তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। তিনি অশ্রু মুছিয়া লীলাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের এতবড় বাড়িটি আজ একটির অভাবে নীরব নিরানন্দ স্তব্ধ, মৌন! বেলা যখন শেষ হইয়া আসিল—তখন সকলের মন হইতে বিজয় ও সরলের আশা যেন ছায়ার ন্যায় সরিয়া গেল—ক্রন্দনের একটা তুমুল রোল যেন সেই নীরব

পল্লীটিকে সচকিত করিয়া তুলিল। থানায় থানায় খবর দেওয়া হইল—কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করা হইল—যে কেহ ইহাদের আনিয়া দিতে পারিবে সে উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিবারও ব্যবস্থা করা হইল।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে—আকাশে দুই চারিটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন সময় সরলের চিঠি লইয়া পত্রবাহক আসিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল! সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সে কি চায় তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—বেচারা থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল—সে চায় বড় বাবুকে—চিঠি আছে। উপরের বারাণ্ডা হইতে চিঠির কথা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় দ্রুত নামিয়া আসিলেন।

পত্রবাহক চৌধুরী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তে পত্র খানি দিয়া এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

চৌধুরী মহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন, চিঠিখানার শিরোনামা সরলেরই হাতের লেখা—পুলক বিহ্বল হৃদয়ে তিনি চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিলেন—তাহাতে লেখা ছিল।—"পরম পূজনীয়

লিখিতে লজ্জা হয়—কাল রাত্রে আপনার এই অকৃতজ্ঞ সন্তান বিজয়ের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া আপনার বাক্স হইতে টাকা লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছিল। বিজয়ের মনে যে একটা দুরভিসন্ধি ছিল তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই—সে আমাকে কুয়াশার অন্ধকারে নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া নৌকা ঘুরাইয়া একদিকে চলিয়া গেল—কেহ আমাকে তুলিবার চেষ্টাও করিল না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি এক দিদি পাইলাম। তাঁহার যত্নে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় আমি জীবন লাভ করিয়াছি—তিনি তাঁহার হাতের চুড়ী খুলিয়া ডাক্তারের ভিজিট দিয়াছেন—আমি এখন তাঁহারই নিকট গোপালপুরের ঘাটে নৌকাতে আছি—শরীর বড় দুর্ব্বল উঠিতে কষ্ট হয়। বুঝিতে না পারিয়া একটা গর্হিত কার্য্য করিয়াছি—আশা করি অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার স্নেহের
সরল।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠিল—তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন—"আর ভয় নেই,

সরলের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে—এ সংবাদে সহসা সেই বিষাদমাখা বাড়ি-খানা মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় হাসিয়া উঠিল—মেঘের অন্তরাল হইতে যেন দীপ্ত সূর্য্য বাহির হইল। তখনই সরলকে আনিতে যাইবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল। চৌধুরী মহাশয়ের ইঙ্গিতে সরকার রাধানাথ কোচম্যানকে ডাকিয়া তিনখানি গাড়ি তৈরি করিতে আদেশ করিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই গাড়িগুলি আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল। একখানি গাড়িতে বিমলা লীলাকে সঙ্গে লইয়া উঠিল। অপর খানিতে চৌধুরী মহাশয় উঠিলেন—ঐ গাড়ির কোচবাক্সে পত্রবাহক উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত হইয়া চলিল। শেষ খানিতে চৌধুরী মহাশয়ের কয়েক জন বিশেষ আত্মীয় উঠিলেন।

রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় গাড়ি ক'খানি সুপ্ত পল্লী চকিত করিয়া গড় গড় শব্দে গোপালপুরের ঘাটে আসিয়া থামিল। বিমলা ও লীলা গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল—উহাদের হৃদয়ের বেগ তখন ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে—বিমলা উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে আবেগভরে বলিয়া উঠিল,—"কৈ, কোথায় তাদের নৌকা—সরল কোথায় ?" চৌধুরী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁক দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'বাত্তি লেয়াও।'

দুই জন সহিস গাড়ির লণ্ঠন খুলিয়া উঁহাদের সম্মুখে ধরিল। পত্রবাহক দাঁড়ী তাঁহাদের পথ দেখাইয়া নৌকাতে আনিয়া তুলিল। সরল তখন কমলা প্রদত্ত আলোয়ানে আপনার দেহ ঢাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—কমলা তাহার শিশুটিকে লইয়া তাহার মস্তকের নিকট বসিয়া আছে। পার্শ্বে একটি হরিক্যান জ্বলিতেছে।

বিমলা নৌকার ভিতরে আসিয়া একেবারে ঘুমন্ত সরলকে জড়াইয়া ধরিল, একটা রুদ্ধ ক্রন্দন তাহার বুক চিরিয়া বাহির হইয়া আসিল" ওরে বাবারে ! আমার ! সরল চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার স্নেহময়ী জননী তাহার মস্তক আপন ক্রোড়ে তুলিয়াছে—সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাতার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—'মা।' লীলা নৌকার উপর পিতার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। মাতার আকুল ক্রন্দনে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল এবং চকিতে নৌকার ভিতরে আসিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—"দাদা তুমি বাড়ি চল, আজ আমাদের কারুর খাওয়া হয়নি।" লীলা সরলের হাত ধরিয়া টানিল—সরল তাহাকে সাদরে আপনার পার্শ্বে বসাইল। চৌধুরী মহাশয় নৌকার দ্বারের নিকট বসিয়া পড়িলেন—আর আর সকলে গঙ্গাতটে দাঁড়াইয়া রহিল—কারণ নৌকাখানিতে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নহে !

বিমলা অশ্রু মুছিয়া কমলার দুইহস্ত ধরিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল,—"তুমি যেই হও মা, সরল তোমাকে দিদি বলেছে তুমি আমার মেয়ে—তুমি আমার সরলের প্রাণ দিয়েছ—তোমার কাছে আমরা চিরঋণী—সরল আমার সাঁঝের বাতি।" বিমলা আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল চোখদুটি আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

কমলা আপন অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া বিনীতভাবে কহিল "মা আমাকে অত কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন। ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন—আমি কে? সরল আমাকে দিদি বলেছে—সরলের সরল কথাগুলি আমার বড় ভালো লাগে, সরল যেন আমার কত দিনের পরিচিত—সরল আমার ভাই! বিমলা উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিল—"মা, তুমি তোমার হাতের চুড়ী খুলে ডাক্তারকে দিয়েছ—পরের ছেলের জন্যে এত কে করে মা!"

সরল সুবিধা পাইয়া এইবার বলিল—"দিদি মাঝিকেও একখানি চুড়ী দিয়েছিল—আহা সে ব্যাচারি বড় ভালো মানুষ—চুড়ী ফিরিয়ে দিয়েছে! সেই আমাকে জল থেকে তুলেছিল মা!"

বিমলা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"কোথায় সে মাঝি!"
"সে বাড়ি গিয়েছে, তার ছেলের অসুখ—কাল সকালে এই নৌকতেই আসবে।"

বিমলা কমলার হাতদুটি ধরিয়া স্নেহভরে কহিল,—"আজ মা তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তারপর কাল যেখানে বল্‌বে আমি নিজে গিয়ে তোমাকে রেখে আস্‌ব?"

কমলা যে হঠাৎ এতটা পরের স্নেহ মমতার ভিতর আসিয়া পড়িবে—তাহা সে সপ্নেও একবার ভাবে নাই। তাহার সমুদায় প্রাণটা যেন গলিয়া জল হইয়া নয়ন দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে আর্দ্রস্বরে বলিল,—"মা, এখন আমার দাঁড়াবার স্থান নেই—এই গোপালপুরে আমার মামার বাড়ি—এখানে এসে শুনলুম মামা ঘর-বাড়ি বেচে কোথায় চলে গেছেন, তাঁর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না!"

"সে জন্যে ভাবনা কি মা, এখন তুমি আমার বাড়ি চল—তারপর——"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কমলা মৃদুস্বরে বলিল—"না মা, আমার যাওয়া হবে না। আমাকে তিন চার দিন নৌকতেই থাকতে হবে?"

"সে কি কথা! কেন মা—?"

কমলা ধীরে ধীরে অঞ্চল হইতে হরিপদর চিরকুটখানি খুলিয়া বিমলার হস্তে অর্পণ করিল।

বিমলা চিরকুটখানি পড়িয়া সানন্দে বলিল—"এই জন্যে? এর ব্যবস্থা আমি এখনি করচি" বলিয়া বাহিরে আসিয়া চৌধুরী মহাশয়কে চিরকুটখানি দিয়া কি বলিল। চৌধুরী মহাশয় সাগ্রহে নৌকার দরজার নিকট হইতে কমলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি আমার বড় মেয়ে—আর লীলা ছোট। (কমলা নিতান্ত লজ্জিতভাবে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল) মা, আমি বল্‌চি, আজ তুমি আমার বাড়িতে চল, আমার কথাটা ঠেল না—নৌকায় কি মানুষ থাকতে পারে? আমি এখানে সমস্ত রাতের জন্যে লোক মতেয়ান করে রাখ্‌চি, তিনি এলেই তাঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে।"

কমলা কোনো উত্তর করিল না, মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। বিমলা আসিয়া কমলার হাত ধরিয়া টানিল—কমলা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে উঠিল—লীলা কমলার শিশুটিকে বক্ষে লইয়া তাহার পিতার নিকট আসিল, তিনি উহার মুখচুম্বন করিয়া মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন একে একে সকলে আসিয়া গাড়িতে উঠিল—চৌধুরী মহাশয় সরলের হাত ধরিয়া গাড়িতে তুলিলেন। তারপর সরকার কালাচাঁদকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখ কালাচাঁদ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, পার্ব্বে তো?"

"পারবো বৈ কি মশায়।"

"কি করবে বল দেখি?"

"এই—যা বলবেন।"

চৌধুরী মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ তোমাকে তিন চার দিন এই নৌকায় ঘাটে থাকৃতে হবে। নৌকা থেকে কোনো ভদ্রলোক নামলেই তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করবে, যদি শোনো হরিপদ বাবু, অমনি তাঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে আস্‌বে। কেমন পারবে তো?"

"এই কাজ! এ আর পারবো না? ঠিক পারবো!"

"তোমার খরচ-পত্তর আমি কাল সকালে পাঠিয়ে দেব। আর দেখ এই নৌকার মাঝি এলেই কাল আমার বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। মনে থাকে যেন! আজ তুমি এই নৌকাতেই থাক!"

"যে আজ্ঞে তাই হবে!"

এ ক'দিন যেন আফিনের মৌতাতে ভোর হয়ে থেক না, বেশ হুঁসিয়ার হয়ে থেকো !"

"আর কিছু বলতে হবে না।"

গাড়ি ক'খানি তখন আনন্দ-কোলাহলের সহিত বিলাসপুর অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ছোট।

—:(*):—

"জালাভরা জল তো আছে, তৃষ্ণায় কেন মর রে ভাই ?"

"বড় জালা তুল্‌তে গালে আমার যে ভাই, শক্তি নাই !"

"যে কলসী-দে ভর্‌লে জালা সে কলসী তো পড়ে' অই !"

"ভরা জালা, কা'ৎ করিয়ে জল গড়া'তে শক্তি কই ?"

"জালার ভিতর বুড়িয়ে কলসী জল নেওয়া কি চলে না ?"

"কলসীটার যে পেটটা মোটা, জালার মুখে গলে না !"

"খুলে বল—কি চাও এখন, দিব এনে তাই !"

"বাঁচি এখন, যদি ছোট ভাঁড় একটা পাই।"

"বিপদ প'ড়্‌লে বুঝ্‌তে পার—ছোট বাঁচায় প্রাণ ;
কোথা রহে এ বুঝ্‌টা, পেলে বিপদ থেকে ত্রাণ ?"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

হেঁয়ালী-নাট্য

প্রথম দৃশ্য

জমিদার দর্পনারায়ণ বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় আসীন।

সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—চারু ও মিহিরের প্রবেশ।

দ। এই যে আপনারা দু'জনেই এসেচেন, খবর কি? কাল রাত্রে খাওয়া দাওয়াটা তো ভালো হয়েছিল?

চারু। তোফা—তোফা—তোফা! সুন্দর আয়োজন হয়েছিল!

দ। ওরে কে আছিস—বাবুদের তামাক দে।

চা। আপনার ঝি-জামাই—

দ। ঝি-জামাইকে বিদেয় দিয়ে এই সবে একটু বসেচি।

চা বিপিন বাবুর মুখে শুনলুম, বরকর্ত্তারা গ্রামভাঁটি, বারোয়ারি, লাইব্রেরি প্রভৃতির জন্যে একশো টাকা দিয়ে গেছেন, সেই জন্যে ছুটে আস্‌চি; আমাদের প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দিন!

দ। ও সব মিছে কথা—শোনেন কেন?

চা। সে কি মশাই—সে টাকা তো আপনার নয়?

দ। আমার নয় তো কি আপনার? জানেন আমার মেয়ের বিয়েতে কত খরচ হয়েচে?

চা! আজ্ঞে আমাদের সেটা জানবার বিশেষ দরকার নেই—আপনি বড় লোক, অনেক খরচা করতে পারেন, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য টাকার উপর হাত দেওয়া আপনার মতন লোকের উচিত নয়। যা দেবেন এই খাতায় লিখে সই করে দিন।

দ। কী! আবার খাতা—খাতা দেখাচ্ছেন—এক পয়সাও দেব না!

চা। একেবারে বঞ্চিত করবেন না, যা হয় যৎকিঞ্চিৎ দিন!

দ। দেখুন, আপনারা আমার প্রতিবেশী তাই আপনাদের ভালোর জন্যে বলচি, এখান থেকে উঠে যান। যদি যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে উঠিয়ে দিতে হয়——

চা। কী! আপনি এত বড় কথাটা বল্‌লেন—মিহির ওঠ, এ বাড়িতে আর নয়!

দ। (রাস্তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া) সোজা রাস্তা রয়েছে—টাকা খোলামকুচি নয়!

চারু ও মিহিরের প্রস্থান।

মি। (পথে যাইতে যাইতে) দেখ্‌লে ভাই, একশো টাকা কেমন হজম করে' ফেল্লে। তারপর কি না এই রকম করে অপমান। ছিঃ!

চা। ও কত বড় জমিদার হয়েচে, তাই আমি একবার দেখবো, ওর দর্প চূর্ণ যদি আমি না করতে পারি, তা হ'লে আমাকে আর চারু বলে ডেকো না—কুকুর বোলো!

মি। জমিদার হলে কি হয়, মন্‌টা ভারি নীচ—ব্যবহারটা ইতরের মতো!

চা। ঘটে কিছু নেই কি না! দেখ না ওকে আমি জব্দ করি! তোমাকে কিন্তু এ বিষয়ে একটু সাহায্য করতে হবে।

মি। বেশ, করব! ব্যাপারটা কি একটু খুলে বল না।

চা সব শুনতে পাবে—তোমাকে না বলে কোনো কাজই কোরবো না। বিপিন বাবুকেও হাত করতে হবে। এখন আপিসের বেলা হ'ল—এখনি দুটো নাকে মুখে গুঁজে দৌড়ুতে হবে। বিকেলে তুমি আমার বাড়িতে এসো, আমি যে মৎলবটা স্থির করেচি, সেইটে তোমাকে বোলবো—আর তোমার মাথায় যদি কিছু থাকে তাও শুনে মৎলবটা পাকা করা যাবে! কি বল?

মি। সেই ভালো—বৈকালে আমি তোমার বাড়িতে যাব!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দর্পনারায়ণ বাবুর শয়ন-কক্ষ—দর্পনারায়ণ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী মন্দিরা।

ম। হ্যাঁগা তুমি মেয়ের বিয়েতে কত টাকা দান করেছ?

দ। কে বল্‌লে?

ম। পাড়ায় তো খুব গুজব—বাংলা কাগজগুলোতে পর্য্যন্ত দেখ্‌ছিলুম, তুমি না কি লাইব্রেরির জন্যে পাঁচ হাজার আর ইস্কুলের জন্যে দশ হাজার টাকা দান করেছ?

দ। বাংলা কেন এই দেখ ইংরেজি কাগজগুলোতেও ঐ খবর প্রচার হয়েচে। (লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া খবরের কাগজগুলি মন্দিরাকে দেখান) এই দেখ না—কবে রায় বাহাদুরী পাই।

ম। খবরটা কি সত্যি?

দ। খেপেচ—ইস্কুলের জন্যে বিপিন বাবু, আর লাইব্রেরীর জন্যে চারু বাবু এসেছিলেন—কিন্তু কিছু না দিয়েই দেখ কি রকম যশ কিনেছি!

ম। কেন বল দেখি, তোমার নামে হটাৎ এ খবরটা বেরুল ?

দ। তা জানি না, বরাত ভালো বল্‌তে হবে—আর নতুন বেয়াই আমার এই দানের কথা কাগজে পড়ে কি মনে করবে বল দেখি ?

ম। মনে করবে মস্ত দাতা !

দ। মন্দ কি ? কার ভাগ্যে এতটা যশ আপনা হ'তে আসে বল দেখি ?

ম। বোধ হয় এতে বিপিন বাবু আর চারু বাবুর কিছু কারচুপি আছে।

দ। তা যদি হয়, তারা আমার মস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী সন্দেহ নেই। যাই এখন বাইরে গিয়ে দেখিগে, আরো হয় তো দু' একখানা খবরের কাগজ এসেছে !

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দর্পনারায়ণ বাবুর বৈঠকখানা—নিমাই সরকার খাতা লিখিতেছে।

দর্পনারায়ণ বাবুর প্রবেশ।

দ। কি হে নিমাই, আজ কিছু কাগজ-পত্র এল নাকি ?

নি। হাঁ—আজ তিনখানা কাগজ এসেছে—লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া অংশটা দেখ্‌বেন (কাগজ দেওন)।

দ। (সট্‌কাটি মুখে দিয়া কাগজ পাঠে রত। পাঠ শেষ করিয়া নিমাইয়ের দিকে চাহিয়াই) কিহে নিমাই, এবার খাজনা-পত্র কেমন আদায় হ'ল ?

নি। না মশাই বড় সুবিধে নয়—বাকি খাজনার অনেকগুলো নালিশ রুজু কর্‌তে হবে।

দ। বাইরে ও কে দাঁড়িয়ে, দেখ তো, আলি নাকি ?

নি। হাঁ—আলি বটে।

দ। ডাক তো।

আলির প্রবেশ ও দর্পনারায়ণ বাবুকে অভিবাদন।

দ। কি হে আলি, কি মনে করে ? খাজনা-টাজনা কিছু এনেছ নাকি ?

আ। এজ্ঞে—খাজনা কোথা পাব—এবারে কি আবাদ কত্তি পারলুম—বন্যেয় সব ভেসিয়ে দিয়ে গেল, খাতি পাই না—হাল-গোরু সব বেস্তি হবে। ঐ জিজ্ঞেস্ করুন না—আব্বাস—কাত্তিক—ফজলা—সকলেই এসেছে।

দ। কোথা তারা ?

আ। ঐ যে বাইরে ডেঁড়িয়ে।

দ। ডাক্ তাদের !

সকলের প্রবেশ ও দর্পনারায়ণ বাবুকে অভিবাদন।

দ। খাজনা আননি তো, তোমরা কি করতে এখানে এলে বাপু—রথ দেখতে ?

আ। এজ্ঞে—শুনলুম আপনার মেয়ের সাদিতে অনেক টাকা দান খয়রাত করেছেন। আর এই গরীব প্রজাদের খাজনাটা এবার রেহাই দেবেন—আর ছেলে-মেয়েগুলোর মিঠাই খাবার জন্যেও কিছু কিছু দান করবেন। সেই জন্যে আমাদের হুজুরের দরজায় আসা।

দ। নিমাই, দাও বেটাদের নামে নালিস রুজু করে। খাজনার কথা উড়িয়ে দিয়ে মিঠাই খাবার টাকা নিতে এসেচ—ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি! আমি বলি—বেটারা বুঝি খাজনা এনেছে! বেরো বেটারা বেরো—দরোয়ান—দরোয়ান !

সভয়ে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দর্পনারায়ণ বাবুর বৈঠকখানা—দর্পনারায়ণ বাবু আসীন।

দুইটি ভদ্রলোকের প্রবেশ।

দ। আপানারা কাকে চান ?

প্র-ভ। আজ্ঞে আপনার কাছেই আমরা এসেছি।

দ। তা বেশ বসুন, ওরে কে আছিস্, বাবুদের তামাক দে! আপনাদের আগমনের কারণ ?

প্র-ভ। আপনি মহোদয় লোক—আপনি দাতা—আপনার যশে চারি দিক ভরে গেছে—আমাদের একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে—সেইটের উন্নতি কল্পে কিছু দেন।

দ। দান! দান! দান করে' করে' আমি ফতুর হয়ে গেছি—দান আর আমি করতে পারবো না।

প্র-ভ। কিছু সামান্য !

দ। এক কড়া কানা কড়িও না।

গাহিতে গাহিতে একদল বাউলের প্রবেশ।

দ। এরা কারা? বাউলের দল দেখছি যে—কি চাই আপনাদের?

বা। আপনার যশোসৌরভ চারি দিকে ব্যাপ্ত—আপনি দাতা কর্ণ—আমরা আপনার গুণ কীর্ত্তন করতে এসেছি!

দ। বেশ, গান! আপনার হাতে ওটা কি?

বা। খাতা।

দ। কিসের?

বা। চাঁদার।

দ। এ্যঁ্যা! চাঁদা—চাঁদা—চাঁদা আর দিতে পারবো না। চাঁদা দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গেছি!

বা। আপনি রাজা, হাত ঝাড়লে পর্ব্বত—বেশি আকাঙ্ক্ষা নাই—গুঁড়ো-গাঁড়' যা দেবেন তাতেই খুসী।

চারিটি ভদ্র লোকের প্রবেশ।

দ। আপনারা কি মনে করে এসেচেন বলে ফেলুন?

প্র-ভ। আজ্ঞে আপনি বিদ্যানুরাগী—স্বধর্ম্মপরায়ণ, দাতা—আমরা আপনার নাম শুনে অনেক দূর থেকে আসচি—আমাদের দেশে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছি—সেই জন্যে কিছু চাঁদা—এই খাতায় একটা সই——

দ। কী! আবার খাতা—আবার চাঁদা—তোমরা কি আমার বাড়ি-ঘর-দোর লুটে নিয়ে যাবার ফিকির করেছ?

দ্বি-ভ। এঁরা সকলেই কিছু কিছু পেয়েছেন বোধ হয়, আমরা গরীব আর বাকি থাকি কেন?

দ। যা হবার তা হয়ে গেছে, আর হবে না—কেটে ফেল্‌লেও আর হবে না—জমিদারিটা কি তোমাদের জন্যে বাঁধা দেবো?

একদল সখের যাত্রাওয়ালার প্রবেশ।

দ। এ আবার কি? যাত্রার দল কে বায়না করলে? এ বাড়ি নয় এ বাড়ি নয়!

যাত্রার দলের অধিকারী। আপনার জয় জয়কার হোক, আপনার নামে গান বেঁধে এনেছি শোনাব।

দ। থাক থাক, এখন আপনার অভিপ্রায়টা কি বলুন দেখি।

অ। কিঞ্চিৎ চাঁদা।

দ। চাঁদা, চাঁদা—আবার চাঁদা—এ চাঁদার জ্বালায় আমি কি দেশ ছেড়ে পালাবো না কি ?

অ। আমাদের সে রকম দু' দশ হাজার দিতে হবে না, দু'শো এক শো হলেই আমরা খুসী। (ছেলেদের প্রতি) গাও গাও তোমরা বাবুর যশ-গান গাও।

দ। থাম—থাম!

অ। না-না—গাও-গাও!

বন্দেমাতরম্ গাহিতে গাহিতে নিশান হস্তে একদল স্বদেশীর প্রবেশ।

দ। এ যে দেখচি বন্দেমাতরমের দল, কে এদের ডাকলে ?

একটি ভদ্রলোক। আজ্ঞে কেউ আমাদের ডাকে নি—আপনি স্বদেশী—দেশের গণ্য-মান্য পরিচিত ভদ্রলোক, আপনি দাতা—আপনার বাড়িতে আজ আমরা বন্দেমাতরম্ গাইব।

দ। গান তাতে ক্ষতি নেই—আপনার হাতে ওটা কি ? খাতা নাকি ?

ভ। না, খাতা নয়।

দ। আঃ বাঁচলুম—তবে ওটা কি ?

ভ। থলি।

দ। কি হবে ?

ভ। চাঁদা।

দ। (লাফাইয়া উঠিয়া)—চাঁদা—আবার চাঁদা! আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েচে—ওরে হরে ?

নেপথ্যে। এই যে দিদিমণির ঘরে বিছানা তুলছি—পুলিস—পুলিস—পুলিস পুলি-পলাও বাবুর বাড়ী ডাকাত পড়েচে।

অন্দরে করুণ স্বরে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

নেপথ্যে। ওরে হরে, তুই শীগ্‌গীর গিয়ে ডাকাতের দল থেকে বাবুকে ছিনিয়ে নিয়ে আয়।

নেপথ্যে। ও মাঠাকুরণ, অত বড় ডাকাতের দলে আমি একলা গিয়ে কি প্রাণটা হারাব ? ইস্ত্রীটাকে বিধবা করব ?

নেপথ্যে। বেরো বেটা নেমকহারাম, বাড়ি থেকে বেরো।

নেপথ্যে করুণ স্বরে। ও বাবা গো, কি হবে গো, দান করে ডাকাতের হাতে বাবুর প্রাণটা বুঝি যায় গো—তোমরা কে কোথায় আছ দেখ

গো। এ রাজ্যিতে কি থানা-পুলিস নেই গো—দিনে ডাকাতি একি সর্ব্বনাশ গো!

বেগতিক দেখিয়া সকলের প্রস্থান। দর্পনারায়ণের অন্দরাভিমুখে গমন।
স্থানীয় হরিসভার কর্ত্তৃপক্ষদের প্রবেশ।

আপনারা কেমন বিদায় পেলেন?

বেশ পেয়েছি, আপনারা শীগ্‌গীর যান—বাবু অন্দরে গেলেন বলে।

কর্ত্তৃপক্ষদের উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় ও অন্দরের দরজায় দর্পনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ।

মশাই, আমাদের নিবেদনটা শুনুন—পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে পড়েছে বলে বঞ্চিত করবেন না।

[দর্পনারায়ণ বাবু সজোরে অন্দরের দিকে ধাবমান ও কর্ত্তৃপক্ষের একজন তাঁহার হস্ত ধরিয়া বাহিরের দিকে আনিবার চেষ্টা করায় দর্পনারায়ণ বাবুর পতন ও মূর্চ্ছা।]

ক-প। আহা বাবুর মাথাটা ফেটে রক্তের নদী হয়ে গেল—বরফ—বরফ —বরফ—ওহে পাঁচু শীগ্‌গীর বরফ আন।

অন্দরে করুণ সুরে। ওগো ডাকাতগুলো তাঁকে মেরে ফেলে চলে গেলো গো—ওরে হরে, কোথা গেলি দেখ্‌না—ওগো কি হবে গো!

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

শারীরিক যন্ত্রণা

একদিন প্রাতে বরাহনগরের বাড়িতে আমার পেটে একটা বেদনা উপস্থিত হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে তাহা এত বেশী হইতে লাগিল যে, ক্রমে অসহ্য বোধ হইয়া উঠিল। বিছানা হইতে নীচের মেজেতে পড়িয়া এদিক ওদিক গড়াইতে লাগিলাম। তখন ডাক্তার ডাকানো আবশ্যক হইল। স্মরণ নাই, কে ডাক্তার ডাকিতে যাইতেছিল—দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্র কবিরাজ যাইতেছেন, তাঁহাকে ডাকিব কি?" আমি, বলিলাম "ডাকো।"

মহেন্দ্র বাবুর পিতা হরিশ পাল মহাশয় আমাদের পাড়ায় চিকিৎসা করিতেন। বরাহনগরের সন্নিকট সিঁতি তাঁহাদের বাড়ি। আমরা ছোট বেলা হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি গত হইয়াছেন। মহেন্দ্র বাবুও চিকিৎসায় বেশ বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন। সকলের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট সদ্ভাব --বিশেষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের একজন বিশিষ্ট ভক্ত।

মহেন্দ্র বাবু আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়াই বলিলেন, "আতপ চাউল ধোয়া জল একটু পাওয়া যাইবে?" নদিদি তখনি নিকটস্থ এক বাড়ি হইতে তাহা আনিয়া দিলেন। মহেন্দ্র বাবু বসিয়া থাকিয়াই একমোড়া ঔষধ আমাকে সেবন করাইলেন এবং পরমহংস মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সেই অসহ্য যাতনা কিছু কমিয়া আসিল। তিনি আর কয়েক মোড়া ঔষধ দিয়া সে দিনকার মতো চলিয়া গেলেন। বোধ হয়, ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইল।

আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয়, এই ঘটনায় আমার মনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হয় যে, কোনোরূপ অসহ্য যন্ত্রণার পর তাহার উপশমে কেমন আরাম বোধ হয়! ইহা তো শারীরিক সম্বন্ধে; কিন্তু মনের যে অশান্তি, তাহা দূর হইলে বোধ হয় সে আনন্দ আরো কেমন গভীর—অশান্তি দূরের কি কোনো উপায় নাই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে যেন একটু আশার আলোক—উৎসাহ আসিতে লাগিল। কিন্তু কি করিলে মনের অশান্তি দূর হইতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

ইহার পর মহেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আমার যখনি দেখা হইতে লাগিল, তখনি তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম এবং তাঁহার মতের কথা আমাকে শুনাইতে লাগিলেন। তখন পরমহংস মহাশয় অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় কাশীপুরে এক বাগান-বাড়িতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে যাইবার কথাও মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে হইল। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ইহা বাংলা ১২৯২ সালের প্রথমেরই কথা।

সংযম

আমার কনিষ্ঠ সহোদর যতীনকে বরাহনগর ইংরাজি ইস্কুলে পড়ানো হইতেছিল। বরাহনগরে বাসা রাখার ইহাও অন্যতম কারণ। এই সময়ের মধ্যে আমার

মনে যতটুকু সংস্কারের ভাব আসিয়াছিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল যে এখন হইতে আমাদের বংশাবলীর মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে।

যতীনের সহপাঠী বালকের মধ্যে মতিলাল চক্রবর্ত্তী আমার কিছু অনুগত হইয়া উঠে। যখন আমার মনের একটু পরিবর্ত্তনের ভাব আসিতেছিল, তখন এই বালক আমাকে সম্মান করিতে লাগিল। তাহাতে আমার মনে একটা আত্ম-সম্মানের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ভবিষ্যতে আমাকে যাহা হইতে হইবে, মতিলাল যেন আমাকে তাহাই করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। সহসা এমন হওয়া যে ভগবানের বিশেষ করুণা তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

এই সময় আমাদের এই পালপাড়ায় ছেলেরা একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মতিলাল তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করে। তখন আমার মনের যে প্রকার অবস্থা,— আমি উৎসাহ পূর্ব্বক আহ্লাদের সহিত তাহার প্রস্তাব মতো কার্য্য করিয়া বরং তৃপ্তি অনুভব করিলাম। মতিলাল লাইব্রেরীর পুস্তক আনিয়া আমাকে পড়িতে দিত। আর কি কি পুস্তক পড়িয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই, কিন্তু যখন আমার প্রাণ শান্তি-অন্বেষী হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিল, তেমন দিনে একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নাম "ধর্ম্মবিজ্ঞান বীজ।" পুস্তকখানির রচয়িতা নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক স্বর্গীয় কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ। কিন্তু তখন রচয়িতাকে চিনিতাম না, এবং সে জন্য আমার মনে কোনো ভাব হয় নাই। এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক খণ্ডে বিভক্ত,—কেননা আমার হাতে যেখানি পড়িয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ড। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পুস্তকের প্রথম খণ্ড ছাড়িয়া দ্বিতীয় খণ্ড পাইলাম,—সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা জানিতেন যে, এই খানিই আমার প্রয়োজন। ইহাতে একটি প্রবন্ধ পড়িলাম "সংযম।" অত্যন্ত ক্ষুধিত ব্যক্তি প্রচুর সুখাদ্য পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, আমার যেন তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইল। আমি তখন যাহা খুঁজিতে ছিলাম, তাহার সন্ধান পাইলাম। আমি বুঝিলাম, প্রাণে শান্তি লাভ করিতে হইলে সমুদয় কু-অভ্যাস কদাচার পরিত্যাগ করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হইবে। চরিত্র গঠন করিবার একমাত্র পথ সংযম। সংযম দ্বারাই শক্তি লাভ করিতে হইবে। সংসারে অনেকের পক্ষে বোধ হয় এরূপ ঘটনা হয় যে, মন্দ বুঝিয়াও অভ্যাস-বলে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না—শক্তিতে কুলায় না,—এখনো ভাবিতে প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে—কি শুভক্ষণে এই

'সংযম' মন্ত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন মনে হইল, যাহা করা আবশ্যক আমি তাহাই করিব। আমার কিছুমাত্র শক্তির অভাব বোধ হইতেছিল না। অদম্য শক্তি যেন আমার করতল-ন্যস্ত হইল। অনেকে বলেন, "ক্রমে ক্রমে কু অভ্যাস ত্যাগ করিতে হয়, এক দিনে হয় না।" আমি তখন দেখিলাম, এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। পাপকে আর মুহূর্ত্তও অবকাশ দেওয়া হইবে না,



১২৯২ সাল। ২৫ বৎসর বয়স।

এক কোপে তাহাকে বলিদান করিতে হইবে। এক দিনেই তামাক, পাণ, মাছ, মাংস ত্যাগ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কু অভ্যাস ত্যাগ করিতে লাগিলাম। ত্যাগে আনন্দ পাইলাম। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন

হইল। প্রাণে এমন গাম্ভীর্য্য আসিল যে, হাস্য পরিহাস একেবারে চলিয়া গেল। মুখ গম্ভীর হইল। আহার, পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত বদলাইয়া গেল। শাদা থান কাপড়, মোটা চাদর, চটী জুতা; নিরামিশ ভোজন,—কঠোর সংযমে উৎসাহ বাড়িতে লাগিল।

এই পরিবর্ত্তনের পর ছয় মাস কালের মধ্যে মনের সঙ্গে শরীরেরও যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বাল্যবন্ধু হরিবিহারী সেনের যত্নে একদিন আমার একটি ফটো লওয়া হইল। অনেক দিনের হওয়ায় ফটোখানি তেমন উজ্জ্বল নাই, তথাপি, আত্মগৌরবার্থে নহে—আমার প্রিয়জনের চিত্ত-বিনোদনার্থ এখানে তাহা প্রদত্ত হইল।

এই অবস্থায় বরাহনগরে আরো কিছুকাল কর্ম্মসূত্রে থাকিলাম বটে কিন্তু এই স্থানের সঙ্গ, কার্য্য, চরিত্রাদি সকলই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় দাঁড়াইতে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু সে উদ্যমের নিকট কোনো বাধাই টিকিল না। পাপ প্রলোভন পরাস্ত হইয়া আর আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। ক্রমে ত্যাগ সুখের বিষয় হইল।

পরলোকগত কর্ম্মী

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈদপুর-নিবাসী ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহরমপুরের তদানীন্তন সব-ডিপুটী শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল বহরমপুরে ও পাঁকুড়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। পাঁকুড় হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ-এ, পড়েন। বাল্যকাল হইতে ইনি যাঁহার সংস্রবে আসিতেন, তাঁহারই স্নেহলাভ করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্য পাঁকুড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজা বাহাদুর তাঁহাকে একটি দু'নলা বন্দুক উপহার দেন। এক সময়ে তাঁহার ডিপুটী হইবার সুযোগ হইলেও তাঁহার পিতার পরামর্শে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় অবলম্বন করেন। প্রথমে কমিশেরিয়েটে ছোলা ও ভুষি সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট পান। কিন্তু তাহাতে

বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় সুবিখ্যাত এণ্ড্রু ইউল কোংর সত্ত্বাধিকারী সার্ ডেভিড ইউল মহোদয়ের উপদেশে পাটের দালালি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার শিক্ষকগণকেও মুগ্ধ করেন ও স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে দালালি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই দালাল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার যশোরাশি বিকীর্ণ হইয়া অনেক নীচমনার ঈর্ষাভাজন হইয়া উঠেন। এই সময় শাদা কালো নির্ব্বিশেষে যাহারই সংসর্গে তিনি আসিয়াছেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারই হৃদয় অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতির মূলমন্ত্র "সারল্য ও সাধুতা।" তাঁহার ব্যবহারে ইংরাজ বাঙালী সমভাবেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার সরল শুভ্র হাসি যে দেখিয়াছে, সে জীবনে কখনো ভুলিবে না। এরূপ সদালাপী,—সদানন্দ লোক খুব অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ব্যবসায়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিত্য তাঁহার আপিসে মিলিত হইতেন। কোনো কোনো ইংরাজ তাঁহাকে আদর করিয়া "পাট ব্যবসার নেপোলিয়ান" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙালীগণ তাঁহাকে সার্ আর, এন্, মুখোপাধ্যায়ের মতো শক্তিসম্পন্ন বলিতেন। ইদানীন্তন জে, আর মিলার সাহেবের মতো সম্ভ্রান্ত ইংরাজও তাহার অধীনে কর্ম্ম করিতে অগৌরব মনে করিতেন না। তাঁহার আপিসের ব্যয়ই মাসে তিন সহস্র মুদ্রা ছিল ; ইহা হইতে কার্য্যের পরিমাণ করা অসম্ভব নহে। পাকা গাঁটের কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আগামী বর্ষে বিলাত যাইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। ইংরাজ, পার্শী, মাড়োয়ারী, জৈন, বাঙালী, সকল সম্প্রদায়ে তাঁহার অসংখ্য বন্ধু ছিল। তিনি দানে ও সদ্ব্যয়ে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্বগ্রামের সন্নিকটস্থ গোবরডাঙ্গা ইস্কুলের উন্নতি-কল্পে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করেন। এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে আরো অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মৃত্যুর সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে স্বগ্রামের পথঘাটের উন্নতিকল্পে তাঁহার দুইটি ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া গৈপুর লইয়া যান। যমুনার স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাট ভাঙিয়া যাওয়ায় তথায় লোহার ঘাট প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছিলেন ; দেশের দুর্ভাগ্য যে, এমন সময় তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি অসীম। যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তিনি অনেক উন্নতি করিতে পারিতেন।

পাটের কার্য্য শিক্ষার অবস্থায়, পিতা তখন বিদেশে, কলিকাতায় হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়াছেন, তথাপি পিতাকে খরচের অনাটনের কথা জ্ঞাপন করেন নাই। এই অবস্থা হইতে নিজের মনের জোরে ও অধ্যবসায় গুণে অতি অল্পকালের মধ্যে যে, তিনি অগাধ ঐশ্বর্য্য উপায়ে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা বাঙালীর পক্ষে অতি উচ্চ আদর্শ।

শ্রী—

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

যমুনা-সংস্কার মেমোরিয়াল প্রস্তুত হইয়া তাহা ছাপা হইয়াছে। এক্ষণে গভর্ণরের নিকট পাঠাইলেই হয়। আমাদের মনে হয় এই কার্য্য যেরূপ তৎপরতার সহিত হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, কমিটির সম্পাদকের উপর সকল কার্য্যের ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত। কেবল মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইয়া থাকি—কত দূর কি হইল! শুনিলাম, মেমোরিয়াল ছাপার সামান্য খরচ ছাপাখানার দেনা আজো শোধ হয় নাই। সকল বিষয়েই দেশের জনসাধারণে উচ্চ শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য করে। সেখানে যদি উৎসাহের কার্য্য দেখিতে পায় তবে সহজেই সকলের মনে উৎসাহ আসে।

গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে দেয়াড়া গ্রামের প্রান্তরে যমুনা নদীর কূলে,—মাঘী পূর্ণিমায় স্নান-উপলক্ষ্যে প্রতি বর্ষে এক বিস্তৃত মেলা হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, এই দিনে গঙ্গাদেবী, ভগিনী যমুনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সে যাহা হউক এই মেলা বহু কাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে এক পক্ষকাল ইহা স্থায়ী হইয়া বহু সহস্র লোক সমাগম হয়। এই স্থান বাবু গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের জমিদারীর অন্তর্গত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ম্যানেজার বাবু শিখরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য যথোচিত পরিশ্রম সহকারে মেলার সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাদৃশ অসংখ্য নরনারীর স্নানের একটিও ঘাট নাই, সুতরাং কাদা ভাঙ্গিয়া স্নান করিতে যে কিরূপ কষ্ট হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা এই মেলা সম্বন্ধে জমিদার বাবু এবং ম্যানেজার বাবুকে দুইটি বিষয়ে অনুরোধ করি। প্রথম ঘাটের জন্য। দ্বিতীয়, মেলাক্ষেত্রে যে একটি জঘন্য

বিসদৃশ ক্রি.ার প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা এককালীন বন্ধ করা আবশ্যক। শেষ বিষয়টির জন্য যদি তাঁহারা মনে করেন যে তাহাতে মেলায় লোক সমাগম এবং আয় কমিয়া যাইবে, তাহাতে আমরা বলি---গত চৈত্র মাসে গৈপুরে একটি ক্ষুদ্র মেলা হয়, তাহাতে ওরূপ কোনো কুরুচির কার্য্য হয় না, অথচ ঐ মেলার পরিসর অনুযায়ী লোক সমাগম কিছু কম হয় না,—আর এক কথা, কোনো রূপ জঘন্য কার্য্যের দ্বারা অর্থাগমের পথ প্রশস্ত রাখা কোনো ভদ্র লোকেরই উচিত নহে।

অনেক দিন হইতে গোবরডাঙ্গায় যুবকগণের দ্বারা একটি থিয়েটার-পার্টির সূচনা হইয়া এক্ষণে তাহা সাধারণ থিয়েটার কোম্পানি-রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এখন তাহার উন্নতির অবস্থা দেখা যাইতেছে। গ্রামে অধিকাংশ ভদ্র-শ্রেণীর যুবকগণ এই অভিনয় ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক সময় দেশের যুবকগণের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, সুনীতি সঞ্চার দ্বারা দেশের সকল প্রকার সংকার্য্যের একটি উৎসাহী দল গঠন করার উদ্দেশ্যে আমরা কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তাহার একটি কারণ, আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসার অতি কম। যতটুকু ছিল তাহার মধ্যে সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। প্রবল বাধা বিঘ্ন মাথা তুলিতে দেয় নাই। আমাদের দেশে এক সময় যাত্রা এবং কথকতার দ্বারা সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেও সমস্ত মহাভারত, রামায়ণের মর্ম্ম যেমন সহজে প্রচার হইয়াছিল, তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অভিনয়ের ভিতর দিয়া সাহিত্য প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে। ইস্কুল-কলেজের উচ্চ শিক্ষা না পাইয়াও উচ্চ শিক্ষার ভাব কতক কতক পাইয়াছে। অভিনয়ে চরিত্র অঙ্কনের যে অসীম ক্ষমতা আছে তাহার বাহ্য ভাবগুলি লাভে অনেকে সুযোগ পাইয়াছে। সুতরাং ইহাতে যে জনসমাজের কিছু উপকার হয় নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু এই অভিনয় ক্ষেত্রে অপবিত্রতার সংস্রব থাকাতে অপকারের ভাগই অধিক হইয়াছে। আমাদের পল্লীগ্রামের অভিনয়-ক্ষেত্রে সে অপবিত্রতা নাই; কিন্তু থিয়েটারের যে আদর্শ, তাহার প্রসূতি ঐ সহরের থিয়েটার এই জন্য ইহাতে চরিত্র গঠনের কোনো সহায়তা করে না। সেইটিই ইহার অসার দিক। ইহাতে যুবকগণের মধ্যে যেটুকু একতা স্থাপন হইতেছে তাহা তেমন উচ্চভাবের ভিত্তিতে নহে। তবে মন্দের ভাল।

সপ্তগ্রামী তাম্বুলীবালকগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

কুশদহ সপ্তগ্রামী তাম্বুলীসমাজের অসমর্থ শিক্ষার্থী বালকগণকে শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সাহায্য প্রদানের জন্য কতিপয় স্বজাতি হিতৈষী ভদ্রলোক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে, এই শ্রেণীর বালকগণ হিন্দুসমাজের অপরাপর জাতির ন্যায় শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করেন। কাহারা কোন্ বিষয়ে সাহায্য লইতে চাহেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাত হইবেন। সমস্ত পত্র গোপনীয় রাখা হইবে, কাহারো নাম প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা নাই।

ঠিকানা—ক, খ, গ

কেয়ার্ অফ্ শ্রীযুক্ত অশোক চন্দ্র রক্ষিত

১৫৩।১ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা

১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা.

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র সমূহের সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সচিত্র নূতন গল্পের বই



চারিবর্ণে মুদ্রিত ও স্বর্ণমণ্ডিত কয়েকখানি সুন্দর মৌলিক চিত্রে শোভিত।

বাঁধাই সম্পূর্ণ অভিনব—নয়নরঞ্জন।

বঙ্গবাসী—"গল্পগুলি ভাল। ভাষায় কায়দা আছে। 'ব্যর্থ' গল্পটীতে করুণ রস উথলিয়া উঠে।"

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"আপনার বিচিত্রা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, গল্পের প্লট রচনায় আপনার ক্ষমতা আছে, যাহা আজ কাল ছোট গল্পে বড় বেশী দেখা যায় না। আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। এই সংগ্রহে আপনার কতকগুলি গল্প যথার্থই ভাল জিনিষ হইয়াছে।"

মূল্য বারো আনা মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত



বালক বালিকাদিগের জন্য সরল ও সুমধুর গদ্যে-পদ্যে লিখিত বহু হাফটোন ও নানাবর্ণে রঞ্জিত স্বর্ণমণ্ডিত চিত্র সম্বলিত নূতন বই।

বালকবালিকাদিগকে উপহার দিবার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক

মূল্য আট আনা মাত্র।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য :—

ম্যানেজার—নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১২।১ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা।

N. A. Press

পঞ্চম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ [২য় সংখ্যা

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
সাধারণ সংস্করণ ১৲ এক টাকা
উৎকৃষ্ট ,, ২৲ দুই ,,

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য
সাধারণ সংস্করণ ⁄১০ দেড় আনা
উৎকৃষ্ট ,, ⁄৩০ তিন ,,







গোবরডাঙ্গার জমিদার ভ্রাতৃগণ

রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর — শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় — ৺প্রমদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস—কলিকাতা।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০	দ্বিতীয় সংখ্যা

দাসের দৈনিক প্রার্থনা

উদ্বোধন

প্রভু পরমেশ্বর, একটিবার তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে দাও। ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও তোমার স্পর্শ দান করো। একবার তোমার দিকে তাকাই। তোমার শরণাপন্ন হই! তোমার আরাধনা করিয়া যেন কৃতার্থ হই।

শেষ প্রার্থনা

অদ্যকার দিনের প্রতি আশীর্ব্বাদ করো, তোমার শক্তির দ্বারা যেন সমস্ত দিনের কার্য্য সম্পন্ন হয়—আমার আমিত্ব-অভিমান অহঙ্কার প্রকাশিত হইয়া তোমার কার্য্যের এবং তোমার সন্তান-সন্ততিগণের যেন বিঘ্ন না জন্মায়।

অদ্যকার অন্ন-জল তুমিই প্রদান করো, তোমার হাতে পান-ভোজন করিয়া যে পবিত্র শক্তি সঞ্চিত হইবে, তাহা যেন তোমারই কার্য্যে ব্যয় করিতে পারি।

এই গৃহের প্রতি তোমার মঙ্গল-ছায়া প্রকাশিত রাখো। অজানিত বিপদ আপদ বিঘ্ন এবং দুর্ম্মতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করো। সকলের মঙ্গল করো, যে যেখানে আছে—যাহাকে স্মরণ হইতেছে, যাহাকে স্মরণ হইতেছে না, সকলেরই কল্যাণ করো—বিশেষভাবে আমার জন্মভূমির কল্যাণ করো। সমুদয় অভাব অনাটনে তুমিই প্রভু লজ্জানিবারণ। দীনবন্ধু, কৃপা করো, কৃপা করো।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কিসের আশে প্রাণ রাখিবে

ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভবের নিশীথিনী ঘেরিবে ঘনঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে ; সাধের ধন জন, দিয়ে বিসর্জ্জন, কিসের আশে প্রাণ রাখিবে ?"

বাস্তবিক আমরা সংসারে কি দেখিতে পাই ? যত দিন যায়, বয়সও যত বাড়িতে থাকে ততই এই জীবন অবসন্ন হইয়া আসে। প্রথম অবস্থায় যে কয়দিন শরীরে বল ও স্বাস্থ্য থাকে, তখন মনে হয়, এ দুনিয়া কি মজার স্থান! মনে যা আসে তাই করি—সুখের অন্বেষণে ধাবিত হই। স্বেচ্ছাচারের ফলে শরীর শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়ে, শরীরে নানা রোগ প্রবেশ করে। তখন ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তিটুকু চলিয়া যায়, রোগ ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ি।

সংসারে যখন পুত্র কন্যা, ক্রমে পৌত্রাদি পাঁচটি জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যে হয় তো দু' একটি করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, তখন শোক কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারি। তা' ছাড়া বড় বড় গুরুতর শোকের ব্যাপারও আছে। সংসারে এমন কেহই নাই, যিনি শোকের কশাঘাত না পাইয়াছেন! ক্রমে রোগে, শোকে, বিষাদ নিরাশা আসিয়া আমাদিগকে যখন আচ্ছন্ন করে, সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভবের নিশীথিনী, ঘেরিবে ঘনঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে ?"

এ সংসারের বিষয়েও এক প্রকার আনন্দ আছে। সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি মানুষের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাহা লাভেও আনন্দ আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, তাহা প্রকৃত আনন্দ নয়। বিষয় লাভে যে আনন্দ, তাহার মধ্যে স্বার্থ, অভিমান, অহঙ্কার অর্থাৎ বিষয়-আসক্তি বর্ত্তমান থাকে। মানব-চিত্তের ঐ অবস্থা চিত্তকে অতিশয় মলিন করিয়া রাখে, অথচ বিষয়-মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষ সে মলিনতার অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, বরং অহঙ্কার এবং আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিয়া এক প্রকার নিকৃষ্ট সুখ অনুভব করে। কিন্তু অশান্তি বলিয়া দেয়, 'বিষয় আনন্দ, বিমল আনন্দ নহে।' বিষয়-আসক্ত-চিত্ত কখনই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

যদি সুন্দর সুকুমার, সুকুমারী পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রীতে গৃহ পূর্ণ হয়, তাহাতে যে এক প্রকার নয়নানন্দ না হয় এমন নহে। কিন্তু ইহাও প্রকৃত আনন্দ নহে। ইহার মধ্যে সর্ব্বদা ভয় এবং সংশয় উপস্থিত হয়। যদি কাহারো

একটু পীড়া হয়, অমনি মন অস্থির হয়। তাহার উপর মৃত্যু আসিয়া দেখাইয়া দেয়, এই যে নয়নানন্দ ইহা নিরাপদ নহে। তাই ভক্ত-বিশ্বাসী আবার বলিতেছেন,—"সাধের ধন জন, দিয়ে বিসর্জ্জন, কিসের আশে প্রাণ রাখিবে ?"

সত্যই আমাদের কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয় যে, আমরা এ সংসারে কিসের আশায় প্রাণ ধারণ করিতেছি ? কোন্ বস্তু মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য-স্থল হইতে পারে ? কোন্ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারি ? সেই বস্তু কি এই সংসারের ধন, জন, মান ও সম্পদ ? কই, তা' তো হয় না, সংসার নিয়ত দেখাইয়া দিতেছে, ধনে জনে পরম শান্তিলাভ হয় না। এ সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর।

তবে কি এ সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই ? আছে! কিন্তু সে পথ সকলে অন্বেষণ করে না। সে যে জ্ঞানের পথ। জ্ঞান ভিন্ন এ সংসারে মানুষ তো কখনই সুখী হইতে পারে না। সংসারে থাকিয়াও যিনি জ্ঞানী, তিনি সুখী। জ্ঞানী কে ? জ্ঞানের লক্ষণ কি ?—জ্ঞান কাহাকে বলে ? সাধারণ ভাবে জানা মানেই জ্ঞান! বস্তু-জ্ঞানও জ্ঞান বটে! কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান বলিলেই তত্ত্ব-জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। তাহার মধ্যে ব্রহ্ম-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই, তাহার আর যত জ্ঞানই থাকুক না কেন, তাহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং, নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরাযয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অর্থাৎ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

এখানে বিদ্যা অর্থে জ্ঞানকেই বুঝাইতেছে, শ্রেষ্ঠবিদ্যা বা পরম জ্ঞান, ব্রহ্ম-জ্ঞান ; ব্রহ্ম-জ্ঞান কাহাকে বলে ? যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম-জ্ঞানী। ভগবানকে জানার প্রধান লক্ষণ এই যে, বিশ্ব-জগতের সকল বস্তুই ভগবানের, সকল বস্তুতেই ভগবানের সত্তা বিদ্যমান। এই জ্ঞান ঠিক হইলে তিনি নিজেকে ভগবানের সন্তান বা দাস বলিয়া বুঝিতে পারেন। নিজের আমিত্ব কিছুই নয়, সকলই যে ভগবানের বিভূতি, তাঁহার এই জ্ঞান নিশ্চয় হয়। তখন তিনি একমাত্র ভগবানের আদেশ পালনই জীবনের কার্য্য জানিয়া দেহ, মন, প্রাণ সকলই তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া

পড়েন। যাঁহার হৃদয় ঈশ্বর-বিশ্বাসে দৃঢ় হইয়াছে, তিনি ঈশ্বর-আদেশ বুঝিতে পারেন। নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানের আলোকে বুঝিয়া তখন তিনি ঈশ্বর-প্রীতি-কামনায় জগতের সেবায়—নরনারীর হৃদয়ে আনন্দ দানের অভিলাষী হইয়া কার্য্য করেন। সেই কার্য্য তাঁহার কর্ম্ম-যোগে পরিণত হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে নানা পরীক্ষা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু অন্য দিকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া শেষ বিশ্বাস ভক্তিরই জয় হয়।

ধন-সম্পদই হউক বা পুত্র পৌত্রাদিতে গৃহ পূর্ণ হউক, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের দাস জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সংসার বা বিষয়, ধর্ম্ম-সাধন পথের বাধা জন্মায় না। তিনি যদি সকলই ঈশ্বরের বলিয়া জানেন, তবে তাঁহার আর বিঘ্ন রহিল কোথায়? বরং ভক্তির চক্ষে সকল বিষয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া সাধক আনন্দে কৃতার্থ হন। স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পদ সকলই ঈশ্বরের, নিজ দেহ মন ইন্দ্রিয় সকল তাঁহারই জন্য,—চক্ষু যদি সেই রূপ দেখাইয়া না দেয়, কর্ণ যদি সেই নাম শ্রবণে অনুরাগী না হয়,—রসনা যদি সেই পরম দয়াল নাম উচ্চারণ না করে, তবে ইন্দ্রিয় সকল বৃথা। তাই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভাবুক-ভক্ত গাহিয়াছেন,—

"কি ফল দেহ ধারণে, বিফল দেহ ধারণে।
ধারণ যে নাহি করে নিখিল জগ-কারণে।
শাখামৃগ মূর্দ্ধা সম শির-কিরীট মণ্ডিত, ভব-তারণ চরণে যেই নাহি হয় লুণ্ঠিত।
বৃথা নয়ন যথা ময়ূর-পুচ্ছ-'পরি অঙ্কিত, মনমোহন-রূপ-দরশনে যেই বঞ্চিত।
আবর্জ্জনা কুণ্ড সম যথা শ্রবণ-গহ্বর, নাহি বহে যাহে নাম অমিয়-নির্ঝর।
ভেক জিহ্বাসম মরণ ডাকি আনে, ধিক্ রসনা বিরত যেই হরিনাম গানে।"

বাস্তবিক এ জীবন যদি ভগবানের অধীন না হইল, তবে সকলই বৃথা। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল পশুর ন্যায় পান-ভোজনে আর বৃথা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ায় জীবনযাপন করিয়া শেষ যখন শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসে, প্রিয় বস্তু সকল চলিয়া যায় কিম্বা আমি যে দিন চলিয়া যাইব, তখন কি লইয়া যাইব? তাই বলি, সময়ে কি একবার আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নয় যে, "সাধের ধন জন দিয়ে বিসর্জ্জন,—কিসের আশে প্রাণ রাখিব?"

দাস—

আওরাঙ্গাবাদে

আওরেঙ্গজেব

এই বিশ্বসংসারের সমগ্র মানব প্রকৃতি যদি চিরদিন একই ভাবে—একই গতিতে প্রবাহিত হইত, তবে এত দিন এ জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা বোধ হয়, অন্য বর্ণে অঙ্কিত হইত। পৃথিবীর যাবতীয় লোকই যদি দশানন বা কংসের মত দেব-দ্বিজ-দ্বেষী, অত্যাচারী ও নৃশংস হইত, তবে আজ আমরা এই পৃথিবীর শস্য-শ্যামলা-সুহাসিনী-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বিকট দৈত্য-দানবের তাণ্ডব নৃত্যে কম্পিত এক মহাশ্মশান দৃষ্টিগোচর করিতাম। প্রকৃত পক্ষে বিষধর ভুজঙ্গ-শিরে যেমন অমূল্য মণি অদৃশ্যভাবে অদৃশ্যাবস্থায় লুক্কায়িত থাকে, তেমনি মানবের বহিঃপ্রকৃতির অন্তরালে এক অন্তঃপ্রকৃতি লুক্কায়িত থাকে। পাষাণের মধ্য দিয়া যেমন নির্ম্মল স্রোত-ধারা প্রবাহিত হয়, অথচ সে স্রোত কোথা হইতে আসে, তাহা কেহ জানিতে পারে না; তদ্রূপ মধ্যে মধ্যে এক একজন পাষাণ-প্রতিম লোকের এতাদৃশ মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মোগল-সাম্রাজ্য-গগনের শেষ-সূর্য্য সম্রাট্ আওরেঙ্গজেব কঠোর, অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক প্রভৃতি বিশেষণে ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্ত্তৃক বিশেষিত। প্রকৃত-পক্ষে বঙ্গের শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ও সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবের নাম ভারত-বাসী যত দূর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সহিত উচ্চারণ করে, আর কোন নবাব বা সম্রাটের নাম তাদৃশ ঘৃণাসহকারে উচ্চারণ করে কি না জানি না। এতাদৃশ-নির্ম্মম, অত্যাচারী, ভ্রাতৃহন্তা আওরেঙ্গজেবের চরিত্রে যখন মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের সমাবেশ দেখি, তখন বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই।

আওরেঙ্গজেব, দাক্ষিণাত্যের আওরাঙ্গাবাদে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বহুবৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদের তদানীন্তন সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত; কিন্তু কুটিল কালের বিষ-দৃষ্টিতে এখন আর সে সৌন্দর্য্যের ক্ষীণ রেখাটুকুও নাই। জগতের রীতিই যখন এইরূপ, তখন ইহাতে কিছু বিস্ময়ের বিষয় নাই! হায়দ্রাবাদ-নিজাম সিংহাসনে উপবেশন করিবার প্রাক্কালে প্রত্যেক নূতন নিজাম একবার এই সহর পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ করেন। বলা বাহুল্য, এটি নিজাম রাজ-পরিবারের প্রথা। আওরাঙ্গাবাদে

আওরেঙ্গজেব ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সমাধি দিয়াছিলেন। আওরাঙ্গাবাদের ষোড়শ মাইল দূরে "রোজা" নামক ক্ষুদ্র সহরে আওরেঙ্গজেব স্বয়ং সমাহিত হইয়াছিলেন।

আওরাঙ্গাবাদ নিজাম রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই সহর বোম্বাই হইতে ১৭৫ এবং হায়দ্রাবাদ হইতে ২৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সহরের লোকসংখ্যা ৬০,০০০ ষাট হাজার ছিল, কিন্তু মৃত্যুর ভীষণ তাড়নায় এখন ২০,০০০ বিশ হাজার মাত্র।

আওরাঙ্গাবাদ সহরের পূর্ব্বগৌরব এখন আর কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও ফটকের দুই একটি পথ বেশ দেখা যায়, কিন্তু অন্যান্য রাজ-প্রাসাদের অতি অল্পমাত্রই চিহ্ন আছে। আওরেঙ্গজেব তদীয় প্রিয়তমা মহিষী রবিয়া দুরাণীর সমাধির জন্য "মৌসলিয়েম" নামে যে অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে অট্টালিকাটি সর্ব্বাপেক্ষা নয়নানন্দজনক। দেখিলে স্পষ্টতই অনুমিত হয় যে, সম্রাট্ সাজাহান-নির্ম্মিত তাজমহলের অনুরূপ করিয়া সেটিকে নির্ম্মাণ করাই আওরেঙ্গজেবের ইচ্ছা ছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফার্গুসন্ লিখিতেছেন,—"Few things can show how steadily and rapidly the decline of taste had set in more than the fact that when the monarch was residing at Aurangabad between the years 1660—70 having lost his favourite wife Rabia Durani, the tomb in honour of her memory—which is ascribed to her third son Asam Shah—was intended, it is said, to reproduce an exact copy of Shah Jahan's celebrated tomb, the Tajmahal. But the difference between two monuments even so short a period, is startling. The first stands alone in the world for certain qualities all can appreciate ; the second is by no means remarkable for any qualities of elegance or design, and narrowly escapes vulgarity and bad taste. In the beginning of the ninteenth Century a more literal copy of the Taj was erected in Lucknow over the tomb of one of the Soverei-

gns ; this last however bad taste and tawdriness reign Supreme. It is difficult to understand how a thing can be so like in form and so unlike in spirit ; but so it is, and these three Tajes form a very perfect scale by which to measure the decline of art after the great Moghul dynasty passed its zenith and began its rapid downward career."

সদাশয় নিজাম গবর্ণমেণ্ট এই অট্টালিকার সংস্কার কার্য্যে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন।

আওরেঙ্গজেব এখানে "পাণচক্কী" নামে আর একটি ছোট খাটো সমাধি-মন্দির তদীয় গুরু, বাবাসাহ মজফরের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সাধু সত্তমের সমাধি-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে একটি সুন্দর উদ্যান আছে এবং ইহার প্রাঙ্গণ শ্বেত মর্ম্মর দ্বারা সমাবৃত। এতদ্ব্যতীত মক্কাগেট, জুম্মা-মস্‌জিদ, মালিক অম্বরের মস্‌জিদ ইহার প্রত্যেকটি দর্শনযোগ্য। মহাত্মা ৺ স্যার স্যালর জঙ্গের আদেশে একবার এই স্থানটি পরিষ্কৃত হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এখানে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু সম্রাট্‌ আওরেঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহারা একে একে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আওরাঙ্গাবাদের নিকট ইলোরার গিরিগুহা প্রমুখ কয়েকটি বিখ্যাত গুহা আছে। আওরেঙ্গজেবের সমাধিস্থল "রোজা" আওরাঙ্গাবাদ হইতে পঞ্চদশ মাইল দূরে অবস্থিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোজা গ্রামে আওরেঙ্গজেব সমাহিত হইয়াছিলেন! আমাদের বিশ্বাস, আওরেঙ্গজেব চরিত্রের মহত্ব এই স্থানেই পরিস্ফুট হইয়াছে। রোজা গ্রামের অতি ক্ষুদ্র সমাধি-মন্দিরের ক্ষুদ্র চূড়া, আওরেঙ্গজেব চরিত্রের অসীম মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজের জন্য মণিরত্ন-খচিত ব্যোমস্পর্শী, সমুজ্জ্বল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া লোক-লোচনের অন্তরালে নিস্তব্ধ, প্রশান্ত পল্লীগ্রামের একপ্রান্তে আপনার চির-বিশ্রাম-স্থল নির্দ্দেশ করিলেন। যে আওরেঙ্গজেব আপন পত্নীর সমাধির জন্য ও তাজ-মহলের অনুকরণে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই আওরেঙ্গজেব আপনার নিজের সমাধির জন্য একখানি গণ্ডগ্রামে ক্ষুদ্র একটি অট্টালিকামাত্র নির্দ্দেশ করিলেন! এ দৃষ্টান্ত কি

আওরেঙ্গজেব চরিত্রের মহত্ত্ব-পরিচায়ক নহে? সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফার্গুসন্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"Aurenzeb himself lies buried in a small hamlet. The spot is esteemed sacred, but the tomb is mean and insignificant beyond what would have sufficed for any of his nobles. He neglected apparently, to provide for himself the necessary adjunct to a Tartan glory, and his successors were too weak, even had they been inclined, to supply the ommission. Strange to say, the sacred Tulsi tree has taken root in a crevice of the brick work, and is flourishing there as if in derision of the most bigotted persecutor, the Hindus ever experienced."

আওরেঙ্গজেব সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি তৎকৃত উইল পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত টুপী এবং তদীয় কোরাণ বিক্রয়-লব্ধ অর্থে যেন তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ঐতিহাসিকগণ ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবেন। তবে যদি উক্ত প্রবাদ বাক্যের মূলে এবং আওরাঙ্গাবাদে আওঙ্গজেবের প্রাগুক্ত মহৎদৃষ্টান্তের বিন্দুমাত্র সত্য নিহিত থাকে, তাহাতে বুঝিতে হইবে আওরেঙ্গজেব একদিকে যেমন নরকের কীটের ন্যায় ঘৃণ্য, অন্যদিকে তেমনি দেবতার ন্যায় বরণীয়।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভিক্ষা

—:০:—

মোর গর্ব্বিত শির নত করে' দাও
প্রভু হে চরণে তব ;
কর শুষ্ক কঠিন চিত্তকে মোর
তোমারি প্রেমেতে দ্রব।
এই তৃষিত পরাণে সঞ্চার' প্রভু
জ্ঞানের সলিল তব ;
দাও অন্ধ নয়নে তোমারি জ্যোতি,
(কর) জীর্ণ জীবন নব।

শ্রী—

দেশ ত্যাগ

(সত্য ঘটনা মূলক গল্প)

আজ প্রায় এক শত বৎসরের কথা, রামচন্দ্র ষোড়শবর্ষ বয়সে শান্তিদেবীর সহিত পরিণীত হন। শান্তিদেবীর বয়স একাদশ বৎসর মাত্র। বিবাহের রাত্রিতে তাহাদের কি কি আলাপ হইয়াছিল,—আলাপ হইয়াছিল কিনা, তাহা কোনো ইতিহাসে লেখে না। একজন পিতামাতার ক্রোড় হইতে অকালে ছিন্ন হইয়া বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সারাপথ ব্যথিত করিলেন, আর একজন সহপাঠী ও সহযাত্রীগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ, তাস খেলা ও সঙ্গীত লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তখন গোপ্‌লা উড়ের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা, কি নিধু বাবুর টপ্পা নূতন বাহির হইয়া থাকিবে। কিন্তু "দেহি পদপল্লবমুদারং" প্রভৃতি জয়দেব ও "জনম অবধি হম্ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল," প্রভৃতি গান সঙ্গী বন্ধুগণ করিতেছিলেন। যেমন নবপক্ষ-উদ্ভিন্ন পক্ষী উড়িতেও পারে না, অথচ মনে করে, আমি পাখী, সুতরাং উড়িতে চায়, তেমনি রামচন্দ্র দাম্পত্য-প্রেম কি, জানিত না; অথচ আমি বিবাহিত, এ কথা হৃদয়ে বেশ অনুভব করিলেন। বিবাহের বাদ্যবাজনার স্মৃতি আমোদ-আহ্লাদ ভিন্ন কোনো স্থায়ী স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল কিনা, জানি না।

কন্যা-বিদায়ের সময় রামচন্দ্রের শাশুড়ী ঠাকুরাণী কন্যাকে জামাতার হাতে-হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার বড় আদরের কন্যা, আজি তোমার হস্তে সমর্পণ কোরলুম, দেখো যেন আমার কন্যা চিরদিন তোমার ঘরে সুখে থাকে। বাবা, বড় ছেলেমানুষ, যদি কোনো দোষ পাও, নিজ গুণে ক্ষমা কোরো।" অশ্রুজলে শাশুড়ীর এক প্রকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, রামচন্দ্রের চক্ষুও অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয়, এই স্মৃতি শেষ জীবনে তাহার হৃদয়ে কখনো কখনো জাগরূক হইত।

বাড়ি আসিয়া যখন দম্পতি এক গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, সহপাঠী বন্ধুদের প্ররোচনায় অপেক্ষাকৃত বড় ও অকাল-পক্ক ছেলেদের পরামর্শে রামচন্দ্র নববধূকে কথা বলিতে অনুরোধ করিলে হয় তো বলিয়াছিল, "আমার

বাপ-মায়ের জন্য এবং ছোট ভাইটির জন্য বড়ই দুঃখ হয়।" বালিকা তখন বলিতে শিখে নাই, "তুমি আমার প্রাণাধিক, জীবন-সর্ব্বস্ব, আমি তোমার পায়ের কাঁটা বুক পাতিয়া লইতে পারি, তোমার পায়ে কণ্টক বিঁধিলে আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়।"

নবোঢ়াবধূ শান্তিদেবী পরমাসুন্দরী, ধনী লোকের ঘরের কন্যা, অতি সাধুশীলা, কিন্তু কমল-কোরকের ন্যায় সে অতুল সৌন্দর্য্য কৈশোরের সবুজ পত্রে আবৃত ছিল। স্ফুটনোন্মুখ হয় নাই। তাই বালক রামচন্দ্র তাহার মনোহারিতায় মুগ্ধ হয় নাই। মুগ্ধ হওয়ার বয়সও আসে নাই। বিশেষত তিনি কৃতবিদ্য, বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, যাহারা বাল্যকালে স্ত্রীর অনুগত হয়, তাহাদের বিদ্যা হয় না। তাই কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র বিদ্যার বিনিময়ে দাম্পত্য-প্রেম কিনিতে চাহিলেন না।

নানা কারণে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে কোনো বিশেষ একটা আকর্ষণ কি বিশেষ বন্ধন হয় নাই। যখন রামচন্দ্র বাড়ি হইতে কলিকাতা গেলেন, তখন জগতে শান্তিদেবী নামে একটি বালিকার অস্তিত্ব ও সে আমার স্ত্রী, এতদ্ভিন্ন আর কোনো রেখা তাহার হৃদয়ে পড়ে নাই। এখনকার বালিকাগণ লেখাপড়া না জানিলেও "প্রাণনাথ, জীবন-সর্ব্বস্ব" বলিয়া পত্র লেখে, তখন তাহাও ছিল না। সুতরাং এই মিলন বিশেষরূপে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই।

২

ষোড়শবর্ষ বয়স্কা সৌন্দর্য্যের ললামভূতা সতী পার্ব্বতী দেবী এক বৃদ্ধ বিপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণের পত্নী, এই বয়সে স্বামী-বিয়োগ হইয়াছিল, তাই তখনকার প্রচলিত প্রথানুসারে সহমৃতা হইবার জন্য নানা অনুরোধ পড়িল। যাঁহারা ভালোবাসিতেন, তাঁহারা বলিলেন, "আহা! ষোলো বছরের বালিকা, এর এ বয়সে জীবন্ত চিতানল, ভাব্‌লে প্রাণ ফেটে যায়!" যাহারা মৃতের সম্পত্তির অভিলাষী, তাহারা বলিল, "তা লালু মুখুর্য্যের স্ত্রী বাসর ঘরে মৃত স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েছিল। এর তো তবু বয়স হয়েচে।" বৃদ্ধারা বলিল, "আহা, কচি মেয়ে, ফুলের মতো সুন্দর, হা ভগবান! এর কপালে এত ক্লেশও ছিল! যখন চিতায় উঠ্‌বে, তখন যে আমাদের প্রাণ দগ্ধ হবে।" কিন্তু এ কথা কেহই বলিতেছে না যে, 'বালিকাকে সহমৃতা হইতে দিয়ো না'। পুরোহিত আসিয়া বলিলেন, "আজ আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, মা ভগবতী কৈলাসে যাবেন।" স্মৃতিরত্ন ঠাকুর বলিলেন, "আহা, কি মনোহর প্রথা, এই বালিকা

মৃতপতির জন্য নিজ জীবন বিসর্জ্জন কোরবেন। কে বলে আজ কলি কাল, এখনো চন্দ্রসূর্য্য আছে।" বলা বাহুল্য, পার্ব্বতী এ কথা কখনো বলে নাই যে, 'আমি সহমৃতা হব'।

পার্ব্বতী ভীষণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নরহন্তার ন্যায় ভয়ে কম্পিত হইতেছিল। কেহই বলে না, 'পার্ব্বতি, তুমি সহমৃতা হ'য়ো না'। সে চিন্তাও কাহারো মনে নাই। এই রূপ, এই যৌবন, এই জ্ঞান, এই বুদ্ধি, এই আশা, এই প্রাণের প্রতি ভালোবাসা, জীবন্ত চিতানলে দগ্ধ হইবে, হা বিধি! এই কি জীবনের পরিণাম! হায় জগৎ কি এত নির্দ্দয়! একজন একটু প্রাণের সহানুভূতি দেখাইল না! কেবল ভাসা ভাসা মায়া মমতা! তাদের আক্ষেপ শুনিয়া রাগ হয়। "হে মা দুর্গা, হে মা কালী, আমার কি হবে। হা কৃষ্ণ, দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি রক্ষা করেছিলে, আজ আমি প্রাণ-ভয়ে তোমায় ডাক্‌চি। হে দয়াময়, দুখিনীর কথা কি তোমার কর্ণে প্রবেশ করে না?" পার্ব্বতী মনে মনে এই বলিয়া বড়ই কাঁদিল, স্বামী-শোকে যত না কাঁদিল, প্রাণের ভয়ে তত কাঁদিল। থর থর করিয়া দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। প্রাণে হতাশের দাব-দাহ উপস্থিত হইল, শীকারী-তাড়িত মৃগের ন্যায় অভাগিনী ত্রাসে আকুল হইল। আজ তাহাকে কে রক্ষা করিবে? সকলেই সতীদাহের উৎসাহে প্রমত্ত। হায়, ইহারা কি মানুষ? প্রতিবেশিনীরা হাতে সিঁদূরের কৌটা দিল, কপালে খুব বড় করিয়া একটা সিঁদূরের ফোঁটা দিল, সুন্দর কস্তাপেড়ে লাল শাড়ী পরাইল এবং বলিল, "পার্ব্বতি, তোর মতন সৌভাগ্য যেন আমাদেরো হয়।" রামচরণ, হরিচরণ, কৃষ্ণচরণ, হরিধন, রামজীবন ও নারায়ণ সকলে সতীদাহ করিবার জন্য কোমর বাঁধিল, নিবারণ নামে একটি ষোড়শ বর্ষের বালক বলিল, "বাবা, আমিও সতীদাহ দেখ্‌তে যাবো।" পিতা বলিল, "না, তুই ভয় পাবি, তোর যেয়ে কাজ নেই।" নিবারণ কোনো মতেই ছাড়িল না, তাই অনুমতি পাইল। খুব জাঁকালো হরিধ্বনি দিতে দিতে সকলে চলিল, সঙ্গে পার্ব্বতী নবমী পূজার স্নাত ছাগ-শিশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। নিবারণ তাহার হাত ধরিয়া চলিল। পার্ব্বতী আকুল প্রাণে দয়াময়কে ডাকিতে লাগিল; ইহা অপেক্ষা তার প্রাণে ব্যাকুলতা কী হইতে পারে! তাই এ ডাক ভগবানের কর্ণে পৌঁছিল। পার্ব্বতী নিবারণকে বলিল, "ভাসুরপো, আমি বাইরে যাবো।" তখন নিবারণকে সঙ্গে দিয়া দাহকারীরা বলিল, "নিবারণ দেখিস্।" নিবারণ জিজ্ঞাসিল, "কাকিমা, তোমার

কেমন বোধ হচ্ছে ?" পার্ব্বতী কাঁদিয়া বলিল, "নিবারণ রে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিস্ কেন ? তোরও তো প্রাণ আছে, তুই একবার ভাব্ না কেমন বোধ হয়—" নিবারণের উল্লাস কমিল, তাহার জন্য প্রাণে বড়ই সহানুভূতি হইল, পারিলে নিবারণ ছাড়াইয়া লইত, কিন্তু কোনো উপায় দেখিল না। ঘাটে আসিয়া নিবারণ বলিল, "খুড়ী মা, ঐ দেখো এক সাহেব শীকারে যাচ্ছেন, তুমি দৌড়াইয়া উহার শরণাপন্ন হও।"

৩

মিঃ হব্ উইলসন্ সেই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পার্টনার ছিলেন। তিনি অতি সহৃদয় ও দয়ালু। কোনো কার্য্য-উপলক্ষ্যে তিনি ঐ স্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। নিবারণ তাঁহাকেই দেখাইয়া দিল। পার্ব্বতী শ্রান্ত ক্লান্ত অনাহারে শীর্ণ, পিপাসায় পীড়িত তথাপি প্রাণপণে দৌড়াইয়া সাহেবের পদতলে পতিত হইয়া বলিল, "সাহেব, রক্ষা করো।" বলিয়াই অতিশয় শ্রান্তিবশত অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অমনি রামচরণ, হরিধন প্রভৃতি শব নামাইয়া রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, এবং পার্ব্বতীকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

সাহেব বলিলেন, "What's the matter ?"

একজন একটু ইংরাজী জানিত। সে বলিল, "সার শি বার্ণ উইথ হার হাস্‌ব্যাণ্ড, আওয়ার সেক্রেড্ কাষ্টম্।"

সাহেব। "Burn alive, you Cowards, avant" বলিয়া সাহেব বন্দুক দেখাইলেন।

হরিধনের দল সরিয়া দাঁড়াইল। কথা বুঝুক আর না বুঝুক তখন ইংরেজের বন্দুকের জীবন্ত প্রভাব সকলেই বুঝিত।

তখন একজন বলিল, "Sir, our religion you not obstruct."

সাহেব। No, I won't allow, বিবি, টুমি উঠ, হামি টোমায় আশ্রয় ডেবে, কেহ টোমার কেশও স্পর্শ করিটে পারিবে না।

অগত্যা দাহকারীরা ফিরিয়া গেল এবং কেহ বলিল, "এসো, জোর কোরে নিয়ে আসি।" বৃদ্ধ হরিচরণ বলিল, "সাহেব মুলুকের কর্ত্তা, আমরা কি কোর্‌বো ?" একজন বলিল, "দেখো, কলিকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের কাছে যাও, ধর্ম্মের প্রতি এত অত্যাচার তিনি কখনো সহ্য কোর্‌বেন না।" একজন বলিল, "কী ভয়ানক ! আমার ইচ্ছা ছিল, সাহেবটাকে এক চড়ে শুইয়ে ফেলি।" আর

একজন বলিল, "বেটি এমন কোরে কুলে কালি দিয়ে গেল!" আর একজন নিবারণকে বলিল, "তুই কি কর্‌ছিলি, কেন ধরে রাখ্‌লি নে।" নিবারণের বাপ বলিল, "ও ছেলে মানুষ, ওর দোষ কি? সাহেবের সঙ্গে এতটুক ছেলে পার্‌বে কেন?" রামচরণ বলিল, "হায়, এত দিনে নিমচাঁদ ভট্‌চার্য্যির কুলে কালি পড়্‌ল। আমরা বাড়ি গিয়ে মুখ দেখাবো কেমন কোরে?" যাহা হউক, শবদাহন করা হইল। বাড়ি গিয়া সকলের মাথা হেঁট হইল। প্রতিবেশীরা তাহাদিগকে, মেনতা-মুখো, কাপুরুষ, বলিতে লাগিল। রামচরণ, হরিচরণ প্রভৃতি রাজা রাধাকান্তের দরবারে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিয়া বলিল, "হুজুর, আপনি হিন্দু জাতির প্রধান স্তম্ভ। আপনি যদি এ বিষয়ে মনোযোগ না করেন, আমাদের জাতি যাবে, ধর্ম্ম যাবে, হিন্দুনাম বিলুপ্ত হবে।" তখন যশোহরের শ্যামচরণ রায়ও সে সভায় ছিলেন, তিনি শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা আমার কাছে থেকে টাকা নাও এবং ভালো লাঠিয়াল আনিয়া দাও, আমি সাহেবের মুণ্ডপাত কোর্‌বো।" রাধাকান্ত দেব কলিকাতার লোক, অত লাঠালাঠির ধার ধারেন না। তিনি বলিলেন, "না, এর অন্য সদুপায় করো।" তখন রামমোহন রায় নামে এক যুবক সাহেবের সহিত মিলিয়া সতীদাহ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাধাকান্ত দেব কুড়ি পাতা লম্বা এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত পার্লেয়ামেণ্টে পাঠাইলেন, তাহার সার কথা এই, 'গবর্ণমেণ্ট যদি এমনি করিয়া আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করেন, তবে সমস্ত হিন্দু লোক বড় দুঃখিত হইবে। অতএব এ সব ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সকলে এই দরখাস্তের দিকে চাহিয়া রহিল। ইতিহাস ইহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা লিখিয়াছেন।

৪

১২১৮ সালের ফাল্গুন মাস, কলিকাতায় ক্রমে গরম বাতাস বহিতেছে, দলে দলে যুবকগণ দীর্ঘিকার পার্শ্বে উদ্যান-মধ্যে বিচরণ করিতেছে। এক্ষণে যেরূপ এলবার্ট-কাটা ইংলিশ কোট, সার্ট বা পাঞ্জাবী-পরা যুবকদল দেখিতে পাই, তখন এরূপ বেশ ছিল না। একটি যুবক একাকী বিচরণ করিতেছিল; মস্তকে বাব্‌রী চুল, অতি সুন্দর কেওয়ারী করা চেরা সিঁথী। মুখখানি শরৎ চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, অতি সুন্দর কোঁচানো একখানি ঢাকাই উড়ুনী অঙ্গরাখার উপরে ফুর্‌ ফুর্‌ করিয়া উড়িতেছে, পরিধানে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছদ। ঈষৎ উদ্ভিন্ন শ্মশ্রু হইতে আতরের

সুগন্ধ বাহির হইতেছে। শরীর দীর্ঘায়াত পরম সুন্দর,—মনে হইত, যেন যাদব-নন্দন প্রদ্যুম্ন সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন, দেখিলেই নয়ন ফিরানো যায় না। যুবক একাকী যেন কিছু চিন্তাকুল মনে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। পুকুরের অপর তীরে আয়া-সঙ্গে একটি মেম। আজকাল যেমন পথে ঘাটে ফিরিঙ্গি ললনাগণ সর্ব্বদা দেখা যায় তখন তদ্রূপ ছিল না। তাঁহার পোষাক অতি পরিপাটী, মূর্ত্তি আরো সুন্দর, কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও বাঙালী মেয়েদের মতো তৈলাক্ত। চক্ষু দুটি নীলপদ্মের ন্যায়, এবং তারকা দুটি গভীর কৃষ্ণবর্ণ, রংটি ইংরেজের ন্যায় তুষারধবল নহে, দুধে-আলতা! ভূমিলুণ্ঠিত পুচ্ছময় গাউন, মস্তকের বিহঙ্গ-পক্ষ-বিভূষিত শিরাভরণ প্রভৃতি দেখিলে মনে হয়, যেন দেবদূতী। পুস্তক-হস্তে করিয়া সকলকে বিতরণ করিতে করিতে যুবকের নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া যেন কিয়ৎকাল আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মেম হঠাৎ এ ভাবের জন্য অপ্রতিভ হইয়া যুবককে বলিলেন, "You speak English, is it?"

যুবক বলিলেন, "Yes"

মেম। I present you this book, and hope you will go through the whole of it.

যুবক। With all my heart, thanks.

মেম। Will you give me your opinion on the book, when we meet in future?

যুবক। I shall try.

পুস্তকখানি প্রদানকালে অকস্মাৎ যুবকের কোমল হস্ত মেমের হস্তের স্পর্শ-সুখ লাভ করিল। মেম ভাবিলেন, কী কোমল স্পর্শ! যুবক কি ভাবিলেন জানি না। উভয়ে এক মিনিট পরে বিচ্ছিন্ন হইলেন, কেহ কাহাকেও ভুলিলেন না। কেহ মনে করিবেন, native নিগারকে মেম স্পর্শ করিলেন, এ অতি আশ্চর্য্য এবং উভয়ের এই আকর্ষণ এ অসম্ভব, কিন্তু ইলবার্ট বিলের পরের কথা, কি স্বদেশী আন্দোলনের দিনের কথা সকলে ভুলিয়া যান! তখন ইংরাজ ভায়াদের নূতন তত্ত্ব ও আমাদের জাতীয় রহস্য সকল জানিতে পরস্পর আকুলহৃদয়। এই বাঙালী যুবক বাঙালী জাতির মধ্যে পরম সুন্দর। বর্ণ আর একটু শাদা হইলে ইংরেজ বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু একটু রক্তাভ হওয়াতে আরো সুন্দর হইয়াছিল। কোনো দেশীয় রমণীর নিকটই

এমন রূপ উপেক্ষিত হইতে পারে না। আর যদি কোনো কারণ থাকে পরে বলিব। যাহা হউক, এই চারি চক্ষুর সম্মিলন উভয় জীবনে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল, ভাবী জীবনে তাহার বিলক্ষণ প্রভাব রহিয়া গেল। একজন এই দৃষ্টিকে অতি শুভদৃষ্টি বলিয়া মনে করিল, কিন্তু যুবক চিরদিন একটি গভীর পরিতাপের সহিত এ দিন স্মরণ করিতেন।

৫

গৃহে আসিয়া যুবক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পুস্তকখানি বাঙালী রমণীগণের দুরবস্থা এবং কি করিলে তাহার উন্নতি হইবে; পুস্তক-মধ্যে য়ুরোপীয় নারীর আদর্শ, রীতি নীতি ও বাঙালী নারীর প্রতি অত্যাচার, সতীদাহের গল্প, বিধবার দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ। লেখিকা য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন একটি হিন্দু মহিলা। পুস্তকখানি যুবকের হৃদয় আকর্ষণ করিল। বর্ত্তমানে আমরা ইংরাজ-চরিত্রের দোষ গুণ অনেকটা জনিয়াছি। এ পুস্তকে ইংরাজ-মহিলা-চিত্র অতি সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত ছিল, তাই যুবক পুস্তক পাঠে অতি বিমুগ্ধ হইলেন। বিশেষ নিজ গৃহের সেই আবদ্ধ অবগুণ্ঠিতা মূক একাদশ বর্ষীয়া গৃহিণী, আর এই জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যা ও সভ্যতায় বিভূষিতা মোহিনী যুবতী এই উভয়কে তুলনা করিয়া যুবক ভাবিলেন, যেন একটি অন্ধকার, আর একটি আলোক!

আবার সপ্তাহান্তে যুবক সেই দীর্ঘিকাতীরে গমন করিলেন, আজ আবার সেই জোতির্ম্ময়ী-রূপিণী-ইংরাজ মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবতী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, স্বাগত, নমস্কার।" (পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমি বাংলাতে লিখিলাম)।

যুবকও নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়া, আপনার বই পড়ে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি, আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিচ্চি।"

যুবতী। আপনার মত ঐ বইয়ের মতের সঙ্গে মিলেচে?

যুবক। যা কিছু অমিল ছিল, আপনাকে দেখে তা দূর হয়েছে, আপনি য়ুরোপীয় মহিলার আদর্শ।

যুবতী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের বাড়ি আসেন, আমার মা অতিশয় সন্তুষ্ট হবেন।"

যুবক। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে যেতে রাজী আছি।

তখন উভয়ে একটি সুন্দর প্রাসাদ-তুল্য মনোহর দ্বিতল বাড়িতে

গমন করিলেন এবং একটি মনোহর সজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিয়া যুবতী একটি প্রৌঢ়া মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, ইনি বাবু রামচন্দ্র সান্যাল, হিন্দু, জাতিতে ব্রাহ্মণ।"

প্রৌঢ়া মহিলাটি যদিও ইংরাজী পোষাক-পরিহিত, কিন্তু দেখিতে পরমা সুন্দরী বাঙালী রমণীর ন্যায়। তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় বলিলেন, "আসুন, আমার সাদর সম্ভাষণ নিন।"

যুবক। আপনার সৌজন্যে খুসী হলুম, সে দিন আপনার কন্যা যে পুস্তক খানি আমাকে দিয়েছিলেন, আমি অতি আনন্দে তা পড়েচি, উহা কি আপনার লেখা?

মহিলাটি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমারই অভিজ্ঞতা ওতে লেখা আছে।"

যুবক। যেখানে আপনি আমাদের সতীদাহ সম্বন্ধে লিখেছেন, সেখানে আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারি নি।

মহিলা যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "উহার প্রত্যেক বর্ণ সত্য। হায়, কতদিনে এই সকল কুসংস্কার দূর হবে।"

যুবক। আপনারা চেষ্টা করলে দূর হতে পারে। আমাদের জাতি অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, এখনো তাহারা হিতাহিত বুঝ্‌তে পারে নি।

মহিলা। আমি আমার কন্যা লিলি পার্ব্বতী উইলসনকে আপনার নিকট পরিচিত করে দিচ্ছি। আপনি এখানে তার সহিত আলাপ করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি ফিরে আস্‌চি।

লিলি বলিলেন, "বাল্যবিবাহ বিষয়ে আপনার কি মত?"

রামচন্দ্র। আপনাদের পুস্তক পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, পতি-মর্য্যাদা অনবগত মহিলার সহিত বিবাহ বিবাহই নয়।

লিলি। বোধ হয়, আপনারো বিবাহ হয়েচে।

রামচন্দ্র ভাবিলেন, একাদশ বর্ষীয়া স্ত্রীর কথা বল্লে উপহাসাস্পদ হব, বিশেষত ওরূপ বিবাহ আমি পছন্দই করি না, তাই বলিলেন, "সে বিবাহই নয়।"

লিলি। "আপনার কি মনে হয়, বাঙালী ও ইংরেজের একত্র সম্মিলনে বঙ্গদেশের উপকার হতে পারে? আমার বোধ হয়, বাঙালী ও ইংরেজের বিবাহ এক্ষণে প্রার্থনীয়, তা হলে আপনাদের সমাজের অনেক কুসংস্কার দূর হয়।"

রামচন্দ্র। জাতিভেদ তার এক প্রধান অন্তরায়। বোধ হয়, এত কুসংস্কার সত্বে এরূপ বিবাহ শুভ ফলপ্রদ হতে পারে না।

লিলি। কেন, আমার মা বাঙালী ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাবা খাটী ইংরেজ, আমাদের তো পারিবারিক কোনো অশান্তি হয় নি।

রামচন্দ্র। আপনাদের এটি আদর্শ পরিবার ও আপনার মাতা আদর্শ মহিলা। আমি চিরদিন তাঁকে শ্রদ্ধা কোর্‌বো।

লিলি। আপনাকে দেখে মনে হয়, যদি সকল বাঙালী আপনার মতো হতেন, তবে দেশের অনেক উন্নতি হ'ত।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতা আসিলেন। যুবক যুবতী বুঝিলেন যে, উভয়ে উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ।

যুবক প্রস্থান করিলে লিলি বলিলেন, "মা, আমি যত যুবক দেখেছি, রামচন্দ্রের ন্যায় charming যুবক আমার চোখে পড়ে নি। যত ইংরাজ যুবক, হঠকারী ও গোঁয়ার, কিন্তু রামচন্দ্র চিন্তাশীল ও প্রকৃত ভদ্র। A perfect gentleman !"

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

কৃতজ্ঞতা

নিশিদিন ভাবি মনে কি দিব তোমায়,
বিশ্বময় অন্বেষিয়া ফিরে এনু হায়!
তব যোগ্য কিছু নাহি এ ধরা-মাঝার,
ম্লান মৌন হয়ে প্রাণ করে হাহাকার!
দৈববাণী হয় প্রাণে,—কেন কাঁদ দীন?
কৃতজ্ঞতা কোহিনুর প্রাণে আছে লীন।
হৃদি-গেহ অন্বেষিয়া লহ ভক্তি ভরে
পুষ্পাঞ্জলী-সম দেও উপকারী করে।
ভক্ত যথা ভক্তি-অর্ঘ্যে পূজে ইষ্ট দেবে,
উপকারী জনে পূজ' সেইরূপ ভবে।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

অমরধামে

[একস্থানে যাহার অভাব ঘটে অন্য স্থানে তাহার উদয় হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ইহলোকের মৃত্যু পরলোকে জন্মগ্রহণের কারণ। এক অবস্থার অবসান না হইলে অবস্থান্তরের আরম্ভ হয় না। তবে আমরা স্থূল সূক্ষ্মে জড়িত মানুষ, স্থূল ভাঙিলে কাঁদি কিন্তু স্থূলের অবসানে সূক্ষ্ম আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশের দিন আসে, এইটি যখন বুঝিতে পারি তখন আশ্বস্ত হই। (কুঃ সঃ)]



অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে

বঙ্গের শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে উজ্জ্বল রত্নগুলি এক একটি করিয়া অপসৃত হইতেছে। আজ আমরা যাঁহাকে হারাইলাম, তিনি গণিত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ও অপরাজেয় ছিলেন। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দের স্থান আর কেহ পূরণ করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গৌরীশঙ্কর আজ প্রমাণ করিলেন যে, মানব-প্রতিভা দেশ ও জাতি-বিশেষে আবদ্ধ নহে। গৌরীশঙ্কর বঙ্গদেশ এবং বাঙালীর নাম অঙ্ক-শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য গৌরবান্বিত করিলেন। যে য়ুরোপ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মণ্ডিত, তাহাকেও আজ গৌরীশঙ্কর মুগ্ধ করিলেন। তাই অধ্যাপক ষ্টিফেন, অধ্যক্ষ ওয়াট্‌ প্রমুখ বিদেশী সাহেব ও দেশীয় অধ্যাপকগণ, সকলেই তাঁহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহারা নিমতলা ঘাট পর্য্যন্ত তাঁহার শবের অনুগমন করিয়াছিলেন।

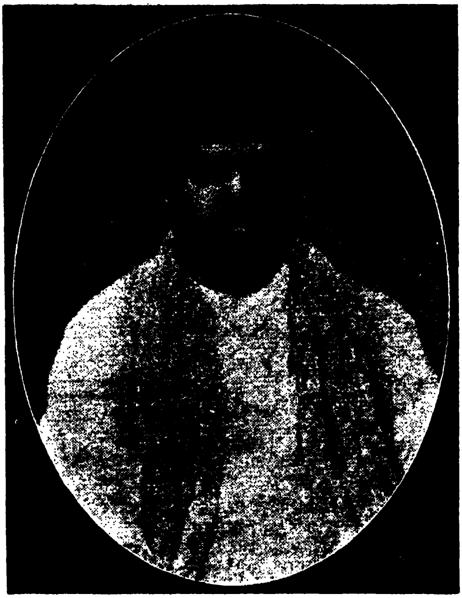
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তৎপরে বাইশ বৎসর বয়সে এম্‌-এ, বি-এল্‌, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গত ৪৭ বৎসর ধরিয়া স্কটিস্‌চার্চ্চ কলেজে গণিতের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, গত ৪ঠা এপ্রিল, শুক্রবার, বেলা ১০ ঘটিকার সময়, এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

একদিকে যেমন তিনি মহাবিদ্বান্‌ ছিলেন, অপর দিকে তেমনই শান্ত, নিরীহ, নিরহঙ্কার, নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। বিদ্যা এবং বিনয়ে সামঞ্জস্য হইয়া তাঁহার চরিত্র অতি সুন্দর হইয়াছিল।

তিনি নীরবে কাজ করিয়া যাইতে ভালোবাসিতেন। কত দুঃখী দুঃস্থ নরনারী তাঁহার সাহায্য পাইয়া উপকৃত এবং ধন্য হইত। হায়, আজ হইতে তাহারা অনাথ হইল। তিনি যাহা দান করিতেন, অন্য কাহাকেও তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে দিতেন না। তিনি এমনই লোক ছিলেন!

তিনি যে কেবল মহাবিদ্বান্‌ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি একজন অনুরাগী সাধক ছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, কিন্তু সামাজিক উপাসনাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন না। তিনি সহজ 'রাজযোগ' সাধন করিতেন। কোনো প্রকার 'হঠযোগ' সাধনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার সাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল 'ধ্যান সাধন'। তিনি প্রতিদিন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা অতিক্রম করিয়া সাধনার স্থানে উপস্থিত হইতে কখনোই শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। মৃত্যুকালেও তাঁহার ধ্যানের অবস্থা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। যখন তাঁহার প্রাণত্যাগ হইয়াছিল, তখনো তাঁহার আত্মীয়গণ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার দেহ প্রাণ-শূন্য, কারণ তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন যে, দেহে প্রাণ নাই।

ভগবান্‌ তাঁহার আত্মাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।



অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন

কালের কঠোর আহ্বানে পয়তাল্লিশ পার হইতে না হইতে, বিনয়েন্দ্রনাথ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে এত উদ্যম, এত উৎসাহ, এত সেবার ইচ্ছা প্রাণে লইয়া আমাদিগকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। হায়, সেই শ্রদ্ধা-বিনয়ে আপ্লুত, প্রতিভা-উদ্দীপ্ত মনোরম মুখচ্ছবি, সেই শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি আর আমরা দেখিতে পাইব না!

তিনি তাঁহার পবিত্র জীবন, অসাধারণ প্রতিভা ও বিনম্র ব্যবহারের জন্য বঙ্গ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর সকলেরই নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় প্রতিভা-বিশিষ্ট শুভ্র সুন্দর অনাড়ম্বর জীবনের সংস্পর্শে যিনি একবার আসিয়াছিলেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথের বিনয়নম্র চরিত্র তাঁহার নামটিকে সার্থক করিয়াছিল।

১৮৬৮, খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামের স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিনয়েন্দ্রনাথের পিতা অত্যন্ত ঈশ্বরভীরু, ও সরলহৃদয় ছিলেন। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত আল্‌বার্ট ইস্কুলে বিনয়েন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সেখানে মহাত্মা কেশবচন্দ্র, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন

প্রমুখ ব্যক্তিদিগের সংসর্গ তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সময় যদিও বিনয়েন্দ্রনাথের বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল, তথাপি আচার্য্যের পবিত্র জীবনের প্রভাব বিনয়েন্দ্রনাথের চরিত্রের উপর শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তৎপরে 'প্রেরিত নববিধান প্রচারক' স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গ বিনয়েন্দ্রনাথের জীবনের উপর বিশেষরূপে কার্য্য করিয়াছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ জেনারল এসেম্ব্লিস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে এম-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তৎপর বৎসর ঐ কলেজ হইতে পুনরায় দর্শন শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজে এবং তথা হইতে ভাগলপুরের তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তথায় ছাত্রগণ তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

কলিকাতা বিনয়েন্দ্রনাথের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছিল। তিনি এখানকার কি শিক্ষা বিষয়ক, কি সামাজিক. কি ধর্ম্মসম্বন্ধে সকলপ্রকার আন্দোলনেই যোগদান করিতেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। যুবকগণের চক্ষুর সম্মুখ হইতে যে এক মহান্ আদর্শ চরিত্র অন্তর্হিত হইল, তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশের যে সমূহ ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং গত বৎসর পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য সিণ্ডিকেটেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের, জুন মাসে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে "পৃথিবীর উদার ধর্ম্ম মতালম্বীদিগের অধিবেশনে" যোগদান করিবার জন্য জেনেভা গমন করেন। সেখানে আপনার বক্তৃতা-শক্তিতে, পাণ্ডিত্যে ও ধর্ম্ম-প্রাণতায় সকলকে মুগ্ধ করেন। তথা হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকা গমন করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন ও প্রশংসাভাজন হন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ 'ক্যাল্‌কাটা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের' সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ছাত্রগণ এই স্থানে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বিশেষ উপকৃত হইত। তিনি ভক্ত ও বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহার বচন মিষ্ট, স্বভাব মধুর ছিল, তাঁহার ব্যবহার নম্র ও অমায়িক ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা অসময়ে তাঁহাকে হারাইলাম!

কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট, কি য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, সকল স্থানেই তাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত।

বিনয়েন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় ও Young Men's Theistic Endeavour Societyর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার অমূল্য উপদেশ-বাণী যে একবার শ্রবণ করিত,সে তাহা আর ভুলিতে পারিত না।

বারম্বার শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিত। হায়! আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাঁহার মুখ-নিঃসৃত সেই অমৃতময়ী, স্বর্গীয় সুমধুর উপদেশ-বাণী আর শুনিতে পাইব না!

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ পি, কে, রায়ের অনুপস্থিতিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার গভীর দায়িত্ব-বোধ ও কর্ত্তব্য-পালনের পরিচয় দান করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন।

এইরূপে বিনয়েন্দ্রনাথ যখন আপনার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রতিভাবলে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছিলেন, তখন সহসা গত বৎসর দুরন্ত 'ক্যান্সার' রোগে আক্রান্ত হইয়া, প্রায় এক বৎসর ধরিয়া সমস্ত রোগ যন্ত্রণা অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া, গত ২৯শে চৈত্র, শুক্রবার, রাত্রি ৩টার সময়, যেখানে কোনো রোগ, শোক, দুঃখ, ক্লেশ নাই, সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের অজর অমর অক্ষয়, চির আনন্দময় ধামে হাস্যবদনে প্রস্থান করিলেন।

বিনয়েন্দ্রনাথের শোকার্ত্তা বৃদ্ধা মাতা ও সহধর্ম্মিণী একমাত্র দুই বৎসরের কন্যাকে লইয়া আজ অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার ভগিনিগণ এবং কৃতী ভ্রাতৃগণ আজ রামতুল্য ভ্রাতার শোকে অবসন্ন। শুধু তাঁহারা কেন, আজ কতস্থানে কত লোকে বিনয়েন্দ্রনাথের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। পরম দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের তাপিত প্রাণে শীতল শান্তি-বারি সিঞ্চন করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। শ্রীসরলকুমার কুণ্ডু।

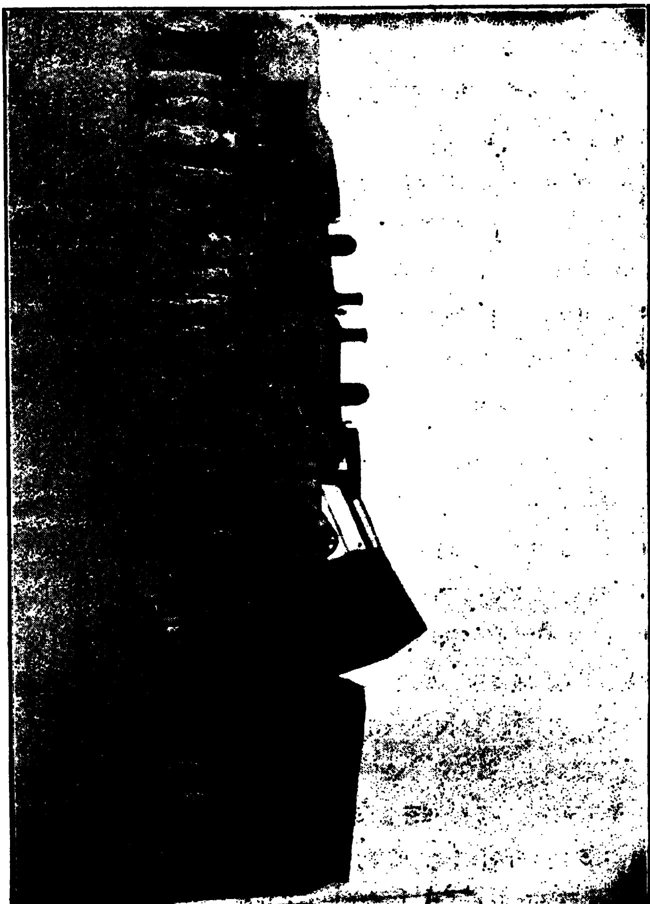
দ'য়ের ভাঁড়

সে দিনকার দ'য়ের ভাঁড়,
তোমায় ঠাকুর-ঘরে দেখেছি যে;
এখন তোমায় দেখ্‌লে পরে,
চোখের জলে বুকটা ভিযে!
কুকুর-চাটা হ'য়ে তুমি
এখন পড়ে' আঁস্তাকুড়ে;
হ'তে চাও ফের দ'য়ের ভাঁড়,
কুমোর-পোনে এসো পুড়ে!

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

রেল সংঘর্ষ

বিগত ২৫শে মার্চ্চ ১৯১৩, রাত্রি ২টা ২২ মিনিটের সময় আলিগড়-ষ্টেশনের নিকট ই, আই, রেলওয়ের একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সহিত একখানি মালগাড়ির যে সংঘর্ষণ



হইয়াছিল, এখানে তাহার ছবি প্রদত্ত হইল। আবাগড় মহারাজের ভূতপূর্ব্ব গৃহ-চিকিৎসক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন মহাশয় এই ফটোখানি কুশদহে প্রকাশ করিবার জন্য দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত রেল-সংঘর্ষের বিবরণ সংবাদপত্র পাঠে সকলে অবগত আছেন; সুতরাং আমরা এখানে কেবল মাত্র উহার চিত্র প্রকাশ করিয়াই নিবস্ত হইলাম।

কুশদহের ইতিহাস

কুশদহের কোনো প্রাচীন ব্যক্তি "কুশদহের ইতিহাস" পাঠ করিয়া একটি সুন্দর সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কুশদহের ইতিহাস-লেখক কুশদ্বীপের ভৌগলিক বিবরণ না দেওয়ায় প্রাচীন কুশদ্বীপ যে কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সর্ব্বাগ্রে সে কথা পরিষ্কার করিয়া বলা লেখকের উচিত ছিল।" যিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কুশদ্বীপকে মহাদ্বীপ বলিয়া নবদ্বীপকে তদন্তর্গত করিয়া আমি কুশদহ-বাসীর স্বভাব-সুলভ পক্ষপাত দেখাই নাই। মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় পক্ষধরের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদানকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"কুশদ্বীপে মহাদ্বীপে নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।
সিদ্ধান্ত তর্কসিদ্ধান্তে শিরোমণি মনীষিনঃ॥"

এখানে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গের তাবৎ নৈয়ায়িক পণ্ডিতই এ প্রবাদের যাথার্থ্য অবগত আছেন।

গঙ্গার ব দ্বীপের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের কতদূর পর্য্যন্ত কুশদহ নামে পরিচিত ছিল, তাহার একটি সুন্দর প্রমাণ আছে। সকলেই অবগত আছেন যে, একাদশী তিথিতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের বিধবাগণ 'নির্জ্জলা উপবাস' করেন। যাঁহারা এরূপ উপবাস করেন, তাঁহারা স্মার্ত্তবাগীশের অর্থাৎ রঘুনন্দনের মতে এরূপ উপবাস করিয়া থাকেন। ইহার অপর নাম নদীয়ার মত। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থানে বিধবারা বিশেষত পুত্রবতী বিধবারা নির্জ্জলা একাদশীর উপবাস মহাপাপ মনে করেন। তাঁহারা জানেন, একাদশীর দিনে জল না খাইলে মহাপাপ জন্মে। ইহার নাম বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের মত। যশোহর জেলায় কপোতাক্ষী নদীর পূর্ব্ব হইতে এই মতের পোষণকারী লোক দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের মত প্রচলিত ছিল, ততদূর পর্য্যন্ত

চন্দ্রদ্বীপের অধিপতিগণের একাধিপত্য ছিল। এমন কি নবদ্বীপের ব্যবস্থাও তাঁহারা গ্রহণীয় মনে করিতেন না। ইহা হইতে অনুমিত হয়, এক সময়ে কপোতাক্ষী কুশদ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপের সীমা অবধারিত করিত। * কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, গঙ্গার ব দ্বীপে কুশদ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ ভিন্ন আর কোনো প্রবল স্থান ছিল না। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া লইয়া কর্ণসুবর্ণ রাজ্য ছিল। তদ্ভিন্ন কপোতাক্ষী ও ভৈরবের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে মানিকদ্বীপ প্রভৃতি অন্যান্য প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহার উল্লেখ পরে করা যাইবে। এক্ষণে কুশদ্বীপ বলিলে আমরা ভাগীরথী ও কপোতাক্ষীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বুঝিব। এবং আমার বিশ্বাস, এই ভূভাগের মধ্যে সমতট অবস্থিত ছিল।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থ সাং সমতট রাজ্যের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সমতটকে চন্দ্রদ্বীপ বলা যাইতে পারে কি না, এরূপ প্রশ্ন উঠিলেও উঠিতে পারে। কিন্তু ধীরভাবে এই সব বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কুশদ্বীপ ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপের সহিত সমতটের ঐক্য হইতে পারে না, কেননা তমোলিপ্তি হইতে ইহার দূরত্ব দেড় শত মাইল মাত্র। সুন্দরবনের মানচিত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যথাসাধ্য কষ্ট-কল্পনা করিয়াও সমতটকে হরিংহাটা নদী ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য। কাজেই সমতটকে কপোতাক্ষী পারে লইয়া যাওয়া কিছুতেই ঘটিতে পারে না।

চৈনিক পরিব্রাজক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমতটে সম্রাট্ অশোকের নিৰ্ম্মিত স্তূপ সহরের সন্নিকটে দেখিয়াছিলেন। তখনো সেখানে ত্রিশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল ও দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু সমতটে বাস করিতেন। কিন্তু শত শত দেবালয় ও শৈব-সন্ন্যাসী নগরে শৈব ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিত। বুদ্ধদেবের মূৰ্ত্তিও ছিল। কিন্তু সাধারণ লোক বৌদ্ধ ছিল না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সম্রাট্ অশোকের বহুপূর্ব্ব হইতে সমতট সমৃদ্ধিশালী ছিল, নহিলে কি অশোক সেখানে স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেন?

---

* সম্প্রতি খ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদ্—দৌলতপুর কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ, মহাশয় সুন্দরবনাঞ্চলের ঘোলপেটুয়া নদীতীরস্থ বাসুদেবপুর গ্রাম হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কুন্দমর্দ্দনদেবের একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপের অধিকার ঘোলপেটুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

লেখক

তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ নগর ছিল, সমতট তাহার মধ্যে একটি প্রধান।

সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র বৃহৎ সংহিতাতে সমতট নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়া-যোগ-সারে গঙ্গাসাগর সঙ্গমের সমীপস্থ যে রাজ্যটির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা সমতট ভিন্ন অন্য স্থান বলিয়া ধরা যায় না, কেননা বিদেশীয় লেখকগণের লেখনী হইতে তমোলিপ্তি ও সমতট ভিন্ন গঙ্গার ব দ্বীপস্থ আর কোনো সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ দেখা যায় না। সংস্কৃত গ্রন্থে, পালি গ্রন্থে বাঙালীদিগের জলযুদ্ধে নিপুনতার উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতেও এ ক্ষমতা বাঙালীরা একেবারে হারায় নাই। সুতরাং বহুপূর্ব্বকাল হইতে—সম্রাট্ অশোকেরও পূর্ব্ব হইতে সমুদ্রের উপকূলে সমতট অতি সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। সম্ভবত এই সমতট হইতে বাঙালীর বাণিজ্য-পোত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন করিত। সম্ভবত এই সমতট হইতে যাত্রা করিয়া বিজয় সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই সমতট হইতে বহির্গত হইয়া বাঙালী ঔপনিবেশিকগণ যাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবত সমতট-বাসী বাঙালী জার্ম্মান্ সমুদ্রে ভগ্ন-পোত হইয়া রোম-সম্রাটের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। এই সমতটবাসী বাঙালী একদিন জলযুদ্ধের নিপুণতায় এশিয়ার অন্যান্য অধিবাসীগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। আমাদের গৌরবের কথা এই যে, এই সমতট আমাদের কুশদ্বীপে অবস্থিত ছিল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সমতটের ধ্বংস হইল কি প্রকারে? এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে। বাণিজ্য-প্রধান স্থান বাণিজ্য শ্রীহীন হইলে উৎসন্ন হইতে পারে; যথা, সপ্তগ্রাম। যেমন সমুদ্র সমতট হইতে দূরে যাইতে লাগিল, নদীমুখে চর পড়িয়া বৃহৎ নৌকাদির যাতায়াতের ব্যাঘাৎ ঘটিতে লাগিল ততই সমতটের অবনতি হইতে লাগিল।

ব্যবসায়ীরা স্থানত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তৎপরে অবশেষে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইল। জনাকীর্ণ নগরে ব্যাঘ্রাদির বিচরণ স্থান হইল। সুন্দর নগর সুন্দর বনে পরিণত হইল। দ্বিতীয় কথা, বৈদেশিক আক্রমণে নগর বিধ্বস্ত হওয়া সম্ভবপর। উড়িষ্যার ইতিহাসে রক্তপুরের যবন কর্ত্তৃক কলিঙ্গ ধ্বংসের উল্লেখ আছে। তৃতীয় কথা, ভূকম্পনে অথবা তদনুরূপ দৈব বিপৎপাতে সমতট ভূপ্রোথিত হওয়া অসম্ভব নহে। কলিকাতা

ও তাহার উত্তর-পূর্ব্বদিকস্থিত স্থানসমূহে প্রায় ২২ হাত মৃত্তিকা খুঁড়িলে সুন্দরীবৃক্ষের সমূল কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। আকস্মিক ঘটনায় ভূপ্রোথিত না হইলে বহুদূরব্যাপী স্থানে এরূপ সমূল বৃক্ষকাণ্ড দৃষ্ট হওয়ার অন্য কারণ নাই। কোনো অজ্ঞাত সময়ে কলিকাতা ও খুলনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ যে বসিয়া গিয়াছিল, ভূতত্ত্ববিদেরা তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। সেই কারণে সমতটের ধ্বংস হওয়া সম্ভবপর। কুশদহের অন্তর্গত কোনো কোনো গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে পূর্ব্বকথিত সুন্দরীবৃক্ষের কাণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণটিই সমতট ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ মনে করা যাইতে পারে। পালবংশীয় দ্বিতীয় নরপতি প্রবল প্রতাপ ধর্ম্মপাল সিংহাসনে আসীন্ হইয়াই রাজ্যবিস্তারে মন দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমে তিপি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সম্ভবত ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক সমতট অধিকার হইতেই ইহার পতনের সূত্রপাত হয়। এখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতেই বঙ্গীয় নৌযুদ্ধ বিশারদেরা সমুদ্রে আর নিজ প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই। তৎপরে মহারাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক সমতট অধিকারে একেবারে জাতীয় জীবনী-শক্তির বিলোপ ঘটে। নারায়ণপাল দেবের প্রশস্তি লেখক আপনাকে সমতটনিবাসী বলিয়া পরিচিত করায় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সে সময়ে সমতটবাসীরা পাল নরপতিগণের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সরমা

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চৌধুরী মহাশয়ের বৃহৎ সংসারে কমলা সকলের দিদি হইয়া উঠিল। আর তাহার পুতুলের মতো ক্ষুদ্র শিশুটি যেন স্বর্গ হইতে দেবতার আশীর্ব্বাদ আনিয়া সকলের অঙ্গে ঢালিয়া দিল; সকলকে আপনার মতো করিয়া তুলিল। শিশুর হাসিতে, তাহার মৃদু অঙ্গ সঞ্চালনে, আধ আধ কথাতে ভগবান যে কি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে এই এত বড় বিশ্বসংসার বাঁধা রহিয়াছে;

কি মায়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মানবমাত্রেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। শিশুটি সকলের অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ভালো-মন্দ বিচার করিতে জানে না, তাই বুঝি তাহাকে ভূমি স্পর্শ করিতে হয় না। সে সকলের কোলে-পিঠে উঠিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বৃহৎ অট্টালিকার প্রতি ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

চারিদিন পরে কালাচাঁদ যখন আপনার কর্ত্তব্য-পালন করিয়া হতাশ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল, চৌধুরী মহাশয় বাস্তবিক তখন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে এক-টুক্‌রা কাগজ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ধীরে ধীরে আসিয়া বিমলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিমলা তখন কমলার শিশুটির সহিত একটা ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক সুখ দুঃখের কথা কহিতেছিল। সহসা চৌধুরী মহাশয়কে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুটি দুই হস্তে তাহার কাপড় ধরিয়া বসাইবার জন্য সজোরে টানিতে লাগিল। চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "হয় তুমি বোসো, না হয় ওকে কোলে তুলে নাও।"

বিমলা শিশুটিকে কোলে লইয়া বলিল, "দেখ্‌চ, এই চার দিনেই আমার কি ন্যাওট্ হয়েচে! আর দিন কতক পরে নাওয়া খাওয়া সব ভুলিয়ে দেবে দেখ্‌চি, আর জন্মে আমি যেন ওর কেউ ছিলুম, তাই আমার সঙ্গে এত ভাব্, আমাকে পেলে ও আর কিছু চায় না!"

"আমি বোলি পরের ছেলেকে এমন কোরে প্রাণটা বিলিয়ে দেওয়া কি ভালো? আজ বাদে কাল সে যখন তোমার প্রাণটা চুরি কোরে নিয়ে তার বাপের সঙ্গে চলে যাবে, তখন তুমি কি কোর্‌বে, শুধু হাউ হাউ কোরে কাঁদ্‌বে।"

"ওরা কি আমার পর, আমি কি ওদের পরের মতো দেখি? সরলকে লীলাকে যে চোকে দেখি ওদেরও সেই চোকে দেখি।"

"সত্যি! কিন্তু তোমার বাড়ি ওরা থাক্‌বে কেন? ওদেরো তো ঘর বাড়ি আছে। এই হরিপদ বাইরে বোসে আছে, আজই ওদের নিয়ে যেতে চায়।"

"হরিপদ এসেচে—বেশ হয়েচে—তা বাইরে কেন—বাড়ির ভেতরে ডাক্‌লে না কেন? তুমি একটু দাঁড়াও। আমি কমলাকে এই খবরটা দিয়ে আসি" বলিয়া দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল। চৌধুরী মহাশয় তাহার গমনে বাধা দিয়া বলিলেন, "অত উতলা হও কেন?" বিমলা বিমর্শভাবে বলিল, "তবে?"

"তবে আর কি? কালাচাঁদ ফিরে এসেচে। হরিপদর দেখা পায় নি।

এখন ওদের বাড়ির খোঁজ খবর নিয়ে সেখানে তো পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কি বলো?” বিমলার মুখখানা যেন একেবারে মলিন হইয়া গেল। সে মৃদুস্বরে বলিল, “তাই তো, হরিপদকে পাওয়া গেল না, তাই তো।” এই বলিয়া বিমলা বসিয়া পড়িল।

“তুমি একটা কাজ করো। কমলাকে জিজ্ঞাসা করো যে, তার আপনার কেউ আছে কি না? আর সে সেখানে যেতে চায় কি না? যদি যেতে চায়, তা হ'লে আমি লোক জন সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। আর যদি তার আপনার কেউ না থাকে, তা হ'লে এখানেই থাক্, এখান থেকেই হরিপদর খোঁজ খবর করা যাবে।”

বিমলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ।”

“না, না—তা, না তুমি একবার জিজ্ঞাসা করো গে। পরের মেয়েকে আমরা আটকে রাখ্‌তে পারি না।”

“আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমি জিজ্ঞাসা কোরে তোমায় বোল্‌বো।”

চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলে বিমলা ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া সে এই নিদারুণ সংবাদটি কমলাকে জানাইবে যে, হরিপদকে পাওয়া গেল না। এ সংবাদে সে হয় তো কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িবে, কিন্তু বলিতেই হইবে। বিমলা ডাকিল, “লীলা।” অপর কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিয়া লীলা কহিল, “কি, মা?”

“তোমার দিদি কোথায়?”

“দিদি ও ঘরে আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। একটুখানি বাকি আছে, এই ফিতেটা জড়িয়ে দিলেই হয়। খোকাকে কি নিয়ে যাবো?”

“না থাক্, তোমার চুলটা বাঁধা হলে তোমার দিদিকে আমার কাছে আস্‌তে বলো। তোমার দাদা কোথায়?”

“দাদা কোত্থেকে একটা পাখী ধরে এনেচে, তাই দিদিকে দেখাচ্চে। বেশ পাখীটি মা, তুমি দেখ্‌বে?”

“দেখ্‌বো, এখন থাক্!”

লীলা চলিয়া গেল।

তখন সান্ধ্য-গগনে দুই একটি করিয়া অসংখ্য তারা ফুটিয়া উঠিল। পরিচারিকা আসিয়া প্রতি কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিল। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কমলা ধীরে ধীরে আসিয়া বিমলার কক্ষে প্রবেশ করিল,

সঙ্গে সঙ্গে লীলাও আসিল এবং তাহার মাতার নিকট হইতে খোকাকে লইয়া চলিয়া গেল। বিমলা নিকটে আসিয়া কমলার হাত দুটি ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে মৃদু-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "একটি কথা বোল্‌বো, মা!"

কমলা শিহরিয়া উঠিল—তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাহার মুখের সমস্ত রক্তটা যেন নিমিষে জল হইয়া গেল, শাদা মুখখানা দীপালোকে ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল। সে একমুহূর্ত্ত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর প্রাণপণ শক্তিতে বল সংগ্রহ করিয়া কহিল, "কি মা!"

বিমলা কি বলিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না—বলিল, "এই এই—"

"ভয় কি মা?

মাতৃ-সম্বোধনে বিমলার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে কমলার মস্তক আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে কহিল, "হরিপদকে পাওয়া গেল না।" কমলা বিস্মিতা হইল, লজ্জায় তাহার শাদা মুখখানা রক্তাভ হইয়া উঠিল। হরিপদকে যে আর পাওয়া যাইবে না, তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সে জন্য তাহার শিহরিয়া উঠিবার ও হৃদয় স্পন্দিত হইবার কোনো কারণ ছিল না। যদি সে আগে জানিতে পারিত যে, তাহাকে এই প্রশ্ন করা হইবে, তাহা হইলে সে অবিচলিতভাবে উত্তর দিতে পারিত। ভীতা হইবার কোনো কারণ ছিল না।

কমলা মাটির দিকে মুখ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "হুঁ।" বিমলা যখন দেখিল, কমলা শিরে করাঘাত করিয়া মস্ত একটা কান্নাকাটির সহিত ভূমিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল না, তখন সে একটু সাহস পাইয়া কহিল, "কর্ত্তা বোল্‌ছিলেন, যদি তোমার আপনার কেউ কোথায় থাকে, তা হ'লে বলো লোক জন সঙ্গে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। আর যদি মা আমাদের এখানে—" শেষ কথাটা কণ্ঠে জড়াইয়া গেল, সম্পূর্ণ বাহির হইল না।

কমলা কাঁপিতেছিল। সে বসিয়া পড়িল। বিমলার পা দুটি জড়াইয়া "জন্মদুখিনী আমি, আমার কেউ নেই মা" বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার সকল কথা স্পষ্ট হইয়া বাহির হইল না। কমলার প্রাণের কথা-কটা বিমলার প্রাণের দ্বারে আসিয়া ঘা দিতে লাগিল। হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। সে সরল প্রাণে তাহাকে তুলিয়া লইয়া অশ্রু মুছাইয়া দিল এবং মস্তক আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া আবেগ-ভরা হৃদয়ে কহিল, "মা, আমার

ঘরের লক্ষ্মী, তুমি কোথা যাবে মা? তুমি যে আমাদের!” বিমলার চক্ষের পাতা ভিজিয়া আসিল।

অসহায়া কমলা একেবারে এতখানি স্নেহ মমতার ভিতরে আসিয়া পড়িল যে, সে আপনাকে আর সংযত রাখিতে পারিল না:—কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত প্রাণটা ভরিয়া গেল। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। কথাগুলি মুখের নিকট আসিয়া জড়াইয়া গেল, একটিও বাহির হইল না। সে শুধু বালিকার ন্যায় ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিমলার হৃদয়ের গুপ্ততম প্রদেশে অন্তর্ব্বাহিনী-ফল্গুনদী এতক্ষণ ক্ষীণভাবে একটি রেখার ন্যায় বহিতেছিল, এখন ভরা-বাদলে দুকুল ছাপাইয়া ভীমবেগে বহিতে লাগিল। সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। চোখের জলে মুখ ভাসিয়া গেল। সে জল টপ্ টপ্ করিয়া কমলার মুখের উপর পড়িতে লাগিল। উভয়েই মৌন, নীরব! আমরা যাহা শত কথায় বুঝিতে পারি না, অশ্রু তাহার মৌন-ভাষায় সহজ সঙ্কেতে নিমেষে বুঝাইয়া দেয়। তাই কমলার অশ্রুর উপর বিমলার অশ্রু আসিয়া যে কি কথা কহিয়া গেল, তাহা ভাষায় বুঝানো যায় না। হৃদয়ে অনুভব করিতে হয়।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে চৌধুরী মহাশয়ের সংসারে কমলার তিন বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু হরিপদর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। ইংরাজী বাংলা সকল কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। কমলার শিশুটি এখন চৌধুরী মহাশয়কে বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে—সে সর্ব্বদাই তাঁহার পিঠের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাঁহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ পাতাইয়া ‘দা-দা’ বলিয়া ডাকে। তিনি তাহাকে ‘দাদা’ বলিয়া কোলে তুলিয়া লন। সকলের চেয়ে তাহার ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ চৌধুরী মহাশয়ের সট্‌কাটির উপর। কেমন করিয়া কোথা হইতে ধূম্ররাশি আসিয়া চৌধুরী মহাশয়ের মুখ ও নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যায়, তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার জন্য সে অনেকবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে। সট্‌কাটির স্থানে স্থানে দংশন করিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। সট্‌কাটি মুখে দিয়া ধূম নির্গত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই, কাশিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। শিশুটির নাম হইয়াছে, ‘মানিকলাল’, কিন্তু মানিকলাল বড় কেহ

বলে না। অনেকে তাহাকে 'খোকা' বলিয়া ডাকে। কেহ কেহ 'নদের চাঁদ'ও বলিত। নদেরচাঁদ বলিবার যে কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, তাহা নহে। সে যখন লাল ধুতি পরিয়া, মাথায় চুড়া বাঁধিয়া, ঘুঙুর গাঁথা মল পায় দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকিত, তখন সকলে তাহাকে 'নদেরচাঁদ' বলিয়া ডাকিত। সরল ঘোড়া হইয়া তাহার গাড়ি টানিত, সে চাবুক লইয়া 'হেৎ হেৎ' করিত। সরল তাহার ছোটো-বড় সমস্ত কথা, তাহার দিদিকে না বলিলে নিদ্রা হয় না। কোনো কিছু করিতে হইলে, তাহার দিদির সহিত পরামর্শ করে। দিদি যাহা বলে, সে তাহা বেদ-বাক্যের মতো মানিয়া লয়। দিদির অমতে সে কোনো কার্য্যই করে না, এমন কি পেট কামড়াইলে, দিদি ঔষধ বলিয়া দিবে, তবে সে খাইবে। কোনো স্থানে নিমন্ত্রণ খাইতে হইলে কোন্ জিনিস কতগুলি খাইবে, তাহা তাহার দিদি বলিয়া ঠিক করিয়া দিবে, তবে তাহার মন উঠিবে। একদিন কমলা বলিল, "তোমার বিয়ের সময় কনে দেখ্‌তে যাবে কে? হয় তোমাকে যেতে হবে, না হয় তোমার বাবা যা পছন্দ করেন।"

সরল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না,না—সেও তোমাকে পছন্দ কোর্‌তে হবে, তোমার পছন্দ না হলে আমার বিয়েই হবে না?"

"কি রকম, আমি কি পুরুষ সেজে কনের বাড়ি যাবো।"

সরল একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তা আমি জানি না।"

এই সময় চৌধুরী মহাশয় সরলকে জমিদারীর কাজ কর্ম্ম একটু আধটু শিখাইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে জমিদারী পরিদর্শনের জন্য সরলকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম তাহার দিদির জন্য সরলের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ফিরিয়া যাইয়া তাহার দিদিকে কি কি কথা বলিবে, দিনের মধ্যে অন্তত তিন চারিবার সে তাহা ভাবিয়া লইত। বাটিতে আসিয়া দুই তিন দিন কমলার কাছ-ছাড়া হইত না—তাহার কথাও ফুরাইত না। কমলাকে সে একদিন তাহার জমিদারী দেখাইয়া আনিবে, ইহাও বলিয়া রাখিয়াছে। তবে সেখানে সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হয়, ইহাই যাহা একটু ভয়ের কারণ! এইরূপে আরো একটি বৎসর কাটিয়া গেল, চৌধুরী মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া আসিল, তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ-যাত্রায় মানস করিলেন।

চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীশঙ্কর একটু তফাতে বাস করেন। পূর্ব্বে

উভয় ভ্রাতা এক সংসারেই থাকিতেন। মাঝে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উভয় ভ্রাতা পৃথক হইয়া পড়িলেন। কালীশঙ্কর তাঁহার প্রাপ্য অংশ বুঝিয়া লইয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগিলেন। কালীশঙ্করের গুণের অভাব ছিল না—তিনি জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথেই বিচরণ করিতেন এবং তাঁহার স্তাবক-মণ্ডলীর শুভ আশীর্ব্বাদে তাঁহার জমিদারীটুকু ফুঁকিয়া দিতে বেশী বিলম্ব হইল না। তাহার পর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা তাঁহার গুণধর পুত্র তারানাথের অনুগ্রহে শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া গেল। কাজেই কালীশঙ্করের যৌবনের তপ্ত শোনিত এখন অকাল বার্দ্ধক্যের আঘাতে ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে—সে এখন ব্রহ্মচারী—পরম সাধু! চৌধুরী মহাশয় এই সাধু পুরুষটির উপর তাঁহার বাটী রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া এক শুভ মুহূর্ত্তে সস্ত্রীক বাহির হইলেন—সঙ্গে রহিল, কালাচাঁদ সরকার, দুই জন পরিচারক ও একজন পরিচারিকা। স্থির হইল, এখন তিনি মধুপুরে যাইয়া কিছুদিন থাকিবেন, পরে যেখানে যেখানে যাইবেন, তাহা ক্রমশ জানাইবেন। চৌধুরী মহাশয়ের কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা যে, তিনি কাশীতে যাইয়া কিছু দিন বাস করেন। বিমলার ইচ্ছাও সেইরূপ। কিন্তু তাহার প্রাণটা সরল, লীলা, মানিকলাল, ও কমলার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়া উঠে—দিনের মধ্যে হয় তো দুই খানা টেলিগ্রাম যাইতেছে—"সরল কেমন আছে? মানিক তাহার জন্য এখনো কাঁদে কি না? লীলা শ্বশুর বাড়িতে কেমন আছে? সরল যেন তাহাকে একবার দেখিয়া আসে।"

চৌধুরী মহাশয় যাইবার দুইদিন পরে কালীশঙ্করের মুখরা গৃহিণী মাতঙ্গিনী ও বিধবা কন্যা উমাশশী একখানা পাল্কী করিয়া আসিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। পুরাতন ঝি চাকরেরা মাতঙ্গিনীকে বিলক্ষণ চিনিত, কাজেই তাহারা তোপের মুখ হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মাতঙ্গিনী দালানে দাঁড়াইয়া গলা সপ্তমে চড়াইয়া কহিল, "ও মা গো, এ কি কাণ্ড! বাড়ি যে থৈ থৈ কোর্‌চে, পা বাড়াবার যায়গা নেই—এই দুদিন গেচে তাতেই এই—আমরা না এলে বাড়িতে ভূতের কেত্তন হ'ত—এত গুল লোকজন সব খাবার ঢেঁকি—বাড়িতে বুঝি ঝাঁট্ পড়ে না—গিন্নি না থাক্‌লে বাড়ির এমনিই দুর্দ্দশা হয়।"

উমাশশী চোখ দুটি কপালে তুলিয়া কহিল, "ও মা গ্যাখো, ঐ কোণটায় রাশীকৃত কলাপাতা পচ্‌চে—ওখানে কুটনর খোলার ডাঁই হয়ে রয়েচে—এ গুলো গোরুর গামলায় দিয়ে আস্‌বার কি লোক নেই? তাই তো বোল্‌চি মা এ বাড়িতে

যেন কেউ নেই—আর দুদিন পরে এলে এ বাড়িতে আর ঢুক্‌তে পার্‌তুম না। ওরে উম্‌শে—ওরে বামী—ওরে রামা তোরা কি কেউ আছিস্‌?"

"এই যে মা ঠাকরুণ, আছি বৈ কি" বলিয়া বামা অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া কহিল—"ঐ কাটা কলা পাত আর কুটনর খোসা ও কেবল আজকের আর একটু পরে সব পোস্কার হয়ে যাবে। আর ছড়া ঝাঁট্‌ তো সবই হয়েছে, মাঠাক্‌রুণ!"

মুখখানা প্যাঁচার মতো বিকৃত করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, "তোর মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে। ছড়া ঝাঁট্‌ পোড়্‌লে বাড়ির এমনি শ্রী। আমরা এসেচি এখন দেখ্‌বি—বাড়ি এমন পোস্কার থাকবে যে, সিঁদুর পোড়্‌লে সিঁদুর তোলা যায়।"

কোথা হইতে সরল ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই যে জ্যাঠাইমা—কখন্‌ এলে? এসেই ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েচ যে—ও সব থাক্‌, এখন ওপরে এসো, আমার দিদির সঙ্গে আলাপ কোরে দি।"

মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, "তুই কাল্‌কের ছেলে—তুই কিনা আমাকে বোল্লি, আমি তোদের বাড়ি ঝগড়া কোর্‌তে এসেচি—তোর বাপ বোলে গেছ্‌ল, তাই দেখ্‌তে এসেচি—তা না হলে কি এ বাড়িতে আর আস্‌তে ইচ্ছে করে? একটুখানি ছেলের এত অহঙ্কার!"

জ্যাঠাইমার ঝঙ্কার শুনিয়া সরল এক দৌড়ে তাহার দিদির নিকট আসিয়া বলিল, "দিদি, খুব সাবধান, জ্যাঠাইমা আস্‌চেন!"

মাতঙ্গিনী গজ্‌রাইতে গজ্‌রাইতে কহিল, "ওলো বামী দেখ্‌লি ছেলেটার আক্কেল—আমাকে পের্‌নাম পর্য্যন্ত কোর্‌লে না—আমাকে বলে কিনা আমি ওদের বাড়ি ঝগড়া কোর্‌তে এসেচি—ছেলেটা একেবারে বয়ে গেচে—ছি-ছি-ছি! তা না হ'লে এই বয়সে বাক্স ভেঙে টাকা চুরি কোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—কি ঘেন্না! আর ওর দিদিটা কে, সেই মাগীটা বুঝি, যেটাকে রাস্তা থেকে এনেচে?"

বামাসুন্দরী ওরফে বামী কহিল, "না জ্যাঠাইমা, অমন কথা বোল্‌বেন না।"

"রাখ্‌ রাখ্‌ আর ঢাক্‌তে হবে না আমরা সব জানি। চার্‌ দিকে ঢি ঢি! সেই মাগিটাকে কিনা আবার বাড়িতে স্থান দেওয়া হয়েচে। আমি হ'লে ঝাঁট্যা মেরে তাড়িয়ে দিতুম, অমন ছেলেরো মুখ-দর্শন কর্‌তুম না। আমার তারানাথ মন্দ বটে, কিন্তু এতদূর নয়, যা হাত তুলে দেবো তাই নেবে।"

বামা বেগতিক দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। উমাশশী মাতার মেজাজ

বুঝিত। সে কহিল, "এ বাড়িতে কি তেমন কেউ আছে যে, ভালো মন্দ বুঝিয়ে দেবে, এ যেন হরি ঘোষের মেলা—চলো মা ওপরে গিয়ে একটু বোসিগে।"

মাতঙ্গিনী কন্যার হস্ত ধরিয়া কহিল, "আয় আগে বাড়িটা পের্দক্ষিণ করি—তারপর হাত পা ছড়াবো।"

বাটী প্রদক্ষিণ করিবার সময় অনেকে আসিয়া মাতঙ্গিনীর পদধূলী গ্রহণ করিল এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। মাতঙ্গিনী সকলকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, বাড়িটা এখন যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে, তাহাতে তাহার এখানে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া স্বহস্তে ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা সময় সাপেক্ষ। কালই কর্ত্তাকে বাটীতে তালা বন্ধ করিয়া এখানে আসিয়া থাকিতে বলিবে। আর তারানাথ—তাহার এখানে থাকিতে কষ্ট হবে, কিন্তু কি কোর্‌বে বলো, না থাক্‌লে নয়! পরের উপকার কোর্‌তে হ'লে একটু কষ্ট কোর্‌তে হয়। সে তাহার মাতার খুব বাধ্য—অবশ্য তাহার এ অনুরোধ এড়াইতে পারিবে না। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

—ঃ*ঃ—

প্রিয়দর্শন ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিজের নৈতিক জীবনে দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, মনে হইল বাল্যকাল হইতেই নীতি শিক্ষার প্রয়োজন। এই সময় শুনিলাম, বরাহনগর কুটিঘাটায় একটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় (সাণ্ডেইস্কুল) আছে। সেখানে প্রতি রবিবারে ইস্কুলের ছেলেদের নীতি-শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ইস্কুলে যতীনকে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। এই সূত্রে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত এই ইস্কুলে শিক্ষা দান করিতেন।

বরাহনগরেই ভবনাথ বাবুর বাড়ি। বিধাতা তাঁহাকে কমণীয়-কান্তি-সুন্দর সুপুরুষরূপে সৃজন করিয়া, তাহার উপযুক্ত মন প্রাণও দিয়াছিলেন। তিনি অতি কোমল-হৃদয় বন্ধু-বৎসল প্রিয়দর্শন ছিলেন।* শুনিলাম, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি

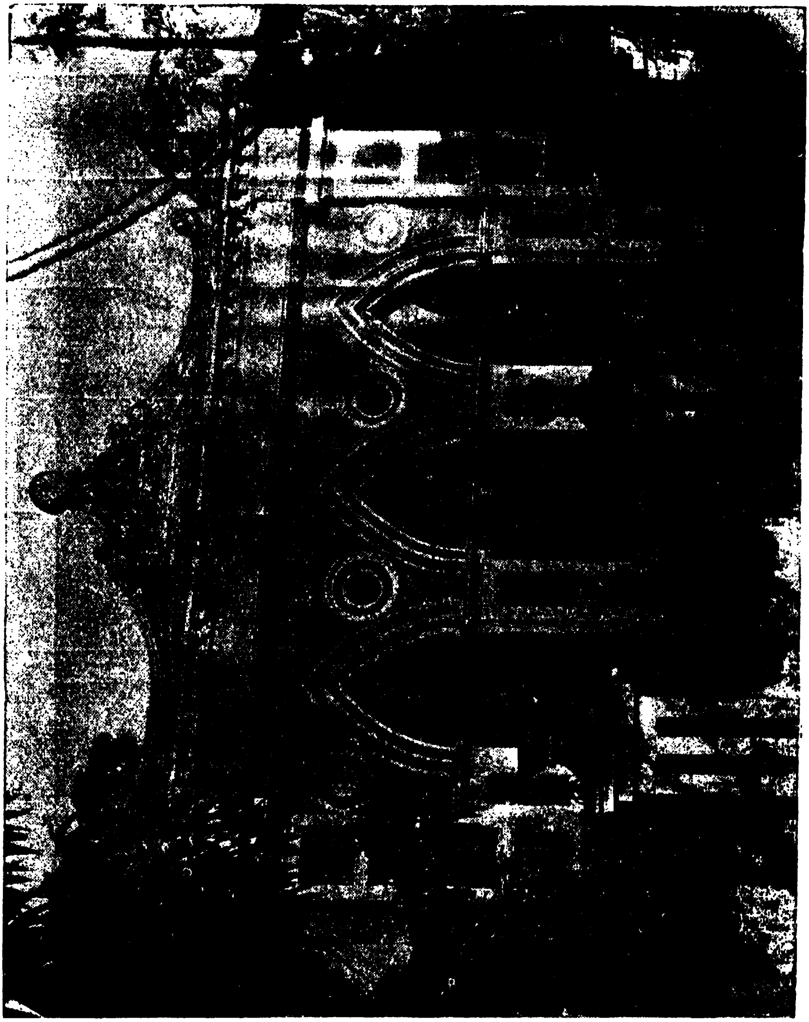
* সময়ের অল্পতাবশত ভবনাথ বাবুর ফটো সংগ্রহ অভাবে, তাঁহার চিত্র প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। (লেখক)

আমাকে ঘনিষ্ট বন্ধুর স্থায় করিয়া লইলেন। প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে আমাদের বাড়ি আসিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বনহুগ্লির কোনো এক বাগানে গিয়া বসিতেন। ইতিমধ্যে কেবল আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। যদিও আমার স্মরণ নাই, তখন তাঁহাকে আমি আমার মনের অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন নিশ্চয়ই আমার মনের সমুদয় অশান্তির ভাব বুঝিয়াছিলেন; তাঁহাকে অকৃত্রিম বন্ধুভাবে কথা বলিয়াছিলাম। বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া, তিনি অত্যন্ত কষ্টবোধ করিরাছিলেন, তাই আমার জন্য তাঁহার প্রাণে এত সহানুভূতির উদয় হইয়াছিল। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের কথা এবং অন্যান্য সাধু মহাত্মাদের কথা বলিয়া আমার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহসা এই ঘটনা বিধাতার অপার করুণা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

এই সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ব হইতে বরাহনগর অঞ্চলে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জনহিতকর বিবিধ সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহার মধ্যে নিয়োগীপাড়ায় তাঁহার নিজ বাটীর সংস্থষ্ট "শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটে" লাইব্রেরী, বালিকাবিদ্যালয়, শ্রমজীবিদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয় এবং প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ঈশ্বরোপাসনা হইত। সর্ব্ব প্রথমে ভবনাথ বাবু আমাকে এখানে লইয়া যান। তখন আমি উপাসনার ভিতরকার যে ভাবার্থ, তাহা তেমন কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু প্রাতঃকাল, স্থানটিও বেশ মনোরম, তারপর শশিপদ বাবুর পুত্র এ্যাল্‌বিয়ান রাজকুমারের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত ব্রহ্ম সংগীত এবং উপাসনার কোনো কোনো কথা বেশ ভালো লাগিত। পাঠকগণের অবগতির জন্য শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটের একখানি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মধ্যে মধ্যে এখানে যাওয়া হইত; আর সেই সময় মুন্সী বাবুদিগের পুরাতন বাটীতে পরমহংস মহাশয়ের শিষ্য-মণ্ডলী অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভবনাথ বাবু আমাকে সেখানেও লইয়া গেলেন। ত্যাগী যুবকগণকে দেখিয়া আমার বড়ই ভালো লাগিল। মনে যেন কি এক অজ্ঞাত ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে—কোনো কোনো দিন পূর্ব্বাহ্নেও তথায় যাইতাম। প্রতিদিন ভবনাথ বাবু উপস্থিত থাকিতেন, কোনো দিন তাঁহার সঙ্গেই যাইতাম। সেই সময় তিনি বি-এ পড়িতেছিলেন। আমি ভিতরে সন্ন্যাসীবৃন্দের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতাম, আর তাঁহাদের কথাবার্ত্তা

শুনিতাম। ভবনাথ বাবু তাঁহার সহপাঠী এক বন্ধু—সত্যবাবুর সঙ্গে মিলিয়া বাহিরের অন্য এক ঘরে পড়িতেন। ঐ বাড়িতে যুবকগণের জ্ঞানোন্নতির জন্য "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা" ও তাহার অন্তর্গত একটি লাইব্রেরীও



শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট

ছিল। শুনিয়াছিলাম, এই সদনুষ্ঠানের মূলেও শশিপদ বাবুর হস্ত কার্য্য করিতেছিল।

কিছু দিন এই কাশীপুর মঠে যাতায়াত করিতে করিতে দেখিলাম। একটি ঘরে সিংহাসনের উপর পরমহংস মহাশয়ের একখানি ছবিতে ফুলমালা ইত্যাদি দেওয়া রহিয়াছে। আমি তখন প্রথমে তাঁহার যেরূপ ছবি দেখিয়াছিলাম। নিম্নে তাহার একখানি অনুরূপ প্রদর্শিত হইল :—



পরমহংস রামকৃষ্ণ

আর একদিন দেখিলাম, দেওয়ালে লেখা রহিয়াছে, "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় রামকৃষ্ণায় নমঃ"—ভবনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাসুদেবায় রামকৃষ্ণায় নমঃ' শব্দের ভাবার্থ কি? ভবনাথ বাবু বলিলেন, "ইহারা

(শিষ্যমণ্ডলী) বিশ্বাস করেন, পরমহংস দেব ঈশ্বর-অবতার ; বোধ হয় সেইভাবে ঐ লেখা।"

এই সময় ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার কোনো মতের যে দৃঢ়তা জন্মে নাই, তাহা বেশ মনে হয়,—তবুও এই কথা শুনিয়া আমার মনে কেমন খট্‌কা লাগিল। যতটুকু ধারণা হইয়াছিল, তাহাতে অবতারবাদ স্বীকার করিতে পারিলাম না। কোনো মনুষ্যকেই ঈশ্বর জ্ঞান করা আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ বোধ হইল। পরমহংস মহাশয় একজন পরম ভক্ত—বিশেষ মনুষ্য, এই আমার বিশ্বাস। সুতরাং এই বিশ্বাসের ভিন্নতা জন্য সেই দিন হইতে মঠে যাওয়ায় আমার শিথিলভাব জন্মিয়া ক্রমে যাওয়া আসা বন্ধ হইয়া গেল। (ক্রমশ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি কুশদহ অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীতে এবার যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হইবেন, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা 'কুশদহ কার্য্যালয়ে' নিজ নিজ বিবরণসহ সংবাদ প্রেরণ করিলে, তাহা 'কুশদহ' পত্রে প্রকাশিত হইবে।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

যমুনা সংস্কারের মেমোরিয়াল শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কোনো কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী মেমোরিয়াল পাইয়া বলিয়াছেন, যখন প্রজা সাধারণ Sanitary Drainage Act অনুসারে কর দিতে প্রস্তুত আছে, তখন সংস্কার না হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। মেমোরিয়াল আপাতত বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের আপিসে রহিয়াছে।

গত ৭ই মে গোবরডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতি হইয়া ইংরাজীতে একটি সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র তাঁহার প্রাণের কথা-যমুনা নদীর সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলেন। উক্ত স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। পরিশেষে তিনি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর বিবরণ এত করুণ রসে বর্ণনা করেন যে, জনসাধারণে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রাপ্ত-পত্র

—:*:—

গোবরডাঙ্গা হাই-ইস্কুলের উন্নতি কল্পে যে চাঁদা আদায় হইয়াছিল তাহার জমা খরচ *

জমা—	
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়	৫০৲
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৫৲
„ ননিগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৫৲
„ কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়	১২৲
„ হরিশচন্দ্র বল	১০৲
„ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	১০৲
বারোয়ারি ফণ্ড	১৮৲
গৈপুর	
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০০৲
মিঃ পি, এন্, বসু	৫০৲
শ্রীযুক্ত পতিরাম চট্টোপাধ্যায়	৫০৲
„ কার্ত্তিকচন্দ্র দে	১১৲
„ সতীশচন্দ্র সিংহ	১০৲
„ অমিয়নাথ বসু	১০৲
„ বিনয়কৃষ্ণ বসু	১০৲
ডাঃ কে, কে, ঘোষ	১০৲
শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র	৫৲
„ নরেশচন্দ্র সিংহ	৫৲
„ উপেন্দ্রনাথ বসু	২৲
„ হরিচরণ সিংহ	১৲
ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র	১৫৲
("গ্রাম্য সমিতি" সম্পাদক)	৮০৲
খাটুরা	
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রক্ষিত	১০০৲

জমা—	
শ্রীমতী বিনোদিনী সেন	১৫৲
„ অনঙ্গমোহিনী আশ চৌধুরাণী	২০৲
শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ	৫৲
ডাঃ অম্বিকাচরণ রক্ষিত	৫৲
শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
„ সনাতন ভট্টাচার্য্য	১৲
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৲
ইছাপুর	
„ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
মাটীকোমরা	
মিঃ এন্, সি, ঘটক (দুই বারে)	৪৲
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
ঘোষপুর	
„ নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
„ শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
„ তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
„ হাজারীলাল ঘোষ	৫৲
চাতরা	
„ জগৎপ্রসন্ন মিশ্র	১৫৲
শ্রীমতী যোগমায়া দেবী মীরজাফর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা	৫০৲
শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বক রাও (সার্কাসওয়ালা)	৩০৲
„ হরিপদ দাস ষ্টেশন-মাষ্টার	৫৲
মোট—	১২৩৭৲

* স্থানাভাবে এবার খরচের তালিকা বাহির হইল না,—আগামীবারে হইবে। (কুঃ সঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা

১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিনামূল্যে বেগমবাহার

উপহার। 'তারার মালা' নামক ১৩৫ পৃষ্ঠায় পূর্ণ কয়েকখানি হাফটোন ফটোযুক্ত এক খানি মনোরম উপন্যাস বেগমবাহার তৈলের প্রত্যেক ক্রেতাকে উপহার স্বরূপ দিতেছেন। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।







বেগমবাহার তৈল

বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু আয়াসে, বহু প্রাচীন আশ্চর্য্য হাকিমি দ্রব্যের সমবায়ে প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা বাদসাহ বেগমদের নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল বলিয়াই তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অটুট থাকিত। যদি যাবতীয় কেশ-রোগ দূর করিয়া সৌন্দর্য্যশালী ইহতে চান, 'বেগম বাহার' ব্যবহার করুন; ঘন কৃষ্ণ কোমল মসৃণ শোভাময়, অলকদামে মস্তক পরিপূর্ণ হইবে। যদি যাবতীয় শিরোরোগ দূর করিয়া মস্তিষ্কের শক্তি লাভ করিতে চান, 'বেগম বাহার' ব্যবহার করুন; সৌরভে মন মাতিবে, মাথা ধরা দূর হইবে, সুনিদ্রা হইবে, মস্তিষ্ক শীতল ও শক্তিশালী হইবে।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ।৵০।

হাকিম মসিহর রহমান

১১৪।১১৫ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বত্রে পাওয়া যায়।

তিনটী আবশ্যকীয় কথা

প্রথম।—আমাদের কেশরঞ্জন তৈল সুগন্ধে অতুলনীয়। একবার "কেশরঞ্জন" মাখিয়া স্নান করিলে বোধ হইবে, মাথায় কে যেন পারিজাতের সুবাস-সিক্ত করিয়া, সুগন্ধি-সম্ভারে দিক সমূহকে আকুল করিতেছে। প্রত্যহ ইহা ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিষ্ক কার্য্যক্ষম হয়, মাথাঘোরা, মাথাধরা, প্রভৃতি যেন মন্ত্রবলে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়।—বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহস্র উপকরণ থাকিলেও সুগন্ধির জন্য, কেশবর্দ্ধক শক্তির জন্য, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্য আর দ্বিতীয় উপকরণ নাই। এই জন্য বঙ্গীয়-মহিলাকুল "কেশরঞ্জনকে" স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বঙ্গীয় যুবতীগণ, কোনো সভায় নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে,—বাড়ীতে কোনো কাজ-কর্ম্ম হইলে "কেশরঞ্জন" না মাখিলে তৃপ্ত হন না।

তৃতীয়।—যাঁহারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র, যাঁহারা জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিষ্টার—তাঁহারা বিনা বিচারে "কেশরঞ্জনের" পক্ষপাতী। কেননা—তাঁহারা ক্রমাগত পরীক্ষায় বুঝিয়াছেন—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা পরিপুষ্ট করিতে—গভীর মস্তিষ্ক চালনা-ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে সতেজ ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে আমাদের "কেশ-রঞ্জন" অদ্বিতীয়।

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি এগারো আনা। ডজন ৯৲ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

কর্ণরোগান্তক তৈল।

আমাদের "কর্ণরোগান্তক তৈল" ব্যবহার করিলে, কর্ণশূল (কটুকটানি), কানে পুঁজপড়া ও কর্ণপ্রদাহ প্রভৃতি যাবতীয় কর্ণরোগ আরোগ্য হয়। শ্রবণ-যন্ত্রের পীড়ায় নানা কারণে অসুবিধাভোগ করিতে হয়। অনেকে যাতনায় হয় তো দিনরাত ছটফট্ করিয়া কাটান। অনেক স্থলে এই সমস্ত কর্ণরোগের পরিণামে অনেকে বাধির্য্য (কালা) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমাদের "কর্ণরোগান্তক তৈল" বাধির্য্যরোগেও মহোপকারী। কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা অল্পদিন ব্যবহার করিলেই ফল পাওয়া যায়। জটিল অবস্থায় কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রয়োগকালে কোনো প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব হয় না। কর্ণ যেন শীতল হইয়া যায়। এক শিশির মূল্য ৸০ বারো আনা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ পাঁচ আনা মাত্র।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

পঞ্চম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২০ [৩য় সংখ্যা

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

কার্য্যালয় :—

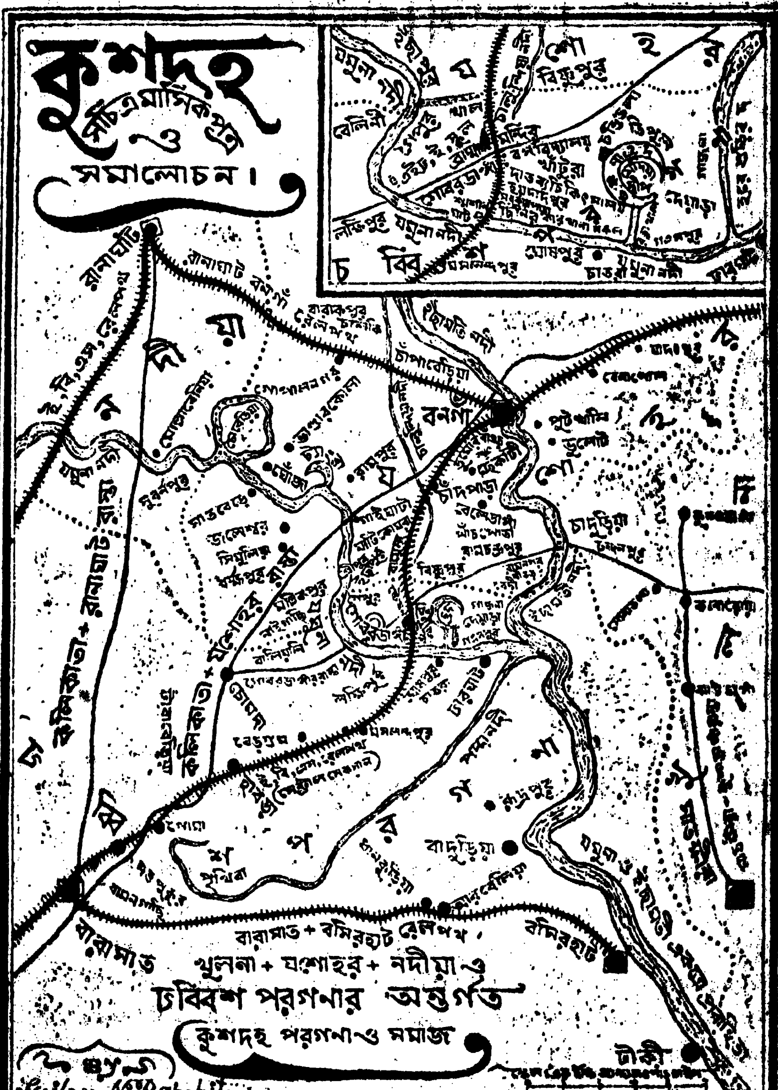
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা প্রতি সংখ্যা /১০

সূচী।

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কুশদহ-মানচিত্র


কুশদহ
সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।
রানাঘাট
বনগাঁ
চাঁদপাড়া
বাদুড়িয়া
বারাসাত
বারাসাত + বসিরহাট রেলপথ
বসিরহাট
টাকী
খুলনা + যশোহর + নদীয়া ও
চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত
কুশদহ পরগনা ও সমাজ
Sailen N. Rakshit.

নিয়মাবলী

১। ১৩২০ সালের "কুশদহ" সচিত্র মাসিক পত্র ডিমাই আট পেজী ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা আকারে অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা মায় ডাকমাশুল ১৲ এক টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ নমুনার জন্য ৵০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। কেবল পোষ্টকার্ড লিখিলে বা আধ আনার টিকিট পাঠাইলে কোনোরূপ নমুনা পাঠানো যায় না।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ ৪ঠা ৩রা নাগাদ কাগজ পান কি না লক্ষ্য রাখিবেন। ১০ই পর্য্যন্ত কাগজ না পৌছিলে আমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ই এর পর আমরা দায়ী হইতে পারিব না, অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য ৵০ মূল্য লাগিবে। যথাসময়ে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দেওয়ায় কাগজ খোয়া গেলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধের কারণ দেখানো অথবা ফেরত দেওয়া কিম্বা অধিক দিন কাপী রাখা হয় না। ফেরত পাইতে হইলে ৴১০ টিকিট পাঠাইতে হয়। মনোনীত প্রবন্ধ কোন্ মাসে বাহির হইবে, তাহা অগ্রে বলা যায় না।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনো পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৫। কুপনে পরিষ্কাররূপে পুরা নাম ও ঠিকানা না দিলে হিসাবে গোল হইবে, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন।

৬। বৈশাখ হইতে চৈত্র, বৎসর পূর্ণরূপে গ্রাহক হইতে হয়।

৭। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্রিকাদি, সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে, মনিঅর্ডার ও অন্যান্য বিষয়ের পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

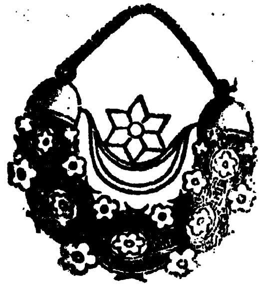
কুশদহে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম—দীর্ঘ সময়ের জন্য,—কভারের ১ম পেজ ৬৲, ৪র্থ পেজ ৫৲, ২য় পেজ ৪৲, ৩য় পেজ ৩৲, রিডিং শেষ পেজ ৪৲, ফর্ম্মার ১ পেজ ৩৷০ টাকা, আধপেজ ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বন্দোবস্ত আমাদের এজেণ্ট, ক্যালকাটা এডভার্টাইজিং এজেন্সী, ১১ নং ক্লাইভ রো, এবং কুশদহ-কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত স্থির করিতে হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা হয়।

"কুশদহ" এক্ষণে ১০০০ এক হাজার ছাপা হয়।

কুশদহ-কার্য্যালয়, ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	শ্রীসরলকুমার কুণ্ডু কার্য্যাধ্যক্ষ।

নূতন জুয়েলারি ক্যাটালগ।





এ বৎসর আমাদের ৩ প্রকার ক্যাটলগ ছাপানো হইয়াছে। ১নং সুবৃহৎ ক্যাটলগের মূল্য ৫৲ টাকা। পুরাতন গ্রাহকগণ মায় মাশুলাদি ১৸০ সিকায় পাইবেন। ২নং মাশুলাদি সহ ||৵০ ৩নং /০ আনা মূল্যে পাইবেন।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্

৪০নং গরাণহাটা, কলিকাতা।

গভর্ণমেণ্ট দ্বারা রেজেষ্টারি করা।

৪০ বৎসরের আবিষ্কৃত লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত, বিশ্ববিখ্যাত

মায়াপুর রসায়ন।

বিনা মূল্যে "মায়াপুর রসায়নের

ব্যবস্থাপত্র ও "বৃহৎ ভারত সঙ্গীত"

পুস্তক বিনামাশুলে পাইবেন।

৵১০ টিকিট পাঠাইলে ।০ আনা মূল্যের "বৃহৎ কবিরাজী শিক্ষা" বিনামূল্যে পাইবেন।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ম্যানেজার—আর ব্যানার্জ্জি।

১১৪ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, কলিকাতা

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২০ | তৃতীয় সংখ্যা

সঙ্গীত

বিভাস—একতালা

(আমি) যে দিন তোমারে পরাণ ভরিয়া ডাকি ;
(তব) শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি।
কে যেন সে দিন আঁখি-তারকায়,
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর ভব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
স্ফুটতর ঐ নভো নীলিমায়,
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চমে গায়, কুঞ্জ-ভবনে পাখী।
যেন গো তোমার পুণ্য-পরশ,
ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

পূজা

—(*)—

কোন্ খানে থাকো তুমি
জীবনের জীবন আমার,
কোথা সে অমর লোক
অতীত কি সব সাধনার ?
কিছু আমি নাহি জানি—
অবসর নাহি জানিবার ;
শুধু জানি, তুমি মোর
সব হ'তে বেশি আপনার !
তাই ওগো, নিশিদিন—
মাতাইয়া এ মরু হৃদয়
জেগে উঠে স্তুতি-গীতি—
ফুটে উঠে কুসুম নিচয় :—
গাই গান আনমনে,—
গাঁথি মালা নয়নের জলে—
ভকতের পূজা এ যে
দেবতার শ্রীচরণ-তলে !
মনে হয় তুমি সদা
হাসিমুখে নীরবে বসিয়া
শুনিতেছ গান মোর—
ফুল-মালা নিতেছ তুলিয়া !
সাধ যায় হেরি তোমা—
নিজ হাতে সাজাই তোমারে ;
বিফল বাসনা কেঁদে
ফিরে আসে শুধু বারে বারে !
এই দগ্ধ জীবনের
বুক ভরা আকুল পিপাসা,
কে জানে কখনো হায়,
মিটা'বে কি মিলনের আশা !

শ্রী—

ইতিহাস কি

ইতিহাস অনেক উপযোগী বিদ্যা ও জ্ঞানের আধার। ইতিহাস সংসারের প্রাচীন ও নবীন মহত্বপূর্ণ ঘটনাদি ও সমস্ত দেশের প্রধান প্রধান মনুষ্য-চরিত্রের জ্ঞান প্রদান করে। মনুষ্য কিরূপে নিজ বুদ্ধিবলে অত্যন্ত অসভ্য ও বন্য অবস্থা হইতে ক্রমশ উন্নতি করিতে করিতে বর্ত্তমান সভ্যতায় উপস্থিত হইয়াছে, ইতিহাস তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। প্রত্যেক দেশের উন্নতির ও অবনতির কারণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঐ সমস্ত দেশবাসীর রীতি নীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি। কেবল ইহাই নহে, ঐ সকল দেশের ঘটনার পরিণামের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নিজেদের ভালো মন্দ অবস্থাও জানিতে পারা যায়। যে দেশ অথবা যে সমাজ পরাধীন ও অবনত হইয়া নানা দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া প্রতিদিন নিপীড়িত হইতেছে, ইতিহাসই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। সে জাতি এই ইতিহাস পাঠ করিয়া আপনাদের অবস্থাকে কি করিয়া ভবিষ্যতে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে তাহার চেষ্টা করে। ইতিহাসই রাজনীতির পরিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন। ইতিহাস পাঠ ব্যতীত রাজনীতিতে হস্ত প্রদান করা সহজ নহে। অধ্যাপক সিলি লিখিয়াছেন ;—

Politics are vulgar, when they are not liberalised by history and history fades into mere literature when it losses sight of its relation to practical politics.

ইতিহাস পাঠে ইহাও জানিতে পারা যায়, যে দেশ এক সময় উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে, তাহারো আবার পতন হয়। যেমন রোম সাম্রাজ্য এক সময় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

ইতিহাস পাঠে কি কি বিষয় লাভ করা যায় তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ লোকই ইতিহাসকে বিবিধ ঘটনার পুঁটুলী ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন না। ইহার কারণ এই যে, ছাত্র অবস্থায় বিদ্যার্থীদিগের ইতিহাসে অত্যন্ত অরুচি। উহারা ইতিহাসকে লোহাচুর ভাজা মনে করে। এই ইতিহাসের পুঁটুলীটি তাহাদের উদরস্থ

করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। কে কোন্ সময়ে জন্মিল, কবে মৃত্যু হইল, কোন্ সময় সিংহাসনারূঢ় হইল, কবে সিংহাসনচ্যুত হইল, কে কখন কোন্ রাজ্য লাভের জন্য যুদ্ধ করিল, এই সমস্ত বিষয় উদরস্থ করিতে তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। অনেকে বিরক্ত হইয়া বলেন যে, ইতিহাসবেত্তারা তো মরিয়া গেলেন—আর আমাদের ঘাড়ে একটা বোঝা চাপাইয়া গেলেন। এ কথাটা ঠিক। কারণ ইস্কুল কলেজে ইতিহাসের পঠন ও পাঠন-প্রণালী এরূপ হইয়াছে যে, অধ্যাপকেরা উপরোল্লিখিত কথাগুলি ব্যতীত অন্যান্য লাভজনক কথা তাহাদের ধারণাতেই আসে না।

ইতিহাস যদি ঠিক লেখা যায়, যদি শিক্ষক ও ছাত্র ঠিক ভাবে পড়েন ও পড়ান, তাহা হইলে ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা সমূহ রুক্ষ ও নীরসের পরিবর্ত্তে শিক্ষিত ছাত্রদের পক্ষে সরস ও রুচিকর হয়।

রাম ও যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য, বিক্রম ও ভোজরাজার প্রজাবাৎসল্য ও ঔদার্য্য, পৃথ্বিরাজ ও জয়চন্দ্রের মনমালিন্য, মুসলমানদের হিন্দুর উপর আক্রমণ, উদয়পুরের মহারাণার দেশভক্তি ও বীরত্ব, আওরেঙ্গজেবের হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, মুসলমানদের পতন, শিখ ও মহারাষ্ট্রদের উন্নতি, অনন্তর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন, ১৮৫৭ সালের সিপাইবিদ্রোহ, সর্ব্বশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সুযোগ্য ইতিহাস-পাঠকদের নিকট নীরস নহে। ভারত ইতিহাস ব্যতীত গ্রীস, রোম ইত্যাদি প্রাচীন দেশের ও ইংলণ্ডাদি নবীন দেশের ইতিহাস পাঠে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করা যায়। বাস্তবিক ইতিহাস কি ও ইহার পরিভাষা কি, এই বিষয়ে ইতিহাসবেত্তাদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা 'গিবন' রোমের অধঃপাত ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—

"ইতিহাস আর কিছুই নহে, কেবল মনুষ্যজাতির অত্যাচার, অজ্ঞানতা, সুখ, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সংগ্রহ মাত্র।" আর একজন ইহাকে দৃষ্টান্তপূর্ণ তত্ত্ব-বিদ্যা বলিয়া মনে করেন। কার্লাইল সাহেবের মতে, মনুষ্য-জাতির ইতিহাস, যথার্থ মহাপুরুষের ইতিহাস। অপর একজন সিদ্ধান্ত নামক কষ্টি পাথরের উপর কসিয়া ইহাকে রসায়নশালা নাম দিয়াছেন। উপরি উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা তাঁহাদের নিজ নিজ অংশমতে ঠিক। কিন্তু সমস্ত কথা বিচার করিয়া দেখিলে এই বুঝিতে পারা যায় যে History is the record of the human mind অর্থাৎ ইতিহাস মনুষ্যজাতির সেই

সকল কার্য্যের সংগ্রহ, যাহাকে উহারা আপনাদের মানসিক শক্তির দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। এ সমস্ত মতের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, সমস্ত মনুষ্যজাতির মানসিক শক্তির প্রেরক একজন। এইজন্য গৌতম ও কনাদ, প্লেটো ও অরস্ত আদি দার্শনিকেরা, যাহা বিবেচনা করিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে না। যে কার্য্য কোনো সময়ে কোনো মনুষ্যদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, চেষ্টা করিলে অনেকেই সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। কিম্বা যে ঘটনা কোনো সময় কোনো মনুষ্যের জীবনে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যকারণের ভাব বুঝিবার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। বিচার ও সংকল্প দ্বারাই সর্ব্বদা কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। অথবা কার্য্য, বিচার, ও সংকল্পই আত্মার শরীর। ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, সমস্তই মনুষ্যের হৃদয়ে বীজরূপে বর্ত্তমান ছিল। ঐ বীজরূপ বিচার অনুকূল সময় পাইয়া ইতিহাসের বিবিধ ঘটনারূপে পরিণত হইয়া যায়। যেমন একটি বীজ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ অরণ্যে পূর্ণ হইয়া যায়। অথবা যেমন মনুষ্যজাতি ও উহার সহিত ভারত, রোম, গ্রীস, ইংলণ্ড ও আমেরিকা ইত্যাদির সৃষ্টি সেই সেই এক মহাপুরুষ হইতে হইয়াছে। সেইরূপ ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার সৃষ্টি কোনো একজন মানুষের বিচারের ফল। ফ্রান্সের রাজ্য-বিপ্লব প্রথমে রুসো ও ওয়ালটেয়ার এই দুই ব্যক্তির বিচারের ফলে ইহার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, পরে যখন এই বিচার-ফল এক, দুই, তিন, চারি করিয়া অন্তিমে সর্ব্বসাধারণের বিচারে যাহা স্থির হইল, তাহাতে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-বিপ্লবের জন্ম হইল। সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্ম ও সামাজিক সংশোধন প্রথমে একজনের বিচারেই উৎপন্ন হয়। পরে যখন সেই বিচার-ফল লইয়া সকলের মনে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম অথবা সমাজের উদ্ধার হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম একজন ব্যক্তিরই বিচারের ফল। মুসলমান ধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা এক সময় দিল্লী হইতে স্পেন পর্য্যন্ত বাজিয়াছিল। উহাও মহম্মদের বিচারের ফল। এইজন্য ইতিহাস যদি ভালোরূপ বুঝিতে ও উহার দ্বারা লাভবান হইতে ইচ্ছা করা যায়, তাহা হইলে যে সময়ের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে, সেই সময়ের মনুষ্যের মনের অবস্থাকে আপনার মনের অবস্থা করিয়া লইতে হইবে, এবং উহার বিচারকে আপনার বিচারের সহিত মিশাইয়া আপনাকে সেই সময়ের লোক মনে করিয়া লইতে হইবে। যেমন গ্রীসের ইতিহাস পাঠের সময় আপনাকে গ্রীক মনে করিতে হইবে। রোমের ইতিহাস পাঠের সময় আপনাকে

রোমান হইতে হইবে। যখন ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের ইতিহাস পাঠ করিবে, তখন আপনাকে অত্যাচারী চার্লস্ মনে করিয়া প্রজাবর্গের উপর ঘোর অত্যাচার করিতেছি এইরূপ ভাবিতে হইবে। আবার আপনাকে ক্রম্ওয়েল হইয়া তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে। ইতিহাস পাঠের সময় আপনাকে তন্ময় হইতে হইবে। তখন আপনার মন হইতে তত্র তদানী ও অত্র ইদানী এই সমস্ত ভেদ-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। এই তত্র তদানী ও অত্র ইদানী ভেদ নষ্ট হইলে ইতিহাসকে নিজের নখ-দর্পণে আনিবার জন্য পুরাতন ঐতিহাসিক স্থান সকল খনন করিবার আবশ্যক হয়। প্রাচীন ইজিপ্ট্ দেখিবার আবশ্যক হইলে পিরামিড খনন করিতে হইবে। অশোক কনিষ্ক আদি প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের কার্য্য সকল প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য সারনাথ, পেশোয়ারী, ও পাটলীপুত্র আদি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সকল বিশেষভাবে অন্বেষণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আরো অনেক বস্তু আছে যাহাদিগকে ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। যেমন প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাচীন মূর্ত্তি ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্যের গঠনপ্রণালী ও শিল্প নৈপুণ্যাদির বিষয় জানিতে হইলে ইহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। যে সময় আগ্রার তাজ দেখা যায়, সেই সময় সাজাহানের ইতিহাস, তাঁহার ভোগ বিলাসিতা, সহৃদয়তা, সাজসজ্জাদি যেন চক্ষের সম্মুখে ঝল্‌মল্ করিতে থাকে। যখন বুদ্ধ ভগবানের শান্তমূর্ত্তি দর্শন করা যায়, তখন শান্তি ও অহিংসা প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে এখন এই ধরণে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। এই জন্য তথাকার লোকেরা ইতিহাসে আন্তরিক প্রীতি ও ইতিহাসের সমুচিত শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। যখন ইতিহাস এখানে এইরূপে পাঠ করানো হইবে, তখন পাঠের সময় ছাত্রদের অত্র ইদানী ও তত্র তদানী ভেদাভেদ দূর করিয়া সেই দেশের ইতিহাসকে নিজের ইতিহাস বলিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে। তখন সেই ইতিহাস শুষ্ক ও নীরসের পরিবর্ত্তে সরস, চিত্তাকর্ষক ও মনরঞ্জক হইবে। ইতিহাস হইতে তখন সকলে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দেশ ত্যাগ

৬

শান্তিদেবী ষোড়শী হইয়া অনুপম সৌন্দর্য্যে ভূষিতা হইলেন। কোমল মধুর ভাষা, অস্ফুট স্বামী-প্রেম, মনোহর চরিত্রবিকাশ হইল। কিন্তু প্রাণের সে রত্ন আসিল না,—তপন আর উদিত হইল না,—বিকশিত চিত্ত-কমল আর উজ্জ্বল তেজে প্রফুল্ল হইল না। দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল, কিন্তু আর এ তৃষিত চকোরের নিকট সে পূর্ণ চন্দ্রমা বিকাশ পাইল না। নৈরাশ্যে হৃদয় অবশ হইত, দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যাইত। 'হে হৃদয়দেব! হে প্রাণের প্রতিমা, আমার কী অপরাধ, আমি একদিন কথা বলি নি, তার কি ক্ষমা নেই, আমি এত কি অপরাধ করলুম! কিন্তু কে সে কথা শুনিবে, কেইবা উত্তর দিবে! রামচন্দ্র সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা-সুরঞ্জিত তেজস্বিনী মহিলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। শাশুড়ীর নিকট গিয়া শান্তি ক্রন্দন করিত, মাতার নিকট মনের ব্যথা জানাইত। মাতা বলিতেন, 'কি করি, তোমার পাথর-চাপা কপাল, আমি কি কোর্‌বো?' বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা রামচন্দ্রকে ধরিল, কিন্তু তিনি নানা ওজর করিয়া বাড়ি আসিতেন না, সর্ব্বাপেক্ষা পরীক্ষার ওজরই অধিক।

রামচন্দ্রের হৃদয়ে শাশুড়ীর কথা কয়টি জাগরুক ছিল। তাহা সময়ে সময়ে তাঁহার চিত্তকে দগ্ধ করিত। স্ত্রীর জন্য তত কষ্ট হয় নাই এবং লিলির প্রেম স্মরণ করিয়া তিনি আর স্ত্রীর কথা ভাবিলেন না। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, যদি কেহ না বুঝিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে বিবাহ বিবাহই নহে। কিন্তু এক রমণীকে চিরদিন অনাথা করিয়া অন্য রমণীর প্রেমে আবদ্ধ হইতে তাঁহার কি অধিকার আছে, তাহা তিনি ভাবিলেন না। এই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার অধঃপতনের কারণ হইল। বাড়ি হইতে কেহ আসিলে স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। এবং কেহ তাঁহার স্ত্রীর কথা বলিতে আসিলে তাহাও শুনিতে চাহিতেন না। তখন রেলপথ ছিল না, তারের খবরও ছিল না, সুতরাং কস্মিন্ কালে দেশ হইতে সংবাদ আসিত। শান্তিদেবীকে ও বাড়ির সকলকে ভুলিবার তাঁহার এই প্রধান সুবিধা ছিল।

কেবল মধ্যে মধ্যে মাতার সেই "আদরের মেয়ে বাবা, ক্ষমা কোরো" এই কথাটিতে হৃদয় ভাঙিয়া যাইত। কিন্তু পরক্ষণেই লিলির মোহ আসিয়া তাহা বিদূরিত করিত।

একদিন একজন সম্পর্কীয় ব্যক্তির দ্বারা শান্তি আপনার দুঃখ সকল লিখিয়া রামচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। পত্রখানি ফেরত আসিল। তাহার উপরে সেই পুরাতন "শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী" প্রভৃতি পাঠ ছিল। তাহা রামচন্দ্রের ভালো লাগিল না। তাই পত্রখানি না পড়িয়াই ফেরত দিলেন। তিনি নিজের নিকট নিজে দোষী, তাই পত্রখানি তাঁহার অপরাধ স্মরণ করাইতে পারিল না। লিলি যদি জানিত, তিনি বিবাহিত, তবে তাঁহাকে চাহিত না, কিন্তু লিলিকে তিনি বলিতেন, আমার প্রকৃত বিবাহই হয় নাই। সুতরাং তাহার দ্বিধা বোধ হইল না। রামচন্দ্রের শাশুড়ী ঠাকুরাণী কত লোক পাঠাইলেন, কোনো ফল হইল না। শান্তিদেবী বিধবাও নহে, সধবাও নহে। আহারের কোনো বিচার করিতে হইত না, একাদশী করিতে হয় না, এই যাহা পার্থক্য, নতুবা তাঁহাকে বিধবা ভিন্ন কিছু বলা যায় না। ক্রমে তিনি বাড়ির স্থাপিত পাথরের গোপালকে মনোহর ফুল পত্রে সাজাইতেন, ও মনে করিতেন, এই আমার স্বামী।

৭

মিঃ হব্ উইলসন্ কার্য্যশেষ করিয়া এক্ষণে দেশে যাইবেন। তাঁহার কন্যা হিন্দু স্ত্রীর গর্ভজাত, তাই কোনো উচ্চবংশীয় ইংরাজ পুরুষ বিবাহ করিবেন না। ইংরাজ মহলেও জাতিভেদ আছে, সুতরাং সুশিক্ষিত বিদ্বান্ পরম সুন্দর উচ্চ কুলোদ্ভব রামচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহে তাঁহার আপত্তি ছিল না। একদিন পরিবার-মধ্যে কয়েকটি যুবকের সম্বন্ধে আলাপ হইতেছিল।

লিলি বলিলেন, "আন্সন সাহেব বেশ শিক্ষিত, কিন্তু বড় unsunful ও নিষ্ঠুর।"

পার্ব্বতী। কিসে জান্‌লে ?

লিলি। তিনি পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেছেন এবং ন্যায় বিচারের ব্যাপদেশেই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করেন।

পর্ব্বতী। রামস্‌বোথাম কেমন ?

লিলি। তিনি কার্পাস শিল্পের জন্য ভারতীয় তাঁতিকুল উৎসন্ন করেছেন।

পার্ব্বতী। ম্যাক্ ক্রিটন ?

লিলি। ক্ষমা করো, নিগার হন্তা বোলে বাবা তাকে ক্ষমা কোর্লেন, না হ'লে তার প্রাণদণ্ড হ'ত। ঐ সব গোঁয়ার স্বার্থপর unscrupulous যুবক আমার ভালো লাগে না। রামচন্দ্র যদিও হিন্দু তাঁর মতো ভদ্র ও মনোহর আমার বড় ভালো লাগে।

উইল্‌সন্। মাতৃসংস্কারই কন্যা পায়। পার্ব্বতি, তোমার কন্যা ঠিক তোমারই মতো বিনয়ী।

পার্ব্বতী। নাথ, রামচন্দ্রের মতো যুবক তুমি কি ভারতীয় সাহেবদিগের মধ্যে দেখেচ ?

উইল্‌সন্। তুমি যেমন নেটিভ হইয়াও নারীকুলের অলঙ্কার, রামচন্দ্র তদ্রূপ পুরুষকুলের অলঙ্কার। তবে হিন্দু, কিছু কাপুরুষ।

লিলি গর্জ্জিয়া উঠিল—"না বাবা, কাপুরুষ নয়, সেদিন কুকের আস্তাবলের একটা ঘোড়া আমাকে পদদলিত কোরেছিল আর কি ? রামচন্দ্র প্রকৃত বীরের ন্যায় তার ঘাড়ের ঝুঁটী ধোরে ফেল্‌লেন, আমার প্রাণ বেঁচে গ্যাল। পরে সহিসগণ তাকে ধোর্‌ল। তা ছাড়া তিনি ভারতীয় ইংরেজের ন্যায় নরহত্যায় আমোদ বোধ করেন না।"

লিলি ভুল বুঝিয়াছিল, রামচন্দ্র নারীহন্তা,—শান্তিকে উপেক্ষার জন্য তাহাকে কোনো মতেই ক্ষমা করা যায় না।

এন্‌গেজমেণ্ট অনুসারে রামচন্দ্র Mr. R. C. Sanyal আসিলেন এবং পরিবার-মধ্যে গৃহীত হইলেন।

উইল্‌সন্ বলিলেন, "মিঃ সান্যাল, আপনি আমার কন্যার প্রাণ রক্ষা কোরেছিলেন শুনে সুখী হোলুম, আপনাকে ধন্যবাদ।

রামচন্দ্র। সে কিছুই নয়, যে কেহ সেরূপ কোর্‌তে পার্‌ত।

উইল্‌সন্। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ধন্যবাদ দি।

লিলি ও সান্যালকে একত্র রাখিয়া মিষ্টার ও মিসেস্ উইল্‌সন্ কার্য্যান্তরে গেলেন। লিলি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "মিষ্টার সান্যাল, আমরা বিলাত যাবো, তাই প্যাসেজ লওয়া হ'য়েচে, কিন্তু প্রাণ তোমার নিকট রেখে যাবো। একদিন তোমায় না দেখ্‌লে প্রাণ অস্থির হয়, কেমন কোরে তোমায় না দেখে দীর্ঘজীবন কাটাবো, রাম, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, বিলাতবাসী হবে।"

রাম। ইংলণ্ডে আমার খরচ চল্‌বে কেমন কোরে এবং আমি কি কোরে জীবিকানির্ব্বাহ কোর্‌বো ?

লিলি। ডিয়ার রামচন্দ্র, আমার পিতার অতুল সম্পত্তি তোমার, আমিও তোমার হবো। আমরা ইংলণ্ডে গেলে খরচের কষ্ট হবে না। বিশেষত তোমার মতো বুদ্ধিমান যুবার সর্ব্বত্রই অন্ন জুটবে।

রামচন্দ্র উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া পরক্ষণেই বিমর্ষবদনে বলিলেন, "কিন্তু—"

লিলি। কিন্তু কি?

রাম। আমি বিবাহিত, যদিও সে বিবাহ বিবাহই নয়, লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র এবং আমাদের কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহে দোষ নেই, কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রে তো বহুবিবাহ নেই। আমার এই আপত্তি।

লিলির উজ্জ্বল বদন আঁধার হইল। সেদিন আর কথাবার্ত্তা হইল না।

৮

নানা মুখে নানা উপায়ে রামচন্দ্রের প্রকৃত সংবাদ দেশে পৌঁছিল। শুনিয়া শান্তিদেবী শয্যাগত হইলেন। শান্তিদেবী মুখের নিকট আর্সি ধরিয়া বলিলেন, "ওরে রূপ তোকে ধিক্!" উপেক্ষিতা, পরপ্রেমাসক্ত পতি পরিত্যক্তা শান্তি-দেবী পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে নাপিত ডেকে এনে দিন, আমি মস্তক মুণ্ডন কোর্‌বো, আমার সকল অলঙ্কার বিক্রী করুন। আমায় গেরুয়া বসন দিন, আমাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিতা করুন। আমার আর সংসারে প্রয়োজন কি?"

পিতা রামহরি ভাদুড়ী অতি পণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক লোক। তিনি বলিলেন, "মা, জগতে সকলেই সুখের জন্যে আসে না, সকলেই সুখ পায় না। ত্যাখো, তোমার মতো অল্প বয়সে যারা বিধবা হয় তারাও তো জীবনধারণ কোর্‌চে। তুমি আপন সুখ দুঃখ অশান্তি সব ভগবানকে অর্পণ করো।"

শান্তি বলিলেন, "পিতা, আমি যদি বিধবা হোতুম, আমার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আমি জান্‌তুম ও পালন কোর্‌তুম। কিন্তু"—শান্তি আর কিছু বলিতে পারিল না।

রামহরি। মা, সুখ দুঃখ সমান মনে করো, এ জীবন যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, পাপ কৌরব, পুণ্য পাণ্ডব, এই যুদ্ধে

"সুখ দুঃখে সমকৃত্বা লাভালাভো জয়া জয়ো,
ততো যুদ্ধায় যুদ্ধস্ব নৈব পাপ অপস্যাম।"

মা, তোমার মতো জীবন-সংগ্রামে কেহ পড়ে নি, বড়লোকের কন্যা বড় ঘরের গৃহিণী হ'য়ে কে তোমার ন্যায় ক্লেশ পায়? সুতরাং তোমার জীবনই জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে, মা, তুমি সুখ দুঃখ সমান মনে কোরে, লাভালাভে

—জয় অজয় তুচ্ছ করো, যুদ্ধ করো অর্থাৎ কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও, তা হ'লে আর পাপ আস্‌বে না।

শান্তি। আমার এক্ষণে কী কর্ত্তব্য?

রামহরি। তুমি মনে করো, তোমার কিছুই নেই, আবার সকলই তোমার সেবার জন্য নিয়োজিত—তুমি সকলকেই সেবা কোর্‌বে। তুমি শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করো, পিতামাতার সেবা করো, দেবর ভাসুরকে যত্ন করো। তাঁদের সন্তানগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় পালন করো। আর প্রতিদিন সেই ভক্তহৃদয়-বিহারী পতিতপাবন হরির চরণে চিত্ত সমর্পণ করো।

শান্তি। নারীর যে আর একটি গুরু আছেন, তৎসম্বন্ধে কি কোর্‌বো?

রামহরি। সে তোমার আছে, কিন্তু কাছে নেই। দূরস্থ দেবতার ন্যায় তাঁর একটি পবিত্র স্মৃতি তোমার হৃদয়ে রেখো। পবিত্র ভাব রেখো, তিনি পাপী, কিন্তু তোমার নিকট তিনি দেবতা, হৃদয়ের প্রীতি-ফুল তাঁর চরণে দিয়ো।

শান্তি। বাবা, ব্যবহার-নিরপেক্ষ প্রেম কি সম্ভব? আমার প্রাণ কি সেই পরপ্রেমাসক্ত পাপীর প্রতি পবিত্রভাবে পূজা দিতে পারে?

রামহরি। শান্তি, তোমার জীবনে সেই শিক্ষার জন্যেই ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। তোমাকে তা কোর্‌তে হবে। তুমি তাঁর সুব্যবহার কুব্যবহার দেখ্‌বে না, তোমার প্রেম, তোমার আসক্তি ভগবানের ভেতর দিয়ে তাঁকে দেবে। পাপীর প্রতি রাগ না কোরে বরং তাকে কৃপাপাত্র মনে করো। আহা, মঙ্গল ও ধর্ম্মপথে থেকে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে তারা কেন ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন ছায়?

শান্তি। ভগবানের ভেতর দিয়ে কি প্রকারে তাকে প্রেম দেবো?

রামহরি। মা, ইহকাল পরকাল সকলই ভগবানের মধ্যে, যিনি ইহকালে তিনিও ভগবানের ক্রোড়ে; যিনি পরকালে, তিনিও তাই, বিধবাগণ যেমন তাঁদের ভক্তি ও প্রেম-ফুল ভগবানে অর্পণ করে ও পতির চরণে তাঁরই মধ্য দিয়ে ছায়, তুমিও তেমনি সেই নিরুদ্দেশ পতিকে ভগবানের ভেতরে অবস্থিত মনে কোরে তাঁর চরণে তোমার প্রেম-ফুল দান করো।

শান্তিদেবী পিতার শিক্ষামত ভগবানকে ডাকিলেন। 'হে প্রাণেশ্বর, হে প্রাণের দেবতা, আমার প্রাণ যার জন্যে আকুল তিনি তোমারই ভেতরে আছেন। পিতা, আমার পূজা প্রার্থনা গ্রহণ করো, তাঁর প্রাপ্য যা তাঁকে

ভাও। নাথ, আমি তাঁকে পাই, না পাই, তাঁকে তুমি পুণ্য পথে রাখো, কদাচ পরিত্যাগ কোরো না।'

৯

মিঃ উইল্‌সনের পরিবারে "রামচন্দ্র বিবাহিত" এই কথায় মহাগণ্ডগোল বাঁধিল। যেন কি এক কুয়াসার ছায়া—ঘোর বিষাদের রেখা সকলের মনে লাগিয়া গেল। লিলি কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইলেন; তিনি ভাবিলেন, রামচন্দ্র বিনা প্রাণ ধারণ কোর্‌তে পারি না। পিতামাতাকে বলিলেন, "আমি এ অসহনীয় জীবন আর বইতে পারি না।"

রামচন্দ্রের প্রকৃত অবস্থা পার্ব্বতী বেশ বুঝিলেন, শৈশবে একটি কন্যার গায়ে ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কখনো স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারও হয় নাই, সুতরাং এ বিবাহ বিবাহই নহে।

পার্ব্বতী রামচন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার মতো Struggle আমার প্রথমে হ'য়েছিল। আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, কেমন কোরে বিধবা-বিবাহ হয়? তখন বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হন নি, বিধবা-বিবাহের আইনও জারি হয় নি। অথচ জগতে আমার দাঁড়াবার স্থান নেই, পবিত্র থাকার উপায় নেই, তাই আমায় সাহেবের আশ্রয় নিতে হ'লো অথচ আমি মিঃ উইল্‌সন্‌কে কোনো মতেই বিয়ে কোর্‌তে পারি না।" পরে পাদ্রি সাহেব বলিলেন, "তুমি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করো, Baptised হ'লে তোমার নব জীবন হবে, পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়াকলাপ কিছুই তোমাকে বাঁধ্‌তে পার্‌বে না। তুমি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করো।"

"এখন খৃষ্টান হবো, সেই ঘৃণিত খৃষ্টান, ইক্রু পিক্রুর সহিত বোসে খাবো, তা হবে না।" রামচন্দ্রের মনে এই বিষয় ধাঁধাঁ উপস্থিত হইল।

তখন পাদ্রি সাহেব আসিয়া অনুকুলে দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন "দ্যাখো, টোমাদের সব উপটর্ম্ম, মানুষপূজা, ভুটপূজা, ডেওপূজা, আর আমরা ঈশ্বর পূজা করি, জিজাজ ক্রাইষ্ট মানুষ নন, ঈশ্বর, টোম্‌রা টাঁর পূজা কোর্‌লে পরিত্রাণ পাবে।" ইত্যাদি।

সাহেবের কথায় রামচন্দ্র অতিকষ্টে হাসি সম্বরণ করিলেন, যীশুখৃষ্ট মানুষ নহেন, ঈশ্বর, আর রাম, কৃষ্ণ ঈশ্বর নহেন, মানুষ, অতি চমৎকার যুক্তি। জোর যার মুল্লুক তার।

কিন্তু রামচন্দ্রের পরিত্রাণ জিজাজের হস্তে, তিনি তাহা বুঝিলেন। 'আহা, লিলি যদি তাঁর জন্যে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে তাঁরো প্রাণ যাবে।

না, যাক্ দেশ, যাক্ ধর্ম্ম, আমি লিলি বিনা প্রাণ ধারণ কোর‍্তে পার‍্বো না।'

লিলি বলিলেন, "রামচন্দ্র, আমি তোমার দেশ হবো, আমি তোমার প্রাণের লোক হবো, তোমার কোনো অভাব থাক্‌বে না। তোমায় না পেলে আমি প্রাণত্যাগ কোর‍্বো।"

রামচন্দ্র লিলির ক্রন্দনে আকুল হইলেন। তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল। কিন্তু হায়, তাঁহার জন্য আর একজন যে প্রাণ ত্যাগ করিবে, একথা মনে হইল না।

রামচন্দ্র যীশু ভজিলেন। পূর্ব্ব জীবনের শুভাশুভ, লাভালাভ, পাপ পুণ্য আর তাঁহাতে পৌছিল না। এখনো তাঁহাকে যে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছে, তাহার সকল বন্ধন ঘুচাইয়া ফেলিলেন, হিন্দু বিবাহের কাঁচা হলুদের রং উঠিয়া গেল। স্মৃতির ব্যবস্থাও যাহা, বাইবেলের ব্যবস্থাও তাহা, ইহারই নাম লৌকিক ধর্ম্ম। গোবর খাওয়া ও ব্যাপ্‌টাইজ হওয়া তুই সমান!

অতি আনন্দে মহা সমারোহে উভয়ে দাম্পত্য-বন্ধনে—আর একটি বন্ধন রামচন্দ্রের জীবনে সংঘটিত হইল! আজ রামচন্দ্র মিঃ আর, সি, সান্যাল হইলেন। লিলি উইল্‌সন্ আজ L. P. Sanyal হইলেন। তখন আর উভয়ের কোনো দুঃখ রহিল না। আর কাহারো প্রাণ বিসর্জ্জনের আবশ্যক হইল না।

রামচন্দ্র অতি আনন্দ সহকারে লিলির সহিত মিলিত হইলেন, তাঁহার প্রাণের আশা পূর্ণ হইল। বিবাহে ইংরাজী ঘটার কিছু বাকি রহিল না। নিশি অবসানে রামচন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শান্তির মাতা বলিতেছিলেন, "বাবা আমার বড় আদরের মেয়ে যত্ন কোরো, তোমার হাতে সঁপে দিলুম।" রামচন্দ্র কাঁদিয়া উঠিলেন, লিলি স্বপ্নের কথা শ্রবণে মনে মনে বড় সহানুভূতি বোধ করিলেন।

দিকশূন্য সীমাশূন্য পরিধিশূন্য অগণ্য বীচিমালা-সমাকুল বঙ্গোপসাগরের অনন্ত তরঙ্গ ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড পালভরে ইংরাজের তরণী অনন্ত সমুদ্রপথে অগ্রসর হইতেছে। বহু যাত্রীপূর্ণ জাহাজখানি যেন অনন্ত জীবজন্তু-পরিপূর্ণ পৃথিবীর ন্যায় আহ্নিক গতিতে চলিতেছে। জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে তুইটি যুবক যুবতী বসিয়াছিলেন। রামচন্দ্র আজি বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষ, নিজ পরিবার, নিজ জাতি, নিজ ধর্ম্ম, সকলের নিকট চিরজীবনের জন্য বিদায় লইলেন।

সান্যাল-বাড়ির রাম বনবাসে গেলেন, এবং শান্তি চিরকালের জন্য বাল্মীকির তপোবনে তপস্বিনীর বেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। আজ শেষ দিনে দেশত্যাগী পাষণ্ড রামচন্দ্রের মনে পিতামাতার কথা, পল্লীর কথা, প্রতিবাসীগণের কথা, আর এক জনের—না, আর না। রামচন্দ্রের চক্ষে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। লিলি সুবাসিত রুমাল হস্তে তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন। আর একজনের হৃদয়েও দুঃখ হইতেছিল, কিন্তু তিনি সমাজ-পরিত্যক্তা, তাঁহাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে তত পরিতাপ-বহ্নি জ্বলিতেছিল না, তিনি আর্দ্রচক্ষে প্রাণের আবেগে বলিলেন, "Farewell, mother India." তিনি মিসেস্ পার্ব্বতী উইল্‌সন্, আমাদের সেই চিতায় সমর্পিতা অভাগিনী। প্রকাণ্ড তরণী নীলাম্বু ভেদ করিয়া সাগরের দিকে চলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে এসিয়াখণ্ড অতিক্রম করিল। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের মন হইতে শান্তিদেবীর স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল।

কিন্তু শান্তি সেই একদিনের স্মৃতি লইয়া আজীবন ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দান, ধ্যান, জপ, কর্ম্ম নানা অনুষ্ঠানে শান্তিদেবী দেশপূজ্যা হইলেন। তাঁহার যশে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইল। (সমাপ্ত)

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

বায়ুমণ্ডল

সকলেই জানেন যে, আমাদের পৃথিবী কেবলমাত্র মাটিতেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে বায়ু ও অন্যান্য গ্যাসের একটা অদৃশ্য আবরণ আছে। উহা আমরা চক্ষে দেখিতে না পাইলেও নানা পরীক্ষা ও প্রমাণে মানিয়া লইতে হয়। কতদূর পর্য্যন্ত ঐ বায়ুমণ্ডল ব্যাপ্ত এ পর্য্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকই তাহা সুনির্দ্দিষ্টরূপে বলিতে পারেন নাই। পৃথিবী হইতে দুইশত মাইল উচ্চে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দেখিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, দুইশত মাইল পর্য্যন্ত পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের ব্যাপ্তি। কিন্তু বায়ুরাশি যে উক্ত দৈর্ঘ্য ছাড়াইয়াও বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরেও বায়ুমণ্ডল আছে কিনা জানিবার জন্য আজকাল পণ্ডিতেরা চেষ্টা করিতেছেন।

এই বায়ু কেবল যে পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশের দিকে আছে তাহা নহে, পৃথিবীর মাটির ভিতরও কতদূরে এই বায়ুরাশি প্রবেশ করিয়া আছে। এইজন্য কূপ, প্রস্রবণ ইত্যাদির জলের সহিত বায়ু মিশিয়া থাকে। জল গরম করিবার সময় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই বায়ুমণ্ডল ব্যতীত উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব। চলাচল, পরিপাকশক্তি, শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য্য এ সমস্তই বায়ুমণ্ডলের একটি উপাদান অক্সিজেন্ (oxygen) বাষ্পের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে এই অক্সিজেন্ বাষ্পের উপরই ভগবানের পার্থিব জীব-সৃষ্টি-লীলা অনবরত চলিতেছে। অক্সিজেন্ বাষ্প গ্রহণ দ্বারা আমাদের শরীরের যন্ত্রাদি শ্রমজনিত ক্ষতি পূরণ করিয়া পুনর্ব্বার নব শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। শরীরের এই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ নামক বিষাক্ত বাষ্পরূপে বাহির হইয়া যায়। এই কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প কোনো দ্রব্য দহনকালেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গাছপালারাও বায়ু ব্যতীত একমুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারিত না। মানুষের পরিত্যক্ত কার্ব্বনিক্ এ্যাসিড্ গ্যাস্ বৃক্ষাদি গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন্ বাষ্পকে ত্যাগ করে। আমরা আবার সেই অক্সিজেন্ গ্রহণ ও কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ বাষ্প ত্যাগ করি। সুতরাং এই আদান-প্রদানে প্রকৃতির ভাণ্ডারে বাষ্পের পরিমাণ কদাচ হ্রাস হয় না, পরন্তু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জীব ও উদ্ভিদের এই উল্টা ব্যাপারটিতে ভগবান্ সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন।

বৃক্ষের দেহে সেইজন্যই কার্ব্বনের মাত্রা অধিক। জন্তুরা আবার গাছপালা ভক্ষণ করিয়া নিজেদের শরীরের পুষ্টির জন্য আবশ্যকীয় কার্ব্বন্ সংগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা গেল, বায়ুতে যদি কার্ব্বনিক্ এ্যাসিড্ গ্যাস্ ও অক্সিজেন্ না থাকিত, তাহা হইলে উদ্ভিদও কার্ব্বন্ সংগ্রহ করিতে পারিত না এবং উদ্ভিদ হইতে জীবজন্তুরাও দেহ-পুষ্টির জন্য কার্ব্বন্ গ্রহণে অক্ষম হইত। একমাত্র মানুষের প্রাণক্রিয়াই যে বায়ুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নহে; বায়ু বিহনে প্রাণবান্ হইলেও মানব জীবন ধারণ করিতে অক্ষম হইত। কারণ বায়ুর অক্সিজেন্ (oxygen) ব্যতীত অগ্নি কদাপি প্রজ্বলিত হয় না। অগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে মানুষকে তাহার সেই আদিম অসভ্য অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। অনবরত তুষারপতনে আমরা জীবন্মৃত হইতাম। প্রকৃতই অগ্নি মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের জ্যোতিতে উত্তীর্ণ

করিয়া দিয়াছে। সভ্য জগতের সামান্য উপকরণটুকুও অগ্নি ব্যতীত অসম্ভব। বায়ুর অভাবে অগ্নির অভাব। আর অগ্নি না থাকিলে কোথায় আমাদের বাষ্পীয়যান, বাষ্পীয়পোত, ট্রেণ, মোটর, টেলিগ্রাম, টেলিফোঁ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ? অক্সিজেন্ ও কার্ব্বনের নিকট আমরা যতদূর কৃতজ্ঞ, এতদূর কৃতজ্ঞ আমরা সমগ্র জড়জীবের স্রষ্টা এক ঈশ্বর ব্যতীত অপর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট নহে।

অগ্নি বাদ দিয়াও মনে করা যাউক মানুষ প্রাণবান্ হইতে পারে। তাহাতে আর কষ্টের অবধি হইত না। সমস্ত রাত্রি তাহাকে ভীষণ তুসারপাত সহ্য করিয়া পরদিন প্রত্যূষে পুনর্ব্বার প্রবল উত্তাপ ভোগ করিতে হইত। দুইশত মাইল ব্যাপী এই বায়ুমণ্ডল আমাদের কত যে উপকার করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পৃথিবীর উপর বায়ুমণ্ডলই শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুর পরিবর্ত্তন ও দিবাভাগের উত্তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি সংঘটিত করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যদেব ঠিক আমাদের মস্তকের উপর এক সরল রেখাসূত্রে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর উপর ঠিক সোজাভাবে কিরণ-রশ্মিগুলি বিচ্ছুরিত করিয়া দেয় ; সুতরাং পৃথিবীও শীঘ্র শীঘ্র গরম হইয়া পড়ে। এইরূপ সোজাভাবে আসিবার সময় কিরণ রশ্মিগুলিকে বায়ুমণ্ডলের অল্প অংশই ভেদ করিয়া আসিতে হয় কিন্তু বৈকালে সূর্য্য যখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়ে অথবা প্রভাতে পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তখন সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়াভাবে পতিত না হইয়া, কতকটা বাঁকিয়া আসে সুতরাং বায়ুমণ্ডলের অনেকখানি অংশকে ভেদ করিয়া তবে সূর্য্যকিরণকে পৃথিবীর উপর বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায়। প্রভাত বা সায়াহ্নের সহিত মধ্যাহ্নের উত্তাপ মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধির যতগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই বায়ুমণ্ডলের অবস্থান তাহার অন্যতম। গ্রীষ্মকালেও সূর্য্যকিরণ ঠিক সোজা পথে পৃথিবীর উপর পতিত হয় বলিয়া তখন অত গরম বোধ হয় এবং শীতকালে তাহার পথ কতকটা বক্র বলিয়া উত্তাপের হ্রাস লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত বায়ুমণ্ডলের জন্য ঘটে।

সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র বা Spectrum লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বর্ণচ্ছত্র সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় নাই—মাঝে মাঝে কৃষ্ণ রেখা দ্বারা খণ্ডীকৃত। এই কৃষ্ণ রেখাগুলির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলেরই আশ্চর্য্য

গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ণচ্ছত্র ব্যাপারটি আর কিছুই নহে; যদি বিভিন্ন গ্যাস্ পোড়ানো যায় তবে ঐ জ্বলন্ত গ্যাসের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখা যায়। যেমন ধরা যাক্, সোডিয়াম্ (Sodium) নামক ধাতুকে দগ্ধ করিলে স্বর্ণাভ হরিৎ বর্ণের আভায় তাহা দগ্ধ হইতে থাকে। এই আভা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সহজেই বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ গ্যাস্ পুড়াইলে কোন্ বর্ণের আভা লক্ষিত হয়। সকলেই জানেন, সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। ইহা নানাজাতীয় গ্যাস্ ও ধাতুপদার্থে সতত দাহ্যমান্ একটা ভয়ঙ্কর আগুনের গোলক। সূর্য্যকিরণকে বিশ্লেষণ করিলে তথায় যে যে ধাতু ও গ্যাস্ দগ্ধ হইতেছে, বর্ণচ্ছত্র বা Spectrumএ আমরা তাহার চিহ্ন বিচিত্র বর্ণের আভায় দেখিতে পাই। সেই বর্ণ দেখিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া দিতে পারেন, সূর্য্য কি কি দ্রব্য দিয়া গঠিত। বর্ণচ্ছত্রে নীল, লাল, সবুজ, বেগুনে, হরিৎ ইত্যাদি বর্ণগুলি পর্য্যায়ক্রমে রেখাপাত করিয়া যায়। এই বর্ণ-রেখা-পর্য্যায়ের মাঝে মাঝে যে সকল কৃষ্ণবর্ণের রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাদের কয়েকটির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ ইত্যাদি যে সকল বাষ্প বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারা সূর্য্যকিরণের কতকগুলি বর্ণকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। কাজেই সৌর বর্ণচ্ছত্রের যে অংশগুলিতে বায়ুমণ্ডলের বাষ্প-শোষিত সৌর বর্ণচ্ছটা রেখাপাত করিত, সেই অংশগুলি বর্ণহীন হইয়া থাকে সুতরাং কৃষ্ণবর্ণের রেখারূপে সেই স্থানগুলি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সৌর বর্ণচ্ছটার কৃষ্ণ রেখাবলীর এই কারণ ব্যতীত আরো কয়েকটি কারণ বিদ্যমান আছে। বায়ুমণ্ডল-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইয়া সেগুলির উল্লেখ অবান্তর বোধে আজ ক্ষান্ত হইলাম।

বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মিকে আসিবার সময় সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সমগ্র বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্যোত্তাপ বায়ুমণ্ডলেই নিঃশেষ হইয়া যায়, পৃথিবীতে আসিতে পারে না। সুতরাং বায়ুমণ্ডল সূর্য্যোত্তাপ-শোষক। পণ্ডিতবর টিণ্ডাল্ (Tyndall) হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যাগত সমগ্র উত্তাপের পাঁচ ভাগের চারিভাগই প্রতিদিন বায়ুমণ্ডল কর্ত্তৃক শোষিত হয়। বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ রস্কো (Roscoe) ও বুন্সেন্ (Bunsen) সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া গমনকালে সৌরতেজের শতকরা ৬৬ ভাগ

নষ্ট হইয়া যায়। ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলে সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাও আমাদের নানা উপকার করিতেছে। ভগবান ক্ষুদ্রাদপি তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তম সৌর-দেহকে কদাচ বিনা আবশ্যকে গঠিত করেন নাই। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হিতকার্য্য আছে। আকাশের বর্ণ নীল হয় কেন? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতেরা ধূলিকণাকেই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, সূর্য্যরশ্মির নীল বর্ণের কিরণ-রেখাকে ধূলিকণারাই প্রতিহত করিয়া আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে। উক্ত নীল রশ্মির কতকাংশ পৃথিবীতে আসিলেও তাহার অধিকাংশই চিরদিনের জন্য ধূলিকণা দ্বারা প্রতিহত হইয়া আকাশমার্গকে নীলাভ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। আকাশে এত সুন্দর নীলাভা এই পৃথিবীর নগণ্য ধূলিকণা হইতেই এক প্রকার উৎপন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধক কবি সত্যই বলিয়াছেন—"মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে!"

"দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বড় কেহ একটা বুঝিতে পারে না" কথাটা অনেক স্থলেই প্রযোজ্য। বায়ুমণ্ডল আছে বলিয়াই যে বিশ্বসৃষ্টি রক্ষা হইতেছে, একথা হয় তো এক বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অপর কেহই খোঁজ রাখেন না। একদিন যদি কোনো একটা শয়তান আসিয়া এই পৃথিবী-মণ্ডিত বায়ুরাশিকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের যে কি অবস্থা হয়, তাহা কল্পনারও অগোচর। আচ্ছা, মনে করা যাক্ যেন সত্যই আমাদের পৃথিবীর চারিপাশে আর বায়ুমণ্ডল নাই। তখন সূর্য্যদেবের প্রবল উত্তাপের ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকিব। একটা কালিমাখা বোতলের ভিতর জল ভরিয়া সূর্য্যকিরণে দুই মিনিটকাল রাখিলেই তাহা টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকিবে। সমস্ত নদী-সমুদ্র, পুকুর-পুষ্করিণী, খাল বিল, খানা ডোবা সমস্তই তো একদিনেই সূর্য্যের উত্তাপে ফুটিয়া ফুটিয়া বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া যাইবে! পাহাড়-পর্ব্বতও সূর্য্যোত্তাপে গলিয়া, গলিত তুষারের ন্যায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকিবে। দিবসে প্রচণ্ড গরম এবং রাত্রে দারুণ শীতে তো মানুষ মরিয়াই যাইবে। সূর্য্য ঠাকুরের যে তেজ কতটা তাহা তখনই বুঝিতে পারা যায়। বিশ্বজননীর অদৃশ্য স্নেহ হস্তের ন্যায় এই বিপুল বায়ুমণ্ডল ধরণীকে পরিবেষ্টিত করিয়া না থাকিলে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে এতদিন জীব জড় সকলেই ভস্মীভূত হইত। ধন্য বিধাতার অপার মহিমা; ধন্য তাঁহার অসীম শক্তি ও শুভ ইচ্ছার পবিত্র লীলা!

বায়ুমণ্ডল সত্যসত্যই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকিয়া একখানি কম্বলের ন্যায় ধরণীকে শীত ও উষ্ণাধিক্য হইতে রক্ষা করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বায়ুমণ্ডল সূর্য্যাগত উত্তাপকে অবাধে পৃথিবীতে আসিতে পথ দিয়া কেবল তাহার কতকাংশ শোষণ করে মাত্র; কিন্তু উত্তপ্ত পৃথিবী যখন সায়াহ্নে ধীরে ধীরে উত্তাপ ত্যাগ করিতে থাকে, বায়ুমণ্ডল তখন ঐ উত্তাপকে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবার পথকে বাধাদান করে। এই জন্যই বলিয়াছিলাম, বায়ুমণ্ডল ঠিক একখানি কম্বল বা পর্দ্দার ন্যায় কার্য্য করিতেছে। বায়ুমণ্ডলের এই গুণের জন্য পৃথিবী কদাচ এককালে সম্পূর্ণ শীতল বা প্রচণ্ড গরম হইতে পারে না। রাত্রিকালে পৃথিবী যখন অনবরত উত্তাপ ত্যাগ করিতে থাকে, তখন বায়ুমণ্ডলই ঐ পৃথিবী-ত্যক্ত উত্তাপরাশিকে আটকাইয়া রাখে। অন্যথা পৃথিবী এককালে শীতল হইয়া যাইলে প্রাণীগণের জীবনধারণ কঠিন হইত। বায়ুমণ্ডল ব্যতীত পৃথিবী-ত্যক্ত উত্তাপ আটকাইবার গুণটি বিশেষভাবে জলীয় বাষ্প ও কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ গ্যাসে বর্ত্তমান।

জলীয় বাষ্পের উক্ত গুণটির উদাহরণ নানা উপায়ে দেখানো যাইতে পারে। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, মেঘাবৃত রজনী, মেঘশূন্য রজনী হইতে গরম হইয়া থাকে। তাহার কারণ বাষ্প-গঠিত মেঘরাশি রজনীর পৃথিবী-ত্যক্ত উত্তাপকে শূন্যমার্গে ছাড়িয়া দিতে চায় না; কিন্তু মেঘশূন্য রজনীতে সেই উত্তাপ অনায়াসে চলিয়া যায় বলিয়াই পৃথিবী ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। মানুষ, গায়ে কম্বল জড়াইয়া যেমন দেহের উত্তাপ রক্ষা করিয়া বাহিরের প্রবল শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় ইহাও কতকটা সেই রকমের। মেঘের উক্ত গুণ ব্যতীত আর একটি গুণ হইতেছে এই যে, ইহাতে সব সময়েই কতক পরিমাণে উত্তাপ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই তাপের (Latent Heat) কথা বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। পৃথিবীর নদ-নদী হইতে যখন প্রচুর বারিরাশি বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন যে প্রচণ্ড উত্তাপের আবশ্যক, তাহা কোথা হইতে আসে? সূর্য্যোত্তাপ দ্বারাই তাহা বাষ্পীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার সময় ঐ সূর্য্যোত্তাপ অলক্ষিতাবস্থায় বাষ্পদেহে প্রচ্ছন্ন (Latent) হইয়া থাকে। তাহার পর বাষ্পরাশি একত্র জমাট বাঁধিয়া যখন মেঘখণ্ডের সৃষ্টি করে, তখনো ঐ প্রচ্ছন্ন উত্তাপ অদৃশ্য অবস্থাতেই মেঘখণ্ডে থাকিয়া যায়, কিন্তু শীতল বায়ু স্পর্শে মেঘখণ্ডগুলি জল-আকারে পতিত হইবার সময় ঐ তাপের প্রকাশ

দেখা যায় এবং ঐ পরিত্যক্ত উত্তাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই আবদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিতে সাহায্য করে। পণ্ডিতপ্রবর হাগার্ড (Dr. Huggard) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক পাউণ্ড বৃষ্টির জল হইতে যে পরিমাণ বাষ্প আবশ্যক হয়, সেই বাষ্পের প্রচ্ছন্নতাপ ৫৮ পাউণ্ড সীসককে গলাইতে পারে। সুতরাং উক্ত উত্তাপ মাত্রার পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ ও জলীয় বাষ্পের ন্যায় পৃথিবীর দৈনিক উত্তাপকে সহজে ছাড়িয়া দেয় না। উহা সূর্য্য-কিরণের উত্তাপকে আসিতে বাধা দেয় না বটে, কিন্তু পৃথিবী-ত্যক্ত উত্তাপকে কোনো ক্রমে ছাড়িয়া দেয় না। আপনারা অনেকে হয় তো কলিকাতা Botanical gardenএ গ্রীষ্মপ্রধান-দেশীয় উদ্ভিদদিগের বৃদ্ধির জন্য কাচের ঘর দেখিয়া থাকিবেন। কাচও ঠিক কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইডের ন্যায় অথবা জলীয় বাষ্পের ন্যায় সমগুণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ উত্তপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে কাচ একটুও বাধা দেয় না; কিন্তু সন্ধ্যার পর পৃথিবী যখন দিনের উত্তাপে ত্যাগ করিতে থাকে, তখন কাচ সেই উত্তাপ কদাপি শূন্যে উপিয়া যাইতে দেয় না। কাজে কাজেই শীতল রাত্রিকালে যখন পৃথিবী ধীরে ধীরে দিনের উত্তাপ ত্যাগ করিয়া ঠাণ্ডা হইতে থাকে, তখন কাচের ঘর দিবসের ন্যায়ই সমান গরম থাকে। কারণ কাচ-আবৃত ভূখণ্ড-ত্যক্ত উত্তাপ তো শূন্যে মিলাইয়া যাইতে পারে নাই, তাহা কাচের ঘরেই আবদ্ধ আছে। কার্ব্বন্ ডাই অক্সাইড্ বাষ্প আমাদের বায়ুমণ্ডলে সতত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা পৃথিবীর উপর ঠিক পূর্ব্বোক্ত কাচের ন্যায়ই কার্য্য করিতেছে। ঐ কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ না থাকিলে পৃথিবী হয় তো এত উষ্ণ হইত না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বায়ুমণ্ডল কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প শূন্য হইলে পৃথিবীর সাধারণ উত্তাপ প্রায় ২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ কমিয়া যাইত। জলীয় বাষ্পের অভাবেও ঐ পরিমাণ উত্তাপের হ্রাস হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আরিনস্ (Arrhenius) হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, বায়ুতে কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইডের মাত্রা দ্বিগুণ করিয়া দিলে পৃথিবীর উত্তাপ ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ বেশি হইবে।

মনে করা যাক্, এক দিবস প্রত্যুষে উঠিয়া দেখা গেল, সমস্ত বায়ুমণ্ডলটাকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দিনটা অত্যন্ত গরম হইবে। সমস্ত পৃথিবীর জল প্রায় বাষ্প হইয়া আকাশে জমিতে থাকিবে এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও তুষারপাত! তখন এত ঠাণ্ডা

হইবে যে, ফারেন্‌হিটের তাপমান যন্ত্র -২৩৯ ডিগ্রি সূচক করিবে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তো তুষারপাতে বাড়ি ঘর, ক্ষেত্র শাদা হইয়া থাকিয়া মেরুপ্রদেশের কতকটা আভাস দিতে থাকিবে। কিন্তু যেমনি সূর্য্যোদয় আর অমনি বরফ গলা! একটা কড়ার ভিতর বরফ রাখিয়া হঠাৎ সেটাকে আগুনের উত্তাপে রাখিলে যেমন হয়, সূর্য্য উঠিলে পৃথিবীরও কতকটা সেই রকম অবস্থা! তুষারের কতক বা গলিয়া ঝড়িয়া পড়িবে আর কতক বা কঠিন হইয়াই বসুন্ধরাকে বিধবাবেশে সাজাইয়া রাখিবে। তখন আমরা কোনো শব্দই শুনিতে পাইব না। সিংহের গর্জ্জন, পশুপক্ষীর চীৎকার, বজ্রের কর্কশ শব্দ এবং জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জ্জন এক মুহূর্ত্তে নীরব হইবে। সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য, আকাশের নীলিমা এ সমস্তই তখন বায়ু বিহনে লুপ্ত। বায়ুর চাপ তখন আর থাকিবে না, কিন্তু বায়ু-চাপ ব্যতীত যে কি অনর্থ ঘটিতে পারে, তাহা কি কেহ কল্পনা করিয়াছেন? আমাদের শরীরের হস্তপদাদির গ্রন্থিগুলি বায়ুর চাপেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতেছে। একবার যদি ঐ বায়ুমণ্ডলকে সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের ঐ গ্রন্থিগুলি আর যথাস্থানে থাকিবে না। আমরা সকলেই খঞ্জ ও নুলা হইয়া থাকিব।

এই বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি কোথা হইতে? প্রশ্ন করিলে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, প্রাচীনকালে পৃথিবী আকারহীন সতত দাহ্যমান্ একটা বাষ্পরাশি বা নীহারিকা ছিল। সেই জ্বলন্ত ধাতু বাষ্পরাশির উত্তাপ ধীরে ধীরে শূন্যে চলিয়া যাইলে, তাহা নির্ব্বাপিত হয়। এইরূপে উত্তাপ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী কঠিনাকার ধারণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি পৃথিবীর মধ্যস্থল সম্পূর্ণ শীতলতা প্রাপ্ত হয় নাই,—সে স্থান আজো গলিত অবস্থায় রহিয়াছে। ভূমিকম্পে ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে আমরা সেই সকল গলিত ধাতু ও বাষ্পরাশির চিহ্ন দেখিতে পাই। পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর নীহারিকা অবস্থায় যে সকল বাষ্প মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারাই আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডলরূপে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্তও আগ্নেয়গিরির গহ্বর হইতে কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্ বাষ্প উত্থিত হইতে দেখা যায়।

অক্সিজেন্ বাষ্পটি অত্যন্ত দহনশীল; নাইট্রোজেন্ ঠিক তাহার উল্টা। বায়ুমণ্ডলে ঈশ্বর এই দুই বাষ্প পরিমাণ অনুসারে ছাড়িয়া দিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন। অন্যথা অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে সমস্ত দ্রব্যই জ্বলিয়া

যাইত। প্রাণীদিগের পরমায়ু কয় মাসের ভিতর নিঃশেষ হইয়া যাইত; গাছপালারাও অল্পদিন বাঁচিত এবং কোনো জিনিষে একটু ঘর্ষণ লাগিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে ছাই করিয়া দিত। আমরাও শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যাইতাম। বিধাতা এই অতি শক্তিশালী বাষ্পের সহিত দুর্ব্বল নাইট্রোজেন বাষ্প মিশ্রিত করিয়া জীব-লীলা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। সমস্তই ধীরে ধীরে হইতেছে। ধন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, জড়-জীবের স্রষ্টা এবং পাতা জগদীশ্বর!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় সন ১২৫৩ সালের ১৩ই ফাল্গুন জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী খাঁটুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺হারাণচন্দ্র মোদক; মাতা গোবরডাঙ্গা-নিবাসী ৺সদাশিব কুণ্ডু (মোদক) মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা পুণ্যবতী। মাতা কিঞ্চিদধিক দুইবৎসরের সন্তান জগদ্বন্ধুকে রাখিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করেন। পঞ্চম বর্ষে ৺নফরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পাঠশালায় ইঁহার প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। তৎপরে ইনি শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'খাঁটুরা আদর্শ বিদ্যালয়ে' শিক্ষালাভ করিয়া ১২৬৫ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর 'গোবরডাঙ্গা উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে' দ্বিতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১২৭০ সালে পিতৃ বিয়োগ ঘটায়, শিক্ষাব্যয়ের অভাবে ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগে বাধ্য হন। একমাত্র আশ্রয়—পিতার পরলোক গমনে অসহায় নিরাশ্রয় বালক জগদ্বন্ধু বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধ-প্রায় দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু 'জগদ্বন্ধু' যাঁহার সহায়—যাঁহার যত্ন উদ্যম ও অধ্যবসায় আছে, তাঁহার উন্নতির পথ কে রুদ্ধ করিতে পারে?

জগদ্বন্ধুকে পিতৃবিয়োগে কাতর অথচ শিক্ষা-বিষয়ে নিতান্ত ইচ্ছুক অবগত হইয়া, গোবরডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় জমিদার স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নানা উপদেশ দানে উৎসাহিত করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে জগদ্বন্ধু চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার্থে কলিকাতায় গমন করেন, কিন্তু ঘটনা-চক্রে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী উদারচেতা স্বর্গীয় বংশীবদন সাধুখাঁ (মোদক)

মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া 'কলিকাতা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে' তিন বৎসর অধ্যয়নান্তে ইংরাজী ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সালের জুন মাসে 'কলিকাতা শ্যামবাজার গভর্ণমেণ্ট সাহায্য-প্রাপ্ত বঙ্গ-বিদ্যালয়ে' প্রধান শিক্ষকপদে স্থায়ি-ভাবে নিযুক্ত হন।

কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু জগদ্বন্ধুর জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। এই সময়ে সৌভাগ্য-ক্রমে ইনি কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন মহাশয়ের সহিত স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁহারই নিকট প্রায় দশ বৎসর কাল ব্যাকরণ, কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য, সমগ্র নিদান, চক্রদত্ত এবং চরক-সুশ্রুতাদির কিয়দংশ শিক্ষা করেন। এত দিনের পর ইহার চিরাভিলষিত চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার আশা কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ হইল।

ইনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও অতিশয় শ্রমশীল। গুরু দায়িত্ব-পূর্ণ প্রধান শিক্ষকের কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও ইনি অবসর-কালে কতিপয় এফ্-এ ও বি-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

১২৮৫ সাল হইতে ইনি সুকুমার-মতি বালক-বালিকাগণের পাঠোপযোগী কতিপয় গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। ১২৯০ সালে ইহার সুপ্রসিদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ সঙ্কলিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রণীত বা সঙ্কলিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ সরল পাঠ এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ নীতি পাঠ আর ব্যাকরণ-সার, ব্যাকরণ প্রবেশিকা এবং বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত হইয়া বিদ্যালয়-সমূহে অধ্যাপিত হইতেছে।

১৯১৩ খৃঃ অব্দে ইহারই প্রণীত বা সঙ্কলিত ৩য় ও ৪র্থ ভাগ নীতি পাঠ প্রেসিডেন্সী বিভাগে এবং বাংলা ব্যকরণ-প্রবেশিকা বর্দ্ধমান বিভাগে ছাত্র-বৃত্তির পাঠ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইনি নিয়োগ কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর কাল একই বিদ্যালয়ে সুখ্যাতি সহকারে অধ্যাপনা-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং এক্ষণে ঐ চির-সেবিত 'শ্যামবাজার মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের' নিজ নিকেতন নির্ম্মাণে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা ভগবানের নিকট ইহার সফলতা কামনা করি।

কুশদহের ইতিহাস

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ সমুদ্রপথে বিচরণ করিতেন। কেবল ভারত সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জেই যে তাঁহাদের গমনাগমন ছিল, তাহা নহে। তাঁহারা আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্র বাহিয়া য়ুরোপেও যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা যে জলযুদ্ধেও বিশেষ নিপুণ ছিলেন, তাহাও উল্লিখিত দেখা যায়। কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-উপলক্ষ্যে বাঙালীরা "নৌসাধনোদ্যত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

আজকাল অনেকে মনে করেন, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কলিঙ্গ-বাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু সিংহল ও যবদ্বীপ যে প্রধানত বাঙালী কর্ত্তৃক উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি যুক্তি দেখানো যাইতে পারে। এক্ষণে যাঁহারা সিংহলের আদিম অধিবাসী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা দেখিতে বাঙালীর ন্যায়। বালীদ্বীপে যে সকল হিন্দু আছেন তাঁহারাও আকারে বাঙালীর তুল্য। তৎপরে সিংহলবাসী ও বালীবাসীর ভাষায় বাংলার অনেক শব্দ প্রায় একরূপ। উভয় ভাষার বিশেষ প্রয়োগ করিলে এসম্বন্ধে সন্দেহ দূর হয়। তৎপরে আচার ব্যবহারের সাদৃশ্যও ধর্ত্তব্য। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিলে কলিঙ্গ অপেক্ষা বঙ্গের সহিত দ্বীপবাসীগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমিত হইবে। তবে যদি তর্কের অনুরোধে ধরা যায় যে, যখন ঐ সকল দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তখন বঙ্গ ও কলিঙ্গ একই রাজার অধীন ছিল, ভাষা ও আচার ব্যবহার একই প্রকার ছিল, এক জাতীয় বণিকই দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিতেন—তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিঙ্গ গঙ্গারাঢ় বা বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। গ্রীক লেখকগণের লিখনভঙ্গী দ্বারা তাহাই যেন মনে করা যাইতে পারে।

প্লিনির কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন, গঙ্গারিড়ি অর্থাৎ গঙ্গারাঢ়ের রাজধানী "পার্থলিস্" নগরের বণিকগণ কর্ত্তৃক প্রাগুক্ত দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন সম্ভবপর। এই পর্থালিস্ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যে যে এই নগর অবস্থিত ছিল, তাহা দেখানো যাইতে পারে। গ্রীক পর্থালিস্ ভারতীয় ভাষায় "প্রতুলী" ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহার অপভ্রংশ পাটল অথবা পাটুলী। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে তীর্থ সমূহের উল্লেখস্থলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যে পাটলপুরের উল্লেখ আছে। সম্ভবত উহাই

গ্রীক কথিত পর্থালিস্। গ্রীক-লেখকের লিখনভঙ্গী দ্বারা অগ্রদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পাটুলীগ্রামও পর্থালিস্ হইতে পারে। যাহা হউক, সমতটই হউক আর পুরীপাটলীই হউক বাঙালী বণিক ও বাঙালী হিন্দু যাইয়া যে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃত ভাষার প্রচলন দ্বারা ঐ সকল দ্বীপবাসীকে সভ্য করিয়াছিলেন, সুযোগ্য য়ুরোপীয় লেখকগণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা লইয়াই আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি। আমরা যে পৃথিবীর বিভিন্নস্থলে যাইয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়া নিজ নিজ কৃতিত্বে ও সাফল্যলাভে গর্ব্বিত হইতেছি, কিন্তু কেহই স্বয়ং দ্বীপপুঞ্জে যাইয়া দ্বীপবাসীগণের সহিত বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃভাব পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছি না। ভারতে এখন মিলে না এমন অনেক জিনিস চেষ্টা করিলে দ্বীপবাসিগণের নিকট আমরা পাইতে পারি এবং তদ্দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

যবদ্বীপে প্রচলিত ভাষার নাম কবিভাষা। এই "কবিভাষা" কথাটা এক বাঙালী ভিন্ন অন্য কোনো স্থানের লোক সহসা বুঝিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কেননা "কবিভাষা" কথাটা এখনো বাংলায় ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্ত্তী কোনো প্রবন্ধে আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা করি। এক্ষণে কবিভাষা ও বাংলার কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ দেখাইতে চাহি।

কবি	বাংলা
মাত	মাতা
পিত	পিতা
ইস্ত্রী	স্ত্রী
মনুষ	মনুষ্য
মস্তাক	মস্তক
কেস	কেশ
দান্তি	দন্ত, দাঁত
পাদ	পা, পদ
রাহ, লুদির	রক্ত, রুধির
গ্রাণ	ঘ্রাণ, নাক
সুরিচ, রদিতিয়	সূর্য্য, আদিত্য

কবি	বাংলা
চন্দ্র	চন্দ্র
তার	তারা
দিন	দিন
রাত্রি	রাত্রি
অগ্নি, গেনি, ব্রাম	অগ্নি, ব্রহ্মা
জলানিধি	জল
সেত	শ্বেত
কাল, কৃস্ন	কালো, কৃষ্ণ
পক্সি	পক্ষী
এণ্ড্যা	অণ্ড, (ডিম)
দের্ম	ধর্ম্ম

সিংহলী	বাংলা
অম্বা, মা	অম্বা, মা
পিপ	পিতা
মং	আমি
তমুসে, উম্ব	তুমি, তুই,
ও, উম্নেহ	ও, উনি, তিনি
স্ত্রী	স্ত্রী
গে, গেদার,	গৃহ, গেহ
আত, পয়	হাত, পা
গম	গ্রাম, গাঁ
নুয়র	নগর
বাত	ভাত
ফিরি	ক্ষীর, দুগ্ধ
নম	নাম
অদ	অদ্য

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাষার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাত কথাটা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে উচ্চারণ-বৈষম্যে বাত উচ্চারিত হয়। খিরি

অর্থাৎ ক্ষীর শব্দটাও তাই। যাঁহারা কবিকঙ্কন চণ্ডী পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভোজনের শেষে ক্ষীর প্রস্তুত করার জন্য দেবাদিদেব গৌরীকে কিরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। এই ভাষাবিচার করিয়াও যদি কেহ বলেন, আদিম সিংহলী ও বালিদ্বীপের হিন্দু বাংলার সন্তান নহেন, তাহা হইলে তত্তৎ স্থানের সাহিত্য তাঁহার সম্যক্ আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

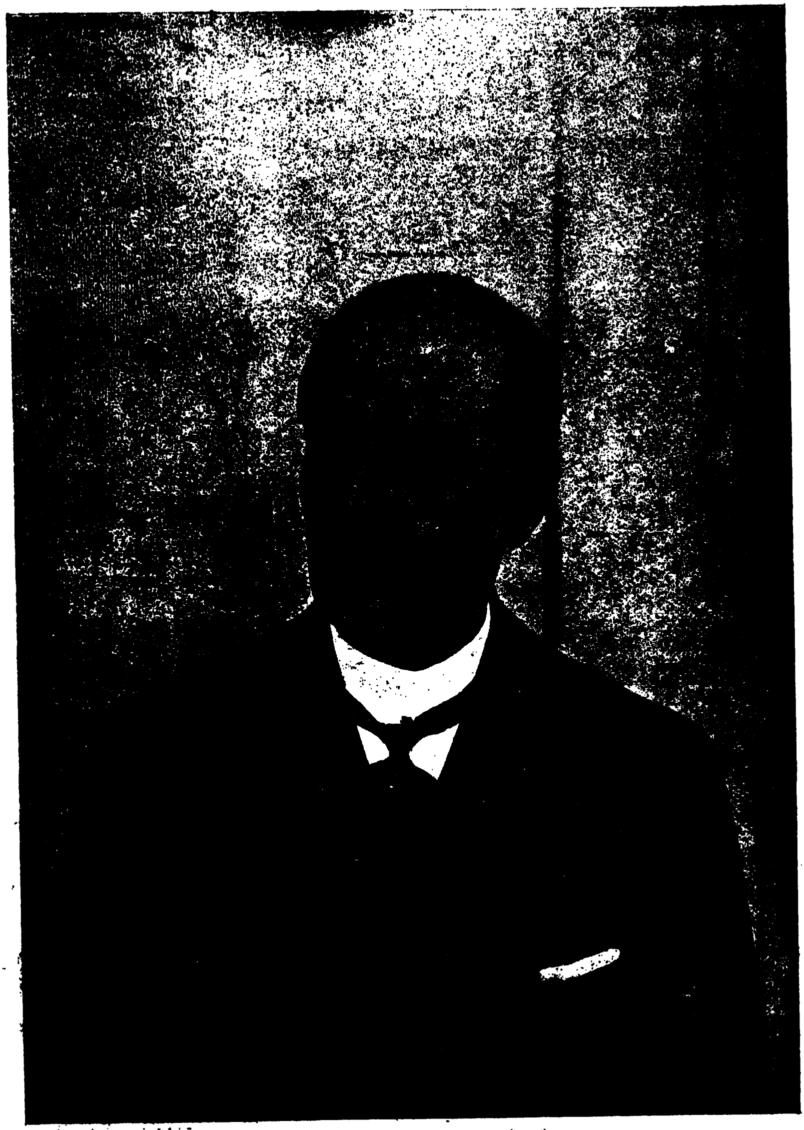
শোক-সংবাদ

জানকীনাথ ঘোষাল

নদীয়া জেলার অন্তর্গত জয়রামপুর গ্রামে ঘোষাল বংশে জানকীনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺জয়চন্দ্র ঘোষাল বলবন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি শক্তির পরিচয় দিয়া তদ্বিনিময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভূসম্পত্তি লাভ করেন। জানকীনাথ বংশগত শারীরিক বলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজে তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় ৺রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ মহাত্মাগণের সঙ্গলাভ করেন। জাতিভেদের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তখন হইতেই তিনি উপবীত ত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি সমাজ-সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং নানা উপায়ে জীবনের এই ব্রত শেষদিন পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন।

পুরুষ-সিংহ জানকীনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু ঠাকুর পরিবারের তিনটি রীতি গ্রহণ করেন নাই,—১। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ, ২। ঘরজামাই থাকা, ৩। উপবীত গ্রহণ। তিনি প্রথমে পত্নীর, পরে কন্যাদ্বয় শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী এবং পুত্র জ্যোৎস্নানাথের উন্নত শিক্ষার ফলস্বরূপ তিনি যে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নের ফল, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি তাঁহার পরিবার-মধ্যে অবরোধ-প্রথার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি নিজপুত্রের অসবর্ণ বিবাহ দেন।

রোগীর সেবা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল। দেশহিতকর কার্য্যে,



জানকীনাথ ঘোষাল

('হিন্দুপেট্রিয়ট' হইতে গৃহীত)

মানব-সেবায় এবং দেশের কাজে তাঁহার যে কিরূপ আজীবন অনুরাগ ও চেষ্টা

ছিল, তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করিতে হয়। ন্যাশন্যাল কংগ্রেস তাঁহার কিরূপ প্রিয়বস্তু ছিল,—কিরূপ প্রাণের সামগ্রী ছিল, কংগ্রেসের জন্য তিনি যে কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন, তাহা ভাবিলে অনেক বিত্তাবাপন্ন ব্যক্তির শিক্ষা হয় এবং শ্রদ্ধায় অনেকের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। মাননীয় জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় কংগ্রেসের দক্ষিণ হস্তছিলেন। ১৮৮৫ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের যত অধিবেশন হইয়াছিল, তিনি তাহার প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে বঙ্গের—সমগ্র ভারতের সমূহ ক্ষতি হইল।

বিগত ১৯এ বৈশাখ, রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় তিনি সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

আজ তাঁহার পরিবারবর্গ আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসিগণ তাঁহার শোকে মুহ্যমান। আমরা তাঁহাদিগকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহাদের শোক-দগ্ধ প্রাণে শান্তি বারি সিঞ্চন করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটের সময় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে আমরা আজ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত। কিন্তু উপায় কি? বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়মেই মধ্য গগনে ভাস্বর ভাস্কর অস্তমিত হইল! দ্বিজেন্দ্রলাল গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার যাইবার আক্ষেপ ঘুচাইবার সাধক ও সহায়। দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ কবিত্ব অবিসংবাদী। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে একটা নূতন রূপ, ভাষায় যে একটা সরল অনাহত সঙ্গীত প্রবাহ এবং ছন্দে যে একটা বাধাহীন সহজ তরল, অথচ মধুর সুর দিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার কাহারো সাধ্য নাই। তাঁহার রচিত "বঙ্গ আমার, জননী আমার" বাংলা দেশের সুদূর পল্লীতে পল্লীতেও স্বদেশ প্রেমের বন্যা আনিয়াছিল। তাঁহার "ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা" গানে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণে "সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি" এই ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল নদীয়া-রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল রায় তাঁহার ভ্রাতা।



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

('ভারতবর্ষ' হইতে গৃহীত)

কৃষ্ণনগরের মাইনর ইস্কুলে দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি "আর্য্যগ্রন্থ" নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহা তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক। এম্-এ, পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তৎপরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি বিলাত যান; এবং ইংলণ্ডের সিসেস্টার কৃষি কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ

হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতি-কালে তিনি 'Lyrics of Ind' অর্থাৎ "ভারতের গীতিকবিতা" নামক ইংরাজি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কিছুকাল আবকারী বিভাগের ইন্স্পেক্টর ও কৃষি বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টারও হইয়াছিলেন। শেষে তিনি জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়ায় তিনি কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল!

শনিবারে দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দকুমার চৌধুরীর লেনস্থ নিজ বাসভবন 'সুরধামে' বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তাঁহার নব রচিত "সিংহল বিজয়" গ্রন্থের পুনরালোচনা ও সংশোধন করিতেছিলেন। সহসা মস্তকে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তৎপরেই অজ্ঞান। তিনি আর চাহিলেন না। কাহাকেও দেখিলেন না। রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটের সময় সব ফুরাইল।

দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, কলিকাতায় বিহারীলাল ভাদুড়ী নামক একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার বিধবা কন্যার সহিত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ হয়। সামাজিক শাসন-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ডাক্তার প্রতাপচন্দ্রের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এক পুত্র ও এক কন্যার জন্মের পর দ্বিজেন্দ্রলাল বিপত্নীক হন, তদবধি তিনি আর বিবাহ করেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল পাঁচ ভ্রাতা, এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরে গেলেন। তাঁহার পুত্র ও কন্যা এখন মাতামহের কাছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাব কবি ছিলেন, তাঁহার বহু কবিতাই বাংলা কাব্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি অনেকগুলি নাটকও লিখিয়াছেন, কিন্তু হাসির গানেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একজন সুগায়ক ছিলেন। বাংলায় হাসির গান রচনায় তাঁহার দ্বিতীয় আর কাহাকেও দেখি না।

'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রিকাখানি তাঁহারই প্ররোচনায় বাহির হইতেছে, তিনি উহার কর্ণধার ছিলেন, নিজের মনের মতো করিয়া এই কাগজখানিকে তিনি চালাইবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়, তাঁহার এ সাধ পূর্ণ হইল না! ১ম সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন!

দাসের আত্ম-কথা

অন্বেষণ

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কাশীপুর মঠে অধিক দিন যাওয়া-আসা করি নাই বটে, কিন্তু যখন ঐ ভাবের সঙ্গে যোগ কাটিয়া গেল, তখন একটা নিরবলম্বন অবস্থার মধ্যে পড়িলাম। প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল—কোথায় যাই, কি করি; কি করিলে প্রাণে শান্তি পাইব, সর্ব্বদা এই চিন্তা চলিতে লাগিল।

অবতার-বাদ অস্বীকার করিয়া বুঝিলাম, ভাসা-ভাসা ভাবে কিছু হইবে না। একটা পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হইবে, কিন্তু সে পন্থা একটা কিছু হইলেই তো হইবে না—ভাবের সঙ্গে বিশ্বাসের সঙ্গে এক হওয়া চাই। আমার পক্ষে সে কোন্ পন্থা! প্রচলিত কত রকম ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাই, কত রকম ভাবও দেখিতেছি, কিন্তু সে ভাবের সঙ্গে আমার মন মেলে না কেন? আমার মন যাতে মিলিবে সে আদর্শ আমি কোথায় পাইব? আমি তো এখন সমস্ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

এক দিকে এই আকুল চিন্তা, তার মধ্যে এক একবার দোকানে গিয়া কাজে কর্ম্মে মন দিতে হইত, কিন্তু কাজের টান বড়ই কম হইয়া আসিতে লাগিল; কেবল বন্ধনের টানে যেন টানিয়া লইয়া যাইত। দোকান ভালো লাগে না, বরাহনগরও আর ভালো লাগে না,—মধ্যে মধ্যে ১০।৫ দিন গোবরডাঙ্গার বাড়ি গিয়া থাকিতাম বটে, তাও তেমন ভালো লাগিত না।

সুরেন্দ্র কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে কিছুদিন তাহার খবর পাইলাম না, তারপর মহেশপুর হইতে তাহার পত্র পাইলাম। যখন প্রাণ বড়ই অস্থির—কি করি কোথায় যাই ভাব, তখন একবার মহেশপুর গেলাম। চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত রেলে গিয়া ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল গো-গাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়া সুরেন্দ্রের সঙ্গে কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিল। মহেশপুর গ্রামের অবস্থা ভালো দেখিলাম না, জমিদার-বংশাবলী বহু বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়াছেন; চরিত্রে কার্য্যে কোনো উন্নতি না থাকায় অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছেন। সুরেন্দ্রকে আনিবার জন্যই আমার তথায় যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাকে কিছুতেই তখন আনিতে পারিলাম না। নানা কাজের ওজর আপত্তি করিয়া সে বলিল, "তুমি যাও, আমি শীঘ্রই তোমার নিকট যাইব।"

এই বাণী যে মহাবাণীতে পরিণত হইবে, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। সে কথা যথাস্থানে পরে বলিব।

মহেশপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দোকানেই বেশি সময় কাটিতে লাগিল। তাহার কারণ দোকানের প্রধান মুহুরী (হেড্ ক্লার্ক) যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুতা ছিল। তিনি বেশ সুমিষ্ট সুরে অনেকটা ভাবের সঙ্গে দাশরথী রায়ের গান গাইতেন। কর্ম্মান্তে প্রতিদিন রাত্রে গান শুনিয়া ভালো ভাবে সময় কাটিয়া যাইত। তা ছাড়া কিছুদিন বারোয়ারিতলায় যাত্রা শোনা আরম্ভ করা গেল। সে সময় মতিলাল রায়, ব্রজরায়, এবং নীলকণ্ঠ প্রভৃতি উদীয়মান যাত্রাওয়ালার দলগুলি নূতন ভাবে, নূতন ধরণে, নূতন সাজে অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রা শুনিতে শুনিতে মনে বেশ ধর্ম্মভাবের উদয় হইত। অনেক সময় অশ্রুপাত হইয়া হৃদয়ে ভক্তির আস্বাদ জাগিয়া উঠিত। যাত্রার ভাবাঙ্গ লইয়া বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হইত, তিনি প্রচলিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া যাহা বুঝাইতে চাহিতেন, আমার সে ভাবে বিশ্বাস হইত না। পৌরাণিক অলৌকিক এবং অতি প্রাকৃত ঘটনা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে গেলে বন্ধু একটু উষ্ণ হইতেন। তাঁহার সংস্কার অত্যন্ত বদ্ধমূল ছিল।

এই সময় আমাদের দোকানের কাজ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং কর্ম্মচারির সংখ্যাও অনেক ছিল। সকলেই অনিয়মিতরূপে স্নান আহার এবং পরিশ্রম করিতেন, এ সকল কাজে এইরূপই চিরন্তন পদ্ধতি। আমাদের নিয়ম করা হইল, প্রাতে স্নান করিয়া কিছু জলখাবার খাইয়া সকলে কাজে প্রবৃত্ত হইবেন। আরো কোনো কোনো বিষয় সুনিয়ম ও শৃঙ্খলাপূর্ব্বক কার্য্য চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। যাহা হউক, আমি ও আমার বন্ধু প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া নিয়মিতভাবে কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। সে একটা বাহ্যভাবের ব্যাপার কিছু দিন চলিল।

যাত্রা গানের ভিতর দিয়া যেটুকু ভাব ভক্তি বা জ্ঞানের আলোক লাভ হইতে লাগিল, তাহাতে ঠিক হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না। কোনো একটি আদর্শ ধরিতে পারিলাম না, সুতরাং অশান্তি দূরের কোনো উপায় না পাইয়া সর্ব্বদা মন অবসন্ন হইতে লাগিল।

ঠিক স্মরণ হয় না কোন্ সূত্রে এই সময় আবার পাঠে মনোনিবেশ হইল।

বোধ হয় মহেশপুরে যে সকল সদালোচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে মহাপুরুষ-চরিতের কথা আমাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াছিল। সম্ভবত কলিকাতায় আসিয়া সেই চিন্তাসূত্রে কয়েকখানি পুস্তক ক্রয় করিলাম। প্রথমে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সঙ্কলিত "বুদ্ধদেব চরিত" পড়িলাম। রাজপুত্র শাক্যসিংহ, জ্ঞান ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন—কী সুন্দর দৃশ্য! তারপর কৃষ্ণবাবুরই রচিত "মহম্মদ চরিত" পড়িলাম। পিতৃ-মাতৃহীন বালক মহম্মদ, পিতামহ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে হইতেই দীন-ভাবটি প্রাপ্ত হইলেন। তারপর তাঁহার প্রাণে গভীর ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কী জ্বলন্ত ভাব! তারপর শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত "ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা" পাঠ করিয়া নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যার গর্ব্ব চূর্ণ, গয়ায় গিয়া ভক্তিলাভ, নদীয়ায় ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন, জগাই মাধাই উদ্ধার—শেষ চৈতন্যের গৃহত্যাগ, বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে আঘাত করিল। তারপর চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয়ের "ঈশাচরিতামৃত," কী চমৎকার বোধ হইল! ঈশার সেই আত্ম-ত্যাগ, প্রেম এবং ক্ষমার ভাব, জগতের দুঃখ পাপ দেখিয়া গভীর ব্যাকুলতা। কী সুন্দর ভাব! কী সুন্দর দৃশ্য! এই সকল জীবন-চরিত পাঠ করিয়া সকল ভাবের মধ্যে, প্রত্যেক জীবনের বৈরাগ্য ভাবটিই যেন আমার নিকট ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে "বুদ্ধদেব-চরিত" হইল ভিত্তি স্বরূপ, গৌরাঙ্গ-চরিতের প্রেমোন্মত্ত ভাব আমার চক্ষে তখন তত আকর্ষণের বস্তু হয় নাই, তাঁহার গৃহত্যাগ; "মহম্মদ চরিতে" ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, ঈশা চরিতের কর্ম্ম-যোগ এবং শান্তভাব দেখিয়া মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

পাঠে মনোনিবেশ করিয়া বিষয়কর্ম্মের চিন্তা মন হইতে একেবারে মুছিয়া যাইতে লাগিল। দোকানের উপরে বসিয়া পড়িতাম, নিতান্ত প্রয়োজনে নীচে হইতে ডাক পড়িলে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইত। মধ্যে মধ্যে বাড়ি আসিয়া নির্জ্জনে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল; কিন্তু অধ্যয়নে যেটুকু জ্ঞানের রেখা মনে অঙ্কিত হইল, তাহাতেও মন তৃপ্ত হইল না, ইহাতেও ঠিক মনের অশান্তি দূরের উপায় দেখিলাম না। মনের বিক্ষেপ ভাব, অভাব বোধ ঘুচিল না। কোথায় যাই, কি করি, কি করিলে আকাঙ্ক্ষার বস্তু পাই, এইভাব চলিতে লাগিল।

সরমা

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যেমন কথা তেমনি কাজ। মাতঙ্গিনীর কড়া হুকুমে, কালীশঙ্কর আপনার বাড়িতে তালা বন্ধ করিয়া কনিষ্ঠের বাড়ির তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারানাথ স্বদলবলে আসিয়া বাহিরের দিকে একটা ভালো কামরা বাছিয়া লইল। চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িটা তখন সরগরম হইয়া উঠিল। তবলায় চাঁটি পড়িল, বেহালায় ছড়ি চলিতে লাগিল, হারমোনিয়মের সুর পরদায় পরদায় উঠিতে লাগিল। গ্রামের অবৈতনিক থিয়েটারটি তারানাথের কৃপায় বেশ জাঁকিয়া উঠিল এবং সত্য সত্যই একদিন মহাসমারোহে চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে 'রাবণ বধ' অভিনয় হইয়া গেল।

*　　　*　　　*　　　*

নথ নাড়া দিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, "হ্যাঁগা, তোমার কি একটু বুদ্ধি বিবেচনা নেই, তুমি না পুরুষ মানুষ?"

স্ত্রীর তর্জ্জন গর্জ্জনে কালীশঙ্কর একটা ভাবী বিপদের আশু সূচনা বুঝিয়া ভীত হইয়া কহিল, "কেন, কি হ'য়েচে?"

"তোমার ভা'য়ের টাকাগুলো যে বারো ভূতে লুটে নিয়ে যাচ্চে—তা কি একবার দেখ্‌বে না? আমি একলা মেয়ে মানুষ ক'দিক দেখ্‌বো বলো দেখি!"

"একটু খুলেই বলো না।"

"এসব কথা কি আবার বোল্‌তে হয়, নিজের চোখ নেই—দেখ্‌তে পাও না, এই যে এত গুলো ইস্কুলের ছেলে, এখানে বোসে বোসে খায় কেন? ওদের কি তিনকুলে কেউ নেই? তারপর এতগুলো ঝি-চাকরের দরকার কি? অতিথিশালায় রোজ এক মণ চাল সেদ্ধ হয় কেন? বাড়িতে এত বাজে লোকই বা কেন? তোমার ভা'য়ের কি পয়সা রাখ্‌তে যায়গা ধরে না?"

কালীশঙ্কর ভাবিয়া দেখিলেন, মাতঙ্গিনীর কথাগুলো নেহাৎ ফ্যাল্‌না নহে, বেশ মূল্য আছে। অতিথিশালার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া এই বাজে লোক গুলোকে বিদায় দিতে পারিলে সংসার খরচ অনেক কমিয়া যাইবে। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতা তো সন্তুষ্ট থাকিবেনই—তা ছাড়া এই খরচের কিয়দংশ আপনার পকেটেও যাইতে পারে। তিনি সহাস্যবদনে মাতঙ্গিনীর মুখের

দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ মাতু, আমি ভেবে দেখ্‌লুম তোমার কথাগুল মন্দ নয়, যা হোক্ এর একটা হেস্ত নেস্ত কর্‌তেই হবে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"সরল যদি কিছু আপত্তি করে।"

"কী—কাল্‌কের ছেলে সে, তোমার কথায় আপত্তি কর্‌বে ?"

"কি জানো, তার বাপের টাকা—"

"হোক্ না তার বাপের টাকা, আমরা তো তাদের ভালোর জন্যেই কর্‌চি, তার বাপের খরচ অনেক বেঁচে যাবে।"

মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে কালীশঙ্কর কহিলেন, "তা দেখি, সরলকে না হয় কিছুদিনের জন্যে জমিদারী দেখ্‌তে পাঠিয়ে দিই।"

"তা সে যাবে কেন ?"

"সে ভার আমার"

"তবে যা হয় করোগে !"

এক সপ্তাহ পরেই কিষণগঞ্জের জমিদারী হইতে নায়েবের এক পত্র আসিল। কোনো জরুরী কার্য্যের অনুরোধে নায়েবের আদেশ মতো সরল কিষণগঞ্জে যাত্রা করিতে বাধ্য হইল, যাইবার সময় সে তাহার দিদিকে খুব সাবধান হইয়া থাকিতে বলিয়া গেল। আট দশ দিনের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিবে, এ ক'টা দিন যেন তাহার জ্যাঠাইমার নজর হইতে একটু তফাতে থাকে। সরল যেদিন চলিয়া গেল, তাহার পরদিনই অতিথিশালার মূলে কুঠারাঘাত হইল। চারিদিকে রৈ রৈ পড়িয়া গেল, কত দীন দুঃখী অক্ষম অনাথের উদরান্ন বন্ধ হইয়া গেল, তাহারা পথে দাঁড়াইয়া কালীশঙ্করকে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিল, কিন্তু সাধু কালীশঙ্কর সে সব গ্রাহ্যের ভিতরেই আনিলেন না। তারপর কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রের উপর কালীশঙ্করের নজর পড়িল। তাহারা চৌধুরী মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া স্থানীয় ইস্কুলে পড়াশুনা করিতেছিল। কালী-শঙ্করের আদেশে যখন একে একে সকলকে বাড়ির বাহির করিয়া দেওয়া হইল, তখন সেই আশ্রয়হীন বালকগুলির মলিন মুখের উপর দিয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল ! পাষাণ-হৃদয় কালীশঙ্কর সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না ! তারপর কয়েকজন ঝি-চাকর ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনকে বিদায় দিয়া কালীশঙ্কর নিরস্ত হইলেন। এত বড় বাড়িটা তখন যেন

খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর তারানাথের অনুগ্রহে বাড়িটা আবার সরগরম হইয়া উঠিত। কারণ থিয়েটারের আখ্ড়া প্রত্যহ চৌধুরী-মহাশয়ের বিস্তীর্ণ বৈঠকখানায় বসিতে লাগিল। ইহাতে ষড়রসের সংমিশ্রণ ছিল। পান ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্যেরও রিহার্সেল চলিত, কিন্তু কালীশঙ্করের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এদিকে আদৌ পৌঁছিত না। পাড়ার চণ্ডিমণ্ডপে, নদীর তীরে, শানের ঘাটে, ময়রার দোকানে কালীশঙ্করের কীর্ত্তিকাহিনীর আলোচনা হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার সম্মুখে আসিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না।

সেদিন মাতঙ্গিনী দেখিল, কমলা ভাঁড়ার হইতে রন্ধনের উপযোগী জিনিষ পত্র বাহির করিয়া দিতেছে। ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। 'কুলশীল অজানা কি জাতের মেয়ে ঠিক নাই, সে কিনা ভাঁড়ার হইতে জিনিষ বাহির করিয়া দিবে! তাহার স্পৃষ্ট দ্রব্য আমাদের উদরে যাইবে, তাহাও কি হইতে পারে?' মাতঙ্গিনী আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে কমলাকে ডাকিয়া কহিল, "হ্যাঁগা বাছা তোমার কি তিনকুলে কেউ নেই—এখানে এমন করে, মুখজুব্ড়ে পড়ে, থাকা কি ভালো?" মাতঙ্গিনীর রুক্ষ কথাগুলো যেন কমলার প্রাণের ভিতর সূচিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে আপনাকে সংযত করিয়া সরলভাবেই বলিল, "সত্যি জ্যাঠাইমা, আমার কেউ নেই, আমি বড় অ—" কমলার দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, মুখের কথা সম্পূর্ণ বাহির হইল না। চাকার মতো মুখখানা একবার ঘুরাইয়া মাতঙ্গিনী কহিল, "শুনেচি, তোমার নাকি সোয়ামী আছে, সে বুঝি সোয়ামী নয়, উপপতি—তা না হোলে কি আর ফেলে পালাতে পারে? একবার খবর নেয় না। এমন দুশ্চরিত্র মেয়ে মানুষকে কি বাড়িতে স্থান দিতে আছে? ও মা, কি ঘেন্না, জাত জন্ম আর রৈল না দেখ্চি!"

কমলার তখন মাথা ঘুরিতেছিল। সে জানালার একটা গরাদে ধরিয়া নিঃশব্দে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলাকে নিরুত্তর দেখিয়া মাতঙ্গিনী সুরটা সপ্তমে চড়াইয়া কহিল, "এমন অজাতের কুলটা মেয়েকে বাড়িতে স্থান দিয়ে পুষে রাখা হ'য়েচে, এ যদি একবার জানা-জানি হয়, তা হ'লে কি আর আমাদের ছেলেগুলোর বিয়ে হবে, না সমাজে মুখ দেখাতে পার্বো। আমি বল্চি, তুমি বাপু

এ বাড়ি ছেড়ে আজই চলে যাও।" মাতঙ্গিনীর গলার আওয়াজ পাইয়া তারানাথ ও উমাশশী আসিয়া দাঁড়াইল।

মুখখানা বিকৃত করিয়া মাতঙ্গিনী আবার কহিল, "দেখ্‌লি উমি, মাগীটা আমাদের জাত জন্ম সব খেলে, তিনকুলে কেউ নেই, তাই এখানে মর্‌তে এসেচে—আপনার জন থাক্‌লে এই দশা? নচ্ছার মাগী এখুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।" উমাশশী টিট্‌কারি দিয়া বলিল, "ঠিক বলেচ মা, ভিজে বেরালটির মতো থাকে, মনে করেচে কেউ কিছু জান্‌তে পার্‌বে না।" মাতঙ্গিনী কমলার মুখের নিকট দুই হস্ত বিস্তার করিয়া কহিল, "তাও কি হয়, আমরা মানুষ দেখ্‌লে চিন্‌তে পারি। মন্তরে পেটের কথা টেনে বের কোর্‌তে পারি। এখন ভালোয় ভালোয় বিদেয় হও বল্‌চি তা না হোলে—" বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে প্রাঙ্গণস্থিত সম্মার্জ্জনী দেখাইয়া দিল।

কমলার চোখের জল চোখে শুকাইয়া গেল। সে মৃদু-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "কার সঙ্গে কোথায় যাবো জ্যাঠাইমা!"

চোখ দুটি কপালে তুলিয়া দন্তপাটি বিকশিত করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, "নেকি, খুকি, কোথা যাবেন তা আমি বোলে দেবো। যেখানে দু'চক্ষু যায়, সেখানে যাও। সাম্‌নে গঙ্গা রয়েচে ডুবে মরো গে।"

লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে কমলা এতটুকু হইয়া গেল। সে ভাবিল, 'মরণ—মরণ! অভাগিনীর জীবনে কি মরণ নেই। আজ যদি ছেলেটা না থাক্‌তো!' কমলা মাটির দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা জ্যাঠাইমা সরল আসুক, আমি যাবো।"

"দেখ্‌ উমি, মাগীটার বজ্জাতি দেখ্‌। সরল আসুক! কেন সরল তোমার কে বাপু?"

"এটা আর বুঝ্‌লে না মা, সরলকে গুণ করেচে।"

"তা আর বুঝিনি, ডাইনি সরলটাকে না খেয়ে আর ছাড়্‌বে না, এখন ভালোয় ভালোয় বিদেয় কর্‌তে পার্‌লে বাঁচি।"

এতক্ষণ পরে তারানাথ কহিল, "কার সঙ্গে যাবে বল্‌ছিল—গঙ্গাধর ঠাকুরকে ডেকে দেবো। এতক্ষণে হয় তো তার পূজো-আচ্ছা হ'য়ে গ্যাছে।"

মাতঙ্গিনী কহিল, "যা তবে তাকে ডেকে দিগে যা।"

লাঞ্ছিতা অবমানিতা কমলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার মস্তক ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতে লাগিল, একটা রুদ্ধ বেদনা যেন প্রাণের মধ্যে

কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিমেষে সমস্ত রক্তটা মাথার উপর উঠিয়া গেল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। যখন তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল বামা তাহার মস্তকে জল সেচন করিতেছে। আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গঙ্গাধর ঠাকুর একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। গঙ্গাধরকে দেখিয়া কমলা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

গঙ্গাধর স্নেহার্দ্র-বচনে কহিল, "মা, আমি তোমার ছেলে, আমাকে দেখে লজ্জা কর্‌বার কোনো কারণ নেই। এখন ওঠ, মানিককে নিয়ে আমার বাসায় চলো। এখানে আর থেকে কাজ নেই, যে ক'টা দিন সরল না আসে সে ক'টা দিন না হয়, তোমার ছেলের কাছেই রৈলে মা?" বিকার-গ্রস্থ রোগীর কর্ণে, কে যেন বলিল—'শীতল জল!' কমলার মরুতপ্ত হৃদয় মাঝে কে যেন শান্তি-সলিল ছিটাইয়া দিল। কমলা গঙ্গাধরের পদ স্পর্শ করিয়া কহিল, "বাবা, বাবা—" তাহার সব কথা বাহির হইল না, প্রাণটা তখন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার নয়ন-প্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল! সে মস্তক অবনত করিল।

গঙ্গাধর স্নেহ-পূর্ণ-স্বরে কহিল, "মা, মা,—" তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

বামা উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, "দিদিমণি চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। এরা থাক্‌তে এ বাড়ি আর মাড়াবো না। বড় গিন্নির বড় গুমর হয়েচে, ঐ মুখে পোকা পোড়্‌বে। ভগবান আছেন দিন রাত্তির হচ্চে, এত অহঙ্কার থাক্‌বে না। বাবু আসুন, মাঠাকরুণ আসুন, দাদা বাবু আসুন, দেখ্‌বে কী কাণ্ড হয়! ঘরের লক্ষ্মীকে ঠিক দুপুর বেলা না খাওয়া না দাওয়া তাড়িয়ে দিলে! মা গো মা বেরাল কুকুরটাকে কেউ যে এমন কোরে তাড়ায় না। এদের যে নরকেও যায়গা হবে না! ছি ছি! দাদা ঠাকুর, আমি মানিককে নিয়ে আসি, আর গাড়ি যুত্‌তে বোলে আসি। তুমি এখানে একটু বোসো, যেন সে আবাগী আবার এসে ঝালঝেড়ে যায় না!"

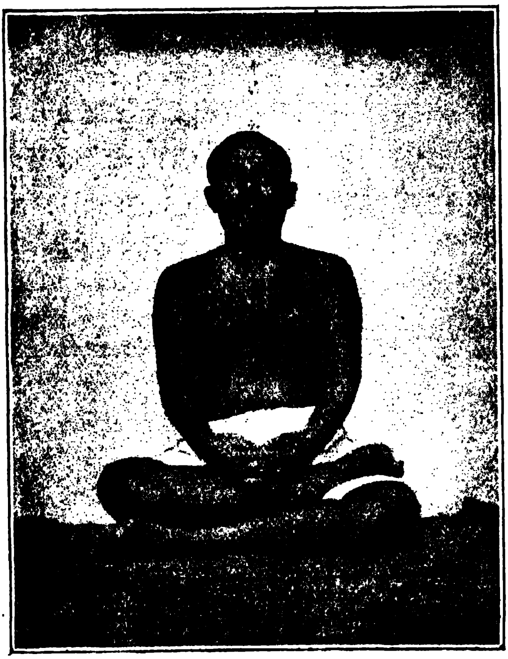
(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ

"কুশদহ"-সম্পাদক দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডুর মধ্যম সহোদর উপেন্দ্রনাথ, গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার রাত্রি ৮টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। অগ্রজ অপেক্ষা উপেন্দ্রনাথ সাড়ে পাঁচ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৪৮ বৎসর হইয়াছিল।

উপেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে প্রথম হইতেই ধর্ম্মভাব ছিল। "সনাতন হিন্দুধর্ম্ম" এই নামটিতে তাঁহার বিশ্বাসের ভাব প্রথমে দেখা গিয়াছিল। যখন তাঁহার অগ্রজ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, তখন তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর মাত্র। অন্যূন ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত অগ্রজের কাজে বাধা দিয়া, তাঁহার প্রতিকূলে চলিয়াছিলেন। তাহার পর সহসা একদিন অগ্রজের নিকট আসিয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে সমস্ত বিরোধের অবসান করেন। আন্তরিক বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া বলেন, "দাদা, এদিকে (ব্রাহ্মসমাজে) এলে যেমন শান্তি পাই, এমন আর কোথাও পাই না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় এবং কীর্ত্তনে প্রাণের খাটী জিনিষ পাওয়া যায়!" এই সময় জ্যেষ্ঠের প্রতি কৃতজ্ঞতা-সূচক কয়েকটি কথা বলেন। অতঃপর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠের প্রতি বাধ্যতা এবং শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আজ অগ্রজকে পশ্চাতে ফেলিয়া পরলোকে অগ্রগামী হইলেন!



উপেন্দ্রনাথের মনে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে "সুখী পরিবার" গঠনের ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। তাই সংসার অনিত্য-অসার বুঝিয়াও স্ত্রী পুত্রের হিতচিন্তা হইতে একদিনের

জন্য বিরত হইতে পারেন নাই, কিন্তু সংসারে শান্তি পান নাই। উপেন্দ্রনাথ সংসারের সকল অশান্তি ভগবানের নামে ভুলিয়াছিলেন। ধর্ম্মের মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া দুঃখ ক্লেশের উর্দ্ধে আপনাকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের নামে ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠানে মধ্যে মধ্যে যোগদান করিতেন। কর্ম্ম-জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি ৺রামকৃষ্ণ রক্ষিতের চিনির আড়তের কার্য্যে ছিলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি শরীরের জন্য তেমন আর চিন্তা করিতেন না, সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নশীল ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ এক পুত্র, পুত্রবধূ, তিন কন্যা ও বিধবা পত্নী রাখিয়া গেলেন।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

ইতিপূর্ব্বে ইছাপুর গ্রামে ডাক্তার বেণীমাধব ঘোষের বাটীতে যুবকদিগের উৎসাহে ও উদ্যোগে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে অধিকাংশস্থলে এইরূপ পাঠাগার পাঠকগণের অনুরাগের অভাবে কিছু দিনের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, উপরোক্ত পুস্তকালয়টি পর পর উন্নতি লাভ করিয়া এখন তাহার পাঠক ও পুস্তকাদির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের মনে হয়, এই পাঠাগারের সঙ্গে একটি আলোচনা সভা (Debating Club) স্থাপন করিলে ভালো হয়।

বহুকালের পর নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নব সংস্কৃত খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে গত ১০ই, ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনি রবিবার উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কয়েকটি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও প্রচারক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। গ্রামস্থ অনেকগুলি ভদ্র ও সাধারণ লোক আসিয়া বেশ আগ্রহের সহিত উপাসনা উপদেশ এবং সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাধারণত এখন আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের তেমন বিদ্বেষভাব দেখা যায় না। এখন যদি সমাজের পরিচালকগণ নিয়মিতরূপে উপাসনাদির কার্য্য চালাইতে পারেন, তবেই মন্দিরের দ্বারা দেশের কিছু উপকারের আশা করা যায়। নচেৎ এই ব্রহ্মমন্দির, কেবল সংস্থাপকগণের নামের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া রহিবে মাত্র।

এবার গোবরডাঙ্গা ইস্কুল, ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষায় প্রশংসনীয় হইয়াছে। প্রেরিত ৫টি ছাত্রই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১। চারুকর আশ, ২। শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪। গোপালচন্দ্র চৌধুরী। ৫। হরিনারায়ণ সরকার।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি খাঁটুরা দাতব্য চিকিৎসালয়-গৃহে যুবকগণের উদ্যোগে একটি পাঠাগারের সূত্রপাত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এখানে অনেকগুলি সাময়িক মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র রাখা হইয়াছে। আমরা আশা করি, যুবকগণ এই পাঠাগার স্থায়ী করিতে যত্নশীল হইবেন।

প্রাপ্ত-পত্র

গোবরডাঙ্গা হাই-ইস্কুলের উন্নতি কল্পে যে চাঁদা আদায় হইয়াছিল তাহার খরচ

চাঁদা সংগ্রহের জন্য সভা আহ্বানের বিবিধ খরচ মাঃ বাবু হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২৸৹
চাঁদার জন্য নিবেদন পত্র ছাপানো—মাঃ বাবু কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় ১২৲
ডাক টিকিট ও কাগজ খাম ইত্যাদি খরিদ মাঃ পাঁচু নাই ১২৸৹
শিক্ষা বিভাগের সার্কুলার বই আনা মাঃ ভি-পি ৩৶৹
স্থানান্তরে চাঁদা আদায় জন্য বারবরদারি খরচ মাঃ বাবু পতিরাম দে ৫৲
ইস্কুলের বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার আলমারি খরিদ মাঃ ঘোষ বসু এণ্ড কোং ২৭৫৲
কলিকাতা হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য ষ্টেশনে আনিবার রেল ভাড়া ১০৶৹
লোহার কড়ি, জানালার বোল্টু খরিদ মাঃ প্রসন্নকুমার রায় এণ্ড কোং ৪৯৷৶৹
ঐ সমস্ত দ্রব্য আনিবার রেল ভাড়া ও গরুর গাড়ি ভাড়া ১৸৹
জানালার অকুলান হওয়ায় যজ্ঞেশ্বর রক্ষিতের নিকট বোল্টু খরিদ ৪৲
গেটের ৪টি ডুমনি ও তারের বেড়ার ৪টি হুক মাঃ শিবু বুনা ৩৸৹
কাঁটা তার ১ বাণ্ডিল মাঃ মধ্যম তরফের কলিকাতার সরকার ১১৲
ঐ তারের বেড়া আঁটিবার জন্য পেরেক ৪ পাউণ্ড ১৲
স্কুল মেরামত
মাঃ আব্বাস আলি ১৮৫৲
ঐ মাঃ প্রসন্ন পটুয়া ৬৮৷৹
কড়ি বরগায় আলকাতরা দেওয়া ১৭৲
খড়খড়ি ও দরজা জানালায় রং দেওয়া ৪০৲
হেড মাষ্টার বাবুর নিকট জমা আছে ৩৫৲
প্রেসিডেন্টের হস্তে মজুত কোম্পানীর কাগজ বাবদে ৫০০৲

মোট—১২৩৭৲

৬ই বৈশাখ, ১৩২০ সাল। শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

শ্রী যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

কার্য্যালয় ঃ—

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৴১০ দেড় আনা

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ঘোষ এণ্ড সনস্

জুয়েলার্স এণ্ড অপটিসিয়ানস্,

৭৪ নং হ্যারিসন রোড। ব্রাঞ্চ ১৬।১নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

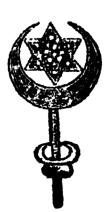


৬১ নং। রূপার ব্রোচ

জারমানীতে প্রস্তুত দাম ২॥০



১১১ নং মাকড়ি। ইহুদি মাকড়ি প্রতি জোড়া গিনি সোনার দাম ২৫৲ হইতে ২৮৲



কানফুল। নানারূপ প্যাটার্নের প্রস্তুত থাকে গিনি সোনার মূল্য ১৩৲

FREE BOOK.

বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণ

স্বপ্ন-বিচার

অর্থাৎ

স্বপ্ন, স্বপ্নফল এবং তদ্দর্শনের লাভালাভ বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক।

বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

—:*:—

কবিরাজ

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



মহাপ্রয়াণ—ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩২০	চতুর্থ সংখ্যা

উঁচু নীচু

—o—

"ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা আমারে, ঠাকুর।"

"কেন গো মা, কি দোষ তোমার ?"

"আমি নীচ জাতি, নীচ কর্ম্ম করি,

দেহ মোর কলুষের ভার !"

"বুকে কারো কভু মেরেছ কি ছুরি !"

"না ঠাকুর, কখনো তো নয় !"

"পর-সুখে কভু পুড়ে কি মরেছ ?"

"না ঠাকুর, তাহাও তো নয় !"

"পর-দুখে কভু সুখী কি হ'য়েছ ?"

"না ঠাকুর, কখনো তো নয় !"

"গচ্ছিত হরণ কভু কি করেছ ?"
"না ঠাকুর, তাহে ঘৃণা হয়।"
"আশ্রিত-পীড়ন কভু কি করেছ ?"
"না ঠাকুর, কোনো কালে নয়।"
"মিথ্যা কথা কভু মুখে কি এনেছ ?"
"না ঠাকুর, জ্ঞানে কভু নয় !"
"ছেড়ে কি দিয়েছ আত্মজাতি ধর্ম্ম ?"
"না ঠাকুর, তা কি কভু হয় ?"
"তবে, করে' থাক কোন্ নীচ কর্ম্ম ?"
"আবর্জ্জনা ঘাঁটিয়া বেড়াই !"
"দাও না কেন সে নীচ কর্ম্ম ছাড়ি' ?"
"তোমাদের কি হ'বে, গোঁসাই ?"
এ মহত্ত্ব যা'র, এ ত্যাগ স্বীকার,
সেই নীচ ! আমি উচ্চ ! হায় !
কৃতঘ্ন সমাজ, উচ্চনীচ জ্ঞান
এইরূপ পাইলে কোথায় ?
"মা, তোমার কক্ষে আবর্জ্জনা-ভার,
তবু তুমি জননী সমান !
উপবীত অঙ্গে আমি, মা, তোমার
অপোগণ্ড অবোধ সন্তান।
ছোঁয়া কোন্ কথা,—পূজিলে তোমারে
হ'বে মম সার্থক জীবন !
ছিল যে জননী শৈশবে আমার,
তাই তুমি আমার এখন !"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

অভয়ানন্দ

এ সংসারে কতই দুঃখ তাপ। মানব-চিত্ত সর্ব্বদাই পাপে তাপ-ভয়ে-ভীত। যিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী জ্ঞানী, তিনিই দুঃখ তাপের অতীত মায়া মোহমুক্ত। "পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব, পাশমুক্ত ভবেৎ শিব।" জ্ঞানের উচ্চ অবস্থায়—মুক্তাবস্থার একটি প্রধান লক্ষণ, অভয়ভাব—সর্ব্বপ্রকার ভয় সংশয় রহিত। এই অভয়ানন্দ কিসে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নানা কারণে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া মানুষের জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। চিরদিন দুর্ম্মতি পাপে নিমগ্ন থাকিতে সকলে পারে না। মানুষের তাহা স্বভাব নয়, উহা অস্বাভাবিক অবস্থা। যখনই পাপের প্রতি মানুষের ঘৃণা উপস্থিত হয়, তখনই জীবনের পরিবর্ত্তন হয়। ঈশ্বর-কৃপায় মানুষ নব-জীবন প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞানতার অবসান হয়। নব-জীবন লাভ অতি সুদুর্ল্লভ হইলেও এমন একটা সময় আসে যখন তাহা অতিশয় অনিবার্য্যরূপেই লাভ হয়। বহুজনের এরূপ হইয়াছে। মানুষ তখন কাঁদিয়া বলে "ধন, মান, ল'য়ে কি করিব, সে সব সঙ্গে তো যাবে না" কারণ মানুষ যে, ধন মান লাভের জন্য ভগবৎ প্রেমের মধুর আস্বাদ ভুলিয়া, স্বার্থপরতার বশে পাপাসক্ত হয়, সেই স্বার্থপরতা যে মানুষের অন্তঃকরণের একটি অতি নিকৃষ্ট ভাব, তখন সে তাহা বুঝিতে পারে।

জীবন পরিবর্ত্তনের প্রথমে অনুতাপ, দ্বিতীয় বৈরাগ্য, তারপর সাধনাবস্থা। সাধনের বিষয় ঈশ্বরের স্বরূপ, সত্যভাবে ভগবানের স্বরূপ সাধন ভিন্ন কেহই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। অধ্যাত্ম-জ্ঞানের মূল, ভগবৎ স্বরূপ। সাধনাবস্থায় শান্ত দাস্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবাবেশ হয়। তারপর পরিপক্কাবস্থা বা স্থায়ীভাব লাভ হয়। ইহার পরও অনেক প্রকার উচ্চশক্তি ও জ্ঞানের সোপান আছে।

যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে এ দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, তাঁহারা ঈশ্বরতুল্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। এই বিশ্বাস ভ্রমমাত্র। কারণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এক ভিন্ন বহু কখনই নহেন। দেহধারী জন্ম-মরণাধীন মনুষ্য, সিদ্ধ-যোগী মহাপুরুষ হইলেও সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে

পারেন না। তবে জীবন্মুক্ত জ্ঞানীগণ অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভাবলে সাধারণ বুদ্ধির অতীত অসাধারণ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে সকল অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রকাশ বটে, কিন্তু তাহা মানব চিত্তের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে, আর যদি কোনো মানবই অভ্রান্ত না হন তবে অভ্রান্ত-ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রকাশ হইল কিরূপে?

ইহার মধ্যে একটু বিশেষ তত্ত্ব আছে। মানব মাত্রেই অপূর্ণ তাহা সত্য, সুতরাং কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদের অধীন হইলেও দেশ কাল ভেদে কোনো কোনো বিষয়ে, এক একজন অভ্রান্ত-তত্ত্ব প্রকাশে সক্ষম হন। ইহা বিধাতার মঙ্গল বিধানের ফল স্বরূপ। আবার যখন যিনি সেইরূপ অবস্থার দিকে অভিমুখীন্ হন, তিনিও সে তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। কথাটা বোধ হয় আর এক দিক দিয়া আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে সকল অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রকাশ।" তবে কি ধর্ম্ম-তত্ত্বমাত্রেই অভ্রান্ত সত্য? না, তাহা নহে! কেন না, ঈশ্বরের কল্পিত-স্বরূপ হইতেও অনেক অবৈজ্ঞানিক কল্পিত সংকীর্ণ ধর্ম্ম-মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সত্য বটে মানুষের নিকট ভগবান্ আপনার সত্য-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক সময় এমন অবস্থা হইয়াছিল যাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক অভ্রান্ত-তত্ত্ব প্রকাশিত আছে। এখনো সে অবস্থা মনুষ্য-বংশ হইতে চলিয়া যায় নাই। এখনো মানুষের মধ্যে সেই সত্য প্রকাশ পাইতেছে। মানুষ সে অবস্থা লাভে এখনো সক্ষম হইতেছে। সে আদর্শ এখনো উপনিষদে সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং, শান্তং শিবমদ্বৈতম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই অভ্রান্ত স্বরূপ পাওয়া যায়। কালে যখন সে উচ্চ জ্ঞানের প্রভাব কমিয়া গেল, কবিত্ব এবং ভাবুকতার স্রোত চলিতে লাগিল তখন ঈশ্বর-স্বরূপে কল্পনা জড়িত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম-ভাব ম্লান হইয়া পড়িল। পরবর্ত্তী সময়ে উপনিষদের ছায়া অবলম্বনে পৌরাণিক ধর্ম্ম-মত গঠিত হইলেও সমস্তই সত্যে পূর্ণ নহে। যাঁহারা বেদ অভ্রান্ত বলিয়া মানেন, তাঁহারাও পুরাণ অভ্রান্ত বলেন না।

তবে কি উপনিষদ্ পাঠ করিলেই অভ্রান্ত সত্য লাভ করিয়া দুঃখ তাপের অতীত অভয় অবস্থা লাভ করা যায়? না, তাহা সম্ভবপর নয়। জীবন্ত-ভাবে সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" স্বরূপগুলি সাধন না করিলে প্রকৃত জ্ঞান এবং

দিব্যজ্ঞান জনিত যে শক্তি—যে শক্তির দ্বারা জীবন্মুক্তি অভয়ভাব লাভ হয়, তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রস্তরে অগ্নি আছে বটে, কিন্তু ইস্পাতের দ্বারা আঘাত বিনা তাহার প্রকাশ হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধনের প্রয়োজন। ব্রহ্ম-জ্ঞানে আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানেই অভয়ানন্দ উপস্থিত হয়।

এইবার একটি মধুময়-তত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রবন্ধের মূল কথা প্রকাশ করিয়া, প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই—

মানবাত্মা অপূর্ণ হইলেও সে অপূর্ণতা নিরবলম্ব নহে। তাহা অনন্তের পূর্ণতার আবেষ্টনে বা আশ্রয়ে, তখন আর ভয় কি? যখন দিব্য-জ্ঞানে দেখি, আমি ব্রহ্মে—ব্রহ্ম আমাতে তখন আর ভয় ভাবনার বিষয় তো কিছু থাকে না। ব্রহ্ম-স্বরূপ আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিলে চিত্তের যে প্রকার অবস্থা হয় তাহা কি ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করিতে পারা যায়! তখন আপনাকে মৃত্যুর অতীত—ব্রহ্ম-স্বরূপে আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে শোক মোহের অতীত—অনন্তের ক্রোড়ে চিরাশ্রিত—কেবল আশ্রিত নয়—স্নেহময়ী জননী—চির মঙ্গলময়ী মা আমার, নিত্য কত নব নব ভাবরসে, কত কৌশলে,—কত সঙ্কেত—ঘটনার দ্বারা তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতেছেন। তাহা কোন্ ভাষায় কিরূপে বলিব! ভাই সাধক, বুঝিয়া লও—আর চরণ ধূলি দাও।

দাস—

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীসের প্রভাব

গ্রীকবীর আলেক্‌জাণ্ডারের পঞ্জাব অভিযান, ভারতে গ্রীকশক্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত যোদ্ধৃসমূহ যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল, আলেক্‌জাণ্ডার তখন পারশ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই জন্যই খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে পুরুরাজের (Porus) সহিত যুদ্ধ বিফল হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের কুত্রাপি মাসিদনপতি আলেক্‌জাণ্ডারের পঞ্জাব অভিযানের

উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, এমন কি তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুত অভিযানের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। বিপাশা নদীর তীরে (Bias) তিনি দ্বাদশটি প্রস্তর নির্ম্মিত বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু তাহার অতি ক্ষীণতম রেখাটুকুও এখন নাই। প্রকৃতপক্ষে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য—য়ুরোপ ও এসিয়া পরস্পর যোগ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। উভয় দেশের সভ্যতা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের ন্যায় মিলিত হইয়াছে। আলেক্‌জাণ্ডারের এই আক্রমণের ফলে ভারতীয় শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির উপরও অল্পবিস্তর পশ্চিমের ছায়া নিপতিত হইয়াছে।

সেলুকাস্ নিকোটার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গ আলেক্‌জাণ্ডারের এসিয়াস্থিত রাজ্যসমূহ শাসন করেন। এই সময়ে পাটলিপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনা) মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিবৃন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই পাটলিপুত্রকে গ্রীক্‌গ্রন্থকার-গণ 'পালিভদ্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখানে গ্রীক্‌দূত মেগাস্থিনিস্ মৌর্য্য-নরপতি চন্দ্রগুপ্তের দরবারে অবস্থান করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা এই চন্দ্রগুপ্তকে ছান্দ্রাকোটাস্ (Sundracottas) নামে অভিহিত করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের পোষক ছিলেন। তিনি পর্ব্বত গাত্রে ও গহ্বরে অনেক উপদেশ খোদিত করিয়াছিলেন; সেগুলি এখনো ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। অশোক তাঁহার ত্রয়োদশ খোদিত লিপিতে পাঁচজন গ্রীক্‌রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচজন গ্রীক্ রাজার নামোল্লেখ হইতে আমরা অশোকের রাজত্বকাল ২৫০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইতেছি।

২৫০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে প্রাচীন পারশ্যরাজ্য সেলুকাস্-শাসিত-রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হয়। তখন দায়োদোতাস্ নামে একজন শাসক নবরাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করিতে থাকেন। এই রাজ্য প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপি বিদ্যমান ছিল এবং উত্তর ভারতের উপর ইহার সাক্ষাৎ শাসন পরিচালিত হইত। ডিমিট্রিয়াস্ (Demetrius) সমগ্র পঞ্জাবের উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপ্রচারিত মুদ্রায় ডিমিট্রিয়াসকে আমরা গজশিরাকৃতিতে টুপি পরিহিত দেখিতে পাই।

অ্যান্টিয়ালসিডাস্ (Antialcidas) একজন গ্রীক্ বংশোদ্ভূত পারশ্য দেশীয় রাজা। তিনি ১৫০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে উত্তর পশ্চিম ভারত শাসন করেন। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সমন্বিত মুদ্রাই ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বেশ নগরের স্তম্ভ দেখিলে মধ্যভারতে গ্রীসের কতটা প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতে গ্রীক্-শক্তি মিনন্দরের সময়ে বদ্ধমূল হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহাকে মিলিন্দা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তিনি বুদ্ধদেবের একজন পরম ভক্ত ছিলেন একথারও উল্লেখ আছে।

কাস্পিয়ান হ্রদের নিকট হইতে কুশান বংশীয় সিদিয়া নামে একদল ৫০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে উত্তর ভারত শাসন করিতে আরম্ভ করেন ; বলা বাহুল্য তদবধি ভারতে গ্রীক্-আধিপত্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়।

এই সিদিয়ান বংশীয় মহাবল কনিষ্ক বুদ্ধদেবের অন্যতম ভক্ত ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রকাশ। এই বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহাকে সম্রাট্ অশোকের পরেই স্থান দান করা হইয়াছে।

পেশোয়ারে তাঁহার রাজধানী ছিল। তথায় তিনি একটি অত্যুচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ১৯০৯ সালে বুদ্ধদেবের একখণ্ড অস্থি পাওয়া যায়। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর এই অস্থি মান্দালয়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পেশোয়ার-মিউজিয়মে ব্রোঞ্জ্ ধাতু নির্ম্মিত আধারে বুদ্ধাস্থি আছে ; সেই আধারে রাজার যে মূর্ত্তি মুদ্রায় অঙ্কিত, ঠিক্ সেই মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

কনিষ্ক সম্ভবত খৃষ্টের মৃত্যুর প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অবশ্য তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্দেশ এখনো ঐতিহাসিকগণের নিকট একটি মীমাংসার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের মুদ্রা পরীক্ষা করিলে ভারতে গ্রীক্ প্রভাবের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। *

প্রাচীন গ্রীসো বক্ত্রিয়ান রাজাদের—বিশেষত ইউথেডিমাস্ (Euthedemus) এবং ইউক্রেটিক্লস্ (Eucraticles) প্রভৃতির প্রচলিত মুদ্রা গ্রীক্ ও লাটিন্ ভাষায় অঙ্কিত। এই সমস্ত মুদ্রায় রাজার কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত এবং অল্প কথায় গ্রীসের গল্প লিখিত থাকিত। পরবর্ত্তী রাজাদিগের সময়ে মুদ্রা সমূহের গঠন প্রণালী ক্রমেই ভারতীয় ধরণে হইতে থাকে। মুদ্রাতে দ্বিভাষিক গল্প লিখিত থাকিত। তন্মধ্যে

* Cf Percy Gardner, coins in the British Museum, Greek and Scythic kings.

একটি ভাষা গ্রীক্ এবং অপরটি খারোষ্টী। এই খারোষ্টী অক্ষর তখন উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, যাহাতে ভারতীয় প্রজারা বুঝিতে পারে তজ্জন্য শেষোক্ত অক্ষরে মুদ্রা অঙ্কিত হইত। মিঃ জেমস্ প্রিন্সেপ্ এই খারোষ্টী অক্ষর দেখিয়া খারোষ্টী বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কুশানদিগের শাসন সময়কার মুদ্রা এতদপেক্ষা আরো হীনদশা প্রাপ্ত হয়। এই সময়কার মুদ্রায় রাজাকে আমরা একটি দীর্ঘ গাত্রাবরণ ও কদাকার চর্ম্মপাদুকা পরিহিত দেখিতে পাই। কনিষ্কের মুদ্রায় গ্রীক্ অক্ষরে লিখিত "বোদ্দ" অর্থাৎ বুদ্ধ এই কথাটি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভারতে মুদ্রা অঙ্কন বিদ্যা গ্রীক্‌দিগের দ্বারাই যে প্রচলিত হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীসো-বক্ত্রিয়ান শাসনের পূর্ব্বে আমরা ভারতীয় মুদ্রাকে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট অঙ্কিত বজ্র সমন্বিত দেখিতে পাই। গ্রীক্ ভাষায় drachme নামে এক প্রকার মুদ্রা আছে, মোগল শাসনকালে তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রার উপর "দাম" কথাটি খোদিত থাকিত, অধুনা এই দাম কথাটি 'মূল্য' অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। শুধু কি ভারতীয় মুদ্রার উপর গ্রীসের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল? ভারতীয় ভাস্কর্য্য বিদ্যার উপরও ইহার যথেষ্ট প্রভাব পতিত হইয়াছিল। জনৈক মৌর্য্য-নৃপতির একজন গ্রীক্ শিল্পী সম্রাট্ অশোকের কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথের সিংহ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন গান্ধারে (বর্ত্তমান পেশোয়ার ও তৎসন্নিহিত স্থান) বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য সমূহে গ্রীক্ শিল্পীর শিল্প-চাতুর্য্য অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গান্ধার বৌদ্ধধর্ম্মের একটি পীঠস্থান ছিল। এই গান্ধারে বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির সমূহ নির্ম্মাণ করিতে অনেক গ্রীক্ শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিল। গান্ধারে যে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে নাগী বা সর্পদেবীর প্রতিমূর্ত্তিটি ঠিক্ গ্রীক্ দেশীয় লিয়োচেয়ার্সের (Leochares) দলের অনুরূপ। গ্রীসে যেমন গানিমেডকে, জিয়াস নামক ঈগলরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে, গান্ধারের নাগীকেও তদ্রূপ গরুড়ের দ্বারা আক্রান্তা বলিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে।

গান্ধারের গ্রীক-বৌদ্ধ-বিদ্যালয় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল। এই বিদ্যালয় পরবর্ত্তী কালে সমগ্র বৌদ্ধ শিল্পের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্টিত করে।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যায় গ্রীসের কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার

অধিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অজন্তার গিরিগুহা-স্থিত প্রাচীর গাত্রাঙ্কিত চিত্র-দর্শনে অনেকটা জানা যায়।

ভারতে স্থপতিবিদ্যা গ্রীসই প্রথম প্রচলন করে—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফার্গুসনের এই মত। কিন্তু তক্ষশীলায় গ্রীক্-নির্ম্মিত স্তম্ভ ভিন্ন এবম্বিধ উক্তির যাথার্থ্যের আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই স্তম্ভটি স্যার আলেক্‌-জাণ্ডার কানিংহাম আবিষ্কার করেন।

ভারতীয় নাটকের উপরও গ্রীসের আধিপত্য পতিত হইয়াছিল। অধ্যাপক আর্ণষ্ট উইণ্ডিচ্ (Prof. Ernst Windisch) নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় নাটকের বিদূষক, চাটুকার প্রভৃতি কথা গ্রীক্ Comedies of menandar নামক নাটকের Fool, Parasite প্রভৃতি কথার অনুকরণে লিখিত। অধ্যাপক আর্ণষ্ট কেবলমাত্র মৃচ্ছকটিকের ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তরিত নাটকের অভিনয় দর্শনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। * মৃচ্ছকটিক যে হিন্দুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি গ্রীক্ নাটকের ছায়াবলম্বনে আপন আপন নাটক লিখিয়াছেন, এ কথা বলা সঙ্গত নহে।

ডাক্তার থিওডার ব্লক্ "Caves and inscriptions in Ramnagar hills" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তত্রত্য গুহার সম্মুখস্থ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি মণ্ডপ ঠিক্ গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ।

সংস্কৃত নাটকের শেষে "যবনিকা" বলিয়া যে কথাটির উল্লেখ দেখিতে পাই, সেই কথাটি "যবন" এই কথাটির পুনরুক্তি মাত্র। বলা বাহুল্য, যবন অর্থে গ্রীক্।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতির উপরও গ্রীসের আধিপত্য কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।

যে গ্রীস্‌কে ভারতীয় আর্য্যগণ "যবন"—এই হীন আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন, সেই গ্রীসের আধিপত্য যে কিরূপে ভারতবাসীর জীবনে স্থান পাইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। গার্গী সংহিতার একস্থানে এইরূপ উল্লেখ আছে

* "The little clay cart". This play has been Translated into English by H. H. Wilson and by Dr. Ryder.

যে,—"যবনেরা (অর্থাৎ গ্রীকেরা) বর্ব্বর, তত্রাচ ভারতীয় বিজ্ঞান তাহাদের হইতেই উদ্ভূত ; সুতরাং তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া মান্য ও ভক্তি করা কর্ত্তব্য।"

ঈদৃশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এতাদৃশ গভীর আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা ও অবতারণা অসম্ভব। তবে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর যে গ্রীসের সভ্যতা আধিপত্য লাভ করিয়াছিল, তাহার মোটামুটি প্রমাণ পাওয়া যায়। *

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বৈজ্ঞানিক বনাম কবি

(গল্প)

তারক আমার সতীর্থ। সে যখন এফ্-এ, পাশ করিয়া 'বি-এস্-সি'র অভিমুখে গিয়াছিল, আমি তখন বি-এ-তে দার্শনিক হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সে ছিল বিজ্ঞানের গোঁড়া আর আমি ছিলাম বাগ্দেবীর কাব্যকুঞ্জের প্রমত্ত কোকিল। আমরা এক 'মেসে' থাকিতাম—উভয়ে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি রকম,—তারক বলিত, দুইটি বিপরীত তাড়িৎ-ধারার মত! তারক কবি না হইলেও উপমাটা ঠিকই দিয়াছিল!—আমরা দুইজনে এক জায়গায় হইলেই অবিশ্রান্ত তর্কের সশব্দ অগ্ন্যুৎপাৎ—তাহা আর থামিতে চাহিত না। মতের এত বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের হৃদয়ের যে কি করিয়া এমন অভিন্নতা জন্মিয়াছিল তা' তারকও বুঝিয়া উঠিতে পারিত না,—আমিও না। তারককে আমি এত ভালোবাসিতাম যে একদিন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম,—"পূর্ব্ব জন্মে আমরা বোধ হয় স্বামী স্ত্রী ছিলুম।"

তারক তো চটিয়া লাল!—বলিল, "তুমি এত বড় কাপুরুষ—স্ত্রৈণ, যে বন্ধুত্বের উপর দাম্পত্য-প্রেমের স্থান নির্দ্দেশ কর!—দাম্পত্য-প্রেমে স্বামীত্বের পদটুকু খুব লোভনীয়—না?"

তখন পর্য্যন্ত আমাদের দু'জনের কেহই পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ

---

* এই প্রবন্ধটি প্রসিদ্ধ "East and West" নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত "Greek influence on ancient Indian Civilisation" নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।

লাভের উপায় অবলম্বন করি নাই, সুতরাং একটু হাসিয়া বলিলাম, "ওরে বিকট বৈজ্ঞানিক মূর্খ!—কাপুরুষ বলিস্ বল্—ওটা না হয় আমাদের বাঙালী জাতের একচেটে বিশেষণ, কিন্তু, তা' বলে' স্ত্রী না হ'তেই আমায় স্ত্রৈণ টাইটেল্ দিস্ কেন—আর তো'তে আমাতে দাম্পত্য-প্রেমের কোনো জন্মে সম্ভাবনা কল্পনায় আমিই যদি স্বামীত্বের ডিক্রী নিতে চাই, তা' হ'লেও কি তোর মত ম্যাক্‌নামারা * স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করা সম্ভব?"

তারক বলিল, "সে যাই হোক্…কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাটা যে বন্ধুত্বের চেয়ে উঁচু দরের, এ কিছুতেই মানি না!"

আমি একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম, "আগে বিয়ে হোক্—"

তখন ফাল্গুন মাস—সন্ধ্যা হয়-হয়—এক টুক্‌রা চাঁদও আকাশে উঠিয়াছে, মিঠে-মিঠে হাওয়া বহিতেছে,—দু'একটা গাছ হইতে কোকিলের সাড়াও পাওয়া যাইতেছে—সম্মুখে গোলদিঘীর পুকুর অর্থাৎ কবিত্বের প্রায় সমস্ত উপকরণগুলি একত্র হইয়া আসিয়াছিল! দেখিলাম, তারকের চিত্তটা যেন সেদিন বিজ্ঞানের যন্ত্রাগার হইতে বারবার কবিত্বের ভাবরাজ্যের দিকে উঁকি মারিতেছিল।

তারক আমার পূর্ব্বোক্ত কথায় খানিক চুপ করিয়া রহিয়া বলিল, "শরৎ, আজ তর্ক কোরো না—সত্যি বলো—বন্ধুত্বের চেয়ে দাম্পত্য-প্রেমটা কি উঁচু জিনিস?"

বৈজ্ঞানিককে কবিতার রাজ্যে দেখিয়া মনে কেমন একটু গর্ব্বও হইল——একটু আমোদও পাইলাম। বলিলাম, "উঁচু কি না বল্‌তে পারি না——তবে, দাম্পত্য-প্রেমে যে নেশা বেশি, এ ঠিক!"

"নেশা বেশি?—তাই তোমরা ঐ প্রেম জিনিসটা নিয়ে তোমাদের কাব্যে অত নাড়াচাড়া করো!"

---

* মিসেস্ ম্যাক্‌নামারা—মেডিক্যাল কলেজের জনৈক ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের স্ত্রী। তিনি রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ যে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, তাঁহার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে যদি কেহ রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার অপেক্ষা বা তাঁহার তুল্য পারদর্শী হন তবেই তিনি পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। এই সংবাদে মিঃ ম্যাক্‌নামারা রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হন এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উক্ত বিদুষীর পাণিগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যার' প্রতিজ্ঞার কথা উল্লিখিতা বিদুষীর জানা ছিল কি না তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইতি টীকাকার।

আমি মনে মনে একটু হাসিয়া নিতান্ত কবির মত গম্ভীরভাবে বলিলাম, "শক্তির যশ সবাই গায় ।"

তারক একটু উত্তেজিতভাবে বলিল,—"শক্তি কি ?—সে তো একটা নেশা—ক্ষণিকের !"

আমি আবার বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ—নেশা বটে, কিন্তু ক্ষণিক তো নয়ই—অধিকন্তু সর্ব্বগ্রাসী এবং সর্ব্বহজমী !—এমন কি তোমার যে এই অটল বান্ধব-প্রীতি একেও বেমালুম হজম করে' ফেল্‌তে পারে !"

"ঈস্—!"

"এই আস্‌চে বছর খবরের কাগজে নামটা বেরুলেই বাপমায়ের ষড়যন্ত্রে যখন নিজের হৃদয়টুকু হারিয়ে বোস্‌বে—তখন বুঝ্‌বে ! তখন আর 'মেস্' ভালো লাগ্‌বে না—কল্‌কেতায় আলাদা বাড়ি ভাড়া কোর্‌বে,—এমন সন্ধ্যেগুলোও এখানে বোসে মাটি কর্‌তে ভালো লাগ্‌বে না,—তখন গোলদিঘীর এই 'উদার আকাশ', অবাধ বাতাস—এ সব আর কিচ্ছুই ভালো লাগ্‌বে না হে—তখন একেবারে 'অন্তঃপুরচারী পরম ব্রহ্মচারী' হ'য়ে উঠ্‌বে—দেখো !"

ভীষ্মের শরশয্যার দিনে অর্জ্জুনের শরজাল যেমন বসুধার বক্ষে আঘাত করিয়া জলধারা উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল, সেই রকম আমার বাক্যবাণগুলা দেখিলাম, বৈজ্ঞানিক তারকচন্দ্রের হৃদয়ে বিঁধিয়া বিঁধিয়া তাহার নিরুদ্ধ কবিত্বের ভাব-ধারাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল ! সে বলিল, "দ্যাখো ভাই, সব সহ্য হয়, কিন্তু আমাদের এই যে বন্ধুত্ব, এটার উপর যে কেউ দু'খানা পটল-চেরা চোখের জোরে সজোরে আঘাত কোর্‌বে—তা' কিছুতেই সহ্য হবে না, তার চেয়ে না হয় বিয়েই কোর্‌বো না !"

আমি যেন চমকিয়া উঠিলাম,—বলিলাম, "এঁ্যা—একেবারে এতটা আত্মত্যাগ !"

তারকচন্দ্র অতি করুণভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "বন্ধুত্বের খাতিরে এটুকু আত্মত্যাগ কি বড়ই কঠিন ?…তুমি পারো না ?… ভেবে দ্যাখো, একটা সামান্য বালিকা—বিশ্বের অনভিজ্ঞতায় আপনাকে জড়িয়ে নিয়ে আস্‌বে,—এসে আমাদের নির্ম্মল নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের উপর নির্ম্মমের মত অনবরত ছুরি চালাতে থাক্‌বে—কবি হ'য়ে তুমি এ সহ্য কোর্‌তে পার্‌বে ?"

আমি অতি কষ্টে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলাম, "দ্যাখো ভাই, তুমি

তোমার বিজ্ঞান-চর্চ্চার পক্ষে বিশ্বের ঐ অনভিজ্ঞতা-জড়ানো বালিকাটিকে একান্ত অনাবশ্যক মনে কোর্‌তে পারো, কিন্তু আমাদের কাব্য-চর্চ্চার পক্ষে ঐ শ্রেণীর একটি জীব বিশেষ দরকারী বোলে মনে করি—"

"কেন বিয়ে না কোর্‌লে আর কাব্য-চর্চ্চা হয় না ?"

"আরে তুমি বুঝ্‌চো না,—ঐ বালিকা বধূগুলিই যে প্রেমের ল্যাবোরেটারী—কাব্য-চর্চ্চার পক্ষে একান্ত দরকারী—"

তারকচন্দ্র একটু বিরক্ত-ব্যথিত হইয়া বলিল, "বেশ তুমিই তবে বিয়ে কোরো—আমি কচ্চি না !"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাতে একূল ওকূল দু' কূলই তোমার নষ্ট হবে—এখন তোমার প্রাণে যে বন্ধু-প্রীতি টল্‌টল্ কোর্‌চে এও থাক্‌বে না—অথচ——"

তারক উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—"কী, আমার প্রাণে বন্ধু-প্রীতি থাক্‌বে না !—সে বরং তোমার না থাক্‌তে পারে !"

"তা হ'লেই হ'লো—তোমারও থাক্‌বে না—একদিকে ভাঙন ধর্‌লে আর একদিকও টেঁক্‌বে না !—"

বৈজ্ঞানিক তারকচন্দ্র কথাটা ভাবিয়া দেখিল, পরে বলিল, "তা হ'লে কি সত্যি সত্যি আমাদের আর তেমন ভাব থাক্‌চে না ?"

"কারুর থাকে নি,—তোমার আমার থাক্‌বে কি করে' ?"

"তবে কি করা যায় ?" তারকচন্দ্র একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিল। বৈজ্ঞানিকের এই কবিত্বময় ভাবনায় সত্যই হাসিতে আমার পেট ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। অতি কষ্টে তাহা দমন করিয়া বলিলাম, "সমস্যা বটে !" পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিবার ভাণ করিয়া বলিলাম "এক উপায় আছে !"

বৈজ্ঞানিক বেচারী যেন অকূলে ভেলা পাইল !—আগ্রহের ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি—কি ?"

আমি আচার্য্যের মত গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আমাদের উভয়ের শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ করা···" অন্য সময় হইলে তারকচন্দ্র হাসিয়া লুটাইত, কিন্তু এ সময় সে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না—বলিল, "তা' হ'লে তো আমাদের আর এমন বন্ধুত্ব থাক্‌বে না !"

আমি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তবু কিছুটা থাক্‌বে !"

উত্তরে বৈজ্ঞানিক তারক হতাশভাবে এমন একটা নিশ্বাস ফেলিল যে, আমি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না—সেই হাসিতে কবিত্বের

মায়াজাল সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল—তারকচন্দ্রের যেন স্বপ্ন ছুটিয়া গেল,—বলিল, "ধ্যেৎ—সব বুজরুগী—! আর আমিও তো আচ্ছা! পাগলামী কর্‌ছিলুম!"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "হ্যাঁ—বিশেষত বৈজ্ঞানিক হ'য়ে,—কবির ফাঁদে ধরা দেওয়া!"

তারকচন্দ্রের আর এক নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল; সে বলিল, "যাক্ এসব কথা মেসে যেন বলে' বেড়িয়ো না!" বৈজ্ঞানিক তারকচন্দ্রের এই একটি মধুর দুর্ব্বলতা ছিল—সে কবিত্বের কাছে অভিভূত হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে তাহার মাথা কাটা যাইত।

আমি বলিলাম, "তাও কি হয়—এমন জয়-বার্ত্তাটা কি বন্ধু-বান্ধবদের না জানিয়ে থাকা যায়?"

তারকচন্দ্র আমার মুখ বন্ধ করিবার উপায় বিশেষরূপে অবগত ছিল, বলিল,—"আচ্ছা চলো 'অন্নপূর্ণা হোটেলে' সেখানে যা হয় আমার দণ্ড কোরো!"

বলা বাহুল্য, আমি রসনার একান্ত অনুগত দাস, সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বন্ধুকে অব্যাহতি দিলাম; কিন্তু তখন কে জানিত যে, তারকচন্দ্র ভবিষ্যতে আমায় আশ্চর্য্যরূপ বোকা বানাইয়া প্রতিশোধ লইবার বিধিদত্ত সুযোগ পাইবে!

২

আমাদের দু'জনের নামই খবরের কাগজে উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের দু'জনেরই একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনো আমাদের মধ্যে তর্কের স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকিলেও কোনো কোনো বিষয়ে আমরা ইদানীং একমত হইতে শিখিয়াছি!—যথা, বিবাহের নামে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর এখন আর পূর্ব্বের মত বিরক্তি বা বিদ্বেষ নাই, বরং আগ্রহাতিশয্য! এবং আমিও নিজের বিবাহে নিজে কবিতা লিখিতে পূর্ব্বের মতন আর অসম্মত নহি,—কারণ কবিতা জিনিষটা কোমল বটে, কিন্তু তাহার পথ অনেকের পক্ষে—বিশেষ তো আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর পক্ষে একান্ত বন্ধুর, অথচ বন্ধুর স্বাক্ষরিত একটি কবিতা নহিলেও বিবাহের মত এমন মধুর জিনিষটা নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া যায়! এইরূপ ছোটখাটো আরো দু'এক বিষয়ে আমরা দুইজনেই একমত হইয়াছি!

আবার একদিন আমরা দুইজনে সেই গোলদিঘীর পাড়ে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। বলা বাহুল্য, বিবাহ সম্বন্ধেই গল্প চলিতেছিল। তারক বলিল, "আচ্ছা—বাসর-ঘরটা বড়ই মধুর—নয় ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা, নয় তো কি জেলখানা মধুর হ'তে যাবে ?"

"কিন্তু—"

"কিন্তু—কি ?"

"এই যত রাজ্যের মেয়ে গিয়ে জড়ো হয়—ভারী লজ্জা করে।—বর বেচারা যে কি কোরে সকলের শানানো রসিকতার চোট সহ্য করে—তাই আশ্চর্য্য !"

"সেই জন্যেই তো আমি বলি পুরুষে পুরুষে বিয়ে হ'লে বেশ হয়—অন্তত বর বেচারী স্বজাতির মুখ দেখ্‌তে পে'ত !"

তারক আমায় একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "ফের—ইয়ারকি !"

"ওহে ঐ শাস্তরটাতে এখন থেকে একটু সায়েস্তা হয়ে থাকা ভালো—কে জানে কখন, ফট্ কোরে বাসর রাত্তির এসে পড়্‌বে !"

"ছাখো ভাই, আমার বিয়েতে যে কবিতা লিখ্‌বে, তাতে ইয়ারকি ফিয়ারকি কোরো না—দোহাই তোমার ! বিয়েটা একটা ঠাট্টার জিনিস নয়।"

"বিয়ের ভাবার্থটা যে দেখ্‌চি সব্‌টাই এরি মধ্যে আয়ত্ত কোরে ফেলেচ !"

"আঃ সব কথায় ঠাট্টা ! ভালো কথা—আমার সেই ফরমাজি কবিতার কি হোলো ?"

না বুঝার ভাণ করিয়া আমি বলিলাম, "কোন্‌টা বলো দিকি ?"

"ঐ যেটা তোমার বিয়েতে তোমায় দেবো বলেছিলুম !" আমি নিতান্ত অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া বলিলাম, "আঃ সেটাও আবার আমায় লিখে দিতে হবে !"

"একটা লিখে রাখ্‌তে দোষ কি—তবে আমিও চেষ্টা করচি একটা লিখ্‌তে সেটা যদি হয়—তবে তোমায় ড্যাম্ কেয়ার !"

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম—বলিলাম, "এঁ্যা—তুমি !"

শান্ত ছেলেকে প্রশংসা করিলে যেমন সে এক রকম লজ্জায় অভিভূত হয়, তারকচন্দ্র তেমনি হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তার প্রথম লাইনটা আমার মনে আছে !"

ইচ্ছা—আমায় শোনায় !

আমি অত্যন্ত আগ্রহের ভাব দেখাইয়া বলিলাম, "তাই নাকি ? এতক্ষণ বল্‌তে হয় !"

তারকচন্দ্র একবার চারিপাশে চাহিয়া বলিল, "চলো—পুকুরের ওধারটায় যাই লোকজন কম আছে !"

আমি হাসি চাপিয়া বলিলাম, "মোটে তো এক লাইন শোনাবে ভাই—তার জন্যে এত কড়া পাহারা কেন ?"

তারকচন্দ্র কিন্তু শুনিল না। অগত্যা উঠিতে হইল। তাহার মনের মতন স্থানে বসিয়া বলিলাম, "বলো।"

সেই সময় একটি লোক আমাদের দিকে আসিতেছিল। তারকচন্দ্র কবিতা আওড়াইতে যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া থামিল। নিকটে আসিলে চিনিলাম—আগন্তুক আমাদের বাড়ির সরকার।

আমি বলিলাম, "কি, লোকনাথ যে !—খবর সব ভালো তো ?"

লোকনাথ প্রণাম করিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র পড়িয়া বুঝিলাম, আমাকে আগামী কল্য বাড়ি যাইতে হইবে এবং যাইবার সময় বাড়ির ফর্দ্দ মত আমার নিজের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি জিনিষ কিনিয়া লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। বুঝিলাম—আমার বিবাহ আসন্ন !

লোকনাথকে বিদায় দিয়া বলিলাম, "ওহে তারক !—এ যে বড় মুস্কিল হ'ল !"

সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"মুস্কিল আর কিসের—শুভস্য শীঘ্রম্।"

"না—হে ! এযে একেবারে 'ওয়ারেণ্ট' এসে ঘাড়ে পড়ল ;—সেটিকে একবার পরখ কোরে দেখ্‌বার ফুরসুৎও পেলুম না। তারপর ছাঁদনাতলায় গিয়ে দেখ্‌বো—এক রক্ষেকালীর বাচ্ছা ! তা হ'লেই তো…"

"না হে না ! সে ভয় নেই ! তুমি এমন কার্ত্তিকটি, তোমার কি আর !"

"আরে ভাই কার্ত্তিক বলেই তো বেশি ভয় !—দেখচ না, আসল কার্ত্তিকটিই আদবুড়ো রয়ে গেলেন !"

"আরে না হে না !—তুমি তায় কবি !"

"ভালো কথা !—কবিতার কি হবে ?"

তারকচন্দ্র মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল,—"হ্যাঁ—হে তাই তো ! ঐ একটা যা মুস্কিল তা, তা আমার কবিতার লাইনটা একবার শোনো দেখি।"

তারকচন্দ্র আবার চারিধারে চাহিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "দোহাই

তোমার—তোমার কবিতাসুন্দরীকে কেউ লুটে নেবে না, তাঁকে একবার প্রকাশ করো !"

তারকচন্দ্র অকটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না বল্‌চি—খালি প্রথম লাইনটা মনে আছে—"

"তা' তো সেই বেলা পাঁচটা থেকে শুনে' আস্‌চি !"

তারক আমার কথা কানে না তুলিয়া বলিল,—"আমি মনে কর্‌চি একটা ছোট্ট সনেট লিখ্‌বো, সেই গুলোই বেশি 'ইম্প্রেসিভ' হয় না ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মাঝে মাঝে 'অপ্রেসিভ'ও হয়—এই তোমার সনেট যেমন আভাস দিচ্ছে !"

তারকচন্দ্রের অমনি অভিমান হইল, বলিল, "তবে থাক্—শুনে কাজ নেই।"

আমি বলিলাম, "বেশ ! বিয়ের সম্বন্ধ আস্‌তে আস্‌তেই তুমি নিজেই মন ভাঙাভাঙি আরম্ভ কোরে দিলে যে !"

তারকচন্দ্র আমায় একটা ধাক্কা দিয়া বলিল,—"তবে শোনো—'বিজ্ঞানের সহচরী যথা তড়িল্লতা'—কেমন ?"

একটা দম্‌কা হাসিতে আমার পঞ্জরগুলা ভাঙিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল, আমি তাড়াতাড়ি একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিলাম, "তার পরের লাইনটা একটুও মনে নেই ?"

তারকচন্দ্র অম্লানমুখে একটুও অপ্রতিভ না হইয়া—বলিল, "আর এখনো লিখি নি,—লিখ্‌বো, সনেটের ধাঁজে হচ্চে না ? কেমন লাগ্‌লো ?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "হ্যাঁ, বেশ একটু নতুনত্ব আছে।"

কথাটা তারকচন্দ্র বিশ্বাস করিল, বলিল, "আমার ভাই বরাবর ঝোঁক, যদি লিখি তো একটু নতুন কোরে লিখ্‌বো।"

হাসিগুলো ঢেউয়ের মত পেটের ভিতর যেন কুল্ কুল্ করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তবে ঐ 'তড়িল্লতা' কথাটার বদলে 'বজ্রাঘাত' কথাটা দিলে আরো একটু বেশি 'ফোর্স' হ'ত—"

আমি আর হাসি চাপিতে পারিলাম না।

* * * *

আমাদের সমস্ত প্ল্যান উল্টাইয়া গেল ! আমার ও তারকের একদিনে বিবাহ। তার বিবাহ হইবে হবিপুরে, আর আমার হরিপুরে। হায়, বড় আক্ষেপ রহিয়া গেল, তার সেই 'বিজ্ঞানের সহচরী যথা তড়িল্লতা' প্রীতি-

উপহার আর লেখা হইল না! আমি তাহাকে কোনো প্রীতি-উপহারে আনন্দিত করিবার অবসর পাইলাম না।

যে বাড়িতে আমার বিবাহ তাহার পাশের বাড়িতেও আর একটি বিবাহ। আমার তখন কেবল মনে হইতে লাগিল, আহা, তারকের বিবাহটা হবিপুরে না হইয়া এই পাশের বাড়িতে হইত! তা' হইলে বেশ একটু নূতন রকমের প্রীতি উপভোগ করিতে পারিতাম!—ভাবিলাম, বিবাহটায় এতটুকু আনন্দ হইবে না!

কন্যাপক্ষ হইতে যখন 'মিলন-গাথা' বিতরণের পালা পড়িল, তখন আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর 'বিজ্ঞানের সহচরী যথা তড়িল্লতা' কথাটি বারবার মনে জাগিয়া আমায় সভার মাঝে অপদস্থ করিবার উপক্রম করিল।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় আমার জীবনসঙ্গিনীর রূপ দেখিয়া তারকচন্দ্রের সেই 'বিজ্ঞানের সহচরী যথা তড়িল্লতা' লাইনটি আমার মনে পড়িয়াছিল।

তারপর বরযাত্রীদের ভোজনের পালা। কন্যাপক্ষের কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "বর কি এই সঙ্গে বোস্‌বে?" আর একজন কে বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, একসঙ্গে দুই বরকে বসিয়ে দাও!"

তখন বুঝিলাম, পাশাপাশি দুই আত্মীয়ের বাড়ি। আমি নূতন বর—অবনত-মস্তকে আহারে বসিয়াছি। পাশে আর একটি বর আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ আমরা কেহ কাহারো পানে চাহি নাই—হঠাৎ পাশের বরের উপর দৃষ্টি পড়িল। ভাবিলাম, কী ভ্রম! আবার চাহিলাম,—দেখি, পাশের সেই নূতন বর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে! আমি তো অবাক্! মৃদুস্বরে বলিলাম, "এ্যাঁ!— তারক?"

তারক গম্ভীরভাবে বলিল, "এই!—নাম ধরে ডাকে ফের—আমি তোর শ্বশুর!"

আমি বলিলাম, "তোর না হবিপুরে বিয়ে হবে লেখা ছিল?"

"সে, ছাপাখানার কীর্ত্তি—হরিপুর ছাপার ভুলে হবিপুর হ'য়ে গেছ্‌লো—ইচ্ছে কোরেই জানাই নি—কেমন আশ্চর্য্য করেচি!"

এ্যাঁ—তুই জানতিস্?"

"ফের 'তুই'—সম্বন্ধ মানিস্ না—আমি যে তোর মাস্‌শ্বশুর।"

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

কুশদহের ইতিহাস

"নহ্যমূলা জনশ্রুতি" এই বাক্যের দোহাই দিয়া কুশদহে পূর্ব্বাপর প্রচলিত একটি জনশ্রুতির উল্লেখ এইখানে করিতে চাহি। কুশদহের অন্তর্গত গ্রাম সমূহে ও আধুনিক কুশদহের বহির্ভূত অনেক স্থানে একটি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। উক্ত প্রবাদ অনুসারে কোনো ব্রাহ্মণ রাজা কোনো সময়ে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ও হৃতরাজ্য হইয়া কুশদহের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন উক্তগ্রাম বনাকীর্ণ ছিল। উক্ত রাজা প্রবাদ অনুসারে একজন প্রধান রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন; কিন্তু কোনো কারণে দুর্গাদেবীর প্রসাদলাভের চেষ্টা করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবের কোপে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়া বনপ্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে দেবীর কৃপায় রোগমুক্ত ও পুনরায় স্বরাজ্য উদ্ধারে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে স্থানে তাঁহার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার চিহ্নমাত্র নাই বলিলেই হয়, তবে সে ভূমিখণ্ড এখনো "কুড়ে রাজার ভিটা" নামে জমিদারের কাগজে উল্লিখিত আছে। রাজবাটী ও অন্যান্য স্থানের অল্প কিছু নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়।

এই কুড়ে রাজা সম্বন্ধে একটি ব্রতকথা আজো কুশদহে চলিত আছে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে স্ত্রীলোকেরা এই ব্রত করিয়া থাকেন। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রতি পূর্ণাতিথিতে ব্রতকথা শ্রুত হয়। কিন্তু ব্রতকথায় ও প্রবাদে একটু পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। শিব দুর্গার আরাধনাকালে "রালরে বাপ দুর্গারে মা" এই কথা ব্যবহৃত হয়। "রাল" পদ শিব অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শব্দের মূল কি তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই কুড়ে রাজাটি কে? ইনিই কি কর্ণসুবর্ণের মহারাজ শশাঙ্ক? ইঁহারই প্রতাপে কনকরাজ রাজ্যবর্দ্ধন পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন? মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কি ইঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ছয়বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কি ইনি বনাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া ইনিই কি কুষ্ঠ ব্যাধিতে পীড়িত হইয়াছিলেন? এবং প্রাণপণে ইষ্টদেবের

আরাধনা করিয়া রোগ-মুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ শশাঙ্কের শেষ জীবন সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সংবাদ জানা যায় না। সেইজন্য অনুমিত হয়, তিনিই হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই বনাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার একজন রাজা বা রাজকুমার লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন—ইহা কি আমাদের গৌরবের কথা নহে? বাঙালীরা যে কেবল বাণিজ্যকার্য্যে সমুদ্রপথে বিচরণ করিতেন তাহা নহে,—দুরদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনও করিতেন এবং নিজেদের ভাষা নিজেদের সভ্যতা, নিজেদের ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা অসভ্য দ্বীপবাসীদিগকে সভ্য করিতেন। ইহা মনে করিলে কি আমাদের আত্মাদরের একটু বৃদ্ধি হয় না?

বাস্তবিক লঙ্কাবিজেতা বিজয়বাহু বাঙালী ছিলেন। তাঁহার পিতা সিংহবাহু রাঢ়ের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতামহী সুরূপাদেবী বঙ্গরাজের কন্যা থাকায় বিজয়বাহুকে আমরা বঙ্গ রাজকুমারীর পৌত্র বলিয়া বঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ধরিতে পারি। সিংহবাহু বঙ্গরাজের দৌহিত্রী তাঁহার পুত্র বিজয়বাহু লঙ্কা জয় করিয়া নিজেদের পারিবারিক নাম অনুসারে লঙ্কার নাম সিংহল রাখিয়াছিলেন এবং সেই নাম এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশের সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যায়,—

> "সিংহবাহু নরিন্দো সো যেন সিংহং সমাগ্নহি
> তেন তস্মং রজানস্তা সিংহলাতি পবুচ্চরে।
> সিংহলেন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিনা
> তেনেব সিংহলং নাম সন্নিতং সিংহলং সুনা।"

বঙ্গরাজের দৌহিত্র সিংহবাহু স্বহস্তে সিংহবধ করায় তাঁহাদের বংশের নাম 'সিংহল' হইয়াছিল, লঙ্কাবিজেতা বিজয়বাহু পিতার উপাধি অনুসারে লঙ্কার নাম 'সিংহল' রাখেন। বিজয়বাহু বাংলার ক্লাইভ। তিনি পিতার বিরাগভাজন হইয়া দেশত্যাগে বাধ্য হন। মাত্র ৭০০ অনুচর লইয়া তিনি সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি যখন লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন, তখনো লঙ্কা যক্ষ নামক অসভ্যদিগের অধিকৃত ছিল। বিজয়বাহু যক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন।

তিনি যেখানে প্রথমে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, সেইখানেই রাজধানী

স্থাপন করেন ও তাহার নাম তাম্রপাণি রাখেন। গ্রীক্ ও রোমীয় লেখকেরা এই রাজধানীর নামানুসারে সমগ্র দ্বীপকে তাপ্রবেণী নামেই অভিহিত করিতেন। বলা বাহুল্য, যে তাম্রপাণি বা তাম্রপর্ণি নামের অপভ্রংশে "তাপ্রবেণী" হইয়াছে।

যেদিন বিজয়বাহু সিংহলে অবতরণ করেন, সেইদিন হইতে সিংহলের অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। মহাবংশের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের বৎসরে, মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজ্যকালে, খৃষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিজয়বাহু শৈব ছিলেন। তিনি নিজের রাজধানীতে চারিটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সহিত কাশীনিবাসী নীলকণ্ঠ আচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সিংহলে গিয়াছিলেন। আর কোনো ব্রাহ্মণ রাক্ষসের দেশে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। এজন্য বিজয়বাহু বাংলা হইতে অনেক বৌদ্ধ লইয়া গিয়া সিংহলে বাস করাইয়া ছিলেন। যতদিন সমুদ্রে বাঙালীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন যে সিংহলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনো বাঙালী সিংহলকে ভুলিতে পারে নাই। উপকথা যাত্রা ও জনশ্রুতিতে সিংহলের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে।

আদিম সিংহলীরা যে বাংলার সন্তান তাহার আর একটি উদাহরণ দেখানো যাইতে পারে। আমরা গঙ্গার ব দ্বীপে বাস করিয়া নদীমাত্রকেই গঙ্গা বা গাং বলি। যদিও প্রত্যেক নদনদীর পৃথক নাম আছে, তথাপি গঙ্গা ও যমুনা ভিন্ন আর সকলগুলির সাধারণ নাম "গাং।" সেইরূপ সিংহলবাসীরাও নদীমাত্রকেই গঙ্গা বলিয়া থাকেন। যেমন কালুগঙ্গা, কল্যাণীগঙ্গা, মহাবলি গঙ্গা ইত্যাদি। ইহা হইতেও কি আমাদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় না?

কতদিন হইতে বাঙালীরা সমুদ্রপথে বিচরণ করিতেছিলেন, তাহার আলোচনা করা আমার ক্ষমতার অতীত, সুতরাং সেকথা তুলিব না। তবে বিজয়বাহুর সমুদ্রযাত্রা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত ঘটনার বহুপূর্ব্ব হইতে বাঙালীরা সমুদ্রবিহারী ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বেদেও সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। মনুতেও দেখা যায় সমুদ্রগামীদিগকে ভোজন করাইতে নাই। তাহা হইলে সমুদ্রযাত্রা যে বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলার হিন্দুরা যে সমুদ্রগমনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও

নিশ্চিত। কেননা গৃহস্থদিগকে যেখানে বর্ষাকালে নৌকা ভিন্ন হাট বাজার করা অসম্ভব, এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাওয়া দুষ্কর এবং আবশ্যকীয় প্রত্যেক কার্য্যের জন্য নৌকা ব্যবহার আবশ্যক, সেখানকার লোক যে সহজেই তচ্চালনে দক্ষতালাভ করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। যাহারা নৌকা চালনে অসাধারণ দক্ষতা-লাভ করে, তাহারা যে তদুপরি অস্ত্রচালনা করিতেও পটু হইবে, তাহাও বিচিত্র নহে। বাঙলীরা যে চিরকাল জলযুদ্ধে পটু ছিলেন, তাহার উল্লেখ কালিদাসের রঘুবংশে দেখা যায়। কালিদাসের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হউক বা চতুর্থ কিম্বা ষষ্ঠ শতাব্দী হউক সে সময়ে যে বাঙালীরা নৌযুদ্ধ-বিশারদ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কালিদাসের কথায় বুঝা যায়, বঙ্গ সন্তানেরাই নৌসাধনোদ্যত ছিল। যদি কেহ এখানে বলিতে চাহেন যে, রাঢ় বা বরেন্দ্র বা তমোলিপ্তিনিবাসীদিগকে কালিদাস লক্ষ্য করিয়াছন, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেননা তিনি গঙ্গার দ্বীপসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার রঘু যে, সেই দ্বীপসমূহে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গার পূর্ব্ব তীরবাসীরাই কালিদাসের উল্লিখিত বঙ্গসন্তান। আর এক কথা। গ্রীক গ্রন্থকারেরা একবাক্যে সকলেই রাঢ়ের অধীশ্বরকে গজবলে বলীয়ান্ বলিয়াছেন। তাঁহার ৭০০ সুশিক্ষিত রণহস্তীর ভয়ে কোনো পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিই তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে সাহস করিতেন না। সকলেই তাঁহার হস্তী-সৈন্যের ভয়ে ভীত ছিলেন। বার্হিলের গ্রন্থে গঙ্গারাঢ়ীর যে যুদ্ধ-ব্যাপারের উল্লেখ আছে, তাহাও মনে হয় এই বঙ্গসন্তানদিগের শৌর্য্য ও অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে। নতুবা তাঁহাদের স্থলযুদ্ধের সংবাদ রোমে পৌঁছিবার ততটা সম্ভাবনা ছিল না। আবার সেই সঙ্গে রোমীয় সেনাপতির উল্লেখ থাকিবে কেন? সম্ভবত কোনো জলযুদ্ধে রোমীয় সেনাপতি বাঙালীর যুদ্ধপটুতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। হয়তো বাঙালী পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে বার্হিল মনস্থ করিয়াছিলেন। সম্ভবত বাঙালীর এই প্রাধান্য সম্রাট্ ধর্ম্মপালের সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সরমা

দ্বাত্রিংশ-পরিচ্ছেদ।

যেদিন গঙ্গাধর ঠাকুর স্ত্রী পুত্র হারাইয়া, পাগলের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সেদিন কে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল, কে তাহার হাত ধরিয়া আপনার গৃহে আনিয়াছিল, কে তাহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিয়াছিল—সে আর কেহ নহে, চৌধুরী মহাশয়! তাহাকে আপনার বাটীতে রাখিয়া চৌধুরী মহাশয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তারপর যখন তাহার শোকের বেগ প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন তাহাকে আপনার দেব-সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। গঙ্গাধর চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবটা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। সে বুঝিল, দেবতার পদে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া, ভগবানের নাম লইয়া যদি জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটাইয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে!

চৌধুরী মহাশয়ের বাটী হইতে এক মাইল তফাতে এক ছায়া শীতল আম্র কাননের মধ্যে গঙ্গাধরের ক্ষুদ্র কুটীর, অদূরে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী কত শোক দুঃখ কত সৌন্দর্য্য সম্পদের স্মৃতি লইয়া আপন মনে চলিয়াছে, সম্মুখে ফল ফুলে ভরা কৃষিদের শ্যামল ক্ষেত্র। গঙ্গাধর এই কুটীরখানিত একলাই থাকে, সকাল-সন্ধ্যা সে চৌধুরী মহাশয়ের দেব-সেবা করে। সেথা হইতে প্রত্যহ সিধা আসে। গঙ্গাধর স্বপাকে এক সন্ধ্যা আহার করে। এই স্তব্ধ-মৌন কুটীর-খানি আজ মানিকের কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই নির্জ্জীব গৃহে আজ জীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে যেন একটা সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। গঙ্গাধরের বুকের মাঝে লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—তাহার ভাঙা-চোরা হৃদয়-বীণায় সহসা কে যেন আঘাত করিল। যে সুর বাজিয়া উঠিল, তাহা গঙ্গাধরের প্রাণটাকে একবার আলোড়িত করিয়া তুলিল। সে দেখিল, তাহার সংসার তো এমনই একদিন ছিল, এম্নি মুক্তাঝরা শিশুর হাসি! সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ! এই আম্রকাননে, এই ক্ষুদ্র কুটীরে শিশুদের অবিশ্রান্ত কোলাহল বিহঙ্গের অযাচিত মধুর সঙ্গীত, আর গৃহিণীর কমকণ্ঠের প্রিয় সম্ভাষণ সবই তো ছিল। গঙ্গাধর আর ভাবিতে পারিল না, যেন কাহার মোহনস্পর্শে শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আজ দুই দিন হইল বামা লীলার শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, কাল তাহার ফিরিবার কথা। তখন শ্রান্ত রবির কনক-কিরণ তরুশিরে ঝিকিমিকি করিতেছিল। কমলা গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর তরঙ্গ-লীলা দেখিতেছিল, মানিকলাল একরাশ ধূলা লইয়া আপন মনে মন্দির গড়িতেছিল, গঙ্গাধর সবে মাত্র গীতাখানি বন্ধ করিয়া তাকের মাথায় তুলিয়া রাখিল, এমন সময় বহির্দ্বারে কড়া নাড়া দিয়া উচ্চরবে কে হাঁকিল, "বাড়িতে কে আছেন—তার এসেচে।" গঙ্গাধর দরজা খুলিয়া দেখিল, পিয়ন এক টেলিগ্রাম লইয়া হাজির!

গঙ্গাধর কহিল, "এ টেলিগ্রাম কার বাপু।"

পিয়ন গলাটা একটু শানাইয়া বলিল, "কমলাদেবীর বাবুদের বাড়ির ঠিকানায় কলকেতা থেকে এসেচে। তাঁরা আমাকে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি কি এখানে আছেন?"

"আছেন," বলিয়া গঙ্গাধর রসিদ সহি করিয়া, টেলিগ্রামখানি লইয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

কমলা তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে, গঙ্গাধরের ডাকে চমকিয়া উঠিল।

গঙ্গাধর কহিল, "মা তোমার নামে একখানা টেলিগ্রাম এসেচে।" কমলা ভাবিল, হয় তো লীলার নিকট হইতে, কিম্বা সরলের নিকট হইতে আসিতে পারে, আগ্রহের সহিত কহিল, "খুলে পড়ুন না।"

গঙ্গাধর খাম ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম পড়িল, তাহাতে এই লেখা ছিল—

"আমি এখন মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে, সাজ্ঘাতিক পীড়িত, এ যাত্রা বাঁচিবার আশা নাই, দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে শীঘ্র আসিয়ো—হরিপদ।"

টেলিগ্রাম শুনিয়া কমলা যেন কাঠ হইয়া গেল। তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিন্ বিন্ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার স্বামী হাঁসপাতালে, মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ করেচেন, হে ঠাকুর, হে ভগবান, গিয়ে যেন তাঁকে দেখ্‌তে পাই, আমার প্রাণটা নিয়ে তাঁর জীবনটা দিয়ো ঠাকুর, তিনি বেঁচে থাক্‌লে সংসারের অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারবেন—আর আমি—"

কমলাকে চিন্তিত দেখিয়া গঙ্গাধর কহিল, "তার আর ভাবনা কি মা?

কাল সকালেই যাতে রওনা হওয়া যায়, তার বন্দোবস্ত আমি করছি। আহা, তিনি একেবারে শেষ সময়ে খবর দিলেন, কাগজে পত্রে এত ছাপিয়ে দেওয়া হ'ল, তিনি যদি একটু আগে খবর দিতেন, তা' হ'লে আর হাঁসপাতালে থাকতে হ'ত না।"

কমলা মাটীর দিকে মুখ করিয়া ধীর শান্তভাবে কহিল, "আজিই রাত্রে রওনা হবার সুবিধা হয় না ?"

"আজই রাত্রে ? তাই তো মা, কাকে সঙ্গে দিই, বামাটাও যদি এখানে থাকত না হয় সঙ্গে যেত। কাকে সঙ্গে দিই, আমারই সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা' তো হ'তে পারে না, তা' হ'লে দেব-সেবা বন্ধ হ'য়ে যাবে। আর এমন একটি লোক নেই যে, ঠাকুরের পূজোটি কোরে দু'টি ভোগ ছায়।"

কমলার চোখ দু'টি ছলছল্ করিয়া আসিল, তাহার কাতর প্রাণের করুণ দৃষ্টি গঙ্গাধরের প্রাণে আসিয়া আঘাত করিল। সে চঞ্চল-চিত্তে কহিল, "আচ্ছা মা, যাতে আজই রওনা হ'তে পারো, সেই চেষ্টায় আমি এখুনি বেরুচ্চি, তুমি একটু স্থির হ'য়ে থাকো, আমি শিগ্‌গীর ফিরে আস্‌বো।" এই বলিয়া গঙ্গাধর বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলা মানিকলালকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ভূমিশয্যায় পড়িয়া রহিল।

গঙ্গাধর চিন্তিত মনে বরাবর গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল ; কিন্তু কোনো পরিচিত কলিকাতা যাত্রীকে দেখিতে পাইল না। ফিরিবার সময় দেখিল, তারানাথ ও তাহার থিয়েটারের বন্ধু বিনয়কুমার এক অশ্বত্থমূলে বসিয়া গঙ্গার লহরী-লীলা দেখিতেছে। গঙ্গাধর এদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। কিয়দ্দূর আসিলে কোথা হইতে নবীন মণ্ডল একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হস্তে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমশাই, যদি এদিকে এসেচেন তো পায়ধূলোটা দিয়ে যান।" এই বলিয়া সে ব্যাগটি ভূমিতে রাখিয়া গঙ্গাধরের যুগলপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। নবীন ধূলা ঝাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলে গঙ্গাধর কহিল, "তাই তো হে নবীন, কোথা থেকে এলে ?"

"আজ্ঞে, এখন আসি নি, যাচ্চি ! আমি একটা নৌকর ভেতরে ছিলুম, আপনাকে ঘাটে দেখে পায়ধূলো নেবার জন্যে ছুটে এলুম।"

"বেশ, বেশ, কোথায় যাচ্চ নবীন ?"

"আজ্ঞে, কল্‌কেতায় যাচ্চি।"

"বড়বাজারে তোমার কাপড়ের দোকান কেমন চল্‌চে? সেখানে এখন কে আছে?"

"বেশ চল্‌চে, আমার ছেলে এখন সেখানে আছে। আমি গেলে সে বাড়ি আস্‌বে।"

গঙ্গাধর একটু বিষণ্ণভাবে বলিল, "নবীন আমার একটা উপকার কোর্‌বে?"

"কোর্‌বো না কেন? কি ঠাকরমশাই খুব শক্ত কাজ কি?"

"না, খুব শক্ত নয়, ছ্যাখো, নবীন, আমার একটি মেয়ে আছে!"

নবীন বিস্মিতভাবে কহিল, "আপনার মেয়ে!"

"হ্যাঁ, সে যেই হোক্, সে আমার মেয়ে। আজ একটা টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়েচে যে, তার স্বামী কল্‌কেতায় বড় হাঁসপাতালে আছে। তুমি যদি তাকে সেইখানে পৌঁচে দাও। আমি নিজেই যেতুম, কিন্তু আমার যে ঠাকুর ফেলে একদণ্ড নড়্‌বার যো নেই।"

"এই উপকার, তা' বেশ, আমিই মা লক্ষ্মীকে নিয়ে যাবো।"

"খালি নিয়ে গেলে হবে না, সেখানে তার থাক্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দিতে হবে। আমি খরচ-পত্র সব তোমাকে দোবো! আর তার স্বামীর অবস্থা জানিয়ে আমাকে চিঠি লিখ্‌তে হবে। পার্‌বে তো?"

"খুব পার্‌বো ঠাকুরমশাই, আমাকে আর বোল্‌তে হবে না।"

"তুমি সে হাঁসপাতাল জানো?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সব জানি, ঠাকুরমশাই! এই যখন আম গাছ থেকে পড়ে কিনুর বাপের পা ভেঙে গ্যাল, তখন কে তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেছ্‌ল? সে এই শর্ম্মা, সেখানে আমি পনেরো দিন থেকে তাকে খাড়া কোরে নিয়ে আসি!"

"তা' হ'লে তুমি সব জানো, তবে আমার সঙ্গে এসো!"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া নবীন সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। গঙ্গাধর ভাবিল, ভগবানের কৃপা না থাকিলে এমন সংযোগ ঘটে না।

গঙ্গাধর কড়া নাড়া দিল।

কমলা দরজা খুলিয়া দিল।

গঙ্গাধর কহিল, "মা তবে এসো, আমি তোমায় তুলে দিয়ে আসিগে। এই নবীন আমাদের খুব পরিচিত, চৌধুরী মহাশয়ের প্রজা। এখন কল্‌কেতায় যাচ্চে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। কোনো ভয় নেই,

তোমাকে সেখানে থাক্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দেবে, আর প্রত্যহ তোমাদের খবর নেবে।"

নবীন বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলী হইয়া কহিল, "মা লক্ষ্মি, আমাকে তোমার ছেলে বোলে মনে কোরো!"

কমলা গঙ্গাধরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার যে এক পয়সার সঙ্গতি নেই, এই চুড়ী ক···"

কমলার কথায় বাধা দিয়া গঙ্গাধর বলিল, "চুপ্ করো, সে ভাবনা আমার। যদি আমারি একটি মেয়ে থাকৃত!"

কমলার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। সে ধীরে ধীরে আসিয়া গঙ্গাধরের পদে প্রণাম করিল।

গঙ্গাধর তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। তারপর গঙ্গাধর কমলাকে নবীনের নৌকায় তুলিয়া দিয়া তাহার শূন্য কুটীরে ফিরিয়া আসিল এবং কিয়ৎক্ষণ শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া হাতে মুখে একটু জল দিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল এবং ঠাকুরের আরতি দিবার জন্য দরজায় তালা বন্ধ করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর দিকে চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার কালো ছায়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিয়াছে।

গঙ্গাধর আরতি সমাধা করিয়া, দেবতার প্রসাদী দু'একখানা ফলমূল খাইয়া দেবালয়ের একপ্রান্তে শুইয়া পড়িল। সেদিন আর তাহার সেই শূন্য কুটীরে ফিরিয়া যাইতে মন উঠিল না।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তখন রাত্রি দশটা, সরলের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। সরল চঞ্চল-চিত্তে নৌকা হইতে অবতরণ করিল। এ ক'টা দিন তাহার দিদির অদর্শনে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দিদি কেমন আছে, তাহার জ্যাঠাইমা কি তাহাকে কিছু বলিয়াছে, যদি বলিয়া থাকে, আহা, সে বড় ব্যাথা পাবে, প্রাণটা তার আরো অস্থির হইয়া উঠিল। জমিদারীতে গিয়া সে এ কয়দিন কিরূপে কাটাইয়াছে, তাহার দিদিকে সে কি কি কথা বলিবে, তাহা সে একটি একটি করিয়া হৃদয়-মাঝে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। জমিদারী হইতে যে হরিণ শিশুটি আনিয়াছে, কতক্ষণে সে উহা তাহার দিদিকে দেখাইয়া তাহার গুণের প্রশংসা করিবে! সরল আর স্থির থাকিতে পারিল না, দ্রুতপদে বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। একজন দাঁড়ী আলো লইয়া তাহার আগে আগে চলিতে

লাগিল, অপর একজন তাহার প্রিয় হরিণ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিল।

সরল যখন বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার গাটা যেন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। সে দেখিল, বাড়িটা কেমন এলো মেলো নীরব স্তব্ধ! কেন, কে জানে সেদিন থিয়েটারের আখড়া বসে নাই! হরিণ শিশুটিকে দালানের উপর বাঁধিয়া সরল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে একেবারে তাহার দিদির কক্ষের দরজায় আসিয়া আঘাত করিল এবং কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি! দিদি!"

চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উমাশশী বাহির হইয়া কহিল, "সরল, এসেচ, আমাকে ডাক্‌চ।"

বলা বাহুল্য, কমলা বিদায় হইলে উমাশশী তাহার কক্ষটি দখল করিয়া লইয়াছিল।

কমলার কক্ষ হইতে উমাশশীকে বাহির হইতে দেখিয়া সরল একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। সে বিরক্তির সহিত কহিল, "না, না, দিদি কোথায়?"

"দিদি? ও বুঝেচি, সেই মাগীটার কথা বল্‌চ, সে মার সঙ্গে ঝগড়া কোরে কোথায় চলে গ্যাছে কে জানে!"

সরলের মাথার উপর যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, সে অধীরভাবে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "জ্যাঠাইমা! জ্যাঠাইমা!"

অপর কক্ষ হইতে হ্যারিকেন হস্তে মাতঙ্গিনী বাহির হইয়া কহিল, "সরল এসেচ বাবা। সমস্তদিন খাওয়া হয় নি, মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গ্যাছে। মুখে হাতে একটু জল দাও। আমি খাবার যোগাড় কোরে দিচ্চি।"

"ও সব এখন থাক্, দিদি কোথায়?"

"দিদি আবার কে? সেই মাগীটা, তার তিনকুলে কেউ নেই, কি জাতের মেয়ে ঠিক নেই, তেমন মানুষকে কি ঘরে যায়গা দিতে আছে বাবা? আর দিনকতক পরে লোক জানাজানি হ'লে সমাজে আমাদের মুখ দেখানো ভার হবে, ভালো ঘরে তোমাদের বিয়ে থা দেওয়া কঠিন হ'য়ে পড়্‌বে। এই সব ভেবে চিন্তে মাগীটাকে তাড়িয়ে দিছি।"

"তাড়িয়ে দেছ? দিদিকে তাড়িয়ে দেছ?" সরল আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিল, তাহার চক্ষু দুইটা তখন জ্বলিতেছিল।

"সরল, তুই কিসেই মাগীটার জন্যে পাগল হ'লি নাকি? গঙ্গাধর ঠাকুর তাকে নিয়ে গ্যাছে! বোধ হয়, তার বাড়িতে আছে, স্থির হও, লোক পাঠাচ্চি। আমাদের এ বাড়িতে আসাই অন্যায় হ'য়েচে। 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর'!"

"আর লোক পাঠাতে হবে না" বলিয়া সরল ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং গঙ্গাধর ঠাকুরের বাটীর উদ্দেশে সেই অন্ধকার জনহীন পথে একলা পাগলের ন্যায় ছুটিতে লাগিল! সরল বাটীর বাহির হইয়া গেলে মাতঙ্গিনী সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ওগো তোরা দেখ্‌লি? মাগীটার জন্যে সরল যেন একেবারে পাগল! গুরুজন মানে না। ছি, ছি! কি ঘেন্না, অমন ছেলেকে আঁতুড়ে নুণ গিলিয়ে মার্‌তে হয়।" অন্ধকারের যবনিকা ঠেলিয়া সরল পল্লী-পথে ছুটিতে লাগিল। খানিকদূর আসিয়া পায় একটা গাছের শিকড় বাঁধিয়া সটাপটে ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রাণের ভিতর তখন যে যাতনা হইতেছিল, এ আঘাত তাহার নিকট তুচ্ছ, কিছুই নহে। সরল তখনি উঠিয়া আবার ছুটিতে লাগিল। খানিকটা আসিয়া আবার সে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, পা হইতে একপাটি জুতা স্খলিত হইয়া পড়িল, একখণ্ড ইষ্টক লাগিয়া কপালটা কাটিয়া গেল, সিল্কের পাঞ্জাবী রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সরল আবার উঠিল, আবার ছুটিল, প্রাণটা তখন তাহার দিদির জন্য আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। সে আপনার দিকে চাহিবার অবসর পাইল না। গঙ্গাধরের কুটীরের নিকটে আসিয়া সরল উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি, দিদি!" সে স্বর ঘুমন্ত রজনীকে চকিত করিয়া তুলিল। আম্র-কানন হইতে প্রতিধ্বনি স্বপ্নের ঘোরে সাড়া দিল, "দিদি! দিদি!" পরমুহূর্ত্তে দরজায় ধাক্কা দিয়া সরল আবার ডাকিল, "দিদি! দিদি!" সে স্বর শূন্য কুটীরের কক্ষে কক্ষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিল। সরল আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে দরজার নিকট বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "দিদি, দরজা খোলো, আমি এসেচি।"

সংসারের উপর্য্যুপরি দারুণ কশাঘাতের পর যদি নিদ্রাদেবীর শান্তিময় আহ্বান না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসার মরুভূমি হইত। মানুষ যখন শোকে তাপে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া সংসারময় ছুটিয়া বেড়ায়, যখন তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ থাকে না, তখন কে তাহাকে আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লয়? কাহার মোহনস্পর্শে দু' দণ্ডের জন্যও সমস্ত ভুলিয়া যায়? কে তাহার অঙ্গে অমৃত সিঞ্চন করে? কে সে দেবী? সে নিদ্রা!

সরলের সমস্ত দেহ তখন অলস অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আর উঠিবার শক্তি ছিল না। সে আরো কয়েকবার অস্ফুটস্বরে "দিদি, দিদি" বলিতে বলিতে দরজার উপর ঢুলিয়া পড়িল। তখন নিদ্রাদেবী এই অসহায় বালককে আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইল এবং তাহার মরুতপ্ত হৃদয়-মাঝে শান্তি-সলিল ঢালিয়া দিল। সে নিমিষে সম্মোহিত হইয়া গেল। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

চৌবেড়িয়া

নীল গগনের তলে নীল যমুনার নীর,
দিগ্বলয়ে অম্বুময় বলয় র'য়েছে স্থির ;
নীল সে বলয় কোলে, ধৌত সে সুনীল জলে,
শ্যামল প্রান্তর সুপ্ত শ্যাম শাখিকুল-তলে ;
একদিন সুপ্রভাতে রঞ্জিত পরিখাময়
যমুনা আপনা হ'তে আনন্দ-সঙ্কুল হয় ;



স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর।

আলোক-আনন্দাবেশে প্রান্তর চাহিল সুখে,
রঞ্জিল পত্রিকারাজি বিটপী প্রসন্ন মুখে,
অনন্ত অম্বরময় আনন্দ তরঙ্গ উঠে,
বিহঙ্গ-কণ্ঠের ধ্বনি ধরণী জাগায়ে ছুটে,
প্রভাত-কুসুম কত সৌরভ-গৌরবময়
কানন আমোদ করি' সুখে প্রস্ফুটিত হয় ;
সেইদিন চৌবেড়িয়া † তোমার কানন-মাঝে
ত্রিদিবের গন্ধরাজ * ফুটিল অতুল সাজে ;
তোমার মৃত্তিকা ধন্য দীনবন্ধু পরশনে,
চির-প্রতিভাত তুমি তাঁর "নীল দরপণে"।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

পরলোকগত

ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় উনসত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশে নগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাঁশবেড়িয়া ও নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বদা প্রতিযোগীতা চলিত। ইঁহারা শিক্ষালাভের জন্য কখনো নবদ্বীপে গমন করিতেন না। নগেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরের পাঠ্যাবস্থায় স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উচ্চ বিষয়ের ধারণাশক্তি তাঁহাতে অল্প বয়সেই দৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ায় তাঁহার অভিভাবক একদা রাত্রিকালে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে করিতে

---

† চৌবেড়িয়া দীনবন্ধুর জন্মস্থান। এই গ্রামটি যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ; তাই কবি তাঁহার "সুরধনীকাব্যে" লিখিয়াছেন :—

"পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবেড়িয়া গ্রাম,
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম।"

* দীনবন্ধুর পূর্ব্বনাম গন্ধর্ব্বনারায়ণ ছিল। তাঁহাকে বাল্যকালে সকলে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে তিনি দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া প্রহার পর্য্যন্ত করেন এবং সমস্ত রাত্রি অনাহারে একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখেন। প্রাতঃকালে কোনো প্রকারে তিনি তথা হইতে পলায়ন করেন। যখন অনেক বেলা পর্য্যন্ত তিনি আর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, তখন তাঁহার অভিভাবক অনুসন্ধানে লোক



স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পাঠাইলেন। তিনি খুঁজিতে খুঁজিতে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া দেখেন, নগেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ। প্রাতঃকালে নগেন্দ্রনাথ আর কোথায় যাইবেন? তিনি ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ভগবানের নাম গান করিয়া সেই নির্য্যাতন-ক্লেশ ভুলিয়া গেলেন। এই সময়ে হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উদার ছিল না, এজন্য অনেক স্থলে ব্রাহ্ম-পীড়নের কথা শোনা যাইত।

কিছুদিন পরে নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করেন। সাংসারিক অবস্থার জন্য তিনি কলেজের শিক্ষায় আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই

সময় তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব ক্রমশ প্রবল হইতে থাকে। কিসে দু' পয়সা উপার্জ্জন হয়, কিসে সংসারের সংগতি হয়, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। একদিকে ধর্ম্মসাধন ও প্রচার, তার সঙ্গে চির দারিদ্র্যকে এই সময় হইতে বরণ করিয়া লইলেন।

এই সময়ে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ মহাত্মাগণ "ভারত-সভা" করিয়া বিবিধ জন-হিতকর কার্য্য করিতেছিলেন। নগেন্দ্রবাবু একজন প্রধানরূপে এই সভার ভিতর দিয়া জন-সেবায় প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্মপ্রচার এবং জন-সেবার কাজে তাঁহার এত আনন্দ ও উৎসাহ ছিল যে, কোনো কোনো দিন তিনি অনাহারে কাটাইয়াও তেমন ক্লেশ বোধ করিতেন না এবং একথা অনেক সময় কেহ জানিতেও পারিতেন না। তাঁহার সাংসারিক কষ্টের কথা শুনিয়া স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস সময় সময় তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ধর্ম্মবন্ধুদিগের বিশেষ অনুরোধে তিনি কিছুদিনের জন্য সিটি ইস্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্য তাঁহার অধিক দিন ভালো লাগে নাই। তৎপরে তিনি বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরেই নগেন্দ্রবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলেজের উপাধিলাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অধ্যয়ন দ্বারা এবং পঠিত জ্ঞান, সাধন ভজন দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞানলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ দার্শনিক ছিলেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সুবিখ্যাত দার্শনিকগণের গ্রন্থের অনেক গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া স্বাধীন চিন্তায় তাঁহার মত সকল প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলা ভাষায় কি বক্তৃতা, কি রচনা উভয়ই অতি হৃদয়গ্রাহী। জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি দার্শনিকভাবে এমন সহজে বলিতে বা লিখিতে পারিতেন যে, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইত। তাঁহার প্রথম রচনা— "থিওডোর পার্কারের জীবনী।" তৎপরে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ ;—"রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত।"

এক সময়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে সাকার উপাসনাদির সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। নগেন্দ্রবাবু তাহার প্রতিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা এক একটি করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করেন।

তাহারই ফলস্বরূপ তাঁহার আর এক উৎকৃষ্ট রচনা,—বাংলা ভাষায় ধর্ম্মের দার্শনিক মীমাংসা "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" গ্রন্থ। তাঁহার যুক্তি ও বিচার শক্তি এবং পাণ্ডিত্য তাঁহার বংশের ফলস্বরূপে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

নগেন্দ্রনাথ একদিকে জ্ঞানী, একদিকে কর্ম্মী, আর একদিকে ভক্ত ছিলেন। ভক্তিসাধন সম্বন্ধে তিনি ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল, অথচ গোস্বামী মহাশয়ের সমুদয় মত কিম্বা ভাব তিনি বিচারশূন্যভাবে গ্রহণ করেন নাই। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ তাঁহাতে শেষ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং ভক্তির সমন্বয় তাঁহার জীবনে সুন্দররূপে ফুটিয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী পাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। স্বামীর সেবায়, ধর্ম্মসাধনে ও কার্য্যে সর্ব্বদা অনুরাগিনী ছিলেন। অনাথ আতুরকে আশ্রয় এবং শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দানে তিনি চিরদিন আগ্রহান্বিতা ছিলেন। দারিদ্র্য-ক্লেশ বহন করিতে পতির উপযুক্ত পত্নীই ছিলেন। এমন সহধর্ম্মিণীকে অগ্রে পরলোকে বিদায় দিয়া শেষ জীবনে নগেন্দ্রনাথ যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ বহন করিয়াছিলেন।

সাধক নগেন্দ্রনাথ চিরদিন ধ্যান-প্রিয় ছিলেন। তিনি অনেক সময় সহজেই ধ্যানস্থ হইতে পারিতেন।

কলিকাতার সংকীর্ণ বাসাবাটীর ছাদে বসিয়া যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁহার অঙ্গে নিপতিত হইলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত না।

এক সময় তিনি কয়েকটি ধর্ম্মবন্ধু সমভিব্যাহারে হাজারিবাগ গমন করেন। একদা তথায় এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হন। সঙ্গীবন্ধুগণ ইতস্তত কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। এমন সময়ে 'বাঘ আস্‌চে' বলিয়া জনরব উঠিল। সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রনাথের নিকট দিয়া বাঘ চলিয়া গেল। যিনি বাঘের মধ্যেও ব্রহ্ম-দর্শন করিতে পারেন— এমন শক্তি যাঁর অন্তরে, বাঘ সে শক্তির কাছে নিজ স্বভাব সিদ্ধ পাশব-শক্তি প্রকাশ করিতে ভুলিয়া যায়, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

আজ আমাদের নিকট নগেন্দ্রনাথের দেহ আর নাই। গত ৩১এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি ৮॥০ টার সময় তাঁহার অমর আত্মা, নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলে,

পরদিন প্রাতে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু ও ভক্তগণ মিলিত হইয়া তাঁহার সেই অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত দেহ পুষ্পমাল্যে পরিবেষ্টিত করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গণে আনিয়া প্রাণের বেদনা, সদ্ভাব ও ভগবানের নিকট আপনার কল্যাণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে সে দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিতে হইল; এখন তাহা আবার সেই পঞ্চতন্মাত্রায় মিলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই দিব্য চরিত্র আজ ফুটিয়া উঠিতেছে। যিনি "দেহ মন প্রাণ দিয়ে পদানত ভৃত্য হ'য়ে," ধর্ম্মের জন্য নিরন্ন, বিবস্ত্র হইয়া আজীবন ধর্ম্মেরই সেবা করিলেন, তাঁহার জন্য কি দুঃখ করিতে হইবে? দুঃখ তো তাহাদেরই জন্য যাহারা এ সংসারে কাঁদিতে কাঁদিতে আসে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত্যু-মুখে চলিয়া যায়। ঈশ্বর-মুখীন্ হইয়া যিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হন, তিনি বৃদ্ধই হউন বা বালক কিম্বা যুবক হউন, নর হউন বা নারী হউন তিনিই ধন্য!

দাসের আত্ম-কথা

এই সময় একদিন রাস্তায় প্ল্যাকার্ডে দেখিলাম, ষ্টার থিয়েটারে "বুদ্ধদেব চরিত" অভিনয় হইবে। ষ্টার থিয়েটার তখন বিডন ষ্ট্রীটে ছিল! কিন্তু বারাঙ্গনা সংশৃষ্ট থিয়েটারের প্রতি তখন আমার সহানুভূতি ছিল না। আমাদের দেশমান্য বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় প্রথমে যখন সাপ্তাহিক "কুশদহ" পত্রিকা বাহির করেন—যে "কুশদহ" কিছুদিনের পর "ভেরী ও কুশদহ" নামে প্রকাশ হইতে থাকে তাহাতে আমি বারাঙ্গনা সংশৃষ্ট থিয়েটারের অপকারিতার বিষয় পাঠ করি। তাহা আমার সত্য বলিয়া বোধ হয়। "বুদ্ধদেব চরিত" দেখিতে আমার এত প্রবল ইচ্ছা হইল যে, তাহা সত্ত্বেও আমি দেখিতে গেলাম। এই দিন আমার পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কী দেখিলাম! যখন্ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, জীবের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনকার সেই দৃশ্য এবং তাঁহার সেই ধ্যান নিরত জীবন—সেই গভীর বৈরাগ্য এবং মৈত্রীভাব, তাঁহার গৃহ-ত্যাগ—কঠোর তপস্যার ভাব দেখিয়া প্রায় সমস্তক্ষণই আমার চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এমন দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নাই, এমন সুখ আর কখনো উপভোগ করি নাই; এ যেন

কি এক নেশার মতো আমার হৃদয় মন আচ্ছন্ন করিল। এই ধর্ম্মভাবের নেশায় আর সকল অসার নেশা এমন তুচ্ছ বোধ হয়, তাহা আমি এইমাত্র অনুভব করিলাম। তখন প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে বাণি উঠিতে লাগিল,—এইতো মানুষ, এই তো মানব-রতন! রাজপুত্র আজ জ্ঞান ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্যাগী। আহা! এমন না হইলে কি সেই পরমধন মেলে। এই তো মানব জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়।

সেই দিনের ভাব দিনের ছায়াতলে আর বিলুপ্ত হইল না; সে দৃশ্য যেন থাকিয়া থাকিয়া আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আবার "বুদ্ধদেব চরিত" পুস্তকখানি পড়িলাম। আবার একদিন চুপে চুপে চোরের মতো থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম; কেননা থিয়েটারের প্রতি আমার যে ধারণা তাহা তো এই ঘটনায় পরিবর্ত্তন হয় নাই; আমি দেখিলাম, এই "বুদ্ধদেব চরিত" কত লোকে দেখিতেছে, কিন্তু হায়! তাহারা কোন্ ভাবে দেখিতেছে? তাহারা যাহা দেখিতে আসে, যে আমোদ সম্ভোগ করিতে আসে তাহাই লইয়া যায়! অভিনয় দেখিয়া, সে দিনও আমার মন কত নূতন নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল। ভাবের উদ্‌ঘাতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মন প্রাণ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

এই সময় দোকানের কাজে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িলাম। মন যেন উধাও হইয়া কোথায় গেল! কিছুদিন বাড়িতে আসিয়া রহিলাম। সদর বাড়ির উপর বৈটকখানায় আশ্রয় লইলাম। যখন মনে যে ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল, তখন সেই ভাবে যেন বিভোর হইয়া উঠিতাম। রাত্রে অল্পাহার আরম্ভ করিলাম, তাহাতে নিদ্রার আবিল্ল কম হইত। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর শরীর মন অতি প্রশান্ত বোধ করিতাম। প্রশস্ত বারাণ্ডায় গভীর রাত্রে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা কখনো তাহার বেশি সময় পর্য্যন্ত পাদচারণা করিতাম। প্রাণে কতই ভাবের সঞ্চার হইত; কখনো সতেজভাবে হৃদয় মন উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠিত—সৎসঙ্কল্পে হৃদয় বদ্ধপরিকর হইত, কখনো ভাবে চক্ষে জলধারা বহিত। তখন উপাধানে মস্তক রাখিয়া নিস্তব্ধে পড়িয়া থাকিতাম,—উপাধান আর্দ্র হইয়া যাইত। যত চিন্তা যত ভাব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এইটিই ফুটিয়া উঠিল যে, ধর্ম্মের জন্য শাক্যসিংহের ন্যায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

যখন এই সঙ্কল্প নিশ্চয়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতাম, তখন প্রাণ

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। উৎসাহে শরীর কণ্টকিত হইয়া পড়িল। আবার যখন ভাবিতাম, আমি কি বাতুল হইয়াছি? আমি কে? কোন্ নরকের কীট, আমি এ কী কল্পনা করিতেছি? সংসার আমাকে ছাড়িবে কেন? তখন হতাশ হইয়া পড়িতাম।

কিছুদিন বাদে "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখিলাম। চৈতন্যের গৃহত্যাগ দেখিয়া আবার যেন প্রাণে আর এক তাড়িত-সঞ্চার হইল। তারপর "ঈশাচরিতামৃত" পুস্তকখানি আবার ভালো করিয়া পড়িলাম। ক্রাইষ্টের ক্রুশে হত ছবি দেখিলাম সে কী ভীষণ দৃশ্য। যীশু চরিতের ভাবে—সেই শান্ত মেষ-শিশু, অথচ কপটীদের প্রতি যিনি ধমক দিলেন, "রে সর্পের বংশ অর্থাৎ হে কপট মনুষ্যগণ, তোমরা কিছুতেই ধর্ম্মের পথ অন্বেষণ করিবে না, ইত্যাদি।" খৃষ্টের ভাবে প্রাণ অনুপ্রাণিত হইল। তখন হইতে প্রাণে এই সংকল্প দৃঢ় হইতে লাগিল ধর্ম্মের জন্য আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গত ৩০এ জুন বঙ্গের লাটসভায় অনারেবল্ নসিপুরের মহারাজা বাহাদুর ও অনারেবল্ রাজা হৃষিকেশ লাহা C. I. E. মহোদয় যমুনানদী সংস্কারের কথা তুলিয়া প্রশ্ন করেন যে গভর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ক মেমোরিয়াল পাইয়াছেন কি না এবং তৎসম্বন্ধে কি ব্যবস্থাই বা করিতেছেন। তদুত্তরে পূর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটারী ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, যমুনা নদী সংস্কার সম্বন্ধীয় এক মেমোরিয়াল গভর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উহা প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার্ সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কমিশনার্ বাহাদুরও স্যানীটারি ড্রেনেজ আইনানুসারে এই নদী সংস্কারের যোগ্য কি না তদ্বিষয়ে ২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়া জেলা বোর্ডের অভিমত চাহিয়াছেন। অধুনা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কমিশনার্ সাহেব বাহাদুরের রিপোর্টের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গত মাসের "কুশদহ" গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের উন্নতি কল্পে ব্যয়ের হিসাবে ৩৫৲ টাকা হেড্ মাষ্টার বাবুর নিকট জমা আছে লিখিত হইয়াছে; পরে জানা গেল, ইস্কুলের পূর্ব্বদিকের হল মেরামতে ঐ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

মানব জীবনের সকলই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! শ্বাস প্রশ্বাস এবং দেহ মনের ক্রিয়াদি যাহা সর্ব্বদা চলিয়াছে তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হই না; বোধ হয়, এইজন্য ভগবান্ আমাদিগের মধ্যে সময় সময় অলৌকিক ঘটনা ঘটাইয়া তাঁহার করুণার পরিচয় দেন, কিন্তু তাহাই বা আমরা ধরিতে পারি কৈ? সম্প্রতি একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়া আমরা অবাক হইয়াছি,—

গোবরডাঙ্গার বাবু বিনোদবিহারী কুণ্ডুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ শিবদাস, গত ২৬এ জ্যৈষ্ঠ যোড়াশাঁকোর দোকান হইতে টালীগঞ্জ হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রাম গাড়িতে যাইতে ছিলেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ধর্ম্মতলায় গাড়ি বদলের সময় ট্রামের সংযোগ ইলেকট্রি সক্ লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া যায়। পড়িবার পূর্ব্বেই গাড়িতে এক ইংরাজ প্যাসেঞ্জার শিবদাসকে বাহুবেষ্টনে ধরেন। এবং তদবস্থায় গাড়ি করিয়া তাঁহার পার্কষ্ট্রীটের বাড়িতে আসিয়া অনেক সাহেব ডাক্তার আনয়ন করেন। ডাক্তার আসিয়া শিবদাসের অবস্থা দেখিয়া জীবনে নিরাশা প্রকাশ করেন। অতঃপর আর একজন ইংরাজ ডাক্তার ডাকা হয়। তিনি সমস্তরাত্রি উপস্থিত থাকিয়া চিকিৎসা করেন। সাহেব মেম ও তাঁহার কুমারীকন্তা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রোগীর যে প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনার অতীত; কিন্তু সমস্ত রাত্রের মধ্যে রোগীর কোনোরূপে চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে আরো এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয় এই যে, দ্বিতীয় বড় ডাক্তার আসিয়া যখন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া মেঃ ব্যাথগেটের বাড়ি পাঠাইলেন, তখন রাত্রি ১০টা; তাঁহারা বলেন যে, এ ঔষধ কলিকাতায় সর্ব্বদা আসে না। উপস্থিত এখানে নাই। ইহার পর ডাক্তার সাহেব জেনারেল্ হাঁসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া কেবল একমাত্রা ঐ ঔষধ প্রাপ্ত হন। তাহাই রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত দাঁতের ফাঁক দিয়া পিচকারী দ্বারা খাওয়ানো হয়। পরে আরো একটা ঔষধ আনিয়া তাহাও ঐরূপে খাওয়ানো হয়। তাহাতেও চৈতন্য হইল না দেখিয়া প্রাতে ৭টার সময় ডাক্তার সাহেব চলিয়া যান। তখন সাহেব পাঁচশত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, আর কত টাকা ভিজিট তাঁহার পাওনা হইবে? ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলেন, "এগারো ঘণ্টায় এগারো শত টাকা ভিজিট হইতে পারে, কিন্তু তুমি একটি বাঙালী ছেলের জন্য এত করিতেছ আমি আর ভিজিট কি লইব।"

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে বেলা ৮—১৬ মিনিটের সময় শিবদাসের চৈতন্য হয়। ইহাতে সকলের কিরূপ আনন্দ হইল, তাহা বলা বাহুল্য। তারপর ডাক্তার সাহেব আসিয়া আবার বেলা ১২টা পর্য্যন্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি করেন। ৩টার সময় রোগী অনেক সুস্থ হইয়া বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। শিবদাসের পকেট বই দেখিয়া সাহেব গোবরডাঙ্গায় এক টেলিগ্রাম করেন। তাহা পাইয়া হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এদিকে স্থির রহিয়াছে, সেইদিন রাত্রে সাহেব সপরিবারে বিলাত যাত্রা করিবেন; কিন্তু সাহেব শিবদাসকে বলেন যে, তুমি আরো ২।৩ দিন এখানে থাকিয়া সুস্থ হও। তারপর আমি তোমাকে গোবরডাঙ্গায় রাখিয়া আসিব আমাদের বিলাত যাত্রা টেলিগ্রাম্ করিয়া বন্ধ রাখিতেছি। তাহাতে শিবদাস অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে অগত্যা সেই দিনই বেলা ৩টার পর বাড়ি পাঠাইয়া দেন। দুঃখের বিষয়, শিবদাস এমন দেব-প্রকৃতি সাহেবের সম্পূর্ণ পরিচয় লইতে পারে নাই, কেবলমাত্র নামটি লইয়াছিল, মিঃ সি, এস, ইয়ং।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা

১২৫ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা,

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Reg. No. C 494.

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

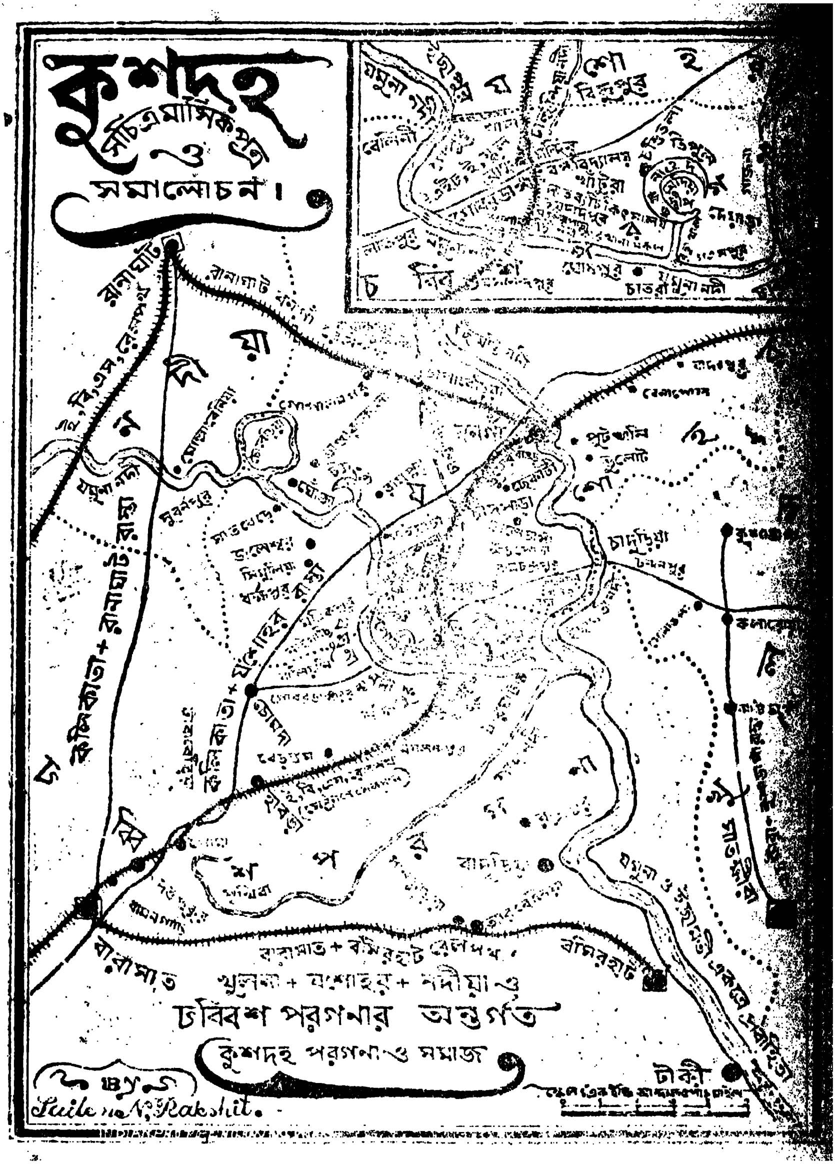
কার্য্যালয় :—

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা



অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা। এই সংখ্যার মূল্য /১০ দেড় আনা।

কুশদহ-মানচিত্র



কুশদহ
সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।
রাণাঘাট
যমুনা নদী
চাঁদুড়িয়া
বারাসাত
বসিরহাট
খুলনা + যশোহর + নদীয়া ও
চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত
কুশদহ পরগনা ও সমাজ
টাকী
Sailen N. Rakshit.

নিয়মাবলী

১। ১৩২০ সালের "কুশদহ" সচিত্র মাসিক পত্র আকারে ডিমাই আট পেজী ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা কিন্তু অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা মায় ডাকমাশুল ১৲ এক টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ নমুনার জন্য ৶০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। কেবল পোষ্টকার্ড লিখিলে বা আধ আনার টিকিট পাঠাইলে কোনোরূপ নমুনা পাঠানো যায় না।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ ২রা ৩রা নাগাদ কাগজ না পাইলে পোষ্ট আপিষে খোঁজ লইবেন। ১০ই পর্য্যন্ত কাগজ না পৌছিলে আমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ই এর পর আমরা দায়ী হইতে পারিব না, অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য ৶০ মূল্য লাগিবে। যথাসময়ে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দেওয়ায় কাগজ খোয়া গেলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধের কারণ দেখানো অথবা ফেরত দেওয়া কিম্বা অধিক দিন কাপী রাখা হয় না। ফেরত পাইতে হইলে ৵১০ টিকিট পাঠাইতে হয়। মনোনীত প্রবন্ধ কোন মাসে বাহির হইবে, তাহা অগ্রে বলা যায় না।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনো পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৫। কুপনে পরিষ্কাররূপে পুরা নাম ও ঠিকানা না দিলে হিসাবে গোল হইবে, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন।

৬। বৈশাখ হইতে চৈত্র, পূর্ণ বৎসরের গ্রাহক হইতে হয়।

৭। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্রিকাদি, সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে, মনিঅর্ডার ও অন্যান্য বিষয়ের পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কুশদহে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম—দীর্ঘ সময়ের জন্য,—কভারের ১ম পেজ ৬৲, ৪র্থ পেজ ৫৲, ২য় পেজ ৪৲, ৩য় পেজ ৩৲, রিডিং শেষ পেজ ৪৲, ফর্ম্মার ১ পেজ ৩॥০ টাকা, আধপেজ ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বন্দোবস্ত আমাদের এজেণ্ট, ক্যালকাটা এডভার্টাইজিং এজেন্সী, ১১ নং ক্লাইভ রো, এবং কুশদহ-কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত স্থির করিতে হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা হয়।

"কুশদহ" এক্ষণে ১০০০ এক হাজার ছাপা হয়।

কুশদহ-কার্য্যালয়,
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীসরলকুমার কুণ্ডু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কোনো অনিবার্য্য কারণে ভাদ্রের "কুশদহ" বাহির হইতে বিলম্ব হইল।

পঞ্চম বর্ষ ভাদ্র, ১৩২০ পঞ্চম সংখ্যা

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন)



গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ	ভাদ্র, ১৩২০	পঞ্চম সংখ্যা

সঙ্গীত

—০—

(সুরট মল্লার—একতালা)

তবু ঘুম ভাঙে কই !

(তুমি) এত যে ডাকিছ, এত জাগাইছ, (আমি) শুনেও বধির হই।
(তুমি) প্রতি পরীক্ষায় প্রতি ঘটনায়, কত না ডাকিছ জাগাতে আমায় ;
আমি দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না, জাগিয়া ঘুমায়ে রই।
এত যে দেখালে কালের ইঙ্গিত, এত যে শুনালে সুযোগ-সঙ্গীত,
আমার মনে হয়, আমার তরে নয়, মন,—সাধে আমি ঘুমায়ে লই।
কি সম্বল ল'য়ে এই ভবে এসে, মোহ-নিদ্রা-বশে কি হ'লাম শেষে,
যা ছিল সম্বল হারালাম সকল, (যেন) সে আমি এ আমি নই।
কাছে যারা ছিল তারা তো জাগিল, নিজ নিজ কাজে সবাই ছুটিল,
আমি চেয়ে একবার, দেখি চারি ধার, তখনি আবার পাশ ফিরে শুই।
এমন ক'রে ঘুম ভাঙিবে কি আর, জাগাইবে যদি মারো বার বার,
(যেন) মার খেতে খেতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, তোমারি আদেশ শিরে বই।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

প্রসঙ্গ

মুক্তি—চক্ষু কর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয় সকল রূপরসশব্দাদি আপন আপন বিষয়েই আসক্ত। যতদিন শারীরিক বিষয়ে মন আসক্ত, তত দিন ইন্দ্রিয় সকলও মনের সঙ্গে এক যোগে আবদ্ধ; কিন্তু সেই মন যখন ভগবানের ভাবে ভাবুক হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকলও সেই ভাবেই কার্য্য করে। এক সময় যে ইন্দ্রিয়সকল সংকীর্ণ বিষয়ে আসক্ত থাকে, আবার সেই ইন্দ্রিয়সকলই ভগবানের প্রেমে আসক্ত হইলে জীবন-মুক্তি লাভ হয়। এক সময় যাহা বন্ধনের কারণ, অন্য সময় তাহাই মুক্তির সহায় হয়।

সৌভাগ্য—ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করাই মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের বিষয়। ধার্ম্মিক পিতা মাতার সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করা, ধার্ম্মিক সহোদর কিম্বা সহোদরা পাওয়া, ধর্ম্মশীলা পত্নী, অথবা ধার্ম্মিক পতি প্রাপ্ত হওয়া, জীবনের প্রথম যাত্রায় ধর্ম্ম-বন্ধু-সঙ্গ লাভ করা, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয়।

অ-শোক—জ্ঞানী ভিন্ন কেহই শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞানে যাঁহার আমিত্ব দূর হইয়াছে; স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলই ঈশ্বরের আমার কেহ নয়, আমিও সেই ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারো নহি, এই জ্ঞান যাঁহার নিশ্চয় হইয়াছে, তিনিই শোক জয় করিতে পারিয়াছেন।

একদা কোনো জ্ঞানী পুরুষের উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগ হয়। পরদিন তিনি কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া নিয়মিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন, একবারও তাঁহার মুখে কেহ শোকের সংবাদ শুনিতে পাইল না। অবশেষে তাঁহার নিম্নতম কর্ম্মচারী একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে আজ স্থিরভাবে কাজ করিতেছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।" তাহাতে তিনি বলেন, "ভাখো পরমেশ্বর আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহা মেয়াদ করিয়া দেন নাই; তাঁহার যখনি ইচ্ছা তখনি লইবেন।"

আর এক সময় এক জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র মারা গিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, সমস্ত রাত্রির পর দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর চক্ষে এক ফোঁটাও জল

নাই, তখন তিনি স্বামীকে বলিলেন, "পুত্র গ্যাল সে এক দুঃখ, ততোধিক দুঃখ যে তোমার চক্ষে একটু জল নাই।" তাহাতে জ্ঞানী পুরুষ বলিলেন, "ভাখো আমি এক সমস্যায় পড়িয়াছি, তাই শোক প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি রাজা ছিলাম, আমার সাত পুত্র ছিল, কিন্তু একে একে সকল পুত্রেরই মৃত্যু হইল, তারপর ঘুম ভাঙিয়া দেখি এই একপুত্র মারা গিয়াছে, তাই ভাবিতেছি—সেই সাত পুত্রের জন্য কাঁদিব, কি এই পুত্রের জন্য কাঁদিব ?"

শোক—শোক! তুমি কোথায় নাই! রাজার প্রাসাদ হইতে দীন দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তোমার অধিকার। তোমার আক্রমণে ক্রন্দনের রোল সর্ব্বত্র ধ্বনিত। যেখানে মায়া-মোহ, সেখানেই তোমার রাজ্য; কিন্তু যেখানে ভক্তি সেখানে তোমার প্রভাব নাই। ভক্তই কেবল তোমার মোহ-জাল ছিন্ন করিতে সক্ষম। ভক্ত যে, স্ত্রী পুত্র পরিজন কাহাকেও আমার বলিয়া জ্ঞান করেন না। তিনি জানিয়াছেন, সকলই তাঁহার ইষ্টদেবের। ভক্ত নিজেও নিজের নহেন, তিনি প্রভুর দাস মাত্র। সংসারে তো তাঁহার আসক্তি নাই; ভক্ত কেবল ভগবানকেই চান। তাঁহাকে লাভের উপায়-স্বরূপে তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে যে তিনি সংসার করেন সেও তাঁহার কর্ম্মযোগের একটি অঙ্গমাত্র। "আমার সংসার" বলিয়া তাহাতে আসক্ত হইবার তাঁহার কোনো অধিকারই নাই। এইরূপ অবস্থায় যিনি ভক্ত, তিনিই জ্ঞানী; যিনি জ্ঞানী, তিনিই যোগী। যোগীর সাধন-কুটীরে, জ্ঞানীর জ্ঞান-মন্দিরে, ভক্তের গৃহে শোক, তোমার কোনো অধিকার নাই।

অন্ধকার সাধন—সম্প্রদায়-ভেদে সাধনের প্রণালী ভিন্ন আছে। যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর-দর্শন-প্রার্থী সাধক, তাঁহাদিগকে একটি বিষয় সাধন করিতেই হয়। সে বিষয়টি অন্ধকারের সাধন; সাধকের চক্ষে যতক্ষণ জগৎ সংসারের এতটুকু আলোকও দৃষ্ট হইবে, ততক্ষণ যোগের ভূমি প্রস্তুত হইবে না। সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইলে,—সংসারের সকল আকর্ষণ তুচ্ছ হইলে তবে সেই ধ্রুব জ্যোতির প্রকাশ অনুভূত হয়। ছবি আঁকিতে হইলে প্রথমে কালো জমি করিতে হয়, তাহার উপর সকল রকম রং ফলানো চলে। যোগ সাধনের প্রথমাবস্থায় অন্ধকার সাধন করিতে হয়। বহুকষ্টে এ সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে

পারা যায়। অন্ধকার ভেদ করিয়া যখন সেই নিত্য সত্য জ্যোতিঃ স্বরূপ, সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখন আবার তাঁহার মধ্যেই এই জগত সংসার দেখা যায়। তখন সংসার আর সাধকের পক্ষে বিঘ্ন বা ত্যজ্য হয় না, তখন ভক্তি সাধন আরম্ভ হয়। দাস হইয়া সকলের সেবা করাই তখন সাধকের কার্য্য হয়।

বিশ্বেশ্বরাষ্টকম্

ভুবনং মুহ্যতে যেন, স হি ভুবনমোহনঃ।
গুণৈশ্বর্য্যৈ স্বমেকোঽসি, প্রভো! ভুবনমোহনঃ॥ ১॥

প্রকৃতি-প্রত্যয়—অর্থ করিলে গ্রহণ,
একমাত্র তুমি প্রভো ভুবনমোহন;
তবৈশ্বর্য্য গুণে পূর্ণ সমস্ত ভুবন,
দেখিয়া মোহিত সব জগতের জন॥ ১॥

অধোক্ষজোঽক্ষজশ্চৈব, নির্গুণঃ সগুণোঽসি চ।
নিরাকারোঽপি সাকারো, বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তুতে॥ ২॥

নিরাকার গুণাতীত তুমি বিশ্বেশ্বর,
তুমিই সাকার সর্ব্বগুণের আকর;
অতীন্দ্রিয় পুনঃ তুমি গোচর সবার,
তব পদে ভক্তিভাবে করি নমস্কার॥ ২॥

অরূপোঽপি সরূপোঽসি, যস্তে হ্যষ্টৌ মূর্ত্তয়ঃ প্রভো!
অস্মাভিরপি তদ্ দৃশ্য, স্বমত্র চর্ম্মচক্ষুষা॥ ৩॥

অরূপ হ'য়েও তুমি সদা রূপবান্,
কেননা তোমারি অষ্ট মূর্ত্তি বিদ্যমান;
আমাদের চর্ম্ম চক্ষে দিতে দরশন,
দয়া করি প্রভু, রূপ করেছ ধারণ॥ ৩॥

ক্ষিত্যপ্ তেজোমরুদ্ব্যোম, দিবাকর নিশাকরৈ।
রূপৈরেতে বৈভোত্বংহি, সদা দৃশ্যো বুধাবুধিঃ ॥ ৪ ॥

ক্ষিতি জল তেজ বায়ু শশী দিবাকর,
আকাশ তোমারি রূপ চক্ষুর গোচর ;
চর্ম্ম চক্ষু মোরা, জ্ঞান চক্ষু বুধগণ,
সবাকারি অধিকার ওরূপ দর্শন ॥ ৪ ॥

সচ্চিদানন্দরূপেন, ভাসিত্বং সর্ব্বতোবিভো !
জ্ঞানিনো জ্ঞাননেত্রেন, পশ্যস্তিত্বাং সদা হৃদি ॥ ৫ ॥

হে বিভো সচ্চিদানন্দ-রূপেতে সদাই,
সমভাবে বিভাসিত আছ সব ঠাঁই ;
জ্ঞানিগণ জ্ঞান-নেত্র করি উন্মীলন,
তোমারে হৃদয়ে নিত্য করে দরশন ॥ ৫ ॥

শরদি বিমলাকাশে, চন্দ্র নক্ষত্র ভূষণৈঃ।
ত্বমেব ভূষিতো ভাসি, বিশ্বেশ্বর নমোস্তুতে ॥ ৬ ॥

শরদের সুনির্ম্মল সুনীল আকাশে
শশী-তারা হীরকের পরি অলঙ্কার,
তুমিই প্রকাশ পাও সবার সকাশে
বিশ্বেশ্বর তব পদে করি নমস্কার ॥ ৬ ॥

জিঘ্রায় তরুগুল্মানাং, যন্মধ্যে পুষ্প সৌরভম্।
তত্তে গাত্র সমুদ্ভূতং, বিশ্বেশ্বর নমোস্তুতে ॥ ৭ ॥

বসন্তে কুসুম গন্ধ করিয়া আঘ্রাণ,
তোমারি সে গাত্র গন্ধ পেয়েছি সন্ধান ;
স্মরি পুষ্পে তব দয়া পুলক অপার,
বিশ্বেশ তোমার পদে করি নমস্কার ॥ ৭ ॥

ত্বমেকো যুগপদ্ভাসি, সর্ব্বত্র জলধৌ দিবি।
বারাণস্যাঞ্চ কৈলাসে, বিশ্বেশ্বর নমোস্তুতে ॥ ৮ ॥

সমকালে বারাণসী কৈলাসশেখর,
বারিধি আকাশে তুমি আছ নিরন্তর ;

অনন্ত বিভূতি তব মহিমা অপার,
বিশ্বেশ্বর তব পদে করি নমস্কার ॥ ৮ ॥

দ্বিজ তারাপ্রসন্নস্থ, কাশীস্থ ভবনে দ্বিজঃ।
চিত্বাষ্ঠা বর্কপুষ্পাণি, বিশ্বেশ্বর-পদেঽদদৎ ॥

শ্রীতারাপ্রসন্ন দ্বিজ ভবনে থাকিয়া,
কাশীবাসী দ্বিজ নাম ভুবনমোহন,
আটটি আকন্দ পুষ্প করিয়া চয়ন,
বিশ্বেশ্বর-পাদপদ্মে অর্পিল গাঁথিয়া।

শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানীর

প্রথমোদ্বোধন দিবস

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কলিকাতাবাসী বোধ হয় তেমন ভাবে আর কোনো দিন মাতে নাই, অথবা তেমন দৃশ্য আর কোনো দিন চোখে দেখে নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে যখন হাওড়া হইতে প্রথম আরোহীপূর্ণ বাষ্পীয় শকট ধীরে ধীরে বাষ্প উদ্গীরণ করিয়া পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করিল, চারিপার্শ্বের লোক তখন বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিল। হাওড়া সেদিন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

হাওড়ায় তখন এখনকার ন্যায় অম্বর-চুম্বি কলকারখানার চিম্‌নী অথবা ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট ও ফ্যান-সমন্বিত বিস্তীর্ণ বিশাল প্রাসাদ ছিল না। তৃণ পত্রাচ্ছাদিত একখানি কুটীর অস্থায়ীভাবে ষ্টেশনের কার্য্যালয়রূপে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। শত শত লোক সেদিন নৌকাযোগে খরস্রোতা জাহ্নবী পার হইয়া কর্দ্দমযুক্ত তীরভূমি অতিক্রম করত ষ্টেশনের অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিল, কারণ তখনো গঙ্গাবক্ষোপরি ভাসমান সেতুর নির্ম্মাণ কল্পনা কাহারো মস্তিষ্কে অঙ্কুরিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাওড়ায় তখন এখনকার ন্যায় গাড়ি, ঘোড়া, প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতির প্রচলন হয় নাই। হাওড়া তখন ঠিক্ একখানি গণ্ডগ্রামের ন্যায়। সেদিন শতশত লোককে

দ্রুতগতি ষ্টেশনের নাতুচ্চ কুটীর-প্রাঙ্গণে আতপতাপ-দগ্ধ-শিরে টিকিটের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল; কারণ টিকিট-প্রদাতা "বাবুগণ" তখন সবেমাত্র কাজে বাহাল হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষিপ্রহস্তে টিকিট দিবার ক্ষমতা তখনো পরিপক্কতা লাভ করে নাই। সেদিন তিন সহস্র লোক বাষ্পীয় শকটের আরোহী হইবার অভিলাষে টিকিটপ্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করেন; কিন্তু তাহার দশমাংশ লোকও টিকিট প্রাপ্ত হন নাই। কাজেই তাঁহাদিগকে সেদিন ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। হাওড়ায় আনন্দ-দিনকর অকস্মাৎ নিরানন্দ ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হইল।

এজন্য যে রেলকোম্পানী দোষী তাহা নহে; কারণ সেদিন মাত্র আটখানা গাড়ি পাণ্ডুয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। তন্মধ্যে দুইখানা প্রথম, দুইখানা দ্বিতীয় ও তিনখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি। এই কয়েকখানা মাত্র গাড়িতে কিরূপে তিন সহস্র লোকের স্থান সঙ্কুলান হইবে?

রেলওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট বা বড় কর্ত্তা মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ষ্টিফেন্‌সন অবশ্য বিলাত হইতে গাড়ি আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে গুড্‌উইল্ জাহাজ গাড়ি সমেত অর্ণব-সমাধি লাভ করায় তিনি তাড়াতাড়ি হগ্‌সনের (Hogson) দ্বারা আটখানি গাড়ি তৈয়ার করান। সুতরাং গাড়িগুলি যে, আদর্শভাবে মনের মতো হইবে না ও সংখ্যায় অল্প হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তখন রেলপথ এমন সুন্দর ছিল না। দুইধার হইতে মাটি কাটিয়া রেলের পথ তৈরী হইয়াছিল। দুই পাশের এই খনিত খাদে, জল পচিয়া একটি ভয়ানক দুর্গন্ধ হইত।

তখন রবিবারে গাড়ি চলিত না। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা সেদিন পূর্ণ অবকাশ-সুখভোগ করিত; কিন্তু ইহাতে সপ্তাহব্যাপী যাহারা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাদের বাষ্পীয় শকটারোহণ সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হইত। সেইজন্য "Printers Devil" শীর্ষক একখানি বেনামী পত্র তদানীন্তন হরকরা পত্রে প্রকাশিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেই পত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় ষ্টিফেন্‌সন্ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম তারিখে ঘোষণা করিলেন যে, প্রতিদিন আপ্ ও ডাউন নামে দুইখানি ট্রেণ হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া যাওয়া আসা করিবে।

তখন ট্রেণের পাণ্ডুয়া পৌঁছিবার কোনো নির্দ্ধারিত সময় ছিল না। মাত্র

আটখানা গাড়ি আপ্ ও ডাউন ট্রেণে যাতায়াত করিত। রাত্রে ট্রেণ চলা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

তখন আর্ম্মাণী ঘাটে রেল কোম্পানীর একটি টিকেট বিক্রয়ের স্থান ছিল। অনেকে আর্ম্মাণী ঘাট হইতে টিকিট কিনিয়া, গঙ্গা পার হইয়া হাওড়ায় যাইত।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার বর্দ্ধমানে কর্ম্মচারী-নিয়োগোৎসব সম্পাদিত হয়। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ, লর্ড ডালহৌসীকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে আপনার অক্ষমতা জানাইয়া মিঃ ষ্টিফেনসন্‌কে লেখেন, "I shall be present at Howrah, but I am concious that I am wholly unfit for the performance of the remainder of the task, which would involve a Railway Journey of 150 miles, a midday banquet and the addressing of 400 people under a Bengal sun."

সেদিন রাত্রি ৪টা হইতে বর্দ্ধমান যাত্রাভিলাষী যাত্রিগণ দলে দলে আসিয়া হাওড়ায় সম্মিলিত হইলেন। লর্ড ডালহৌসী ৯-৩০ মিনিটের সময় সদলবলে হাওড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ উৎসবের উদ্বোধন কার্য্য সমাপনান্তে কোম্পানীর কল্যাণ কামনা করিয়া যীশু খৃষ্টের উপাসনা করিলেন।

বর্দ্ধমান যাত্রীদিগকে লইয়া দুইখানি ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল। ট্রেণ বর্দ্ধমান উপস্থিত হইলে আগত অতিথিবর্গকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক পত্র-পুষ্প সুশোভিত মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইল। রেলওয়ের এজেণ্ট ষ্টিফেন্‌সন্ সভাপতির পদ গ্রহণ করত ভারতের সর্ব্বত্র রেলওয়ে বিস্তারের অনেক আশার ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। সে সভায় দেশীয় বিদেশীয় অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁহারাও সভাপতির সুরে সুর মিলাইয়া ভারতব্যাপী ঊর্ণনাভের ন্যায় রেলপথ বিস্তারের আশ্বাস দিলেন।

কী আশ্চর্য্য! কে জানিত, একদিন যে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানী সামান্য একখানি তৃণ-কুটীরে ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করিয়া সামান্য আটখানি মাত্র গাড়ি লইয়া ভারতে ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করেন, আজ তাহাদের সেই স্বল্প উদ্যম-জাত ক্ষুদ্র বীজ এত বড় বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবে?

জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন্ বিলাতে প্রথম বাষ্পীয় শকট আবিষ্কার করেন, ম্যাক্‌ডোনাল্ড

ষ্টিফেন্‌সন্ সেই বাষ্পীয় শকট চালনা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করেন। উভয়েই আমাদের বিশেষ হিতৈষী। আজ তাঁহাদেরই উদ্যমের ফলে বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী—ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়াছে। রেলপথ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে।*

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সার্থক

(গল্প)

অবন্তিপুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। কয়েকখানি সুন্দর উদ্যান-শোভিত অট্টালিকা ও বাঁধানো পুষ্করিণীতে গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে! গ্রামের যুবকেরা চাঁদা তুলিয়া একটি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এখানে গ্রামের সকলে মিলিয়া নানা রকম সদালোচনায় সময় অতিবাহিত করেন; কিন্তু গ্রামের প্রান্তে ঐ যে একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখা যায়, উহার অধিবাসীটিকে কখনো এই পাঠাগারে দেখা যায় না। গ্রামের কারো সহিত তাঁহার আলাপ নাই, নিঃসঙ্গী অবস্থায় ইনি এই জীর্ণ গৃহে বাস করেন। আজ এক বৎসর ইনি এই গ্রামে আসিয়াছেন। গ্রামবাসীরা শুনিয়াছে যে, ইহার নাম ডাক্তার রামকুমার সেন; কিন্তু ইহার সহিত তাদের পরিচয় এই পর্য্যন্ত। এক বৎসরের মধ্যে তিনি এক দিনও গ্রামের কারো বাড়ি যান নাই, কারো সহিত পরিচয়ের চেষ্টা অবধি করেন নাই। গ্রামে দু' তিন জন বড় ডাক্তার থাকাতে এই নবাগত, অপরিচিত ডাক্তারকে ডাকিবারও কখনো দরকার হয় নাই। আর আসলে ডাক্তার কি না, তাই বা কে জানে, হয় তো লোকটা হাতুড়ে। সুতরাং গ্রামবাসীরাও তাঁর সহিত আলাপ করিতে উৎসুক হয় নাই। তারা কেবল ভাবিত, লোকটি মাঠের মধ্যে একলা থাকে কি করিয়া? তিনি কি করেন, কে তাঁর যত্ন নেয়, কে আহারের তত্ত্বাবধান করে, কিছুরই খোঁজ তারা রাখে না। তাদের প্রয়োজনই বা কি! কেবল গ্রামের বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে কয়েক জন দুঃখ করিয়া বলেন, আহা, এই বয়সে কোথায় পুত্র, কন্যার যত্নে থাকিয়া, নাতি নাত্‌নী লইয়া সুখে

* এই প্রবন্ধটি "Bengal past and present" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত "The opening day of the East Indian Railway Company" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। (লেখক)

সংসারে বাস করিবে, না একলা শূন্য ঘরে পড়িয়া আছে। কেউ দেখিবার নাই, বাড়িতে তত্ত্ব আসিলে কিম্বা নূতন ফল মূল পাইলে, করুণাময়ীরা চাকরের হস্তে দিয়া কিছু এই নিঃসঙ্গ মানুষটির জন্য পাঠাইতেন; কিন্তু চাকর ফিরিয়া আসিয়া বলিত, ঘরের দরজা বন্ধ, ডাকিলেও কেহ সাড়া দেয় না। অগত্যা তাঁরা বাধ্য হইয়া এই অপরিচিতের খোঁজ লইতে বিরত হইলেন। শুধু তাঁহার প্রতি একটা সুনিবিড় বেদনা-ভার অন্তরে রহিল। জগতে যে অসহায়, যে পরিত্যক্ত, যে হেয়, নারীর হৃদয়ের অপার্থিব স্নেহ তার দিকেই ধাবিত হয়। নারী জাতির প্রাণে বিধাতা এমন কোমলতা, এমন করুণার উৎস রাখিয়াছেন বলিয়াই তো এই দুঃখপূর্ণ সংসার-মরুতে মানুষ টিকিয়া আছে।

ডাক্তার রামকুমারের বয়স পঞ্চাশ হইয়াছে; কিন্তু দেখিলে মনে হয় বয়স চল্লিশ। কী সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, কর্ম্মঠ বাহু যুগল। বিশাল চোখ দুটি করুণায় ভরা, তাতে এমন একটি বিষাদের ভাব মেশানো আছে যে, কাহারো দিকে চাহিলে মনে হয়, যেন কোনো দেব-দূত মর্ত্ত্যের ধূলি-মলিন মানবের দিকে করুণাভরে চাহিয়া আছেন। সে দৃষ্টি কী সুন্দর, কী প্রশান্ত! তাহা যেন বলিয়া দেয়—মানব, আর কতদিন সংসারের মোহে ডুবিয়া থাকিবে, উঠ, তাঁর কাজে লাগিয়া যাও!

প্রত্যহ ভোরের বেলা, সূর্য্য না উঠিতেই ডাক্তার রামকুমার খালি পায়ে, গ্রামের আশে পাশে যে সব গরীবের জীর্ণ কুটীর আছে, সেইখানে যান। এই সব কুটীরে গ্রামের চাষা, ধোপা, নাপিত, জেলে প্রভৃতি দরিদ্র জাতির বাস। এই সময়ে পথে হঠাৎ গ্রামের কোনো লোকের সহিত তাঁর দেখা হইলে, তিনি কোনো কথা বলিতেন না, শুধু তার দিকে একটু চাহিতেন। যার সহিত দেখা হইত, সেও কেমন একটা বিস্ময় ও ভয়ের সহিত তাঁর দিকে চাহিয়া থাকিত। আর তিনি চলিয়া গেলে পাড়ার লোকের কাছে তাঁর কথা লইয়া যত সব আজগুবি গল্প করিত। ডাক্তার রামকুমার গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়া যাতায়াত করেন না, মেঠো রাস্তা দিয়া, ক্ষেতের ভিতর দিয়া তিনি এই সব গরীবের কুটীরে যান। গ্রামের মধ্যে কেহ কেহ তাঁকে এই দিকে যাইতে দেখে; কিন্তু তিনি যে কখন ঘরে ফেরেন, তাহা কেহ দেখে না, কেহ জানে না।

এমনি করিয়া দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন গ্রামের প্রধান উকিল বাবুর পুরাতন চাকর হরি কাজে আসিল না। সেদিন বাড়িতে

কাজের একটু অসুবিধা হইল ; কিন্তু আরো তো কত চাকর, কোনো কাজই পড়িয়া রহিল না। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে হরির বাড়ি। কে আর অত দূরে তার খোঁজ করিতে যায়, বিশেষ যখন কোনো দরকার নাই।

চারিদিন পরে হরি আসিল। বাবু তো রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি রে হরে, আজকাল এত কামাই করিস্ কেন? তোর কি হ'য়েছিল?" ছল্ ছল্ নেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া হরি বলিল, "বাবু, আমার ছেলেটির বড় অসুখ, এই চার দিন যে কি ভাবে গিয়েছে, তা আর কি বোল্‌বো। বাছা যে আর চোখ মেলে চাইবে তা ভাবি নি, চার বছরের অতটুকু ছেলে, তার এত জ্বর কি সে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে, এই ভেবেই আমরা সারা হ'য়েছিলুম ; কিন্তু ডাক্তার বাবুর দয়ায়, ভগবানের আশীর্ব্বাদে বিপদটা কেটে গেছে। এখন বোধ হয় সে সেরে উঠ্‌বে।"

বাবু শুনিয়া বলিলেন, "কি রে কোন্ ডাক্তার? গোবিন্দ বাবু?"

হরি বলিল, "না বাবু, টাকা দিয়ে এত বড় ডাক্তার কে নেবে! আমাদের সে সাধ্য নাই, ভাগ্যিস্ ডাক্তার রামকুমার বাবু আছেন, তিনিই তো দয়া ক'রে আমার বাড়িতে গিয়ে এই চারদিন রাত জেগে ওষুধ দিয়ে ছেলেটিকে বাঁচিয়েচেন। আর সে যে কী সেবা তা বল্‌বার নয় ; অথচ একটি পয়সা নেন নি। নিজের ঘর থেকে পথ্য তৈরি ক'রে এনে বাছাকে খাইয়েচেন। উনি তো আমাদের মা বাপ। উনি আছেন ব'লেই তো আমরা দুঃখীরা বেঁচে আছি, উনি তো মানুষ ন'ন, দেবতা!" এই বলিয়া হরি আপন কাজে চলিয়া গেল। উকিল বাবু বসিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাই তো এ লোকটার আবার এত গুণ! একলা ঐ ভাঙা ঘরে গ্রামের শেষে পড়িয়া আছে ; আমরা যার একটু খোঁজ লইতেও সঙ্কুচিত হই, তার হৃদয়টা এত বড়! এমন মহৎ! আর ভাবিবার সময় হইল না, উকিল মানুষ, কত কাজ!

ক্রমে গ্রামের চাষা, ধোপা, মুটে, মজুর সকলেরই মুখে ডাক্তার রামকুমারের নাম শোনা যাইতে লাগিল। সকলেই বাবুদের বাড়ি আসিয়া বলে, "উনি মানুষ ন'ন, দেবতা। উনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, জীবনদাতা। এই যে এবার এমন অকাল পড়েচে, আমরা উঁহারি দয়ায় বেঁচে আছি।" গ্রামবাসীরা শুনিয়া অবাক্! লোকে তো সচরাচর ধনীর সহিতই আলাপ করিতে উৎসুক, বিদ্বানের বন্ধু বলিয়া গৌরব করিতে চায় ; কিন্তু এমন সব মূর্খ, দরিদ্রের বন্ধু কে হয়? এমন অদ্ভুত লোক তো কখনো কেহ দেখে

নাই। কেমন করিয়া কোন্ সাধনা বলে এই অল্পদিনের মধ্যে লোকটি আর্ত্তের বন্ধু, দরিদ্রের সহায়, নিপীড়িতের আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল, তাহা তারা ভাবিয়া পাইল না। এই তো সেদিন সে আসিয়া ঐ ভাঙা ঘরে বাসা লইল, এরি মধ্যে কেমন করিয়া সে গরীবের হৃদয়ে রাজা হইয়া গেল! গ্রামবাসীরা যাকে মূর্খ, গরীব, একটা হাতুড়ে ডাক্তার ভাবিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছিল, তারি নাম কি না এখন সকলের মুখে! এ কী অদ্ভুত ব্যাপার; কেমন করিয়া এমন বিপ্লব হইয়া গেল!

গ্রামের শিক্ষিত যুবকেরা আশে পাশের জঙ্গলে শিকার করিতে যাইত। একদিন কোনো শিকার না মেলাতে সকলে দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে একজন, গাছের উপরে একটি সুন্দর পাখী দেখিয়া গুলি করিল। যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পাখীটি মাটিতে পড়িয়া গেল। যুবকদল উল্লাসে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিল। উকিল বাবুর পুত্র যোগজীবন প্রেসিডেন্সীতে এম্-এ, পড়ে। সে-ই পাখীটি আহত করিয়াছে বলিয়া সকলে তার হাতে পাখীটি তুলিয়া দিল! যোগজীবন পাখীটি হাতে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে কে যেন তার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কে এই দীর্ঘকায় মহাপুরুষ! যোগজীবন স্তম্ভিত হইয়া তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিয়া চিনিল, এ সেই ধনীর অপরিচিত, দরিদ্রের বন্ধু ডাক্তার রামকুমার। কী বেদনা ভরা করুণার সহিত তিনি ঐ পাখীকে দেখিতেছেন! যেন তাঁর দৃষ্টিই পাখীটির সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দিবে! তিনি শুধু বলিলেন, "আহা, নিরীহ নির্দ্দোষ প্রাণী।" সে কথায় কী কোমল ভৎ'সনা, কী বেদনা! যোগজীবনের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি পাখীটি তাঁর হাতে দিয়া বলিল, "আর এমন নিষ্ঠুরতা কোর্‌বো না। পাখীটি আপনি নিন্, দেখুন বাঁচাতে পারেন কি না!"

ডাক্তার রামকুমার পাখীটি হাতে লইয়া গৃহে আসিলেন। পাখীটিকে রাখিয়া কত যত্নের সহিত তার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর পশ্চাতে যোগজীবনও যে কখন আসিয়াছে, তাহা তিনি একটুও বুঝিতে পারেন নাই। সামান্য একটা পাখীর প্রতি তাঁর এই যত্ন, তাকে বাঁচাবার এত চেষ্টা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল! সে ভাবিল, মানুষের উপর ইঁহার দয়ার কথা তো শুনিয়া আসিতেছি, আবার সামান্য একটা প্রাণীর জন্য এত করুণা! এই মানুষকে আমরা এতদিন দয়ামায়া শূন্য একটা অপদার্থ বলিয়া দূরে ফেলিয়া

রাখিয়াছিলাম! ক্রমে পাখীকে দেখিতে আসিয়া যোগজীবনের সহিত ডাক্তার রামকুমারের পরিচয় ঘনিষ্ট হইল।

তাঁর নিপুণ হস্তের সেবায় পাখীটি বাঁচিয়া গেল। যোগজীবন দেখিল, ডাক্তারের ক্ষুদ্র গৃহখানি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সম্মুখে একটি ছোট ফুলের বাগান। রোজ সকালে রোগী দেখিবার সময় এই বাগান হইতে ফুল তুলিয়া ডাক্তার তাদের জন্য লইয়া যান। বসিবার ঘরখানি একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেখানে যে কত বই তার ঠিক নাই। তার পাশের ঘরখানি ডাক্তারি বই, ঔষধ ইত্যাদিতে পূর্ণ। যোগজীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে প্রত্যহ আসিয়া তাঁর কাজের সাহায্য করিতে লাগিল। এমনি করিয়া অন্তরের মিলন যখন গাঢ় হইয়া উঠিল, তখন সে তাঁর জীবনের ইতিহাস জানিতে ব্যাকুল হইল। এমন মহান্, এমন বিদ্বান্, এমন ধর্ম্মপ্রাণ লোক কেন এ রকম নিঃসঙ্গ-জীবন যাপন করিতেছেন, তাহা জানিতে সে উৎসুক হইল। সে বুঝিয়াছিল, ডাক্তার তাকে স্নেহ করেন, সেই সাহসে সে একদিন সন্ধ্যাকালে ইহার কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল। কথাটা শুনিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, প্রশান্ত মুখে একটা অব্যক্ত বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বৎস, তোমার নিকট আমার কিছুই লুক্কায়িত নাই। আজ পূর্ব্ব জীবনের কথা তোমাকে বলিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব।" এই বলিয়া তিনি একটু থামিলেন, অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা; কিন্তু আমার মনে হয় যেন সে দিনকার ঘটনা। তার স্মৃতি তেমনি নবীন, তেমনি তীব্র রহিয়াছে। আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি, আর জীবনকুমার তোমারই মতো প্রেসিডেন্সিতে এম্-এ পড়ে। একদিন সন্ধ্যাকালে কলেজ হইতে বাড়ি আসিতেছি, বড় রাস্তার চৌমাথায় ভয়ানক ভিড়। দেখি এক সৌম্যমূর্ত্তি যুবক এক বৃদ্ধা অন্ধের হাত ধরিয়া রাস্তা পার করিয়া দিতেছে। রাস্তার অপর পারে গিয়া বৃদ্ধা তাকে কত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "বাছা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, যে দয়া আজ করলে,—"জীবনকুমার বলিল, "না, না আমি তো কিছুই করি নাই মা, শুধু একটু কর্ত্তব্য করিয়াছি," এই বলিয়া সে অন্য দিকে চলিয়া গেল। এই স্বার্থপূর্ণ, প্রলোভনময় সহরে এমন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভাই, ধন্য তুমি, আমাকে কি তোমার জীবন পথের সঙ্গী করিয়া এমনি মহৎ করিয়া নিবে?"

সেই হইতে যে পরিচয়ের সূত্রপাত তাহা শেষ পর্য্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। সেই যে আত্মায় আত্মায় মিলন হইয়া গেল, তাহা অনন্ত কালের জন্য অটুট হইয়া রহিল। দু'জনে দু'জনকে যে কি ভালোবাসিয়া ফেলিলাম তাহা বলিবার নয়। সে প্রেম কেবল অনুভব করা যায় মাত্র, কথনো প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। জীবনকুমার রোজ সন্ধ্যাকালে আমাদের বাড়িতে আসিত এবং এক ঘণ্টা থাকিয়া চলিয়া যাইত। আমার পড়িবার ঘরে জীবনের সেই ঘণ্টাগুলি কি সুখেই যে কাটিয়া যাইত কি বলিব। মানুষের জীবনে যে এত সুখ আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমরা সেই পাঠগৃহে বসিয়া দু'জনে কত কাব্য, সাহিত্য, কত রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির আলোচনায় সুখের সন্ধ্যাগুলি কাটাইয়া দিতাম। কোনো দিন সে কোনো বই হইতে পড়িত, আমি শুনিতাম। কোনো দিন বা আমি তাকে শুনাইতাম। কোনো দিন সে বাজাইত, আমি গাইতাম, আবার কোনো দিন শুধু নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া সময় কাটাইয়া দিতাম। সে প্রায় বলিত, দ্যাখো তুমি ডাক্তার হইলে আর আমি এম্-এ পাশ করিলে, দু'জনে মিলিয়া কোনো গ্রামে গিয়া থাকিব, তুমি গ্রামের সব গরীবদের চিকিৎসা করিবে, শারীরিক উন্নতির ভার লইবে, আর আমি ইস্কুল করিয়া তাদের মানসিক উন্নতির ভার লইব। এইরূপে যদি আমরা জীবন কাটাইতে পারি, তা হ'লে বেশ হয় না? আমি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিতাম, তা হ'লে তো জীবনকে ধন্য মনে কোর্‌বো।

আমার বন্ধু বলিয়া আমার মা জীবনকুমারকে স্নেহ করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন তার জন্য আমার পাঠগৃহে পাঠাইয়া দিতেন। আমার জন্য খাবার থাকিলেও আমি সেদিন আর তাহা খাইতাম না, তারই খাবার দুজনে ভাগ করিয়া খাইতাম, তা'তেই ক্ষুধা দূর হইত, আর খাইতে ইচ্ছা হইত না। এইরূপে দিন যায়, ক্রমে আমার পরীক্ষা নিকটে আসিল, বুঝিতে পারিলাম, জীবনকুমার প্রত্যহ আসে বলিয়া আমার পিতা তার উপর বিরক্ত। তিনি মনে করিতেন, পরীক্ষার সময় রোজ একঘণ্টা গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিতেছি। জীবনকুমারের উপর তাঁর বিরক্তির ভাব দেখিয়া তাকে তাহা জানাইব ভাবিলাম; কিন্তু সে যে অভিমানী, একথা শুনিয়া যদি আর না আসে। তাই কি করিয়া একথা তাকে জানাইব ভাবিতাম। সে সরল, নির্ম্মল, নিঃসংশয়-চিত্ত ছিল। সে ভাবিত আমাদের বাড়ির সকলেই তাকে ভালোবাসে, তাই সে কোনো দ্বিধা না করিয়া আমাদের

বাড়িতে আসিত। সে যে এখন রোজ আসে তাহা পিতা যে ইচ্ছা করেন না, একথা আমি কেমন করিয়া তাকে বলিব, এই ভাবিয়া এক একদিন অস্থির হইয়া উঠিতাম। কোনো দিন সে আমার মুখে এই ভাবনা দেখিয়া বিষন্নভাবে বলিত, "ভাই, তোমার আজ কি হ'য়েচে আমাকে বলো, শরীর ভালো আছে তো ?" আমি খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিতাম, কি আবার হবে, এমন সুস্থ শরীরে কি কিছু হয় ?" তখন সেও হাসিত। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতাম, আমার অন্তরের ক্ষুদ্র ভাবটুকুও বন্ধুর অজানিত থাকে না ! এমনি প্রেম বটে !

তারপরে একদিন আমরা পাঠগৃহে বসিয়া আছি, সে Shellyর skylark পড়িতেছে, আর আমি মুগ্ধচিত্তে শুনিতেছি,—সে এমন সুন্দর করিয়া কবিতা পড়িতে পারিত—এমন সময় আমার পিতা সেই ঘরে আসিয়া বলিলেন, "রাম-কুমার, তোমার কি এখনো পড়বার সময় হয় নি ?—কেবল-ই গল্প ?" এই বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, কী যে বেদনা পাইলাম, তাহা বলিতে পারি না। জীবনকুমারের দিকে চাহিয়া দেখি তার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখ ছল্ ছল্ করিতেছে। আমি নিকটে গিয়া তার হাত ধরিয়া বলিলাম, "ভাই কিছু মনে কোরো না। বাবা তোমাকে—" জীবনকুমার বাধা দিয়া বলিল, "বুঝেচি, আর বল্‌তে হবে না, এখন আমি আসি" আমি তাহাকে সদর রাস্তা অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায়ের সময় বলিলাম, "কাল এসো কিন্তু," সে মাথা নাড়িল।

গৃহে আসিয়া কেবলি তার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সে কাল আবার আসিবে তো ? পিতা তাকে কেন এমন কষ্ট দিলেন ?		*		*		*

সেদিন আর পড়া হইল না। পরদিন সন্ধ্যাকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে আসিল। সেদিন মা তাহার জন্য খাবার পাঠাইয়া দিলেন। আমি যখন খাবারের থালা তার সম্মুখে রাখিলাম, সে আমার দিকে চাহিয়া শুধু একটু ম্লান হাসি হাসিল। তার মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, কি যে ঘোর বিষাদ, নিরাশা মাখানো তাহা কি বলিব ! আমার বুকটা অজানিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। খাবার খাইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "আজ যাই একটা কাজ আছে।" কত রাত তার সেই বিষাদমাখা মুখখানি স্বপ্নে দেখিয়াছি ! পরদিন ডাকে একখানা চিঠি পাইলাম, জীবনকুমারের লেখা, সে লিখিয়াছে,—

"ভাই চলিলাম, আর তোমার উন্নতির পথে বাধা হইয়া থাকিব না।"

এই দু'দিন হইতে যাহা আশঙ্কা করিতে ছিলাম, তাই হইল। এই চিঠি

পাইবার পর তিন চার দিন পর্য্যন্ত আমি একেবারে জড় পিণ্ডবৎ পড়িয়াছিলাম। জননীর অতুলনীয় সেবায় জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, স্থির করিলাম, এরূপভাবে জীবন নষ্ট করিব না। ডাক্তারি পাশ করিয়া তারি প্রদর্শিতপথে জীবনকে চালিত করিব। বিধাতার দেওয়া বেদনার দান নত মস্তকে গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যকে তুলিয়া লইলাম।

তারপর দিনরাত পরিশ্রম করিয়া ডাক্তারি পাশ করিবার পর কয়েক বৎসর সহরেই প্র্যাক্‌টিস্ করিলাম। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি পাইয়া গ্রামে গ্রামে বাস করিয়া দরিদ্রের সেবা করিতে এতদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। সহরে থাকিতেও গরীবের নিকট হইতে কখনো এক পয়সাও লই নাই। এখন আমার অর্থের অভাব নাই। সুতরাং আমার প্রিয়তম যে ভাবে জীবন কাটাইতে বলিত, সেরূপে জীবন কাটাইবার কোনো বাধা নাই। একমাত্র দুঃখ সে এখন আমার সঙ্গে নাই। তবে আশা আছে, এইরূপে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে যাইতে কোনো দিন তার দেখা পাইব। ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া, এই আশাতেই জীবন-পথে স্থির হইয়া চলিয়াছি। এখানে যদি তার সঙ্গে আর দেখা না হয়, তবে ভরসা আছে বিধাতা আমার এই সব ক্ষুদ্র কার্য্যের ভিতর দিয়া জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়া তাঁরই চরণমূলে উপনীত করিবেন। সেখানে আবার দু'জনে মিলিব।"

কথা শুনিতে শুনিতে কখন যে সূর্য্য অস্তে গেল,—চাঁদ উঠিয়া আবার পশ্চিমে ডুবিয়া গেল, তাহা যোগজীবন বুঝিতেও পারে নাই। সে শুধু ব্যাকুল নয়নে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শ্রী—

কুশদহের ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ সমতটের সিংহাসনে স্বাধীন রাজগণকে বিরাজ করিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত স্বাধীন ভূপতিগণের কোনো বিবরণ সংগ্রহ করার উপায় নাই। সম্ভবত আইন আকবরীতে যে সকল রাজগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সমতটের রাজগণের হইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চীনদেশীয় জনৈক পরিব্রাজক জলপথে সমতটে আগমন

করিয়াছিলেন এবং একজন বৌদ্ধ নৃপতিকে সমতটের সিংহাসনে বিরাজ করিতে দেখিয়াছিলেন। যখন মহাত্মা হুয়েন্থসাং সমতটে আগমন করেন তখনো অতি প্রাচীন রাজবংশকে সমতটের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের সময় হইতে যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, সম্ভবত সেই বংশীয় নৃপতিগণ সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধকালেও সমতটের রাজাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীগণের নিকট তাঁহারা কিছুকালের জন্য " বৈতসী বৃত্তি" অর্থাৎ অধীনতা স্বীকার করিতেন মাত্র—স্থানচ্যুত হইতেন না, কিন্তু আবুল ফজেলের সময় যে সকল পুরাতন সংবাদ সংগ্রহ করা সুসাধ্য ছিল, বর্ত্তমানে তাহাও লুপ্ত হইয়াছে। কাজেই আইন-আকবরী-প্রণেতার ন্যায় শুষ্ক বংশতালিকা প্রদানের আমাদের আবশ্যকতা নাই; তাহাতে লাভও নাই। তবে একটি কথা বলা আবশ্যক। হয় তো তাহা শুনিলে পুরাবিদ্‌গণের নিকট আমি উপহাসাস্পদ হইব। হয় তো কেহ আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বাতুলালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু কথাটি এত গুরুতর যে উপহাসিত হওয়া নিশ্চিত জানিয়াও তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিশ্বাস অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাঢ়ে বঙ্গে যখন অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এই সমতট বঙ্গের অধিবাসীগণই তাঁহাদের রাজা গোপালকে গৌড়মণ্ডলের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক গোপাল প্রথমে বঙ্গের রাজাসনে আসীন হইয়াছিলেন। পরে গৌড় ও মগধ জয় করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, পালবংশের আদি পুরুষ এই গোপাল বঙ্গের অর্থাৎ কুশদহের অধিবাসী ছিলেন। বাস্তবিক প্রবাদও এই অনুমানের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশে ঠাকুরমার গল্পে এখনো শুনিতে পাওয়া যায়, প্রত্যহ এক রাজধানীতে শ্বেতহস্তী দ্বারা রাজা নির্ব্বাচিত হইত; কিন্তু রাত্রি না পোহাইতে সে রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। অবশেষে কোনো সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি বহুবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। এ গল্প যে কেবল শ্বেত হস্তী সম্বন্ধে প্রচলিত আছে তাহা নহে, নানা স্থানে নানা আকারে এই গল্প প্রচলিত দেখা যায়।

ব্যপটতনয় গোপালও এইরূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোপাল যে প্রথমে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তারানাথের লেখায় তাহার উল্লেখ আছে। কোনো প্রতিহিংসা-পরায়ণা রাজ্ঞীর চক্রান্তে পড়িয়া গোপালের পূর্ব্বনির্ব্বাচিত রাজগণ নিহত হইতেন। অশেষবিধ কৌশলে

গোপাল সে বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবসর ক্রমে সেই রাজ্ঞীকে তাঁহার কুকার্য্যের যথোচিত শাস্তি দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার যশ-সৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। লোকে সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। শেষে বাঙালীর বুদ্ধিকৌশলে, বাঙালীর বাহুবলে, বাঙালীর সহায়তায় তিনি গৌড়মণ্ডল একছত্র করিতে সমর্থ হইলেন। তদনন্তর মগধ বিজিত হইল। এই সময় হইতে বাঙালীর গৌরব চরম সীমায় উঠিয়াছিল। বাঙালীর বাহুবলে মগধ, কাশী, কলিঙ্গ বিজিত হইল; কিন্তু এই সময় হইতে বঙ্গ নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইল। সাম্রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্থাপনে আগ্রহশীল বাঙালীর নৌযুদ্ধ পটুতায় দৃষ্টি রহিল না; সমুদ্র-পথে বিচরণ বিষয়ে ঔদাসীন্য হইল। বাঙালীর বিলাসিতা আসিল।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তুলসী

"ইন্দ্রাদ্যৈঃ সকলৈর্দ্দেবৈরর্চ্চিতাং সুরসুন্দরীম্।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্॥"

তুলসী লেবিয়েটী জাতীয় ওসাইমাম্ স্যাঙ্কটেটাম্ (Ocymum Sanctatum) নামক বৃক্ষ। বৈদ্য-শাস্ত্রে ইহা সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী গৌরী, শূলঘ্নী ও দেবদুন্দুভি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ণ-ভেদে ইহা দুই প্রকার—কৃষ্ণ ও শ্বেত। হিন্দুর নিকট এই বৃক্ষ পরম পবিত্র। বোধ হয়, পুরাকালে পূত-আত্মা হিন্দুগণ ইহার গুণাবলী স্মরণ করিয়াই ইহাকে এত পূজা করিতেন। তখন ঘরে ঘরে তুলসী বৃক্ষ রোপিত হইত। বৈশাখের নিদাঘ-তাপে এই বৃক্ষ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে হিন্দু নরনারীগণ ভক্তি-প্লুত-মনে বারি-ধারা দিয়া ইহার জীবন রক্ষা করিতেন। অধুনা আমরা সুসভ্য ও শিক্ষিতাভিমানী হইয়া এই পরম পবিত্র বৃক্ষের মাহাত্ম্য স্মরণ করি না। এখন প্রত্যেক গৃহের কথা দূরে থাকুক, আমাদের সমস্ত পল্লী অনুসন্ধান করিলেও একটি তুলসী বৃক্ষ মিলে কি না সন্দেহ। যে বৃক্ষের গুণ বর্ণনাতীত, সেই বৃক্ষের এত অনাদর! আমরা কেমন বুদ্ধিমান!

আয়ুর্ব্বেদ বলেন,

"তুলসী কটুকাতিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠ কৃচ্ছ্রাস্র পার্শ্বরুককফবাতজিৎ ॥"

তুলসী কটু তিক্ত রস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য দাহজনক, পিত্তকারক এবং আগ্নেয়। ইহা কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্ববেদনা, কফ ও বায়ু নাশ করিয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয়েরা বহুবিধ ঔষধের অনুপান রূপে তুলসী পত্রের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। শিশু ও বালকদিগের সর্দ্দি কাশিতে ইহা "ইপিকাক্" অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই রস সিকি তোলা অল্প মধুর সহিত সেবন করাইলে শীঘ্রই রোগোপশম হইয়া থাকে। আমাদের দেশের বিলাতী ঔষধ-প্রিয় বাবুরা শিশুর একটু সর্দ্দি জ্বর হইলেই তাড়াতাড়ি শিশি হস্তে করিয়া ডাক্তারখানায় আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংস্কার যে, দুই চারি আনা মূল্য দিয়া ডাক্তারখানা হইতে লেপ-পত্রসংযুক্ত এক শিশি রক্তবর্ণের আরক ক্রয় করিলেই শিশু সদ্যঃ নিরাময় হইবে। ঘরে এমন অনায়াস-লব্ধ ভেষজ থাকিতে কেন যে তাঁহারা পরোপাসনা করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এমত ক্ষেত্রে সকলকেই আমি এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। পিতামহীর যুগে বাকস-তুলসী-বিল্ব-সেফালিকা দ্বারা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইত। আজ দেশের আর সেদিন নাই। যুগধর্ম্মে আমরা শ্রম-বিমুখ হইয়াছি। বর্ত্তমান কালে বন্য গুল্মপত্রাদি সংগ্রহ করিতে আমরা ক্লেশ অনুভব করি। এখন রোগীর নিকটে তুলসী-বিল্ব-পত্ররস পানের কথা বলিলে তিনি অমনি অধরে ঔদাস্য-ব্যঞ্জক হাস্য-রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিয়া থাকেন, "মহাশয়! উহা ঘটিয়া উঠিবে না, আপনি এক শিশি ঔষধ দিন্"।

তুলসী পত্রের রস মৃদুবিরেচক। সম্ভবত যকৃতের পিত্ত-নিঃসরণ বৃদ্ধি করিয়া ইহা বিরেচন ক্রিয়া প্রকাশ করে। শিশুদিগের সর্দ্দি জ্বরসহ প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, এমত ক্ষেত্রে তুলসী পত্রের রস সর্দ্দি পরিপাকের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রশুদ্ধি করিয়া শীঘ্রই শিশুকে নিরাময় করে। যে সকল শিশু মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া অন্য আহারের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, তাহাদের কখনো কখনো এক প্রকার দুর্দ্দম কোষ্ঠবদ্ধ রোগ জন্মিয়া থাকে। প্রতিবার মলত্যাগ কালে শিশু যন্ত্রণায় অস্থির হয়। শিশুর মল কঠিন, শ্বেতবর্ণ এবং উহাতে পিত্তের অভাব দেখা যায়, এই সকল স্থলে তুলসী পত্রের রস বিশেষ উপযোগী। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া এক সপ্তাহ কাল এই ঔষধ সেবন করাইলে মলের

কাঠিন্য ও বর্ণ-বিকার দূর হয়। ইহার তীব্র আস্বাদ নিবারণ করিবার জন্য অল্প পরিমাণে মধু সহ প্রযোজ্য। বিবিধ পিত্ত সংক্রান্ত রোগেও ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে, তবে শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ ও পৈত্তিক পীড়ায় ইহা যেরূপ সুফল প্রদান করে, প্রাপ্ত-বয়স্কদিগের পক্ষে সেরূপ ফলপ্রদ নহে।

এই পত্রের রস আগ্নেয়। ইহা সেবন করিলে পাকস্থলীর রক্তাবেগ বৃদ্ধি পায় ও অধিক পরিমাণে পাচক-রস নিঃসরণ হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহা এবম্বিধ ক্রিয়া প্রকাশ করে। সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বরে পত্রের রস বিশেষ উপকারক। "ভাবপ্রকাশ" বলেন, মরিচ-চূর্ণসহ এই পত্রের রস সেবন করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। পার্শ্ববেদনা সংযুক্ত কাশ রোগে তুলসী পত্রের রস উপযোগীতার সহিত ব্যবহৃত হয়। রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে সিকি তোলা হইতে এক তোলা রস মধুসহ দৈনিক দুই তিন বার সেবন করাইলে শীঘ্রই রোগোপশম হইতে দেখা যায়।

ইহা কফ নিঃসারক, দুই চারি দিন ব্যবহার করিলেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা তরলীভূত হইয়া উঠিয়া যায়। কর্ণশূল রোগে যখন রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন কর্ণবিবরে এই পত্রের রস প্রয়োগ করিলে আশু বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। গলগণ্ড অথবা উপদংশ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নাসাভ্যন্তরে একপ্রকার ক্ষত হয়। এই রোগে নাসিকা-গহ্বর হইতে সর্ব্বদাই পুতিগন্ধময় পঁজ নিঃসৃত হয়। অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ইহাকে "ওজিনা" রোগ বলিয়া থাকেন। এই ওজিনা রোগে তুলসী বৃক্ষের শুষ্ক পত্র সুচূর্ণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে শীঘ্রই ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠে। মহাব্যাধি কুষ্ঠরোগে লেবুর রসের সহিত তুলসী-পত্র বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়।

তুলসী-বীজ মূত্রকারক প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস হইলে অথবা মূত্রকৃচ্ছ হইলে এই বীজ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। স্বপ্নদোষ রোগে কৃষ্ণতুলসীর মঞ্জরী মহৌষধ। গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত কবিরাজ মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ভিষগাচার্য্য এই ঔষধের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যহ নিদ্রার প্রাক্কালে অঙ্গুলি পরিমাণ দুইটি মঞ্জরী পানের সহিত চর্ব্বণ করিয়া খাইলে সপ্তাহ মধ্যে এই অসাধ্য ব্যাধি সহজেই অন্তর্হিত হয়। যে সকল রোগী এই কদর্য্য রোগ ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই এই বনজাত অমূল্য ভেষজটি পরীক্ষা করিবেন। তুলসী বৃক্ষে এক প্রকার কীট জন্মে। এতদ্দেশে একটি প্রবাদ আছে যে, ঐ কীট মাহুলীর মধ্যে পুরিয়া গল-

দেশে ধারণ করিলে শ্বাসকাশ রোগ নষ্ট হয়। বিষ-বৈদ্যের মুখে শুনিয়াছি, তুলসীমূল আশীবিষের অন্যতম ঔষধ। তাহারা বলে, এই মূল গৃহে রাখিলে সর্প-ভয় থাকে না। ইহার তীব্র গন্ধে সর্প দূরে পলায়ন করে।

তুলসী ম্যালেরিয়া নাশক। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্রদেশে বিলাতী ইয়ুকেলিপ্টাস্ বৃক্ষ রোপিত হইলে যেরূপ ম্যালেরিয়া নাশ করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ এই তুলসী বৃক্ষ গৃহ-প্রাঙ্গণের চতুস্পার্শ্বে রোপিত হইলে তৎস্থানের ম্যালেরিয়া-বিষ দূর হয় বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন। আশা করি, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গ-পল্লীবাসিগণ তুলসীর অসামান্য গুণ স্মরণ করিয়া আবার গৃহে গৃহে এই পবিত্র বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভগবৎ-প্রেম

খুঁজেছি তোমারে দেব চাঁদের কিরণে,
হাসিয়াছি কত হাসি তারকার সনে,
কুঞ্জে যবে পিকগণ করয়ে কূজন,
প্রকৃতির প্রেমে মরি! হ'য়েছে মগন।
যোগী-জন-প্রিয় ঐ দৃপ্ত হিমাচলে,
ঝরঝর-মুখরিত নির্ঝরিণী-তলে,
বরষার ঝঞ্জাবাতে মেঘ গরজনে,
উদ্ভাসিতা প্রেমে তব তটিনীর সনে;
করিয়াছি কত প্রেম কতই সাধনা
না পাইনু প্রেম তব কঠোর যাতনা,
বীণার ঝঙ্কার সম কহিলেন প্রভু—
"ওরে বৎস বাহ্য প্রেম প্রেম নহে কভু।
প্রেম করো বিশ্ব-নরে গৃহে যেয়ে ফিরে,
বিশ্বপ্রেমে মোর প্রেম মিলিবে অচিরে।"

শ্রীনীরোদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

ত্যাগ-সমস্যা

এই সকল ঘটনা ঘটিল ১২৯২ সালের মধ্যে। ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে রামকৃষ্ণ রক্ষিত কোম্পানির চিনির আড়তে অংশীদাররূপে কার্য্যারম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসর অক্ষুণ্ণভাবেই কার্য্য চলে। তারপর আমার মনের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন দোকানের কাজে দিন দিন আমার অমনোযোগ ঘটিতে লাগিল, তখন রামকৃষ্ণ বাবু কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, যদি আমি কার্য্য ত্যাগ করি তবে অংশীদারদিগের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া হয় তো তাহাতে ফারমের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামকৃষ্ণ বাবু পাঁচজনকে লইয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে ভালো বাসিতেন। তিনি সহসা কাহাকেও ছাড়িতে চাহিতেন না, এ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল। আমি যাহাতে পুনরায় কাজে মনোযোগী হই, তিনি এরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই আমার মনে এই সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল—দোকান ছাড়িব কি না? কার্য্যত দোকানে আর মন নাই, দোকান ছাড়িয়া বাহিরে বাহিরে থাকিতে পারিলেই স্বচ্ছন্দে থাকি; যেখানে ধর্ম্ম-বন্ধু-সঙ্গ, ভগবৎ প্রেমের মিলন, সেখানেই যাইতে ভালো লাগে।

যখন মনের এইরূপ অবস্থা,—ভিতর হইতে বুঝিতেছি, বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। কাজ কর্ম্ম আদৌ ভালো লাগে না, সেদিকে একটুও মন নাই; অথচ এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ আছি, ছাড়িব বলিলেও ছাড়াইতে পারিতেছি না। রামকৃষ্ণ বাবু যখন ধীরে ধীরে টানিতে থাকেন, তখন দশদিন এড়াইয়া দু' পাঁচ দিনও আবার কাজে আসিতে বাধ্য হই। সে কয়দিন যে কি অশান্তিতে কাটাইতে হইত, কতবার বিরক্ত হইতাম, কতবার কাজ ছাড়িয়া উপরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্য হই।

কিন্তু এই সময় দু' একবার মনের অবস্থা এমনো হইয়াছিল "দূর হোক্ আর পারি না, ও সকল চিন্তা ছাড়িয়া দি, যেমন কাজ কর্ম্ম করিতেছিলাম;

তেমনি করি, আর গণ্ডগোলে কাজ নাই," এই সঙ্কল্প করিয়া কিছুমাত্র কাজে মনোযোগ দিতে পারিতাম না। শীরঃপীড়া উপস্থিত হইত—শরীর কেমন করিত—আমি যেন আর নিজে নিজের বশে থাকিতাম না ; তারপর যেই ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িতাম, কোন প্রিয়জনের নিকট গিয়া বসিতাম, প্রাণে যে ভাব চলিতেছে, তাহা প্রচার করিতাম, তখনই আবার প্রাণে শান্তি ও বল পাইতাম।

এইরূপ ত্যাগ-সমস্যার অবস্থায় কোনো একদিনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া যাইতে ছিলাম। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে আসিয়াছি, তখন লোক-সমাগম দেখিয়া মনে হইল, আজ রবিবার এখন সমাজে উপাসনার সময় হইয়াছে। আমি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহার পূর্ব্বে আর কোনো দিন এখানে আসিয়াছিলাম কি না তাহা আমার ঠিক স্মরণ হয় না ; কিন্তু এই দিনটি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে সঙ্গীত হইতেছিল, তার মধ্যে আমার প্রাণে প্রবেশ করিল,

"যদি এ ভবে পার হবে, ছাড়ো বিষয় কামনা,
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন করো তাঁর সাধনা।"

আহা! একি শুনিলাম, এই তো ঠিক কথা! আজ কি আমারি জন্য এই আয়োজন! এই তো বিধাতার ইঙ্গীত।

এই ঘটনায় ঠিক হইয়া গেল, বিষয়-সংশ্রব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতেই হইবে! গোপনে দোকানের খাতায় হিসাব দেখিয়া বুঝিলাম, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত খরচ বাদে আমার অংশে ছয় সাত হাজার টাকা পাওনা হইবে। ইতিপূর্ব্বে দণ্ডীদাদা গোবরডাঙ্গায় যে চিনির কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে এই সমস্ত টাকা দিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ চালাইলে, লভ্যাংশ দাদার বলিয়া রাখিয়াও কেবল সুদের টাকায় সংসার চলিবে, তা ছাড়া ছোট দু' ভাই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভগবান এই তো আমাকে তাঁহার পথে যাইবার উপায় করিয়াই রাখিয়াছেন, তবে আর সংসারের জন্য আমার ভাবনা কেন? সংসার কতই চায়, তাহা ভাবিতে গেলে কেহ ভগবানের পথে যাইতে পারে না।

যখন এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইলাম। মুক্তভাবের একটা স্বাদ যেন এই দিন অনুভব করিলাম। এ প্রলোভন আর ছাড়া যায় না, যেমন করিয়াই হোক্—যত শীঘ্র সম্ভব বিষয় ত্যাগ করিয়া

তাঁহার পথে—তাঁহার প্রেম-সমুদ্রে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এ জিনিষ কুলে বসিয়া একটু একটু আস্বাদ করিবার জন্য নয়। একেবারে প্রাণ ভরিয়া পান করিতে হইবে।

ত্যাগের শক্তি সঞ্চার

এই চিন্তা যখন অনেকটা প্রশমিত হইল, তার সঙ্গে সঙ্গে আর এক চিন্তা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আমার সাধন-পথ কি? বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ভাবে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইঁহাদিগকে লইয়া, এক একটি সম্প্রদায় গঠন হইয়াছে, তাহার কোনোটি তো আমার জন্য বুঝিতেছি না। আমার প্রাণে যে একেশ্বরবাদের ভাবই জাগিতেছে; কিন্তু কেবল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং জ্ঞানে বা মতে তো ধর্ম্মভাব স্থায়ী হইবে না, সাধন চাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঐ দিন গান শোনার পর প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঐ সমাজে যাইতে লাগিলাম, গানগুলি খুবই ভালো লাগিত। গান শুনিয়া প্রাণে ভাব হইত, কেমন একটা বলও পাইতে লাগিলাম। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশও খুব ভালো লাগিত। সম্ভবত সাধনের আবশ্যকতা এই সময় মনে জাগিয়াছিল।

মনের অবস্থা যখন এতদূর অগ্রসর হইল, বিষয় ত্যাগ স্থির হইয়া গেল, তথনো কিন্তু রামকৃষ্ণ বাবুকে নিজমুখে কাজ ত্যাগের কোনো কথা আমি বলিতে পারিতেছি না, তিনিও আমার ভাবগতি বুঝিয়াও তবু যেন একেবারে আমার আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় আর এক ঘটনা হইল।

বাল্যবন্ধু হরিবিহারী সেন তখন "সেন ফ্রেণ্ডস" নামে এক টেলার সপ খুলিয়া কার্য্য করিতেছিল। আমার মনের পরিবর্ত্তনের ভাব দেখিয়া হরিবিহারী খুব সহানুভূতি করিয়াছিল, বিশেষত তার সঙ্গে বড়ই প্রাণের ভালোবাসা ছিল। এই সময় প্রায় প্রত্যহ হরিবিহারীর দোকানে গিয়া বসিতাম। ক্রমে হরিবিহারীর মনের ভাব অনেকটা ভালো দিকে আসিতে লাগিল। এই সময় হরিবিহারী বলে "ভাই এক বেরুয়া (তার ভাবার্থ উদাসীন) আসিয়াছিল, আমরা তো তাঁর ভাব তেমন কিছু বুঝিতে পারি না, তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা করাইয়া দিব। আর এই দেখো তিনি কি কাগজ না বই রাখিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া হরিবিহারী তিন ফর্ম্মা কাগজ আমাকে দিল। আমি দেখিলাম তাহার প্রথম পরিচ্ছদের হেডিং "প্রথম স্বপ্ন-নির্ব্বেদ," প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী

নামক ব্যক্তি "জীবন পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়" নামে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যে টুকু পড়িলাম, তখন যেন এই টুকুই আমার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রথম স্বপ্ন, নির্ব্বেদ, যার প্রাণে বাস্তবিক নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রাণের ছবিরূপে এই লেখা বাহির হইয়াছে, কে সে ব্যক্তি!



স্বর্গীয় প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী

সেদিন চলিয়া গেলাম। পরদিন বেলা ২টা কি ৩টার সময় প্রিয়নাথ আমাদের দোকানে উপস্থিত,—সঙ্গে হরিবিহারী! সে দর্শন বোধ হয় ১০ মিনিটের জন্য। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, প্রিয়নাথ আর সেখানে একটুকুও

বিলম্ব করিলেন না, কেবল প্রাণের একটি টান দিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর দোকানের বন্ধন আমার একেবারেই কাটিয়া গেল।

প্রিয়নাথের পরিচয় আমি আর অধিক কি দিব। তিনি সর্ব্বজন পরিচিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, নিরুপাধি নিরাশ্রয় হইয়া, এই মহানগরীর এবং কতদেশের গণ্যমান্য বিদ্বান পূজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কিসের জন্য,—একমাত্র হৃদয়ভরা প্রেমের জন্য। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে যতই ঘনিষ্টতা হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের মধ্যে মতভেদ ও ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে প্রেমের বন্ধন একদিনের জন্যও মলিন হয় নাই। এখন তো প্রিয়নাথ এ জগতে আর নাই, এখন শরীর-মুক্ত আত্মার সঙ্গে মতভেদ ভাবভেদ কোথায়? এখনো কি তাঁর জাতি-ভেদ ভাব আছে, শরীরের সঙ্গে শারীরিক ভাব কি লুপ্ত হয় নাই? প্রিয়নাথের প্রেম কেবল যে আমার সঙ্গে পরিচয়ে আমার প্রতি আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, আমার সম্পর্কে যত দুর গিয়াছিলেন, সকলকেই আপনার জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহারাও কোনো দিন প্রিয়নাথকে ভুলিতে পারেন নাই। প্রিয়নাথের সংশ্রবে যাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ, তাঁহার সম্পর্কীয় বা প্রিয়জনবর্গের সকলের সঙ্গেই সেই একই ভাব আজো আছে। ইহা প্রেমের মোহিনী-শক্তি ছাড়া আর কি বলিব। শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থান ২৪ পরগণার রাজপুর জয়নগর গ্রামের সন্নিকট গোকর্ণী গ্রামে। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অধিক কাল, শ্যামবাজার স্বর্গীয় মোহনলাল মিত্রের দেবালয় বাড়িতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি আরো বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের

পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে

পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার অসীম করুণায় চক্ষুর অগোচর কীটাণু হইতে অতিকায় গজেন্দ্র পর্য্যন্ত সংখ্যাশূন্য বিভিন্ন প্রাণী-মণ্ডলী যথাসময়ে সৃষ্ট ও পরিপালিত হইতেছে, সাক্ষাৎ পাওয়া দূরের কথা—মনেও যাঁহার ধারণা করা যায় না, অথচ যিনি জ্ঞেয় এবং জীবের গতি, যাঁহাকে সহজে

জানা যায় না, অথচ না জানিলেও নিস্তার নাই, সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ জীবের পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে জানিবার, তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার সহিত বিরলে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করত সংসারের দারুণ জ্বালা জুড়াইবার এক অতি সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধ ক্ষমতাপরিশূন্য, বদ্ধ মানব! পিতা মাতাই তোমার ঈশ্বর। তোমার প্রতি তাঁহাদের অপার স্নেহ ও অনন্ত সহিষ্ণুতা এবং উপমা বিরহিত ক্ষমাগুণের অনুধ্যান করো, ভাবিয়া দেখো, তোমার সেই অক্ষম ও জড়পিণ্ডবৎ নিরাশ্রয় দেহকে কতযত্নে কতকাল ধরিয়া প্রতিপালন করিয়া এখন মানুষের মতো করিয়াছেন, পিতা মাতা তোমার প্রতি যেমন, ভগবান ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ জীবের প্রতি তদপেক্ষা অনন্তগুণে স্নেহবান্। মনে একগুণের ধারণা আসিলে শত সহস্র লক্ষগুণের ধারণা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। কষ্ট করিতে হয় না। ম্যাপ্ দেখিয়া পৃথিবীর জ্ঞান হয়, ফটোগ্রাপ্ দেখিয়া গাম্ভীর্য্যময়, স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত হিমাচলের বিশাল বপুর ধারণা করো, ও আপনা আপনি ধন্য হও। তাই ঋষিগণ বলিতেছেন, পিতা মাতাই তোমার সাক্ষাৎ দেবতা। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আরাধনা করো। বিশ্বাস রাখো পিতামাতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সহজে বুঝিবার, সহজে চিনিবার পক্ষে পিতা মাতা ভগবানের জীবন্ত ফটোগ্রাপ্।

যাঁহারা পিতামাতাকে এত উচ্চে স্থান দিয়াছেন, তাঁহারাই আবার বলিতেছেন,—

"মাতা শত্রু পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ" অর্থাৎ যে পিতামাতা পুত্রের জ্ঞানশিক্ষাদানে বিমুখ, তিনি পিতামাতাই নহেন, বরং শত্রু। তবেই বুঝা গেল, জ্ঞানই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়। কেননা জ্ঞান না থাকিলে বুঝিব কেমন করিয়া। চক্ষু থাকিলে তো দর্পনের প্রয়োজন। আবার দেখো শাস্ত্রে কি আছে,—

একমপ্যক্ষরংযস্তু গুরু শিষ্যে নিবেদয়েৎ
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ।

আর কিছু নয়, বেশী কিছু নয়, শুদ্ধ একটিমাত্র অক্ষর যিনি শিখান, তাঁহার উপকারের প্রতিশোধের দ্রব্য এ জগতে নাই, জ্ঞান এমনি স্পৃহনীয়!

বিদ্যা বা জ্ঞান কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, ইহাতে বাঞ্ছনীয় তাবৎ পদার্থই মিলে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলদাতা, একমাত্র জ্ঞান। বিদ্যায় চরিত্র

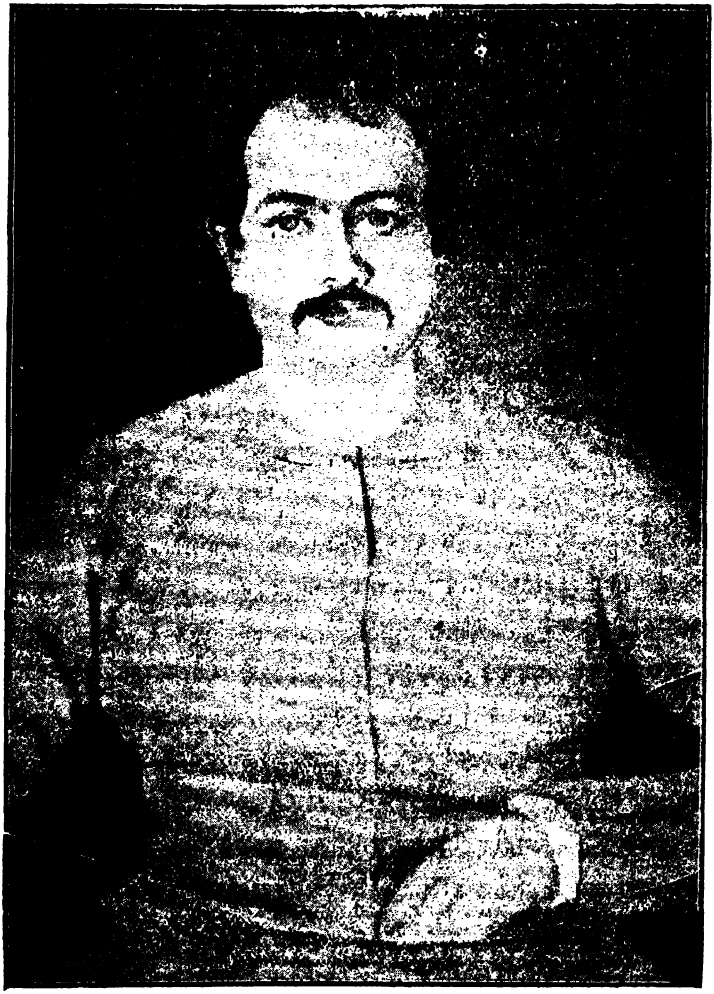
উন্নত, শরীর বলিষ্ট—এবং পার্থিব সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সংসাধিত হয়। রাগ দ্বেষ স্বার্থপরতা প্রভৃতি পশুভাব তিরোহিত হওয়াতে মানব পৃথিবীবাসী হইয়াও স্বর্গের অনুপম সুখভোগের অধিকারী হইয়া থাকে। যাহা হউক সমাজ মধ্যে তবে যে এ দেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর বিরোধ দেখা যায়, তাহার কারণ স্বতন্ত্র, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা হয় না। বলিয়াই এ দুর্দ্দশা। কালে এ প্রথার পরিবর্ত্তনের আশা করা যায়, বোধ হয় ইতিমধ্যেই সূচনা হইয়াছে। এ হেন জ্ঞানের প্রসারকল্পে যিনি অর্থব্যয় করেন, কায়মনোবাক্যে জ্ঞান প্রচারের সহায়তা করেন, তিনি সর্ব্বজন বরেণ্য, তিনি মানুষ হইয়াও দেবোচিত পূজা পাইবার পাত্র। যে সমাজে এমন একটি লোকও আছেন, সে সমাজও ধন্য।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রদেশে লেখাপড়া শিক্ষার প্রায় কোনো উপায়ই ছিল না। উপায়ের মধ্যে এক সেকেলে পাঠশালা। তথায় বালকেরা ১৪।১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আঙ্ক আঙ্ক কর কন কুয়া কিয়ো করিত। অগ্রে তালপাতে পরে কলার পাতে শেষে কাগজে লিখিত, অঙ্কের মধ্যে তেরিজ জমাখরচ গুণ ভাগ ও শুভঙ্করী শিখিয়া পাঠ সমাপ্ত করিত, অনেকে কল কমর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িত। ভাষা শিক্ষার পুস্তকও ছিল না, সুতরাং পড়াও হইত না।

প্রবাদ আছে, একটি প্রজা খাজনা দিয়া গোমস্তা মহাশয়ের নিকট দাখিলা লইতে আসিয়াছিল। গোমস্তা নাম জিজ্ঞাসা করায় প্রজা বলিল, আমার নাম খড়্গেশ্বর। গোমস্তা বিপদে পড়িলেন, খড়্গেশ্বর লিখিবেন কেমন করিয়া। অনেক ভাবিলেন, এ বিপদের কুল কিনারা হইল না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় সে তাহাই বলিল। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিস্তর গালি দিয়া গদাধর নাম রাখিলেন, এবং সেই নামেই তাহাকে দাখিলা দিলেন। খেলারাম ও ক্রেপারামে বড় সদ্ভাব ছিল। লোকে খেলারাম লিখিতে পারিত, কিন্তু ক্রেপারাম লিখিতে অনেকে গলদ্ ঘর্ম্ম হইতেন।

যখন পাঠশালার কথা উঠিল, তখন ছাত্র শাসন প্রাণালীর কথাও কিছু না বলিলে অন্যায় করা হয়। আমরাই সেই সেকেলে পাঠশালার শেষ ছাত্র। কঠোর শারীরিক দণ্ডে ছাত্রদিগকে সদা সন্ত্রস্ত রাখিতে পারিলে গুরুমহাশয় সকলের নিকট সবিশেষ সম্মানিত হইতেন। গুরু মহাশয়ের প্রতি অভিভাবক-দিগের আদেশই ছিল, ছেলে কাণা খোঁড়া না হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া অন্য যে কোনো প্রকার দণ্ড গুরুমহাশয় করিতে পারেন, তদনুসারে তিনি

কথনো ছাত্রদিগকে নাড়ু খাওয়াইতেন, কথনো তাহাদের গাত্রে জলবিছুটী দিতেন, কথনো বা তাহাদিগকে পিপীলিকাপূর্ণ স্থানে বসাইয়া রাখিতেন। ফলত তৎকালে ছাত্র-শাসন-প্রণালী অতি লোমহর্ষণ ছিল, অথচ ইহাতেই



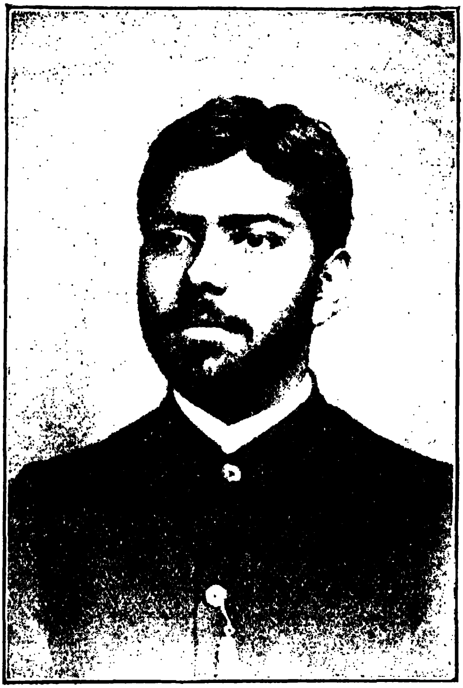
স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আবার গুরুমহাশয়ের পশার প্রতিপত্তি বাড়িত। ভাগ্যে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না, তাই এত নির্যাতনেও মরি নাই! আমরা কথনো কথনো উপায়ান্তর না দেখিয়া যমুনা পারে পলাইয়া গিয়া আত্ম-রক্ষা করিতাম।

দেশের এই দারুণ দুঃসময়ে বাবু সারদাপ্রসন্নের আবির্ভাব হইল। দেশের জন্য, দশের জন্য তাঁহার প্রাণ স্বতঃই আকুল হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষের ব্যাকুলতা হইতে গোবরডাঙ্গা ইস্কুলের সৃষ্টি ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। ইস্কুলটি তাঁহার এমনি প্রাণের সামগ্রী ছিল যে, শকটারোহণে বেড়াইবার সময়েও তাহার কথা ভুলিতে পারিতেন না। পথিপার্শ্বে বালক দেখিলেই গাড়ি থামাইয়া সুমিষ্ট ভাষায় বিদ্যালয়ের উপযোগীতা বুঝাইয়া দিতেন এবং ইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে বলিতেন। কেবল ইস্কুল বলিয়া নয়—লোকের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল, প্রথা ছিল না বলিয়া তখন শোকসভা আহূত ও তথায় বক্তৃতা পাঠ হয় নাই।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হইতে তদীয় বংশধরগণ বিবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি এই পৈতৃক-কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই সুদীর্ঘকালে, এই এক ইস্কুল সংরক্ষণকার্য্যে তাঁহাদের কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, তবে অনুমান হয় ৬০ হাজারের কম হইবে না। এখন আবার ইস্কুলের ব্যয় ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়াও তাঁহারা ভগ্নোদ্যম হন নাই, বরং ইস্কুলের বর্ত্তমান সেক্রেটারী মহাশয় উদ্যমশীল তরুণবয়স্ক জোতিঃপ্রসন্ন বাবু যেন নবোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। অদ্য আমরা এই অভিনব সভায় আহূত হইয়া ছাত্র শিক্ষক এবং ভদ্রমণ্ডলী পরিবৃত সেক্রেটারী মহাশয়কে স্বয়ং স্বহস্তে বালকগণকে পারিতোষিক বিতরণে নিযুক্ত দেখিয়া কত আনন্দ ও কত উৎসাহ সম্বলিত নিরুপম সুখানুভব করিতেছি। যাঁহারা আজ পঞ্চাশতের অধিক কাল ব্যাপিয়া সকল দানের সার বিদ্যাধন দান করিয়া দেশের মহান্ধকার দূর করত সকলের বরেণ্য হইয়াছেন, আসুন আমরা হৃদয়ের সহিত প্রাণের সহিত কৃতজ্ঞতাচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া ভক্তিপুষ্প দিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করি।

কিন্তু এই শুভদিনে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে প্রাণের নিভৃত প্রদেশে বড় একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল, মনে করিয়াছিলাম, সে কথা তুলিব না, কিন্তু তাহা পারিলাম না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—কিন্তু সে ক্ষোভের, সে মানসিক যাতনার তো উপশম হইল না। কৈ আমাদের পতিরাম বাবুর দশ সন্ততির শোকাগ্নি প্রশমন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন সুরেন্দ্রনাথ আজ কোথায়? যাঁহার



পাঠ্যাবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ

বিনয় নম্র সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিলে কি স্বদেশী কি বিদেশী আত্ম-বিস্মৃত হইত, বিধির বিপাকে পলক-কাল মধ্যে তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন। গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত নববিধানের প্রবল বাত্যায় যখন ইস্কুল গৃহ থর থর কাঁপিতেছিল, তখন কে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে অমিতবলে সে কম্পন প্রশমিত করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে চমকিত করিয়াছিল? হায় কৈ সে সুরেন্দ্রনাথ! সুরেন্দ্র! তুমি তো চলিয়া গেলে, ইস্কুল বাবুদের বটে, কিন্তু তাহার ফলভাগী জনসাধারণ। এই জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুকে আপন ভাবিয়া কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহা হাতে কলমে চোখে আঙুল দিয়া কে আর দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবে? গৃহস্থ যেমন দুর্গোৎসব বা আনন্দের কার্য্যে মাতিয়াও অপহৃত প্রাণের সামগ্রীকে ভুলিতে না পারিয়া শোকাবেগে এক একবার অশ্রুপাত করে, বৎস সুরেন্দ্রনাথ! আজ তোমারি বিরহে আমাদেরও সেই দশা উপস্থিত!

সরমা

তখন উষার অঙ্গে লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বাকাশ বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। দেবদারুর উচ্চ শাখায় বসিয়া দোয়েল প্রভাতী গাহিল। পথে তখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। গঙ্গাধর দেবালয় হইতে বাহির হইয়া আপনার কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সে যখন তাহার কুটীরের সম্মুখে আসিল, তখন বালসূর্য্যের প্রথম কিরণ তরুশিরে সোনার মুকুট পরাইয়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিতেছে। গঙ্গাধর দরজার নিকটে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল, সরল অচৈতন্যভাবে দরজার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। তাহার কপালে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। রুধির-রঞ্জিত জামাটি স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, একপায় জুতা, অপর পা খালি, মাথার চুলগুলা উস্ক শুষ্ক—মুখখানা মলিন—বিষণ্ণ!

গঙ্গাধর ডাকিল,—"সরল?"

সরল স্বপ্নের ঘোরে সাড়া দিল,—"দিদি!"

সরলের এই করুণ স্বরটা গঙ্গাধরের প্রাণে আসিয়া বিঁধিল। সে বুঝিল, বালক সরল তাহার দিদির জন্য কাতর-হৃদয়ে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে, রাত্রের অন্ধকারে পথে আছাড় খাইয়া কপালটা কাটিয়া গিয়াছে। আহা, রক্ত এখনো জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সরলের অবস্থা দেখিয়া গঙ্গাধর আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি আপনার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া সরলের দেহের শুষ্ক রক্তগুলি মুছিতে লাগিল। সহসা এই শীতলস্পর্শে সরল চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, গঙ্গাধর শিশুর মতো তাহাকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া রক্ত চিহ্নগুলি মুছাইয়া দিতেছে। সে আপনার অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া গেল। পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া কহিল,—"দিদি কোথায়?"

গঙ্গাধর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"ভয় নেই, তোমার দিদি আছেন—"

সরল অধীরভাবে কহিল,—"কোথায় দিদি,—কোথায় আছেন?"

গঙ্গাধর কহিল,—"ব'ল্‌চি, কে তোমাকে এখানে আন্‌লে সরল ? তোমার অবস্থা দেখে যে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে !"

"কেউ আমাকে এখানে আনে নি, আমি রাত দশটায় বাড়ি এসে শুনলুম জ্যাঠাইমা দিদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে ! আর আপনি তাকে নিয়ে এসেচেন। তাই শুনে আমি একলা আপনার বাড়িতে ছুটে এলুম। অন্ধকারে পথে প'ড়ে গেছ্‌লুম, তাই কপালটা কেটে গেছে, দিদি কোথায় ?"

"ব'ল্‌চি, একটা চাকরকে কি সঙ্গে কোরে আসতে নেই ? তা' হ'লে তো এত কষ্ট পেতে না। আহা, যদি আমি একবার জান্‌তে পার্‌তুম যে তুমি বাড়ি এসেচ ? কাল যে আমি তোমাদেরি বাড়ির ঠাকুর-দালানে শুয়ে রাত কাটিয়েচি।"

"দিদিকে তাড়িয়ে দিয়েচে শুনে আমার মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গ্যাল আমি একেবারে ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। চাকর বাকর কাউকে তো দেখ্‌লুম না। সেকথা মনেও আসে নি, আপনি কেন বাড়িতে না থেকে আমাদের ঠাকুর দালানে শুয়ে ছিলেন ?"

"তোমার দিদি আর মাণিক এই ক'টা দিনে আমার এই ছোট্ট ঘরখানিতে লক্ষ্মী শ্রী ফিরিয়ে এনেছিল। মাণিকের হাসিতে ঘরখানি আমার হাস্‌ত। কাল বৈকালে মা লক্ষ্মী আমার কল্‌কেতায় রওনা হ'য়েচেন। আমি নিজে নৌকায় তুলে দিয়ে এসেচি। বাড়িতে এসে এই শূন্য ঘরে আর ঢুক্‌তে পারলুম না, তাই ঠাকুর-দালানে প'ড়ে ঘুমিয়েছিলুম।"

সরল বিস্মিতভাবে কহিল,—"দিদি কল্‌কেতায় কেন ?"

গঙ্গাধর মুখে কিছু না বলিয়া বস্ত্রের খুঁট্‌ হইতে টেলিগ্রামখানি খুলিয়া সরলের হাতে দিল !

সরল টেলিগ্রাম পড়িয়া কয়েকমুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক হইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল,—"আহা, হাঁসপাতালে প'ড়ে আছেন, আজই আমি কল্‌কেতায় রওনা হব।"

"তা' বেশ, এখন বাড়ি চলো, কাল রাত্রে বোধ হয় কিছুই খাওয়া হয় নি ! যেতে পার্‌বে কি ? না গাড়ি আন্‌তে লোক পাঠাবো ? কপালটায় কি বড় ব্যথা হ'য়েচে ?"

"না ব্যথা তেমন হয় নি, ইট লেগে কেটে গিয়ে একটু রক্ত বেরিয়েছিল ; কিন্তু বাড়ি আমি যাবো না—জ্যাঠাইমা থাক্‌তে ও বাড়ি

আমি যাবো না। যে আমার দিদিকে তাড়িয়ে দেছে আমি তার মুখ দর্শন কোর্‌বো না।"

গঙ্গাধর সময় বুঝিয়া বলিল,—"খালি কি তোমার দিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?" সরল বিস্মিতভাবে কহিল,—"আর কাকে?"

"তোমাদের অনেকগুলি পুরোনো ঝি-চাকরকে! ইস্কুলের ছেলেগুলিকে যারা তোমার বাপের অন্নে মানুষ হচ্ছিল, আর অতিথিশালা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে। পাড়ায় হাহাকার পড়েচে—তোমার বাপের কাছে বোধ হয় দরখাস্তও গ্যাছে। দেবসেবা বন্ধ কোরে আমাকে যে কেন তাড়ান নি তা' ব'ল্‌তে পারি নে।"

"ওঃ ঠিক্ ব'লেচেন, সেই জন্যে আমি রাত্রে এসে একটাও ঝি-চাকরকে দেখ্‌তে পেলুম না।"

"শুধু তা' নয় তোমার বৈটকখানায় এখন তারানাথের যাত্রার আখ্‌ড়া বসে।"

"বটে, আমি এখুনি বাড়ি যাবো, দেখি, জ্যাঠামশাই কি বলেন। কেন তিনি এ সব কাজ ক'র্‌লেন?"

"যেতে পার্‌বে কি সরল?"

"পার্‌বো, কিন্তু এ বেশে গেলে লোকে আমাকে পাগল ব'ল্‌বে, আপনি কোনো লোককে গাড়ি আন্‌তে পাঠিয়ে দিন!"

"সেই ভালো" বলিয়া গঙ্গাধর বাহিরে আসিল এবং পাঁচু প্রামাণিকের ছেলে মধুকে ডাকিয়া গাড়ি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

গঙ্গাধর ফিরিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ বাতাসার সরবৎ করিয়া সরলকে খাওয়াইল। সরবৎটুকু পান করিয়া সরল একটু সবল হইয়া উঠিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মধু আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ি মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া আছে!

সরল গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিল।

তখন প্রভাত তপনের তরুণ কিরণ সোনার বর্ণ গায় মাখিয়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিয়াছে। কালীশঙ্কর বৈটকখানার বারাণ্ডার উপর একখানি চেয়ারে বসিয়া সট্‌কা টানিতেছিল। মুখখানা বিষণ্ণ যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন!

সরল বাটীর ভিতর না গিয়া একেবারে বৈঠকখানায় আসিয়া কালীশঙ্করের সম্মুখে দাঁড়াইল। কালীশঙ্কর সরলকে দেখিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, "সরল যে, শুন্‌লুম তুমি নাকি রাত্রে এসেছিলে। এসেই বাড়ি থেকে চ'লে

গেলে, ব্যাপার কি? রাত্রে ছিলে কোথায়? কপালটা কেটে গ্যাল কি কোরে?”

সরল সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল,—“আপনারা আমার দিদিকে তাড়িয়ে দিয়েচেন?”

কালীশঙ্কর গম্ভীরভাবে কহিল,—হ্যাঁ, তাকে তাড়িয়ে দেওয়াই হ'য়েছে—কি জাতের মেয়ে তার ঠিক নেই, তাকে বাড়িতে রাখা কেন?”

সরল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—“আপনি ইস্কুলের ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়েচেন কেন? অতিথিশালা বন্ধ কোরেচেন কেন?”

কালীশঙ্কর স্বরটা চড়াইয়া দিয়া কহিল,—“আমি যা কোরেচি তা' ভালোর জন্যেই কোরেচি। তুমি কি মনে করো, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো। আসুক তোমার বাপ, আমি সব কথা ব'লে দেবো, তোমার স্বভাব চরিত্র এমনি মন্দ হ'য়ে গেছে। তুমি এতটুকু ছেলে তোমাকে আমি হ'তে দেখ্‌লুম, তুমি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাও। অমন জান্‌লে তোমাদের বাড়িতে পা দিতুম না।”

সরলের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে গঙ্গাধরের নিকটে আসিল। গঙ্গাধর আড়াল হইতে সমস্তই শুনিয়াছিল, তাহাকে আর কিছু বলিতে হইল না। সে সরলের হাতখানা ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। তাহার প্রাণটা তখন জ্বলিতেছিল। কালীশঙ্করের তিরস্কার-বাণগুলি তাহার হৃদয়ের পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিয়াছিল। সে আপনার বাড়িতে সহানুভূতি পাইল না, কিন্তু গঙ্গাধরের এই অমৃতময় স্নেহস্পর্শে বালক সরল কাঁদিয়া ফেলিল।

সরল আসিয়াছে শুনিয়া বাহিরে অনেক লোক জমা হইয়াছিল। ইস্কুলের ছাত্রসমূহ, তাড়িত ঝি চাকর, অতিথিশালার আতুর খঞ্জ প্রভৃতি অনেকে সরলের নিকট তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সরলের চক্ষে জল দেখিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। সকলেই নির্ব্বাক হইয়া সরলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সরল কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—“আমি সব শুনেচি—জ্যাঠামহাশয়ের হাতে তোমাদের যে দশা হ'য়েচে, আমারো সেই দশা; এ বাড়িতে আজ আমারো স্থান নেই। জ্যাঠামহাশয় থাকৃতে আমি এখানে জল গ্রহণ কোর্‌বো না। চৌধুরী মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু সীতানাথ বাবু কোথা হইতে ঝড়ের ন্যায় আসিয়া

সরলকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন,—"বেশ, এখানে জল গ্রহণ না করো, আমার বাড়িতে চলো ; তারপর যা ভালো বিবেচনা হয়, তাই করা যাবে।"

স্বর্গ হইতে কে যেন স্নেহের আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিল ! সরল অধীরভাবে "কাকাবাবু" বলিয়া সীতানাথ বাবুর বক্ষের ভিতর মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইতে লাগিল, তাহার কথা বাহির হইল না, স্বর জড়াইয়া আসিল।

সীতানাথ বাবু সরলের হাত ধরিয়া আপনার বাটীতে আসিলেন। সেখানে স্নান আহারের পর একটু সুস্থ হইল, পরে খাতাঞ্জিকে ডাকিয়া কলিকাতা হইয়া পিতার নিকট যাইবার উদ্দেশে কিছু টাকা লইল, এবং সেই দিন অপরাহ্নে নৌকা-যোগে কলিকাতায় রওনা হইল।

সরল কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমেই মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে আসিয়া হরিপদর অনুসন্ধান করিল এবং অনুসন্ধানে জানিল, হরিপদ নামে কোনো রোগী সেখানে নাই, কিম্বা সম্প্রতি মারা যায় নাই। সরল হঠাৎ যেন একটা ধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়িল। হরিপদ সেখানে নাই, একথা সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে Principalএর অনুমতি লইয়া প্রত্যেক রোগীর নিকটে যাইয়া টেলিগ্রামের বিষয় জানাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাহাতে কোনোই ফল হইল না, হরিপদর কোনোই উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তারপর সরল কমলার জন্য হাঁসপাতালে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহার কোনো সন্ধানই মিলিল না। কোনো যাদুকরের যষ্টির আঘাতে সরল যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণটা তখন তাহার দিদির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, এখনি সে সমস্ত কলিকাতাটা ছুটিয়া বেড়ায় ; প্রত্যেক বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া দেখে, তাহার দিদি কোথায় ! সরল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিল, হয় তো কোনো কারণে তাহার দিদির কলিকাতা পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে। এখনি আসিবে ! সমস্ত দিন অনাহারে সরল হাঁসপাতালের দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার দিদির অপেক্ষা করিতে লাগিল, শেষে যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল, একটি দু'টি করিয়া আকাশে তারকা ফুটিতে লাগিল, সমস্ত রাজপথ হীরার হার পরিয়া হাসিয়া উঠিল, তখন সে ম্লানমুখে শ্রান্তদেহে এক পান্থ-নিবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সরল প্রত্যহ দুইবার করিয়া হাঁসপাতালে আসিতে লাগিল, কিন্তু হরিপদ কিম্বা কমলার কোনো সন্ধানই পাইল না। অবশেষে অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া বড়বাজারের এক অপ্রশস্ত গলির ভিতর সরল নবীন মণ্ডলের কাপড়ের দোকান আবিষ্কার করিল বটে, কিন্তু উহা বন্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। এইরূপ চার পাঁচ দিন ব্যর্থ-চেষ্টা করিয়া সরল তাহার পিতার নিকট মধুপুরে চলিয়া গেল।

চৌধুরী মহাশয় ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মধুপুরে বাস করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার মানসিক কষ্ট! যেদিন তিনি তাড়িত ছাত্রগণের করুণ-প্রার্থনা-পূর্ণ আবেদন পত্র পাইলেন, সেদিন তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে বালকগণের কাতরহৃদয়ের করুণ-ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যখন তিনি পড়িতেছিলেন, "আপনি আমাদের পিতা, আজ পিতা থাকিতে আমরা আশ্রয়হীন, পথের ভিখারী!" তখন বাস্তবিক তাঁহার নয়নকোণে অশ্রুরেখা দেখা দিয়াছিল। তারপর যেদিন তিনি শুনিলেন, অতিথিশালা বন্ধ হইয়াছে, দাস দাসী প্রভৃতি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন তাড়িত হইয়াছে, সেদিন মর্ম্মাহত হইলেন। কথাটা সহজে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেইদিনই তিনি কালীশঙ্করকে এক টেলিগ্রাম করিলেন। টেলিগ্রামের উত্তরে জানিলেন, বাজে খরচ কমাইবার জন্য সত্য সত্যই তিনি এই কাজ করিয়াছেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তারপর ক্রোধের বশে কালীশঙ্করকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন; কিন্তু সে চিঠি পাঠানো হইল না। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিঠিখানি আবার পড়িলেন, পড়িয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সম্মান রক্ষা করিলেন। ভাবিলেন, তাঁহাকে শীঘ্রই বাটী যাইতে হইবে, যাইয়া আবার সব ঠিক্ঠাক্ করিবেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই গঙ্গাধরের পত্রপাঠে জানিলেন যে, তাঁহার সাধের বৈটকখানায় তারানাথের কৃপায় থিয়েটারের আখ্ড়া বসিতেছে এবং কমলাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন সে তাহার কুটীরে আছে। চৌধুরী মহাশয় অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের শিখা ছুটিয়া গেল, তিনি গৃহ মধ্যে দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এ সংবাদটা বিমলার কাণে উঠিতে বেশি বিলম্ব হইল না। সেদিন বিমলা

শয্যাত্যাগ করিল না, একবিন্দু জল গ্রহণ করিল না!

পরদিন বিমলা বাটী ফিরিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের শরীর নিতান্ত অপটু থাকায় ডাক্তারের পরামর্শে আর এক সপ্তাহ থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ইহার দুইদিন পরে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ম্যানেজারের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। উহাতে লেখা ছিল, "যেদিন সরল কলিকাতায় রওনা হয়, সেইদিন রাত্রে তারানাথ খাতাঞ্চিকে মারপিট করিয়া তাহার তহবিল তছ্‌রূপ করিয়া পাঁচশত টাকার খুজরা নোট লইয়া পলায়ন করে। বড়বাবুর নিতান্ত অনুরোধে এ সংবাদ এখনো পুলিসে জানানো হয় নাই। আপনার অনুমতি পাইলে মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিব। বড়বাবু আজ সপরিবারে আপনার বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন।" চৌধুরী মহাশয়কে এক মনে পত্র পাঠ করিতে দেখিয়া বিমলা কহিল,—"এ আবার কার চিঠি এল, সরলের চিঠি পত্র পাই না কেন? কে জানে সে কেমন আছে? আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে, আর এখানে থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না!"

"আমারো না, কালই আমরা রওনা হব, শরীর খারাপ ব'লে ব'সে থাক্‌লে আর চলে না।"

"কেন কি হ'য়েচে, এ চিঠিটা কার?"

"ম্যানেজারের।"

"খবর কি?"

"খবর আমার মাথা, আর মুণ্ডু। তারানাথ নাকি খাতাঞ্চিকে মারপিট কোরে তার তবিল ভেঙে পাঁচশো টাকা নিয়ে পালিয়েচে। ছেলেটা কী বদমায়েস!"

"তা' কি আজ জান্‌লে!"

"বরাবরই জান্‌তুম, তবে কি জানো হাজার হোক্‌ বড় ভাই, আস্‌বার সময় খালি মুখের কথা একবার ব'লে এসেছিলুম বাড়িটা একবার একবার দেখো। কে জানে যে তিনি নিজে বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে সপরিবারে এসে বাস কোর্‌বেন।"

"নিজের বিষয় আশায় সমস্ত গালে দিয়ে, এখন তোমার বাড়িতে এসে লোকজন তাড়িয়ে দিয়ে, খরচ কমিয়ে তোমার লাভ দেখাচ্চেন!"

"যাক্‌, এখন যে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে বিদেয় হ'য়েচেন এতেই আমি খুসী!

"কিসে জান্‌লে তাঁরা চলে গিয়েছেন?"

"ব'ল্‌তে ভুলে গেছ্‌লুম, ম্যানেজার লিখ্‌চেন যে, বড়বাবুর নিতান্ত অনুরোধে তিনি ঐ মারপিট আর টাকা চুরির সংবাদটা এখনো পুলিসে জানান নি। আমার অনুমতি পেলে মোকদ্দমা রুজু কোর্‌বেন, আর বড়বাবু সপরিবারে আপনার বাড়িতে চলে গেছেন।"

"আমার বোধ হয় আবার ফিরে আস্‌বেন, শুধু দেখ্‌তে গেছেন, তাঁদের গুণধর ছেলে, বাড়ি থেকে কোনো জিনিষ পত্র নিয়ে গেছে কি না!"

"তা' হ'তে পারে, দেখো আর একটা কথা বলি, ম্যানেজার লিখ্‌ছেন "যেদিন সরল কল্‌কেতায় রওনা হয় সেইদিন রাত্রে তারানাথ মারপিট কোরে টাকা নিয়ে পলায়, সরলের কল্‌কেতায় আসবার কারণ কি? কৈ তার তো কোনো চিঠিপত্র পেলুম না।

"আজ সকালে আমি লীলার একখানা চিঠি পেয়েচি। সে লিখ্‌চে যে, বামা তার বাড়িতে গিয়ে খবর দেয় যে, কমলাকে তার জ্যাঠাইমা তাড়িয়ে দিয়েচে। সে এখন গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়িতে আছে, এই শুনে সে কমলাকে নিয়ে যাবার জন্যে জামাইকে সঙ্গে করে ছুটে এসেচে। এসে গঙ্গাধরের কাছে শুন্‌লে যে হরিপদ টেলিগ্রাম কোরেচে যে, সে কল্‌কেতার বড় হাঁসপাতালে আছে, তার বড় অসুখ। তাই শুনে কমলা যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। গঙ্গাধর ঠাকুর লোক দিয়ে তাকে, কল্‌কেতায় পাঠিয়ে দিয়েচে। সরল নাকি জমিদারী দেখ্‌তে গেছেল। সেখান থেকে এসে, এই সব শুনে সে কল্‌কেতার হাঁসপাতালে হরিপদকে দেখ্‌তে এসেচে!"

"একথা আমায় এতক্ষণ বলো নি কেন?"

"তোমাকে বল্‌বার জন্যেই এসে ছিলুম, এসে দেখ্‌লুম তুমি একমনে চিঠি প'ড়্‌চ। তোমার চিঠি না শুনে কি আর আমার চিঠির কথা বলতে পারি?"

"তা' বেশ, এই ক'টা দিনের মধ্যে যে এত কাণ্ড হ'য়ে যাবে, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!"

"আর ভাব্‌বার দরকার নেই, যাতে কাল যাওয়া হয়, কালাচাঁদকে তার বন্দোবস্ত কোরে রাখ্‌তে বলো। কলকেতায় গিয়ে হাঁসপাতালে ওদের একবার দেখে যেতে হবে, যদি হরিপদ একটু ভালো থাকে, তা হ'লে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভালো কোরে ডাক্তার দেখানো যাবে, কি বলো?"

"বেশ তো, তাই হবে।"

"মাণিকের জন্যে এখনো আমার মন কেমন করে।"

"আমারো।"

"আহা, সে আমাদের "ন্যাওটো" ছিল। আজ ক'দিন থেকে আমার ডান চোখ্‌টা নাচ্‌চে, বাছার আমার কোনো অসুখ বিসুখ—" কথাটা বিমলার মুখে আট্‌কাইয়া গেল, সম্পূর্ণ বাহির হইল না, সে মনে মনে বলিল, হে মা কালি, হে মা দুর্গা যেন সে ভালো থাকে।

এই সময় কালাচাঁদের সহিত সরল আসিয়া তাহার পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিল। সরলের চেহারা দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত হইয়া গেল, তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপর পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে, তাহার বিকসিত নয়ন-কোলে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। রুক্ষ চুলগুলা মাথার উপর সোজা হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কয়েকদিন তাহার আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই।

চৌধুরী মহাশয় সরলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা সরলের হাত দু'টা ধরিয়া আপনার নিকট টানিয়া আনিল, এবং কাতরস্বরে কহিল,—"তুই এমন হ'য়ে গেলি কেন বাবা? হরিপদ হাঁসপাতালে ভালো আছে তো? মাণিক আমার কেমন আছে? তোমার দিদি ভালো আছে তো?" বিমলার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

সরল অতি কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"হাঁসপাতালে মা কাউকে দেখ্‌তে পাই নি। হরিপদ নামে কোনো লোক হাঁসপাতালে যায় নি। দিদিকেও সেখানে পাওয়া গেল না। আমি তিন চার দিন ধ'রে হাঁসপাতালে খোঁজ কোর্‌লুম, কিন্তু দিদি কিম্বা হরিপদর কোনো সন্ধান পাই নি!"

চৌধুরী মহাশয় বিমলার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তাই তো, ব্যাপার কি?"

বিমলা নতমুখে কহিল,—"কি জানি!"

চৌধুরী মহাশয় সরলকে কহিলেন,—"গঙ্গাধর তোমার দিদিকে কার সঙ্গে পাঠিয়েছিল?"

"নবীন মণ্ডলের সঙ্গে। আমি অনেক কষ্টে বড়বাজারে এক গলির ভেতর তার দোকান খুঁজে বার কোর্‌লুম, কিন্তু সে দোকান বন্ধ; আমি দু' তিন দিন গেলুম, কিন্তু দোকান বন্ধ দেখে ফিরে এলুম।"

"চৌধুরী মহাশয় আপন মনে বলিলেন,—"এখন উপায়!"

বিমলা ত্রস্তভাবে বলিল,—"এর আর কি; কাল তো বাড়ি যাচ্চি।

যাবার সময় তুমি নিজে একবার হাঁসপাতালে গিয়ে ভালো কোরে খোঁজ কোর্‌বে। ও ছেলে মানুষ ওর কথায় বোধ হয় কেউ কাণ দেয় নি !"

"বাড়ি যাবে মা, তোমরা যাও, আমি আর যাবো না। জ্যাঠাইমা থাক্‌তে আমি সে বাড়িতে আর মাথা গলাবো না।"

বিমলা সস্নেহে কহিল,—"তোমার জ্যাঠাইমা বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছেন। রাক্ষসী দু'দিনের জন্যে এসে আমার সোনার সংসারটা খেয়ে গেলেন।"

* * * * *

যথাসময়ে চৌধুরী মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সরলকে সঙ্গে লইয়া যখন মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল ও ক্যাম্বেল কলেজ হাঁসপাতালে বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোনো ফল পাইলেন না, তখন তিনি নবীন মণ্ডলের দোকানে আসিয়া দোকান বন্ধ দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ফিরিবার সময় লোক মুখে শুনিলেন, নবীন দোকানে আসে নাই। তাহার পুত্র দোকান বন্ধ করিয়া দেশে গিয়াছে।

কলিকাতায় দুই দিন থাকিয়াও যখন চৌধুরী মহাশয় হরিপদ কিম্বা কমলার কোনো সন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে আসিলেন। তাঁহার আগমনে পরিত্যক্ত বাটী আবার হাসিয়া উঠিল, অতিথিশালা পুনরায় খুলিয়া দেওয়া হইল, গরীব দুঃখীরা দুই হস্ত তুলিয়া ভগবানের নিকট চৌধুরী মহাশয়ের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল। ছাত্রেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পড়শুনা আরম্ভ করিয়া দিল, তাড়িত আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে পুনরায় আহ্বান করা হইল। চৌধুরী মহাশয়ের সোনার সংসার আবার পূর্ব্বের ন্যায় জল্‌জল্‌ করিতে লাগিল। চৌধুরী মহাশয় বাটীতে আসিয়া প্রথমে নবীন মণ্ডলকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নবীনের পুত্র আসিয়া বলিল যে, সে আজ পর্য্যন্ত তাহার পিতার কোনো খবর পায় নাই। তাহার বিশ্বাস, হয় তো নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। সে নৌকা তাহাদের ঘাটের নয়। তারানাথ টাকা ভাঙিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আজো তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঘা লাগিয়াছিল সরলের কোমল প্রাণে, সে তাহার প্রাণদাত্রী দিদির জন্য বাসি ঝরা ফুলের মতো দিন দিন শুখাইয়া যাইতে লাগিল। বিমলা চঞ্চল হইয়া উঠিল। চৌধুরী মহাশয়ের অপটু শরীর আরো ভগ্ন হইয়া পড়িল।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জলপ্লাবন

এবার বর্দ্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা ভাসিয়া গিয়াছে। কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, আর কত লোক মৃত-কল্প কে! বলিতে পারে? আশ্রয়, অন্ন, বস্ত্রাভাবে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। প্রচুর সাহায্য প্রয়োজন। হৃদয়বান্ মহাত্মারা উদ্‌যোগী হইয়াছেন, শত শত লোক সাহায্য লইয়া ছুটিয়াছেন। "দয়াবানেরা ধন্য! কারণ তাহারা ঈশ্বরের দয়া পাইবে।" এই ঘটনায় জনসমাজ সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সকলের মুখেই হাহাকার, সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এ সময় আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, কেবল কি আমরা হায় হায় করিব? না, আর কোনো আশার কথা আছে। সে কথা কে শুনাইতে পাবেন? যিনি বিশ্বাসী, তিনি এই ভীষণ ঘটনাতেও ধৈর্য্যশীল। তিনিই বলিতে পারেন, "মানব মণ্ডলী স্থির হও, একটি জীবনের জন্য যাঁহার কত আয়োজন, এখনো তাঁহার মহিমা দর্শন করো, আশ্বস্ত হও, ইহ জীবনের অতীত অদেহী অবস্থা আছে, তাহার বিষয় অন্বেষণ করো।"

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

এতদ্দেশে রেল খুলিবার পর, গৈপুর নিবাসিগণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গ্রামের মধ্যস্থল হইতে গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে যাইবার জন্য একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করেন। সম্মুখীন্ জমি না পাওয়ায় ঐ রাস্তা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৫০০।৬০০ ফুট পশ্চিমে শেষ হয়; সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীর দ্বারা Land Acquesition Act অনুসারে ৯০৲ টাকায় ঐ জমি খরিদ করা হইয়াছে! এতদিনে একটি বহুদিনের কষ্ট দূর হইল। গৈপুর গ্রামে একটি গ্রাম্য সমিতি আছে। ঐ সমিতির সম্পাদক,—ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র। তাঁহারি উদ্‌যোগে এই শুভ কার্য্য হইয়াছে। আমরা পরম্পর শুনিতেছি, ঐ সমিতির ফণ্ডে অবশিষ্ট যে টাকা ছিল, তাহা গোবরডাঙ্গা ইংরাজি ইস্কুলের উন্নতি কল্পে দান করা হইয়াছে।

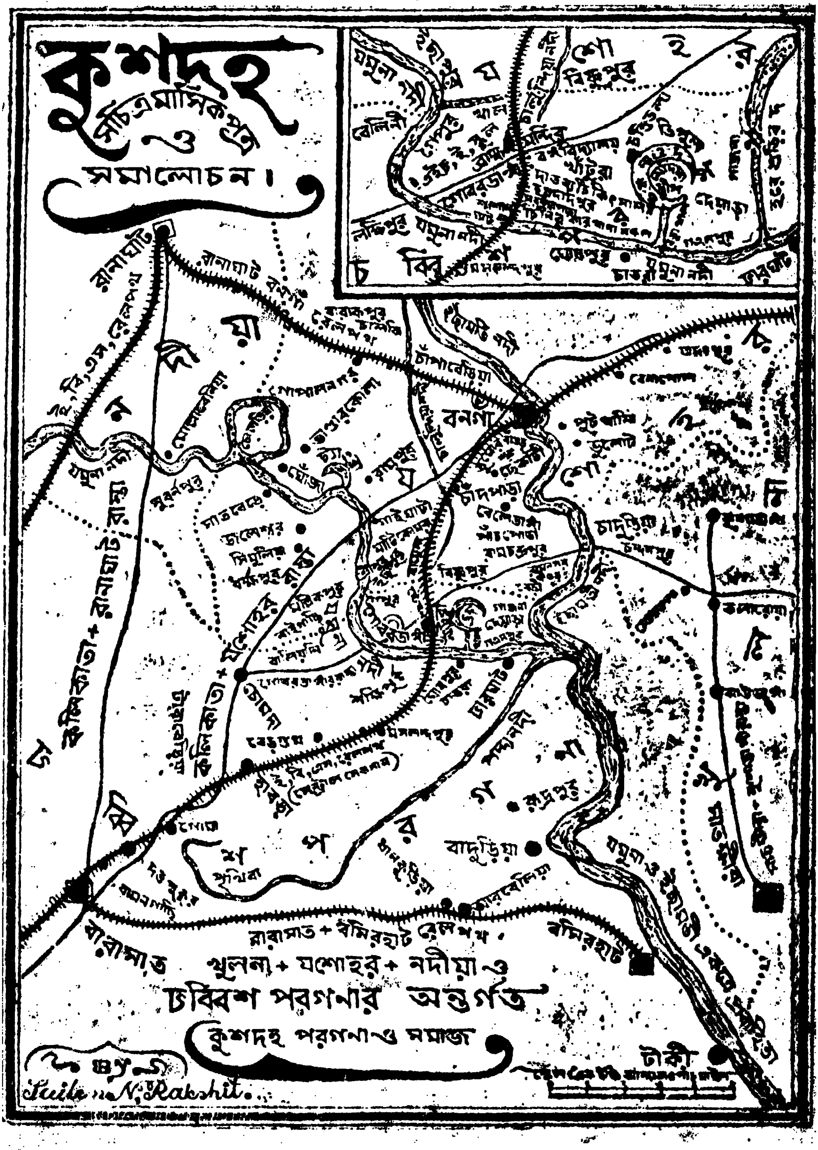
আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইছাপুর বঙ্গবিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী শ্রেণীতে পরিণত করিতে বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ও বাবু হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এস্‌-সি, বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ, প্রভৃতি উদ্‌যোগী হইয়াছেন; প্রবাসী ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ এই হিতকর অনুষ্ঠানে একযোগে সচেষ্ট হইলে এ চেষ্টা সফল হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

বন্যা প্রপীড়িত দুঃস্থগণের সাহায্যার্থে কুশদহবাসিগণেরও মুক্তহস্ত হওয়া প্রার্থনীয়। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ইছাপুরের বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন; কেহ গোপনে দান করিতে ভালোবাসেন, তাহা ভালো, আবার সংকাজের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনও ভালো।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Reg. No. C 494.

কুশদহ-মানচিত্র

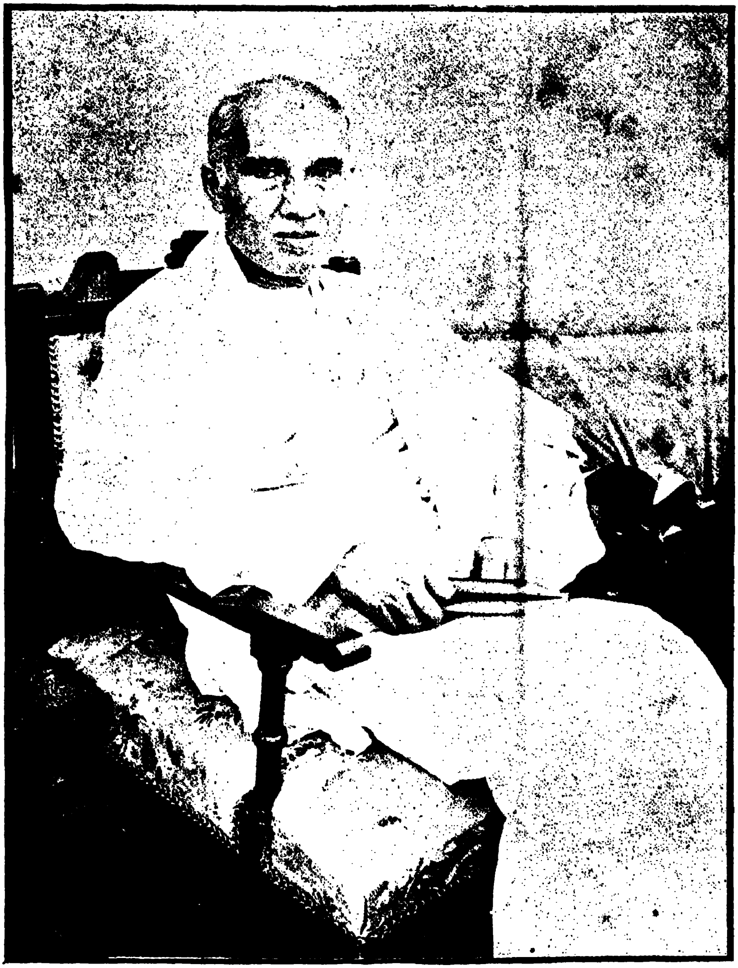

কুশদহ
সচিত্র মাসিক পত্র ও
সমালোচনা।
রানাঘাট
বনগাঁ
চাঁদপাড়া
যমুনা নদী
বাদুড়িয়া
বারাসাত
বারাসাত + বসিরহাট রেলপথ
বসিরহাট
খুলনা + যশোহর + নদীয়া ও
চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত
কুশদহ পরগনা ও সমাজ
টাকী

অনিবার্য্য কারণে আশ্বিনেরও "কুশদহ" ১৫ই বাহির হইল।

পঞ্চম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩২০ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)



শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু B. Sc. (Lond.) F. G. S.

THE NEW ARTISTIC PRESS, 1, RAMKISSEN DAS LANE, CALCUTTA

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩২০ { ষষ্ঠ সংখ্যা

(একটি পুরাতন)

সঙ্গীত

——o——

কাফি—কাওয়ালি।

জানি তুমি মঙ্গলময়।

জানি তুমি মঙ্গলময় হে, জানি তুমি মঙ্গলময়,

প্রতি পলকে পাই পরিচয়।

সুখে রাখ দুঃখে রাখো, যে বিধান হয়,—

কিছুতেই নাহি ভয়।

আর যাই করো প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু,

এই মম ভরসা—

এসো প্রভু এসো প্রভু, হৃদয় মাঝে—

হবে শুভ নিশ্চয়।

(ব্রহ্মসঙ্গীত

প্রার্থনা

প্রার্থনা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদে তাহার অর্থ প্রার্থনা। অক্ষম শিশু জানে না কি তার অভাব, যাহা তার অভাব তাহাই সে চাহে, ক্রন্দনই তার প্রকাশ।

মানুষ আপন শক্তি অপেক্ষা আর এক অধিক শক্তির কল্পনা করে এবং তাহার সাহায্য চায়। জ্ঞানে ভাবে যত অজ্ঞ থাকে, প্রার্থনার প্রকাশও ততো নিকৃষ্ট হয়। প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ অবস্থা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

প্রার্থনার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি আছে আগে তাহার দু'একটি উল্লেখ করিব।

প্রথম, বিশ্বপতি ভগবান্ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মে পরিচালিত করিতেছেন, সকলই কার্য্য কারণ-সূত্রে গ্রথিত, অতএব তুমি প্রার্থনা করিলে কি তিনি তোমাকে নিয়মাতিরিক্ত কিছু দিতে পারেন! প্রার্থনা না করিলেই বা তোমার প্রাপ্য কোথায় যাইবে? তিনি সর্ব্বদর্শী, ন্যায়বান্, সকলকেই সমান দেখেন, তিনি তোমার অনুরোধে ভুলিয়া তোমার অধিক প্রিয় হইবেন?

দ্বিতীয়, এদেশে ধর্ম্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদর্শ 'যোগ'। ঐ আদর্শের সাধক দিগের উপদেশ, "ধ্যান ধারণার দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মস্থ করো, সেই স্বরূপে এক হইয়া যাও, নচেৎ তোমার প্রার্থনার ধর্ম্ম তোমাকে নিম্ন অঙ্গের সকাম ধর্ম্মে লইয়া যাইবে। তুমি যদি সেই পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারো, দেখিবে জগৎ সংসারে তোমার প্রার্থনার বস্তু কিছুই নাই। তুমি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পারো; কিন্তু তোমার কামনা কোথায়, ভর্জ্জিত বীজে কি আর অঙ্কুর হয়।"

এই প্রকার যাঁহাদের মত তাঁহাদিগকে "অদ্বৈতবাদী" বলা যায়। তাঁহাদের মতে "আত্মা এক, বহু নয়, এবং নিত্য; যাহা নিত্য তাহা অনাদি, তাহার আরম্ভ বা জন্ম নাই। যাহার আরম্ভ বা জন্ম আছে, তাহার শেষ বা মৃত্যু আছে, সুতরাং তাহা অনিত্য। অজন্মার স্রষ্টা কোথায়? তাহা স্বয়ম্ভু; স্বয়ম্ভু বহু হয় না, বহুর সীমা সংজ্ঞা আছে সুতরাং অনিত্য, উহা শারীরিক বস্তু হইতে পারে, আত্মা নয়। 'পাশ বদ্ধ ভবেৎ জীবঃ পাশ মুক্ত ভবেৎ শিবঃ।' তুমি নিজেকে আমি জ্ঞান করো উহা মায়া,—মায়া অবসান হইলে নিজেকে সেই পরমাত্মা বলিয়া বুঝিতে পারিবে।"

এই মত অত্যন্ত সত্য জীব ব্রহ্ম স্বরূপে এক, এই মহা সত্য ঋষিরা উপলব্ধি করিয়া ধ্যান-সমাধিতে মগ্ন হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ভাষ্যকারের "সোহং বাদ" অর্থাৎ আমিই সেই, নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভক্তিবিরোধী। আবার খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্মের দ্বৈতবাদ—অর্থাৎ ঈশ্বর একজন ব্যক্তি, মানুষ ও স্বতন্ত্র আর ব্যক্তি, এ ভেদ জ্ঞান মূলে অযৌক্তিক ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস। এইরূপ বিশ্বাসে কখনোই অহংভাব দূর বা উচ্চ যোগধর্ম্মে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়; উক্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের সাধক, তাঁহারা কোরাণ এবং বাইবেলের মধ্যে যেখানে একত্ব তত্ত্বগুলি আছে, তাহা গ্রহণ করিয়াই উচ্চ অঙ্গে অগ্রসর হন। যেমন ঈশা একস্থানে বলিয়াছিলেন, "আমি এবং আমার পিতা এক।"

কালে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি এবং সাধনার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সকল প্রকাশ হইয়া যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন হইয়াছে, তাহাই সাধকের কল্যাণপ্রদ। এই প্রবন্ধে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া মূল তত্ত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সাধকের, জ্ঞানের খুব উচ্চ অবস্থাতেও আপনাকে সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া জ্ঞান হয় না। সমাধিতে কোনো ভেদ জ্ঞান থাকে না বটে; কিন্তু তখনো একের সঙ্গে আর এক থাকে; এক অন্যের আনন্দ ভোগ করে, এক অন্যকে দেখিয়া মগ্ন হয়—একত্রেই দুই থাকে।

দ্বিতীয় যুক্তি—এক অদ্বিতীয় সত্তা একাকী থাকিলে কোনো সার্থকতা ছিল না, কে দেখিত, কে জানিত? দুই না হইলে লীলা হয় না, অব্যক্ত ব্যক্ত রূপে প্রকাশ হইলেন, ইহাই সৃষ্টি। উহা একেই ছিল, পুত্র পিতার ভিতরেই ছিল, সময়ে প্রকাশ হইল। সাকার, নিরাকারে দৃশ্যমান্ জগত সাকার পরিবর্ত্তনশীল, জড়গুণ বিশিষ্ট হইল, কিন্তু আত্মা ব্যক্তিত্বে ভেদ হইয়াও স্বরূপে নিত্যত্ব রহিল। কেননা স্বরূপেই তাঁহার প্রকাশ, অধিকন্তু নিত্য চিরদিন নিত্য। যাহা স্বরূপে তাহা অংশ হইয়াও অনন্তকে আশ্রয় করিয়া নিত্য, সুতরাং এখানে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধে অনন্ত উন্নতিও রহিল। যাহা অজড় অর্থাৎ চৈতন্য, তাহা চির উন্নতিশীল।

এক পূর্ণ শক্তি, স্বইচ্ছায় বহুধা বিকাশ হইলেন কিছুই অসম্ভব নহে। এখানে কোনো অস্বাভাবিক অবস্থার কল্পনা করিতে হয় না। একটু অন্তর দৃষ্টিতে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এক অখণ্ড শক্তির দ্বারা জীব-শক্তি সর্ব্বদা পরিচালিত হইতেছে। বাস্তবিক দুইটি ইচ্ছা একত্রে কাজ করিতেছে, একটি

ইচ্ছা আত্ম, তাহা আমি নিজ আয়ত্তে রাখিয়া কাজ করিতে পারি, সেই সকল কাজ করিতেও পারি, না করিতেও পারি। যে কাজ আমি ইচ্ছা না করিলেও করিতে বাধ্য, অথচ তাহাতে কোনো প্রকার আত্মগ্লানি হয় না, বরং না করিতে ইচ্ছা করিলে চিত্ত অপ্রসন্ন হয়, তাহা আমার ইচ্ছা নয়। তাহা আমারই ভিতরে ঈশ্বর ইচ্ছা। এই জ্ঞান লাভ করিলে যোগাবস্থা উপস্থিত হয়, ইহাই জীব ব্রহ্মের যোগ। "সোহং বাদ" অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একই, এই বিশ্বাস কাল্পনিক। ইহাতে ভক্তিতত্ত্বের একেবারে মূলচ্ছেদহইয়া যায়। আত্মার উন্নতি স্থগিত হইয়া পড়ে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যোগ ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান কিছুরই প্রতিকূল নয়, বরং উক্ত মতই সকল যোগগুলির অনুকূল। ভক্তি-পথের জ্ঞানী দিন দিন সুন্দর প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় জ্ঞানের সৌরভে, ভক্তির সৌন্দর্য্যে সেবার মনোহারীতায় জগদানন্দকর হইয়া উঠেন।

তারপর ঈশ্বরে বিলীন হওয়া একটি মত আছে, তাহা আরো অদ্ভুত; যাঁহারা ঈশ্বরে বিলীন-নির্ব্বাণ মুক্তির কল্পনা করেন, তাঁহারা এ কথাটা বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন না যে, নির্ব্বাণ-মুক্তি বা ঈশ্বরে বিলীন, ইহা ধ্বংসের নামান্তর মাত্র। জীবাত্মা পূর্ণ ব্রহ্মে বিলীন হইলে ব্রহ্মের এক ছটাক ওজন বাড়ে না, পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণই থাকেন। তাহাতে জীবাত্মার স্বার্থকতা কি? সুতরাং 'বিলীন' কথাটা ধ্বংস কথা ছাড়া আর কি বলিব? আমার জ্ঞান যদি না রহিল, তবে আমার থাকার স্বার্থকতা কি? আমি জীবন্মুক্ত হইয়া অনন্তকাল ব্রহ্ম ইচ্ছায় যুক্তভাবে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আরো কত কত মুক্তাত্মার সঙ্গে পরমানন্দে বিচরণ করিব। এই তো দিব্যাবস্থা। অতএব সৃষ্ট বল না বল অনন্ত হইতে যে নিত্য-বিন্দুর প্রকাশ তাহা নিত্যকাল নিত্য-বস্তুর সঙ্গে যদি না থাকিবে, তবে তাহার নিত্যত্ব কোথায়।

অতএব পরমাত্মার সঙ্গে আত্মা অভেদ, অথচ ভেদ, এই তত্ত্বের নাম 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।' পরমাত্মা এবং আত্মা এ উভয় জ্ঞান বিশ্বাস যদি যুক্তি পূর্ণ সত্য সঙ্গত না হয়, তবে বিশ্বাস কখনোই স্বাভাবিক হইবে না, স্বাভাবিক বিশ্বাস ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন বা বিশুদ্ধ চরিত্র লাভও অসম্ভব। আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই, মানুষ বিবিধ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনে বিশ্বাসের তেমন ফল পাইতেছে না, জীবন নিস্তেজ। জড়াসক্তিতে আবদ্ধ; চৈতন্য বলহীন। অতএব বিশ্বাস খাঁটী হওয়া আবশ্যক। আমার দেহ

অনিত্য, কিন্তু আত্মায় আমি নিত্য ; আমার ইষ্টদেবতা আমার প্রাণের প্রাণ, তিনি যেমন সকলের তেমন আমার। তিনি আমার বাহিরেও সত্য, কিন্তু আমার ভিতরে অবিচ্ছেদে আমার সঙ্গে আছেন। আমার বলিতে কিছুই আমার নয়, সকলই তাঁহার, তিনি আমার আমি তাঁহার। দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিশ্বাস এইরূপ।

এখন একবার ভাবিয়া দেখা উচিত আমার প্রাণময়, প্রেমময় ইষ্ট দেবের নিকট প্রার্থনা করা তাঁহাকে কথায় ভুলাইয়া বশীভূত করা নয়, কিন্তু আমার মূঢ়তা দূরের জন্য মহা প্রয়োজন। প্রার্থনাও কর্ম্মফলের অন্তর্গত ; আমরা যে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হই, তাহা কেবল বাহিরের কর্ম্মের জন্য নয়, আন্তরিক ভাবযুক্ত কর্ম্মের জন্য। প্রার্থনা, একটি বিশেষভাব শুদ্ধি কর্ম্ম, এমন কি প্রার্থনাই সকল সকাম কর্ম্মের নিবারক। প্রার্থনাই সাধককে নিষ্কাম ইচ্ছা-যোগে লইয়া যায়। প্রার্থনার উচ্চ আদর্শ ("Thy well be done") "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" অন্তরাত্মার সঙ্গে ভাবে ও জ্ঞানে সমতা সাধনের একমাত্র উপায় প্রার্থনা।

প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে—নিজ আত্মার জন্য, অপরের জন্য, দৈনিক ঘটনায় আপদ্ বিপদ দূরের জন্যও প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর আবার যে চেতনা ফিরাইয়া পাই, আবার একটি দিনের জন্য তাঁহার দয়া এবং মহিমা উপভোগের জন্য জাগি, এবং প্রতি-দিনের কার্য্য যাহাতে তাঁহার অনুগত দাস হইয়া করিতে পারি, আমিত্ব অভিমান তাহার মধ্যে না আসে, এ জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্নগ্রহণকালে, অন্নদাতারূপে তাঁহাকে অন্তর-চক্ষে দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা আবশ্যক। সমস্ত দিনের কর্ম্মান্তে আবার তাঁহারই চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিদ্রিত হওয়া উচিত। এইরূপে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ প্রার্থনায় জীবন ভরিয়া তুলিতে না পারিলে এই মলিন জীবনের অবসান হয় না। জ্ঞানের উন্নতিতে প্রার্থনাকে বিশুদ্ধ করে, আবার প্রার্থনাই জ্ঞান বিকাশের একটি বিশেষ সহায়। তুমি কেবল একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে উপকার না পাইবে, কিন্তু প্রার্থনা করিয়া পাঠ করিলে দেখিবে কোথা হইতে সহজে জ্ঞানলাভ হইতেছে। প্রার্থনাই সাধককে যোগের অনুকূলে লইয়া যায়। সাধন রাজ্যে প্রার্থনা অত্যন্ত আবশ্যক। এই প্রার্থনার আদর্শ ঋষিদিগের মধ্যেও আরম্ভ হইয়াছিল।

"ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।"

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করয় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহপাপ হইতে রক্ষা করো; আমাকে পরিত্যাগ করিয়ো না, আমাকে বিনাশ করিয়ো না।

হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা করো। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো।

তুমি যে সুখকর, কল্যাণকর, সুখ কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

তৎপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রার্থনার ভাব আরো বিকাশ হইয়াছে,—ভক্ত নরোত্তম দাসের প্রার্থনা,—

"হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পায়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।
গোলকের প্রাণধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেন তায়।
এ সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।"

কিন্তু এই প্রার্থনার জন্য আমরা মহর্ষি যীশুর নিকট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঋণী। খৃষ্ট ধর্ম্মে প্রার্থনার ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। বর্ত্তমান যুগে যীশুর প্রার্থনা প্রাচ্য যোগ ধ্যানের সহিত সামঞ্জস্য হইয়া আবার এই প্রাচ্য জাতির সম্মুখে এক মহান্ আদর্শ বিকাশ হইয়াছে। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান কর্ম্মের সমাবেশে এখন যাহা জগতের ধর্ম্ম হইবে, তাহারই পূর্ব্বাভাব দেখা যাইতেছে। বিধান-প্রেরিত মহাপুরুষ এবং ভক্তগণ মহা-প্রয়াণ করিলে একবার জনসমাজে অন্ধকার আসে, এখন সেই লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু এই অন্ধকার চিরদিন থাকিবে না। জগতের আধ্যাত্ম-তত্ত্ব পিপাসুগণের নিকট বর্ত্তমান আদর্শই যে আদরণীয় হইবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। আর বর্ত্তমানে যে অল্পসংখ্যক সাধকও এই ধর্ম্ম জীবন গঠন করিয়া গেলেন, তাঁহারাও ধন্য হইলেন। দাস—

পাথেয়

——:০:——

সদ্যোজাত শিশুর মনটা সাদা কাগজের মতো, তাহাতে একটুও আঁচড় কাটা নাই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে যাহা দেখে, শুনে, নাড়াচাড়া করে, আর ভাবে, তাহার মনে তাহারই একটা দাগ পড়ে। এইরূপে একটার পর একটা করিয়া দাগ পড়িতে পড়িতে মস্তিষ্করূপ Sensitive Plateখানি ভরিয়া উঠিতে থাকে, মনের ভাণ্ডার বোঝাই হইয়া যায়।

ইংরাজ দার্শনিক মনস্বী লকের এই মত যুক্তি বলেই হউক, অথবা আমাদের জন্মার্জ্জিত সংস্কার বশেই হউক, আমরা গ্রহণ করি না, উহাতে আমাদের বিশ্বাস ও নাই। আমরা বলি বৃদ্ধের সকল অবয়ব, সকল শক্তি, তাহার সারাটি জীবনের ইতিহাস ঐ সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে নিহিত ছিল, তখন যাহা চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। আবার শিশুতে যাহা প্রকাশ পাইল তাহা গর্ভস্থ ভ্রূণ মধ্যে লুকাইয়া ছিল এবং অণ্ডাকৃতি ভ্রূণ বিন্দুমধ্যে ধৃত ছিল। বিন্দু শিশুতে, শিশু বৃদ্ধে পরিণত হইল মাত্র। বিন্দুটি কি বৃদ্ধের ঐ অত হাড়ের বোঝা, মাংসের পিণ্ড, রসরক্তের রাশি তাহার অনুপ্রমাণ পরিসরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল? বৃদ্ধকে যৌবনের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছিল, যুবককে শৈশবের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছিল, শৈশবের পশ্চাতে কি ছিল? ছিল, শিশুর গর্ভবাস। গর্ভস্থ ভ্রূণের পূর্ব্বাবস্থা কি ছিল?—ছিল, একটি বিন্দু। ক্রমেই স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পৌছিতেছে। বিন্দু কোথায় বাস করিতেছিল?—অনঙ্গ বা অ-তনুর মধ্যে। অ-তনু কোথায় ছিল?—ছিল পূর্ব্বপুরুষের মনের মধ্যে। এই পূর্ব্বপুরুষের মনের শক্তি ও সংস্কার পুরুষানুক্রমে এইরূপে সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিয়া বক্ষ্যমান শিশুতে পরিণত হইয়াছে। শিশু যাহা স্বভাবে করে, যাহা না ভাবিয়া না বুঝিয়া করিয়া বসে, তাহার এরূপ প্রত্যেক গতিবিধি দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে সে সব তাহার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের পুনরভিনয় বা তাহার জন্মাধিকৃত স্মৃতির আবরণগুলির উদ্‌ঘাটন।

শিশু জন্মিয়াছে অবয়ব লইয়া। এ অবয়ব সে কোথা হইতে পাইল? ইহা তাহার বংশগত—কতক তাহার পিতার, কতক তাহার মাতার, কতক পিতৃকুলের, কতক মাতৃকুলের। এমনো হইতে পারে যে, সে বাপমায়ের কোনো

সাদৃশ্যই পায় নাই, কিন্তু মুখে বা কোনো না কোনো অঙ্গে একপুরুষ পূর্ব্বের না হয় বহু পূর্ব্বপুরুষের কোনো ব্যক্তির মুখের বা অঙ্গ বিশেষের আদল আসে। বাহিরের আকারের সঙ্গে মন ও মনের ধর্ম্মও ঐ ভাবে শিশুর সঙ্গী হয়। শিশু তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারে ও অনুভূতিগুলিতে তাহার এ জন্মের মস্তিষ্কটি বোঝাই করিয়া আনিয়াছে। এখনো তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মস্তিষ্কের রেখাগুলি স্পষ্ট হয় নাই—সবগুলিও প্রকাশ পায় নাই। কতকগুলির এখন আদ্‌রা দিয়াছে মাত্র। ক্রমে ক্রমে আঁচড়গুলি ফুটিয়া উঠিবে। শিশু তাহার পূর্ব্বপুরুষের সংস্কারে বা অভ্যাসের স্মৃতি লইয়া আসে বলিয়াই তাহার পছন্দ অপছন্দের বস্তু থাকে, তাহার প্রীতি অসন্তোষের কারণ জন্মে। শিশু কি চায়, কি না চায়, তাহার মেজাজের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় তাহার ধাত কি; তাহার এই নিজস্ব প্রকৃতি, আর সকল শিশুর মধ্য হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। সদ্যোজাত শিশুর যখন কিছুই ফোটে নাই, তখন সে যা' দেখে, যা' শোনে তা'র সবগুলির ছাপ তাহার মস্তিষ্কে পড়ে না। অনুকূলগুলির পড়ে, প্রতিকূলগুলির পরিত্যক্ত হয়। সেগুলি সে ঝাড়িয়া ফেলে। পূর্ব্ব পুরুষের অভ্যাস ও সংস্কারের স্মৃতিই এ জন্মের বিষয় বস্তু হইতে বাছিয়া গুছিয়া অনুকূলগুলি গ্রহণ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি দান করে। চতুর্দ্দিকের বিষয় ব্যাপার তাহার লুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলে। তাহারই ভিত্তির উপর শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়।

শিশু যে সম্বল লইয়া আসে, তাহাই তাহার জীবন-পথে অগ্রসর হইবার পাথেয়; উহা তাহার ভবের হাটে বাণিজ্য করিবার মূলধন। এই মূলধন সে যত বৃদ্ধি করিতে পারে, বার্দ্ধক্যে পৌছিতে পৌছিতে তাহার লভ্যাংশ দান করিয়া বিলাইয়া তাহার যত সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতে পারে, ততই তাহার গৌরব। তাহাতেই তাহার কৃতিত্ব। যে শিশু যত অল্প পাথেয় লইয়া আসে, সে ভবের হাটে আপনাকে ততই নিঃসম্বল দেখিতে পায়। কেহ যুঝাযুঝি করিয়া, "মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন" করিয়া মূলধন বৃদ্ধি ও সম্পত্তি করিয়া লয়—কেহ যুঝিতে না পারিয়া পাথেয় শেষ করিয়াই নিঃস্ব হইয়া পড়ে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

নিবেদন

আপনার পাপখানি
আপনি টানিয়া আনি' ;
দিব হে চরণে তব বাসনা আমার,
যে চরণ পুষ্পদলে
প্রীতি-স্নিগ্ধ-পুণ্যজলে
পূজে সবে, দিব তাঁরে পাপ উপহার।
আমার পূজার রীতি—
নাহি পুণ্য, নাহি প্রীতি,
হৃদয়ে জাগায় ভীতি ঘনায় আঁধার,
সে আঁধারে একাকিনী
বসি' এই পূজারিণী
তব নামখানি হৃদে যপে অনিবার।
আপনারে দিয়া তবে
পূজা সমাপিতে হবে,
হেন কথা শতমুখে শুনি শতবার ;
মোর মাঝে মোর যেটি
আনিয়া ধরিনু সেটি,
সব হ'তে এ যে মোর শুদ্ধ আপনার।
গোপনে রাখিয়া পাপ,
ভাবি দিব পুণ্যভাগ
এবে দেখি পুণ্য যাহা সকলি তোমার ;
ওহে দেব পুণ্য-সেতু
সর্ব্ব-পাপ-মুক্তি-হেতু !
লহ লহ পাপরাশি অধম জনার
এতদিনে মন মোর
মুক্ত, হের নিশি ভোর—
পূর্ব্বাকাশে কার হাসি প্রকাশে এবার।

শ্রীহেমলতা দেবী

কুশদহের ইতিহাস

---o---

সমতট ও ডবাক

প্রয়াগের অশোকস্তম্ভের একস্থানে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়া পূর্ব্ব দেশের সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি প্রত্যন্তরাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। 'সমতটের' নাম আরো অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে বরাহাচার্য্যের বৃহৎ সংহিতায় 'সমতট' রাজ্যের নাম আছে; কিন্তু 'ডবাক' নাম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই ঢাকাকেই সমতট বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। একমাত্র জেনারল কানিংহাম ভৌগোলিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত মুরনী নামক গ্রামকে প্রাচীন সমতট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, তাঁহার মত এখন আদৃত হইতেছে। ওয়াটার সাহেবের মতে ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্ব্বে সমতট অবস্থিত। বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক সাহিত্যজগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত মত অনুসরণ করিয়াছেন। যদিও ভূমিকাটি পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত তথাপি গ্রন্থকারও যে উক্ত মতের অনুবর্ত্তী এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যখন খ্যাতনামা দুইজন লেখক ঢাকা বা বিক্রমপুরকে সমতট বলেন নাই, তখন আমিও ভরসা করিয়া আমার বক্তব্য এখানে পরিষ্কার করিয়া বলিতে সাহসী হইলাম।

কানিংহাম সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে আমি যশোহর জেলার অন্তর্গত মুরনী গ্রাম সমতট বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, কুশদহের অন্তর্গত জলেশ্বর বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনো স্থান সমতট হইবে।

এক্ষণে সে মতেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছি। পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, ভাগীরথী ও কপোতাক্ষীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ কুশদ্বীপ। ইহার মধ্যে বেত্রবতী বা বেত্না তীরে সমতট অবস্থিত ছিল। আমার মনে হয়, সমতট নাম এখনো একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনো বেত্না তীরে

'সামটা' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সম্ভবত তাহাই প্রাচীন সমতট। কেবল যে নাম সাদৃশ্য দেখিয়া আমি এরূপ মনে করিয়াছি, তাহা নহে। এরূপ মনে করিবার আরো অনেক কারণ আছে। সামটার সংলগ্ন বাগুড়ি বাগাচড়া প্রভৃতি গ্রাম অতি সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামগুলি প্রাচীনও বটে। ইহারই ৫।৬ ক্রোশের মধ্যে বেনাপোল, লাউজানী, বুড়ন প্রভৃতি পুরাতন হিন্দুরাজ্য-গুলি ছিল, এবং সোনাবেড়িয়ার মঠবাড়ী এখনো ভগ্নাবস্থায় আছে। ইহার অল্পদূরে ইচ্ছামতী তীরে চাতড়িয়ার মন্দির তারাপীঠ এখনো আছে। ইহার অল্পদূরে ধনপোতা নামে একটি ধ্বংসাবশেষ আছে। সেখানে কেহ কেহ প্রচুর অর্থ পাইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সকল পুরাতন মুদ্রার একটিও কেহ কখনো সংগ্রহ করেন নাই। কর্মকারের দোকানেই সেগুলির পরিচয় হয় ও রূপান্তর প্রাপ্তি ঘটে! বাগুড়ি বাগাচাড়ায় অনেক পীরালি দেখা যায়। তাঁহারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহম্মদ তাহের পীর আলি খাঁর সময়ে স্বধর্ম পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ কানিংহাম সাহেবের উল্লিখিত মূরনীও এখান হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই সকল কারণে আমি "সামটা"কে সমতট মনে করিতে বাধ্য হইলাম। আমার ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ দয়া করিয়া আমার ভ্রম প্রদর্শন করিলে আমি বাস্তবিকই সুখী হইব। বিষয়টির যতই আলোচনা হইবে, ততই সত্যাবধারণের সুযোগ হইবে। সুখের বিষয়, য়ুরোপীয় লেখকগণের মতামত এখন আর "অভ্রান্ত সত্য" বলিয়া স্বীকৃত হয় না। সকলেই স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া বিষয় বিশেষের মীমাংসা করিতে অভিলাষী। কেহই পর মুখাপেক্ষী নহেন। এইজন্য ভরসা করিয়া এ বিষয়ে যোগ্যতর লেখকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি।

ডবাক—এ পর্য্যন্ত ডবাক সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচনা হইয়াছে কি না আমি বলিতে পারি না। সেইজন্য সাহস করিয়া এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম। আমার মনে হয়, ডবাক নাম হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সাধারণ লোকে এখনো ডাগ্না বা ডাহা নামে ঢাকার উল্লেখ করিয়া থাকে। এই ডাগ্না বা ডাহা শব্দ ডবাক শব্দেরই অপভ্রংশ। আমাদের নিম্নবঙ্গে সাধারণত গুবাক শব্দটা গুয়া নামেই কথিত হয়। সুতরাং ডাগ্না বা ডাহা নামে যে ডবাক অভিহিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। কেবল নাম সাদৃশ্য লইয়া এ বিষয়ে মত প্রকাশে অগ্রসর হওয়া সাহসের কর্ম্ম সন্দেহ নাই। তবে সত্য কথা

বলিতে হইলে নাম সাদৃশ্য একেবারে পরিত্যজ্যও নহে। আসল কথা, আমাদের দেশে 'ডাকের বচন' বলিয়া যে সকল প্রবচন প্রচলিত আছে, যে গুলিকে বাংলা ভাষার আদি রচনা বলিতে হইবে, সেগুলি এই ডবাক দেশ প্রচলিত প্রবচন মাত্র। নতুবা ডাক পুরুষ নামক কোনো ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস, যে ঢাকাই বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ রোম সম্রাটের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল, যে স্থানের বয়ন শিল্প উনবিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানের জন্মভূমি য়ুরোপে অতুলনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, যে ঢাকার মসলিন অদ্যাপি তুর্ক সুলতানের অতি প্রিয় বস্তু, যে ঢাকার সুধীগণের জন্য বঙ্গদেশ তিব্বতের শিক্ষাগুরু পদে বৃত হইয়া সমগ্র এসিয়া খণ্ডে সম্পূজিত হইয়াছিল; যে ঢাকার বীর সন্তানগণের বাহুবলে একদিকে পোর্ত্তুগীজ ও অপরদিকে মোগলবাহিনী বিমর্দ্দিত হইয়াছিল; সেই ঢাকা হইতেই যে স্বদেশের ভাষায় আদি রচনা উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাকের বচন যে ডবাক প্রদেশের প্রচলিত প্রবচন, তাহা বিশ্বাস করিতে আপত্তি করিতে পারা যায় না। কেননা ডাকবচনগুলি ভূরিদর্শনের ফল। যেরূপ অভিজ্ঞতালাভ করিলে এরূপ প্রবচন করা যাইতে পারে, এবং যাহার যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধারণ লোকে আদর করিতে পারে, সেরূপ জ্ঞান, সেরূপ বহুদর্শিতা একমাত্র বৈচিত্র্যবিহীন জীবনে সম্ভবপর। আমার ধারণা, সমতটবাসীর এরূপ অভিজ্ঞতা-লাভের অবসর ছিল না। সমুদ্রচারী নৌযুদ্ধপরায়ণ বিদেশ গমনে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ কখনো আষাঢ়ের তিথিবিশেষ হইতে বৎসরের বা চাষের ফলাফল নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই! বিদেশ গমনে অনভ্যস্ত, অপ্রবাসী পর্য্যবেক্ষণ প্রিয়ব্যক্তিগণই এরূপ ভূরিদর্শনের ফলাফল সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া থাকেন। ডবাকবাসীগণ ঘরে বসিয়া শিল্পের ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে সময়ক্ষেপ করিতেন। নচেৎ শিল্পের উন্নতিতে তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভে সমর্থ হইতেন না। কলাবিদ্যায় উন্নত দেখিয়া তাঁহা-দিগকে প্রবাসে অনভ্যস্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এরূপ ব্যক্তিগণ যে ভূয়োদর্শনের ফলাফল সাধারণ্যে প্রচার করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং ডবাক প্রচলিত প্রবচনগুলিকেই ডাক বচন বলিয়া গ্রহণ করিলে বোধ হয়, কেহ আমাকে বাতুলালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন না।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা বিষয়ে দান

মিঃ পালিত স্বদেশবাসীর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়! বাংলা দেশে তিনি যে উচ্চাদর্শ দেখাইয়াছেন :



শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত

সমগ্র বাঙালী জাতিকে চিরদিন তাঁহার প্রস্তাবিত সদনুষ্ঠান দ্বারায় গৌরবান্বিত

করিয়া রাখিবে। শুধু বাঙালী জাতি নহে, সমগ্র ভারতবাসীর নিকট একটি সুমহান্ দৃষ্টান্ত অমর হইয়া থাকিবে।

মিঃ পালিত ধনী নহেন, আজীবন আইন ব্যবসার দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার জীবতাবস্থায় সন্তান থাকা সত্বেও উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ দেশের লোকের উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ দানের পরিমাণ সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা। এই অর্থের দ্বারা ছাত্রবাস সংশ্লিষ্ট একটি বিজ্ঞান কলেজ হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই দান প্রাপ্ত হইয়া পালিত মহাশয়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভাইস্‌চ্যান্সেলার সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত অর্থাভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। মিঃ পালিতের দানে সে অভাব দূর হইল।" তিনি সর্ব্ব প্রথমে যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, ভগবানের কৃপায় আমাদের দেশের অন্যেও আজ সে পথ অনুসরণ করিতেছেন।

আজ আর একজন মহাত্মার নাম উল্লেখ করিতেছি। তিনি আমাদের দেশবাসীর হৃদয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মহান্ দানে সকলের হৃদয়ে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নবরস সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। আইন ব্যবসায়ে ডাঃ ঘোষের ন্যায় বিচক্ষণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আছেন কি না জানি না। তিনি যশ, ও ক্ষমতাতে আইন ব্যবসায়ীগণের অগ্রগণ্য। সম্প্রতি তিনি স্বদেশবাসীর শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা মিঃ তারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিজ্ঞানশিক্ষালয়ে কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি নির্ব্বাচিত থাকিবে ও উক্ত শিক্ষালয়ের উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয়িত হইবে। ডাঃ ঘোষ ইতিপূর্ব্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাহা বেঙ্গলি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ভবিষ্যতে আরো দশ লক্ষ দান করিবেন।

বাংলাদেশ বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাবিষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ। যে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মিঃ পালিত ও ডাঃ ঘোষ আপনাদের জীবনব্যাপি পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ অকাতরে দান করিয়া গেলেন, সমগ্র বাংলাদেশের জনসংখ্যা হিসাবে ইহা যথেষ্ট নহে। যেদিন বিধাতার আশীর্ব্বাদে উক্ত

মহাত্মাগণের সংকল্প, সাধন দ্বারায় বঙ্গবাসীগণ বিজ্ঞানের বিমল-জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্ট পদ্ধতি দ্বারায় কৃষিশিল্পও বৈজ্ঞানিক নানা কলকৌশল



ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ

আবিষ্কার করিয়া নানা শিল্প দ্রব্য ভারতের প্রতি সহর, নগর, পল্লীতে বিপনি

শ্রেণী স্বদেশজাত দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিবেন, আশা হয় সে সুদিন অদূরে প্রতীক্ষা করিতেছে।

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ দেশবাসীর নিকট বহু পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত। দেশের সমস্ত জনহিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিয়া আসিতেছেন। এবার দামোদরের বন্যায় পশ্চিম বঙ্গের কত স্থানের কত লোকের ঘর বাড়ি ভাসিয়া গিয়াছে, লোকের অন্ন বস্ত্রের কত কষ্ট হইতেছে, ডাঃ ঘোষ বন্যা প্রপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্থ লোকের দুঃখমোচনের জন্যও বহু অর্থ দান করিয়াছেন। ধন্য! যাঁহারা দেশবাসীর শিক্ষা ও দুঃখ দূর করিবার জন্য দান করেন! তাঁহাদের দানের ফল স্বরূপ সদ্ভাব ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকুক!

শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত।

পাখীর লেকচার

(উদ্ভট)

স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি যেন একজন পক্ষিভাষাবিদ্ হইয়া উঠিয়াছি! মনে বড় উল্লাস হইয়াছে! একটা পাখীর ডাক শুনিতে পাইলে হয়—অমনি বুঝিয়া লইব পাখীটা কি বলে?

হঠাৎ দেখিলাম, আমি যেন মিত্তিরদের বার বাড়িতে! আবার দেখি একটা টিয়া দাঁড়ে বসিয়া কিচির মিচির কি ছাই ভস্ম বকিতেছে। আমি তখন আমার নূতন শিক্ষার লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলাম—যত শুনি ততই ভাবিতে লাগিলাম—পাখীটা বলে কি?—শুনিবে?—

পাখী বলিতেছে:—

"আমি বাবুদের বড় মেয়ের আদরের পাখী, জাতিতে টিয়া। সাধ ক'রে আমার নাম রাখা হ'য়েচে—'হীরামণি'। আমি সোণার দাঁড়ে থাকি, পোড়াদেশে হীরে মাণিকের ছোলা পাওয়া যায় না, তাই আমায় এই ছোলা খেতে দেয়। মনের মত ছোলা দিতে পারে না ব'লে এরা কত রকমের কত ফল এনে আমায় খাওয়ায়!

"তারপর আদরের কথা! তোমরা যাকে আদর করা বলো, আমি সেই

আদরের কথা ব'ল্‌চি!—তা' সে রকম আদর আমি যেমন পাই, তেমন তুমি বোধ হয় কখনো পাও নি, আর পাবেও না, কেমন আদর শুন্‌বে?

"বাবুদের বড় মেয়ে—নাম নীলা—রোজ ভোরে উঠে আমায় তাদের বাগানে নিয়ে বেড়ায় ফুলের হাওয়া খাওয়ায়—তোমাদের মত কথা বলা শেখায়—আর ঘন-ঘন চুমু খায়—ভাগ্যে আমি বিহঙ্গিনী হ'য়ে জন্মেছিলুম!

"তা' থাক্—আমার সুখ শুনে কি হবে—তোমার তো এমনটি সুখ নেই!

হঠাৎ পাখীটা কেমন গম্ভীর হইয়া গেল—আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু এই সুখই কি আমার প্রাণের খিদে মিটায়?—তা' যদি হ'তো—তা' হ'লে কাকটা শালিকটা যখন এ গাছ ও গাছ ক'রে বেড়ায়, তখন কেন আমার বুকটা ফেটে গেল ব'লে বোধ হয়?—আর সেই সময় একটা অনেক দিনের ভুলে যাওয়া ঝাউগাছের কথা কেন অল্প অল্প মনের মাঝে ফুটে উঠে—তখন এ ছাই সোণার শিকল কেটে ফেলে সেখানে উড়ে যেতে প্রাণ কেন কেঁদে উঠে!—ভালোবাসার চেয়ে আবার সুখ কি আছে—নীলা যদি সত্যিই আমায় ভালোবাসে তা' হ'লে আমার মত সুখী কে?—তা' হ'লে এত সুখে আমি এত অসুখী কেন?—

"কিন্তু—মানুষে কি ভালোবাসে? তারা কি ভালোবাস্‌তে জানে?—তারা স্বার্থপরতার ওপর ভালোবাসার বার্ণিস দিতে বড় পটু!

"তারা মূর্খ—তাই, যা' অনন্ত তা'কে তারা সসীম ভেবে অসীমের সীমা দিতে যায়! অসীমের সীমা—ভালোবাসায় স্বার্থ! কই চাঁদ সূর্য্যি তারা তো সকলেরি জন্যে সমান আলো দিয়ে থাকে!—এক আকাশের জল তো সব যায়গাই পড়ে—একটা ছোট ফুল—সেও তো তার গন্ধটুকু সকলের জন্যেই ঢেলে দেয়—আর এই বনের পাখী—এরা এত গান গেয়ে সকলকেই শোনাতে চায়!—তবে এই মানুষগুলো কেন এমন হ'লো!—তাদের সেই এক-প্রাণ একজনের বেলায় কাঁদে, আর একজনের বেলা কাঁদে না! তারা না কি তাদের মিত্র নয়—শত্তুর—তাই তাদের বিপদে আমোদ হয়!—হায়!—হায়!—রবির মুখে অন্ধকার, আর নদীর মুখে কুটো—ভালোবাসার কাছে শত্তুর!—নদীর মুখ বেঁধে স্রোত কমা'লে কেন—তাই তো কুটো ভাস্‌চে—"

যাক্ আর হ'লো না। পাখীর কথা শেষ না হ'তেই কে আসিয়া জাগাইয়া দিল—একটি তিন বৎসরের খোকা—ডাক্‌চে—"ওত—ওত"—ছেলেটি আমার কে?—আমার সর্ব্বস্ব!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

ধাতু দৌর্ব্বল্য
ও
তাহার প্রতিকার

—:o:—

সোনার বাংলার স্বাস্থ্য-শোচনীয়তার প্রতি লক্ষ করিলে মন স্বতঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কেমন নীরোগ দেহ লইয়া শতাতীত জীবী হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে আমরা জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালসার দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমালা পরিধান করিয়া অম্লোদ্গার তুলিতে তুলিতে চত্বারিংশৎ বর্ষ মধ্যেই সংসার-নাট্যমঞ্চের অভিনয় সমাপ্ত করিতেছি। এখন দেশের লোকের মুখ-শ্রী ম্লান, চক্ষু কোঠরগত, মন স্ফুর্ত্তিহীন। ইহার বহুবিধ কারণ থাকিতে পারে; পরন্তু শুক্রদোষই যে তন্মধ্যে প্রধানতম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শতকরা ৭৫ জনের মধ্যে এই দোষ দৃষ্ট হয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাই আজ বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুক্রদোষ বা ধাতু দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতেছি।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই এই দুশ্চিকিৎস্যব্যাধির মুখ্য কারণ। শরীরে শুক্রধাতু অবিকৃত থাকিলে চিত্তপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগ দ্বেষাদিও হ্রস্ব হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে বলিতেছেন,—"মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" আমাদের স্বর্গগত পিতৃ পিতামহগণ মিতাহার, মিতবাক্, মিতনিদ্র ও সংজিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন। আমরা ব্রত-ভঙ্গ করিয়াছি। কুভোজন, অতিভোজন দুরালাপ, আলস্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এখন আমাদের নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে। এইরূপে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলে "শ্যামা" কি করিবেন?

অবিমৃষ্যকারিতার সহিত ইন্দ্রিয়সেবা করিলে কিরূপ কুফল ফলে তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,

"কুরঙ্গঃ—মাতঙ্গ—পতঙ্গ—ভৃঙ্গ—মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।"

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন ইহারা একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সমবেত পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবাকারীর মরণ না

হইবে কেন? আমরা প্রায় সকল ইন্দ্রিয়েরই অবৈধ সেবা করিতেছি; সুতরাং আধি, ব্যাধি ও অভাবের পীড়নে নিষ্পেষিত না হইব কেন?

রাত্রি জাগরণ, উত্তেজক দ্রব্য আহার, অতিভোজন, আলস্য, কুচিন্তা, ও অসৎ গ্রন্থ পাঠাদি এই রোগের গৌণ কারণ। "ভোগে রোগভয়ং।" আমরা অনেক সময় মাংস, ডিম্ব, পলাণ্ডু ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য স্বেচ্ছামত আহার করিয়া এই ব্যাধিকে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকি। উত্তেজক আহারে মনশ্চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়; সাত্ত্বিক আহারে মন স্থির হয়।

গীতা বলিয়াছেন,—"আয়ুঃ সত্ত্বাবলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥"

সাত্ত্বিক আহার চিত্তের বলকারক, হৃদ্য এবং আয়ু, আরোগ্য বল, সুখ ও প্রীতি-বর্দ্ধক। খাদ্য দ্রব্যের বিধি নিষেধ, ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের চিন্তা-প্রসূত তত্ত্বসকল উপেক্ষনীয় নহে।

ধাতু দৌর্ব্বল্য রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এতদ্দেশে প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর এই রোগ ভোগ করিতেছেন। এই রোগে মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। রোগীর মুখ-শ্রী কেমন এক প্রকার রুক্ষভাব ধারণ করে। সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল শক্তিহীন হইয়া যায়। পরিপাক বিকার, স্মরণ শক্তির হ্রাস এবং উদ্যমহীনতা ইহার নিত্য সহচর। কখনো কখনো ইহা হইতে মৃগী, যক্ষ্মা, উন্মত্ততা প্রভৃতি অসাধ্য ব্যাধি সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাজারে এই রোগের বহুবিধ ঔষধ বিক্রয় হয়। যে দেশে যে রোগের আধিক্য যত অধিক, সে দেশে সে রোগের ঔষধের অপ্রাচুর্য্য থাকে না। ইহার প্রতিকার কল্পে কত লোক কত সালসা, বৈদ্যুতিক ঔষধ, অঙ্গুরী, মাদুলি, কবচ ইত্যাদি যে বাহির করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে লোকে হীরা জীরার পার্থক্য বুঝিতে পারে না। দরিদ্ররোগী রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া একবার সালসা, একবার কবচ ক্রয় করিয়া "ইতো নষ্টতো ভ্রষ্টঃ" হইয়া পড়ে। সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক বহুমূল্য শাস্ত্রীয় ঔষধ ব্যবহার করাও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমি এই স্থলে একটি সুপরীক্ষিত ঔষধ লিপিবদ্ধ করিলাম। যে সকল নষ্টশুক্র ব্যক্তি রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

জেলা ২৪ পরগণা জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব রেকর্ডকীপার এবং অধুনা বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব C. S. I. মহোদয়ের ধনাধ্যক্ষ মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃব্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থান কালে একটি মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর নিকটে এই ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে এই ঔষধ ব্যবহারে সমধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়া এত কাল পর্য্যন্ত অনেক লোককেই ইহা দ্বারা রোগ মুক্ত করিয়াছেন। এক সময়ে মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির গৃহ-চিকিৎসক বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও নিতান্ত স্বল্প নহে। হীনবীর্য্য বঙ্গবাসিগণ উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব ত্যাগ করিয়া এই মহৌষধ ব্যবহার করিলে নববলে বলীয়ান্ ও আয়ুষ্মান হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

তিসী	... ...	./।০	এক পোয়া
কাঁচা হরিদ্রা	... ...	./।০	ঐ
কার্পাস তুলার বীজ মধ্যস্থিত শস্য	...	./৵০	অর্দ্ধ পোয়া
ক্ষুদ্র শাল্মলী বৃক্ষের মূল	...	./।৵০	দেড় পোয়া
খোরমা	... ...	./।০	এক পোয়া
চিনি	... ...	./॥০	অর্দ্ধ সের
গব্যঘৃত	... ...	./॥০	অর্দ্ধ সের
৩ নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর।	...	~~/৩~~	~~তিন সের~~

খোরমা এক জাতীয় শুষ্ক খর্জ্জুর ফল বিশেষ। ইহা কলিকাতার বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি মেওয়া ফল বিক্রেতাদিগের দোকানে পাওয়া যায়। প্রথমে তিসী, কাঁচা হরিদ্রা, কার্পাস তুলার বীজ মধ্যস্থিত শস্য, শাল্মলী মূল এবং খোরমা উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সুচূর্ণ করিবেন। ইহার দ্রব্য চতুষ্টয় সহজে চূর্ণ হয় না। অতএব যে সকল স্থলে অবিলম্বে ঔষধ প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়, তথায় বাটিয়া লইলেও চলিতে পারে। কার্পাস তুলার বীজগুলি সাবধানে ভাঙিয়া উহার মধ্যস্থিত শস্য বাহির করিয়া লইবেন। একখানি কটাহে ঘৃত চাপাইয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে জ্বাল দিতে হইবে। ঘৃত নিশ্চল নিষ্ফেন ও বিরত-শব্দ হইলে উহাতে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ বা পিষ্ট দ্রব্য, চিনি ও ক্ষীর, প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িতে থাকিবেন। সমস্ত দ্রব্যগুলি নাড়িতে নাড়িতে একত্র মিশ্রিত হইয়া ঠিক মোহনভোগের ন্যায় হইলে নামাইয়া একটি নূতন মৃৎপাত্রে

রাখিয়া দিবেন। প্রত্যহ প্রাতে দুই তোলা পরিমাণে এই ঔষধ খাইয়া সহ্যমত একপোয়া হইতে অর্দ্ধসের কাঁচা দুগ্ধ পান করিতে হইবে। যে সকল রোগীর পাক-যন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল তাঁহারা আরো অল্প মাত্রায় ঔষধ খাইবেন। ঔষধ সেবন-কালে শাক, অম্ল, দধি, খেঁসারির ডাল ও দারাভিগমন নিষিদ্ধ। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, নির্ম্মল বায়ু সেবন, সহ্যমত ব্যায়াম, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সাধু-সঙ্গ ও সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইতে অভ্যাস করিবেন। দুশ্চিন্তা সুকোমল শয্যায় শয়ন, বিলাস বাসনা, মদ্য, মাংস, ডিম্ব, পলাণ্ডু ও অধিক গরম মসলা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যাদি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ঘৃতদুগ্ধাদি স্নিগ্ধ বলকর খাদ্যই এই রোগে প্রশস্ত। পথ্যাপথ্যের প্রতি উদাসীন্ থাকিয়া ঔষধ সেবন করিলে রোগোপশম হইবে না, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন। "নতু পথ্য বিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি"—এই ঋষিবাক্য স্মরণ করাইয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি করিলাম।

ডাক্তার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
গোবরডাঙ্গা।

সরমা

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সরমার পিতা কলিকাতার একজন বনিয়াদি বড়লোক। তিনি ধনে, মানে, যশে, গৌরবে সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার গাড়ি, ঘোড়া, চাকর, দাসী, দ্বারবান কিছুরই অভাব ছিল না। যাহা থাকিলে মানুষকে মানুষের মতো বলিয়া বোধ হয়, ভগবানের কৃপায় তাঁহার সে সমস্তই ছিল। তিনি বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

মুকুন্দবাবু তাঁহার একমাত্র কন্যা, সরমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, প্রাণের তুল্য ভালোবাসিতেন, 'এবং শৈশব হইতে গল্পের ছলে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। সরমার বয়স, যখন নয় বৎসর তখন তাহাকে প্রফুল্লর

সহিত মিলাইয়াছিলেন, প্রফুল্লর বয়স তখন তেরো। সে বড়ই মধুর মিলন, বড়ই রমণীয় দৃশ্য! এক বৃন্তে দু'টি ফুল মুখোমুখি চাহিয়া আছে, কে আগে হাসিয়া উঠে?

মুকুন্দবাবু মনে করিলে অনেক বড় লোকের বাটীতে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেন; কিন্তু প্রফুল্লকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, রাজপুত্রের মতন ছেলেটিকে জামাতা করিতে তাঁহার বড়ই সাধ হইয়াছিল। তাই তিনি নয় বৎসর বয়সে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিলেন। তিনি অনেক সময় এই বালকবালিকাকে এক সঙ্গে বসাইয়া গল্প গুজব করিতেন, আদর যত্ন করিতেন, তাহাদের মধুর আলাপ শ্রবণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। আহা, সে বড় পবিত্র ভাব, স্বর্গীয় সুধা মাখা বালকবালিকার সরল হৃদয়ের খোলা ভাষা, সংসারের কুঁটিলতা তখনো তাহা স্পর্শ করে নাই। প্রফুল্ল যেমন বিদ্যানুরাগী ছিল, তেমনি ধর্ম্মলোচনায় তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সরমা তাহার উপদেশগুলি মন দিয়া শুনিত, প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিত, কোনো কিছু বুঝিতে না পারিলে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইত। এইরূপে ইহাদের জীবন-প্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণে এই ফুল দু'টি সহসা শুখাইয়া গেল। কেমন একটা কোথা হইতে মস্ত বিপর্য্যয় ঘটিল, যেন সকলি মিছা। সংসারের গতি এমনি কুটিল! এতই ভুল ভ্রান্তিময়!!

সরমা স্বামীর অসুখ শুনিয়া হঠাৎ পিত্রালয় হইতে চলিয়া আসিল, সেই অবধি মুকুন্দবাবু আর কোনো সংবাদ পান নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন প্রফুল্ল সারিয়া গিয়াছে। সরমা তাহার শ্বশুরকে এ রোগের সংবাদ কাহাকেও জানাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। নিজেও অপর কাহাকে জানায় নাই। তাহার কারণ, এই একে তো এ রোগের ঔষধ নাই. তাহার উপর আবার যিনি দেখিতে আসিবেন, তিনি হয় তো মুখ সিঁটকাইবেন, চোক্ ঘুরাইবেন, আর বাহিরে আসিয়া কত কুৎসা করিবেন। তাহা সরমার প্রাণে সহ্য হইবে না, তাই সে এ সংবাদ কাহাকেও দেয় নাই।

একদিন সরমার পিত্রালয় হইতে একজন পরিচারিকা কিছু খাবার লইয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদাবাবু কেমন আছেন?"

সরমা গম্ভীরভাবে বলিল,—"বাবা যদি জান্‌তে চা'ন, তা' হ'লে বলিস্ বড় অসুখ।"

"কি অসুখ দিদিমণি একবার দেখে যাই না ?"

"না, তোর দেখ্‌বার দরকার নেই।"

পরিচারিকা বিদায় হইল।

সরমার পিতা দাসীর নিকট প্রফুল্লর অসুখের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনটা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "সে কি কথা—অসুখ এখনো সারে নি, এ সংবাদ তো এতদিন কেহ আমাকে দেয় নি, কি অসুখ, সরমা ঝিকে তাও তো বল্ল না।"

সরমার পিতা নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন, কাল সকালে যাইয়া দেখিয়া আসিবেন। পরদিন সাতটার সময় সরমার পিতা প্রফুল্লকে দেখিতে আসিলেন। প্রফুল্লর পিতা মহাসমাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। প্রফুল্লের পুত্র দু'টি "দাদামশাই এসেচেন, দাদামশাই এসেচেন" ব'লে একটা মহা হৈ চৈ করিয়া তুলিল। বড় ছেলেটি ছুটিয়া গিয়া সরমাকে তাহার দাদামহাশয়ের আগমন সংবাদ জানাইয়া আসিল। মুকুন্দবাবু তাঁহার বৈবাহিকের সহিত কিছুক্ষণ মিষ্টালাপের পর প্রফুল্লকে দেখিবার জন্য উঠিলেন। প্রফুল্লর ছেলে দু'টি তাঁহার দুই হাত ধরিয়া উপরে প্রফুল্লর ঘরে আনিল। সরমার পিতা চৌকাট পার হইয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিষের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল, তিনি মনে মনে বলিলেন, "ভগবান্ আমাকে এ কি দেখাবার জন্যে এখানে আন্‌লেন, এ যে আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবি নি, মনেও কখনো ধারনা করি নি। আমার প্রফুল্লর এ কী দশা হ'লো! আমাদের কোন্ পাপে তার এ শাস্তি হ'লো।" তিনি দেখিলেন, প্রফুল্ল ঘরের মেজেতে বিছানায় বসিয়া আছে, তাহার হস্ত ও পদের অঙ্গুলীসকল খসিয়া গিয়াছে, মুখ এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে, সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার শরীরের অনেক স্থানে কাপড় জড়ানো রহিয়াছে, পা দু'টি ফুলিয়া উঠিয়াছে, নাসিকা ও কর্ণে ক্ষত হইয়াছে। সে একেবারে উত্থান-শক্তি রহিত পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আর কি দেখিলেন? দেখিলেন, তাঁহার স্নেহের সরমা নির্ব্বিকার চিত্তে প্রফুল্ল-বদনে সেই আতুর প্রফুল্লর সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, আর তাহার পদ-প্রান্তে বসিয়া আছে। সরমার পিতা ভাবিলেন "এ কী এ? এই কি সেই ননির পুতলা আদরের সরমা আমার, না কোনো মায়াময়ী দেবী? সরমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি এত বল ছিল? এ পতি ভক্তি সে শিখিল কোথায়?"

সরমার পিতা যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইয়া ক্ষণেকের জন্ম আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তিনি নির্ণিমেষ লোচনে সরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে মুখের এক অপূর্ব্ব জ্যোতি, মধুর কমনীয়তা, স্নিগ্ধ, শীতল নির্ব্বিকার ভাব!

মুকুন্দবাবু একখানি চেয়ার লইয়া একটু তফাতে বসিলেন। তিনি অতি করুণ-স্বরে বলিলেন,—"মা, সরমা তুমি আমায় এই দেখাবার জন্যে এখানে আন্‌লে—প্রফুল্লর এ দশা দেখ্‌বার পূর্ব্বে আমার মরণ হ'লো না কেন? সরমা, তুমি আমার বড় আদরের ধন ছিলে—আমি যে সাধ ক'রে তোমার নয় বৎসর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু হা অদৃষ্ট! তুমি দু'দিন সুখী হ'লে না, আমাদের কী পাপে প্রফুল্লর এমন দশা হ'লো।"

মুকুন্দবাবুর কণ্ঠ-রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। সরমা স্থির গম্ভীর-স্বরে বলিল,—"বাবা, বাবা, আপনি কাঁদ্‌চেন কেন? কে বল্ল আমি অসুখী? আমার মতো ভাগ্যবতী এ সংসারে ক'জন আছে? বাবা আপনি আমার ধৃষ্টতা মাপ ক'রবেন, পতি-সেবা করাই তো আমাদের ধর্ম্ম, এ কাজে তো আমার কোনো কষ্ট হয় না বাবা!"

মুকুন্দবাবু নির্ব্বাক হইয়া কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। সরমা সে চাহনির অর্থ বুঝিল, সে ধীর সংযতভাবে বলিতে লাগিল,—"আপনি কি মনে করেন, আমি এই পুতি-গন্ধ-বিশিষ্ট বিকলাঙ্গ দেহটার পুজো ক'র্‌চি, তাও কি হ'তে পারে বাবা, এই মেদ, মাংস জড়িত ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহটা কি এতই সার পদার্থ, এর ভেতর কি কিছুই নেই, আছে বৈ কি? বাবা, সকলকেই ম'র্‌তে হবে। মর্‌বার পর দেহটা শ্মশানে যাবে, শ্মশানে গিয়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে কোথায় চলে যাবে। এঁর এই বিকৃতাঙ্গ দেহটারও পরিনাম তাই হবে। তখন সুরূপে কুরূপে প্রভেদ থাকে না বাবা তবে বাবা, এই দুর্গন্ধ শ্রীহীন দেহটা দেখে এত চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ কি? এঁর ভেতর এমন একটা সজীব পদার্থ আছে, যা' চিত্তকে আকর্ষণ করে—সে সেই অবিনশ্বর পরমাত্মা আমি তাঁরি সেবা ক'র্‌চি। আমি সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মহাপুরুষকে এঁর সেই বিকলাঙ্গের ভেতর দেখ্‌তে পাই। আমি তাঁরি রূপ ধ্যান করি, পূজো করি। তাঁরি সেবায় এ জীবন উৎসর্গ ক'রেচি। আমি অসুখী কিসে, বাবা?"

সতীর মন এতই নির্ম্মল, এমনি পবিত্র! বুঝি, গঙ্গাজল অপেক্ষা পবিত্র!

মুকুন্দবাবু সমস্ত শুনিলেন। ভাবিলেন, বুঝি কোনো দেব-বালার মুখ-নিঃসৃত দৈববাণী! সরমার মুখের দিকে চাহিলেন—দেখিলেন, মুখে অপূর্ব্ব লাবণ্য-ছটা, চক্ষে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, হৃদয়ে বুঝি, অচলা ভক্তি। সরমার পিতা মনে মনে বলিলেন, সরমা, ধন্য আমি, ধন্য তোমার সেই পুণ্যগর্ভা জননী। সরমা এ শিক্ষা কোথা হইতে শিখিল, বুঝি ভগবানের এমনি দয়া, এমনি তাঁর কৃপা—এমনি করিয়া (নিমিত্তের জন্য একজনকে রাখিয়া) বুঝি তিনি পাপীর উদ্ধার করেন।

মুকুন্দবাবু মুখে বলিলেন,—"মা, আজ তোমার মুখে এ কী অমৃতবাণী শুন্‌লুম। তুমি যে আমাকে জ্ঞানের পথে এনে দিলে। আমরা সুরূপে কুরূপে প্রভেদ দেখে থাকি। আমরা ধন ঐশ্বর্য্যে মত্ত হ'য়ে জীবনের পরিণাম ভাবি না। আমরা ভগবানকে ডাক্‌তেও জানি না, খুঁজেও পাই না, শুধু হাহা ক'রে পৃথিবীময় ছুটে বেড়াই। এ পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় যাবো মা?

শত বৎসরের রুদ্ধ দ্বার যেন ইঙ্গিতে খুলিয়া গেল, সরমার পিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সরমা স্থিরভাবে বলিল,—"বাবা, আপনি আবার কাঁদ্‌লেন, আমি আপনার নিকট বালিকা, কি ব'ল্‌তে কি বলেছি, আপনি আমাকে মাপ ক'র্‌বেন।"

"মা সরমা, তুমি আবার বলো, আবার বলো।"

"কি ব'ল্‌বো, বাবা?"

"সেই পথ দেখিয়ে দাও।"

"বাবা, আমরা নিত্য শত শত প্রাণীর প্রাণে বেদনা দিচ্ছি, কিন্তু সামান্য একটিমাত্র পিপিলিকারও পরমায়ু দেবার আমাদের ক্ষমতা নেই। আমাদের আছে কেবল সেই বুকভরা তমটুকু, উহাই আমাদের জীবন-পথের কণ্টক।"

"ঠিক বলেচ মা, আমাদের আত্মাভিমানই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, কিন্তু তা' যায় কিসে?"

"তা' জানি না, বাবা তুমিই একদিন ব'লেছিলে তখন আমি ছোট, 'আত্মবৎ-সর্ব্বভুতেষু' সকলকেই আপনার মতো দেখ্‌বে। আমি তাই শিখেছি, তাই এই বিকলাঙ্গ দেহকে আর আমাতে কিছুই প্রভেদ দেখি না।"

"ধন্য সে সরল বিশ্বাস, সরল বিশ্বাসের অপূর্ব্ব মহিমা। বুঝেচি সরমা তোমার এ অভ্রান্ত বিশ্বাস তাঁরি অনুগ্রহ।"

"আর আপনার আশীর্ব্বাদ।"

সরমার পিতা যেন অকুল সাগরে একটা কুল পাইলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, বিশ্বাসই সকল কার্য্যের মূল, ভক্তি উহার সহায়তা করে। সরমা এই অটল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল ও ভক্তি-ভরে তাঁহার সেবা করিয়া সে এখন অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বুঝি, বৈকুণ্ঠে তাহার স্থান। ভগবান কি যেন একটা খেলা খেলিতেছেন, বুঝি সরমাকে দিয়া প্রফুল্লকে তরাইবেন।

সরমার পিতা স্নেহ-ভরে বলিলেন,—"মা, আমি তোমার ছেলে, তুমিই আমাকে আশীর্ব্বাদ করো যেন এই বৃদ্ধের মনটা তোমারি মতো সরল, পবিত্র ও ভক্তি পূর্ণ হয়।"

সরমা পিতার পদধুলি লইল, ভক্তি-গদগদ-চিত্তে বলিল,—"আমি আপনার সেই স্নেহের সরমা, আমাকে ও কথা ব'ল্‌বেন না।"

মুকুন্দবাবু স্নেহ-ভরে সরমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। সতীর করস্পর্শে তাঁহার অন্তরের কুহেলিকা যেন খানিকটা কাটিয়া গেল। তিনি অনেক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"মা, এখন আমি আসি।"

প্রফুল্ল হাঁটু ও কুনুইয়ের উপর ভর দিয়া তাহার শ্বশুরের পদধূলি লইতে আসিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"বুঝেচি বাবা আর আস্‌তে হ'বে না, স্থির হও।" প্রফুল্ল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি মহাপাপী, আমার এ পাপের শান্তি নেই, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন পর জন্মে আমার সদ্গতি হয়।"

মুকুন্দবাবু সস্নেহ বচনে বলিলেন,—"কে বল্‌লে তোমার পাপের শান্তি নেই, তুমি যতই কেন মহাপাপী হও না, তোমাদের স্থান বৈকুণ্ঠে, তোমার জলন্ত অনুতাপানলে তোমার এখানকার পাপ এখানেই ভস্মীভুত হ'য়ে গেছে। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার কি হ'বে? ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমার উপর র'য়েচে তুমি দেখ্‌চ না স্বয়ং লক্ষ্মী এসে তোমার পদ-সেবা ক'রূচেন—ভগবান এমনি ক'রে তাঁহার লীলা খেলা দেখান—এমনি ক'রে জীবকে দিয়ে জীবের উদ্ধার সাধন করেন, তাঁর মহিমা প্রচার করেন।"

প্রফুল্ল ভক্তিভাবে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া শ্বশুরের পদধুলী লইয়া মস্তকে রাখিল।

সরমার পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন দু' চার দিন পরে আবার আসিবেন। সরমার শিশু দু'টি দাদামহাশয়কে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পঞ্চস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সরমার পিতা চলিয়া গেলে প্রফুল্ল বলিল,—"ছাখো সরমা উনি যা' ব'লে গেলেন আমি যেন এখন সে সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখ্‌চি। আমার এ পাপেরও ক্ষমা আছে। ভগবান্ বুঝি নিতান্ত নিরুপায় দেখে আমার উপর কৃপা-দৃষ্টি ক'রেছেন। প্রাণে যেন আজ একটু শান্তি পেলুম।"

সরমা ধীরে ধীরে কহিল,—"অনুতাপ পাপকে দগ্ধ করে, শরীর ও মনকে পবিত্র করে। তোমার অনুতাপানলে তোমার পাপ দগ্ধ হ'য়েচে।"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রফুল্ল কহিল,—"হতভাগ্য আমি—সতীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি নি। সরমা তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

"তোমায় ক্ষমা ক'র্‌বো? ভগবান্ তোমায় ক্ষমা ক'রেচেন, আমার ক্ষমায় যদি হয়, তবে শতবার সহস্রবার ক্ষমা,—কিন্তু আমি কে, আর তুমিই বা কে? আমরা মায়াপাশে-বদ্ধ সংসারের জীব, আমরা কাজ ক'র্‌তে এসেচি একজনের অঙ্গুলী সঞ্চালনের ইঙ্গিতে কাজ ক'র্‌চি, তিনি যা' করাচ্চেন আমরা তাহাই ক'র্‌চি, কর্ম্ম শেষ ক'রে কে কোথায় চ'লে যাবো তা' কে ব'ল্‌তে পারে?—তবে মনে হয়, আবার তোমায় আমায় মিলিত হ'বো, এমনি ক'রে এমনি ভাবে তোমার পদ-সেবা ক'রবো।"

প্রফুল্ল এক বুক ব্যথা লইয়া কহিল,—"সরমা, আবার তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হ'তে চাও?"

সরমা গাঢ়-স্বরে কহিল,—"কেন নয় তুমি যে ভাগ্যবান পুরুষ, আমি যে তোমারি হৃদয়ে ভগবানের বিরাট রূপ দেখতে পাই! তিনি যেন তোমারি হৃদয়ে তাঁর বিরাট দেহ পেতে রেখেছেন, তার ওপর কত শত নদ, নদী, পাহাড় পর্ব্বত, সাগর প্রান্তর, কত বন, উপবন, কত শত জীব জন্তু, পশু পক্ষী, কত কীট পতঙ্গ যেন সেই মহাপুরুষের ইঙ্গিতে স্ব স্ব কর্ম্ম ক'র্‌চে—কর্ম্ম ক'রে নিজ নিজ স্থানে চ'লে যাচ্চে, আবার আস্‌চে, আবার কর্ম্ম ক'র্‌চে, যেন কর্ম্মের শেষ নেই। অনন্তকাল থেকে জীবের কর্ম্ম যেন এমনি ভাবেই চ'লে আস্‌চে, যেমন কর্ম্ম শেষ ক'রে চ'লে যাচ্চে, অমনি কর্ম্মফল ভোগ কর্‌বার জন্যে আবার

আস্‌চে। আমরাও কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যে আবার আস্‌বো, আবার তোমায় আমায় মিলিত হ'বো।

সরমার কথাগুলা যেন প্রফুল্লর মরু-তপ্ত-হৃদয়ে শীতল সলিল ছিটাইয়া দিল। তাহার অধর প্রান্তে এক বিন্দু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সরমা তাহা দেখিল না। প্রফুল্লকে মৌন দেখিয়া সরমা কহিল,—কি ভাব্‌চ?

"ভাব্‌চি তুমি যে আমার হৃদয়ে ভগবানকে দেখতে পাও, সে শুধু তোমার অভ্রান্ত বিশ্বাস, অপরাজিতা ভক্তি ও অনন্ত পুণ্যের ফলে। আর আমিও ভাগ্যবান্ বটে, তা' না হ'লে তোমার মতো স্ত্রী-রত্ন লাভ হ'বে কেন? এখন আমার মরণেও সুখ।"

এই সময় সরমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীল আসিয়া বলিল,—"মা আমরা দাদাম'শায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি যাচ্চি, আবার কাল আস্‌বো।

সরমা বলিল,—"তা' যাও বাবা অনীল কাঁদ্‌বে না?"

"না মা, সে কাঁদ্‌বে না, দাদাম'শাইয়ের ঘড়ি ঘড়ির চেন ধ'রে টানাটানি ক'র্‌চে।"

"তোমরা তবে ময়লা কাপড় জামা ছেড়ে ফর্‌সা কাপড় জামা পরে যাও।"

সরমা জামা কাপড় বাহির করিয়া দিল, সুশীল তাহা পরিল ও অনিলের জন্য লইয়া গেল। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু

মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত যমুনাতীরবর্ত্তী গৈপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত বসু বংশে প্রমথনাথের জন্ম হয়। ইনি ৺তারাপ্রসন্ন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার শান্ত মধুর, স্বভাবটুকু ইনি ষোলোআনাই পাইয়াছেন। সকলে সুশ্রী, মেধাবী ও শান্ত প্রকৃতির বালকটির বড় পক্ষপাতী ছিলেন, এবং ভবিষ্যতে সে যে একজন মানুষের মতো মানুষ হইবে এরূপ মনে করিতেন। খাঁটুরা বঙ্গবিদ্যালয়ে ইনি সর্ব্বপ্রথম পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন।

তাঁহার পিতা ৺তারাপ্রসন্ন বসুকে তখন কর্ম্মোপলক্ষে প্রায়ই অন্যত্র থাকিতে হইত, এবং পিতামহ ৺নবকৃষ্ণ বসু কৃষ্ণনগরে মোক্তারি করিতেন। একদিন গ্রামস্থ একটি পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া প্রমথনাথের জীবন সংশয় হয়। ইহার অনতিপরেই তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে, খাঁটুরা বিদ্যালয়ের পাঠসমাপনের পূর্ব্বেই, নিজের নিকট কৃষ্ণনগর লইয়া যান। ৺নবকৃষ্ণ বসুর সৌজন্যতা ও অন্যান্যগুণে গোয়াড়িকৃষ্ণনগরের ছোটবড় সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। নয় বৎসর বয়সের সময় প্রমথনাথ কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল।

কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হইয়া প্রমথনাথ অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষক প্রভৃতি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনও গঠিত হইতে লাগিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রমথনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তদানীন্তন নিয়মানুসারে (অধুনা যে নিয়ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে) ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনো ছাত্রকে উক্ত পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইত না; তজ্জন্য তাহাকে আর এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার অনতিকাল পরেই শ্রদ্ধাস্পদ নবকৃষ্ণ বসু মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

প্রকৃতি বিজ্ঞানালোচনায় প্রমথনাথ বড় উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু তখনকার দিনে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না থাকায় বিলাত যাইয়া উক্ত বিষয় শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা সম্ভবত তাঁহার পূর্ব্বাবধিই ছিল। তাই, ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় গিলক্রাইষ্টবৃত্তি পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান অধ্যাপক মহামতি লব, অন্যতম অধ্যাপক ৺অম্বিকাচরণ সেন এবং দেশপূজ্য ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ মহোদয়দিগের নিকট তিনি তাঁহার সকল সাধুসংকল্পে যথেষ্ট উৎসাহ পাইতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রমথনাথ ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। কয়েক মাস পরে, অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিয়া

কলিকাতায় সেণ্টজেভিয়র কলেজে বি-এ, পড়িতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, যে তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।

উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে বৃত্তি পাইয়া প্রমথনাথ জন্মভূমি, আত্মীয় বন্ধুবর্গ সকলের নিকট বিদায় লইয়া নূতন যৌবনের নূতন উদ্যমে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ সমুদ্রযাত্রাকে যতদূর দোষাবহ মনে করিতেন, এখন তাহা নাই; সুতরাং প্রমথনাথের উক্ত কার্য্যে যথেষ্ট নৈতিক সাহসের আবশ্যক হইয়াছিল। বিলাত যাইবার সময় মহানুভব লব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"and he has knack of being able to master any subject to which he fairly gives his attention." যথা সময়ে মহাত্মার উক্ত বাক্যের সফলতা হইয়াছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বিলাত পৌছিয়া প্রমথনাথকে প্রথমত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। পরে, তিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, ন্যায় ও রসায়ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিরা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এম্-বির প্রথম বিজ্ঞান পরীক্ষা এবং বি-এস্-সির প্রথম পরীক্ষা— এই যুক্ত পরীক্ষার প্রাণীতত্ত্বে চতুর্থস্থান ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর প্রাকৃতিক ভুগোল ও ভূতত্ত্বে তৃতীয় এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে "রয়েল স্কুল অফ্ মাইন্সের" ভূতত্ত্ব, প্রস্তরীভূত-কঙ্কালতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, এবং পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষায় প্রথম তিনটি বিষয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করেন।

পাঠ সমাপনের পর তিনি ভারত সচিবের নিকট ভারতীয় ভূতত্ত্ব কিম্বা শিক্ষা বিভাগে চাকুরী প্রার্থনা করেন। ভারতবাসীকে বিলাত হইতে এতদ্দেশীয় কোনো কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সরকার বাহাদুর প্রথমত কিছুদিন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু তাহাতে তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া পরীক্ষার্থীদিগকে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যাপনা দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। যাহা হউক, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি ভারত সচিব

কর্তৃক ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগে সহকারী পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কয়েক মাস ফরাসি ও ইতালি দেশে ভ্রমণ করিয়া বৎসরের শেষভাগে কলিকাতায় পৌঁছিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে স্বসমাজভুক্ত করাইয়া লইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমাজ-পতি রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এবং ইছাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ গণ্যমান্য অনেকে তাঁহাকে সাদরে সমাজভুক্ত করিয়া লইতে ইচ্ছুকও ছিলেন; কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে তাঁহাকে একটি প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। বিদ্যাশিক্ষার্থে সমুদ্রযাত্রা যে পাপ বলিয়া গণ্য এবং তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক, ইহা তিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না; সুতরাং কুশদহ সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে সসম্মানে উচ্চাসন দান করিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রমথনাথ প্রাতঃস্মরণীয়, স্বদেশহিতৈষী, কর্ম্মবীর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট নৈতিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়। "সিভিল ম্যারেজ য়্যাক্টের" সাহায্যে বিবাহ, আইন সঙ্গত করিতে হইলে বর-কন্যাকে তাঁহারা হিন্দু কিম্বা সাধারণে গ্রাহ্য কোনো ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। প্রমথনাথের বিবেকবুদ্ধি একদিকে যেমন কৌলিন্য প্রথার পক্ষসমর্থন করিতে পারিল না, অপরদিকে তেমনি "তিনি হিন্দু নহেন" এরূপ স্বীকৃত হওয়াও অনুমোদন করিল না; সুতরাং তাঁহার বিবাহ সনাতন হিন্দু পদ্ধতিতেই নিষ্পন্ন হইল।

বসু মহাশয়ের নয় সন্তান, চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা। প্রথম তিনটি কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং সন্তানাদিও হইয়াছে। অপর দুইটি এখনো অবিবাহিতা। পুত্রেরা সকলেই অবিবাহিত। সম্প্রতি তাঁহার পরিবার মধ্যে একটি বিশেষ শোকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৯ বৎসর বয়সে পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু ধন্য প্রমথনাথের হৃদয়-বল! পুত্র শোকেও একদিনের জন্য বিচলিত না হইয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। সংসার যে অনিত্য, মায়াময়, প্রহেলিকাপূর্ণ, তাহা তিনি অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তিনি আমাদের সাবেক চাল চলন এবং "মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের" পক্ষপাতী; কিন্তু সম্ভবত তিনি যৌবনে এ সকল বিষয়ে ভালোরূপে চিন্তা করিবার অবসর পান নাই, কিম্বা যে কোনো কারণে হউক, কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সাধারণত, একটু পরিণত বয়সে মানুষের চিন্তাশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; আর, সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার সহায়তা করে। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ যত্নবান। নিরূপিত সময়ে আহার, নিদ্রা ও ব্যায়ামাদি করিতে কথনো অবহেলা করেন না।

ভারত সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বসু মহাশয় কিরূপ যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভূতত্ত্ব বিভাগের পত্রিকাদি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার বৈদেশিক সহযোগীরা তাঁহাকে বরাবর সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। বলা বাহুল্য, উক্ত বিভাগে ভারতবাসী-দিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। দুরারোহ হিমাচলের চিরতুষারাবৃত প্রদেশ হইতে আসাম, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশাল অরণ্যানী প্রদেশ সমূহে তিনি যেরূপ উদ্যম ও নির্ভীকতার সহিত ভূতত্ত্ববিষয়ক তথ্য সংগ্রহার্থ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা আদৌ 'ভীরু' বাঙালী স্বভাবের পরিচায়ক নহে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ খনিজ পদার্থের তথ্য সংগ্রহার্থে ক্রমান্বয়ে ময়ূরভঞ্জ, ভাগলপুর, পাতিয়ালা, ঝিন্দ, কাশ্মীর, জুনাগড়, জামনগর, রাজপিপলা, ত্রিপুরা, লাক্‌টার প্রভৃতি করদ মিত্র রাজ্যসমূহে, এবং কানারা, ধারবার, ত্রিচিন পল্লী প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, সাধারণে অবগত নহেন, তিনিই সুবিখ্যাত টাটা কোম্পানীর লৌহখনির আবিষ্কারক।

দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য বিনা আড়ম্বরে প্রমথনাথ আজীবন নানা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ প্রীতি যশোলাভাকাঙ্খা কিম্বা নীচ স্বার্থাভিসন্ধি দ্বারা কলঙ্কিত নহে। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ মহাশয় যখন ইংলণ্ডবাসীকে ভারত-কাহিনী শুনাইবার জন্য ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ তদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন প্রমথনাথ সেখানকার—"ইণ্ডিয়ান সোসাইটী" নামক সমিতির সম্পাদক। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্ব হইতে তিনি স্বদেশীয় শিল্পোন্নতি এবং এতদ্দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা উপায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে "টেক্‌নিক্যাল ও সায়েন্‌টিফিক্‌ শিক্ষা"

শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন বিজ্ঞান শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে এবং কিরূপভাবে উক্ত শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিলে সুফল দর্শিতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে গভীর গবেষণার সহিত আলোচনা করেন। অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারই প্রস্তাবিত প্রণালী অনেকাংশে অবলম্বিত হইয়াছে। প্রধানতঃ, তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি কিছুদিন উক্ত কলেজের ভূতত্ত্বাধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের জন্য "বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট" নামক শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সম্ভবত তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্‌যোগী ছিলেন। তিনি প্রথমে উক্ত বিদ্যালয়ের অবৈতনিক প্রধানাধ্যাপকের কার্য্য করেন, পরে "রেক্টর" পদে অভিষিক্ত হন। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের"ও তিনি অন্যতম সভ্য। তাঁহারই চেষ্টার ফলে কলিকাতাস্থ "ইণ্ডিয়ন্ ইণ্ডাস্‌ট্রিয়্যাল্ য়্যাসোশিয়েশন্" নামক শিল্পসমিতি গঠিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত সমিতির প্রথম সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর তিনি "বেঙ্গল ইণ্ডাস্‌ট্রিয়্যাল্ কন্‌ফারেন্সের" সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন, এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডাস্‌ট্রিয়াল্ কন্‌ফারেন্সের" অভ্যর্থনা সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৩—৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সাবানের কারখানা খুলেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় উক্ত কারখানার কার্য্যে ভালোরূপ মনোযোগ দিতে না পারায়, তাহা পরে উঠিয়া যায়। সম্ভবত, স্বদেশীয়ের চেষ্টায় সেইটিই সর্ব্বপ্রথম সাবানের কারখানা। তৎপরে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আসানসোলের নিকট দু'টি কয়লার খনি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর খনির কার্য্য ভালোরূপে চালাইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন। আমাদের দেশে যৌথকারবারের প্রথা ইদানীং বিশেষ প্রচলিত ছিল না। প্রমথনাথ বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, এবং সাধ্যমত যৌথকারবারের অংশ গ্রহণ করিয়া ও নিজের উদ্‌যোগে কোম্পানী খুলিয়া, এইরূপ নানা উপায়ে উক্ত প্রথা প্রচলন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। "রংপুর টোব্যাকো কোং", "ইণ্ডিয়া প্রস্‌পেক্‌টিং কোং" প্রভৃতির তিনি একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য-চর্চ্চা তাঁহার জীবনের চির-সঙ্গী। পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনস্থ "জিওলজিক্যাল্ সোসাইটির" ও "এসিয়াটিক্ সোসাইটির" সভ্য ছিলেন। অধুনা

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" অন্যতম সভ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে, এখনো তাঁহার ছাত্র জীবনের অবসান হয় নাই। এখনো পর্য্যন্ত প্রতিদিন ৬।৭ ঘণ্টা সাহিত্য-সেবা করিয়া থাকেন। তিনি বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক ও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বাংলা "প্রাকৃতিক ইতিহাস" এবং ইংরাজি "ব্রিটিশ শাসনাধীনে হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" নামক পুস্তক দু'খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকের একান্ত অভাব। "প্রাকৃতিক ইতিহাস" খানি ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। আর, "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" এতদ্দেশীয় ও বিলাতীয় বিদ্বজ্জন সমাজে প্রমথনাথকে চিরপরিচিত করিয়া দিয়াছে। অবশ্য, তাঁহার মতের সহিত সকল বিষয়ে সকলের মতের ঐক্য হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু উক্ত পুস্তকের সমালোচকদিগের সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা তিনি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন,—পুস্তকখানি গভীর গবেষণা, বহু অভিজ্ঞতা, পক্ষপাতশূন্যতা ও নির্ভীক অন্তরের পরিচায়ক, এবং হিন্দু সভ্যতার একখানি উজ্জ্বল চিত্র। উপস্থিত তিনি সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে একখানি নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

এইখানে আমরা আর দু' একটি কথা বলিয়া বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপসংহার করিব। বসু মহাশয়ের চরিত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের প্রতিচ্ছবি। তিনি একদিকে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়াদি প্রতীচ্যগুণে, অপরদিকে দয়া, স্নেহ, ঔদার্য্য, নিস্পৃহতা প্রভৃতি প্রাচ্যগুণে বিভূষিত। তাঁহার ভিতর গাম্ভীর্য্যও আছে, কৌতুকরসও আছে। তিনি শান্তপ্রকৃতি, অথচ তেজস্বী, সুপণ্ডিত, অথচ আত্মম্ভরিতাশূন্য। জ্ঞানী অথচ সরল বিশ্বাসী। তাঁহার স্বদেশ হিতৈষণা অসার বাক্যোদ্গীরণকারী নহে, কার্য্যোন্মুখী। তিনি দেশ হিতকর নানাকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন,—সকল সময় আশানুরূপ ফললাভ করিয়াছেন এরূপ নহে; কিন্তু ফললাভে বঞ্চিত হওয়ায় কখনো নিরুৎসাহ বা কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার আদর্শ সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। ভারতমাতা তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত সন্তানের নিকট এখনো অনেক আশা রাখেন। ভগবান্ তাঁহাকে সুস্থ দেহ, সবল মন ও দীর্ঘজীবন দান করুন। শ্রী—

দাসের আত্ম-কথা

—————:০:—————

প্রেমের আকর্ষণ

অল্পদিনের মধ্যেই প্রিয়নাথের সঙ্গে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। এমন মিষ্ট সঙ্গ যেন আর কখনো পাই নাই। দৈনিক অবশ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া প্রতি দিন প্রিয়নাথের নিকট যাওয়া তখনকার প্রধান কাজ হইল।

কলিকাতা সহরে প্রিয়নাথ তখন প্রায় নিরাশ্রয়। শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তাঁহার মাতুলের একটি ভাড়াকরা ঘরে তিনি কোনো রকমে থাকেন। তার মধ্যে তো আর আমাদের স্থান হয় না। প্রিয়নাথের হৃদয়াকর্ষণী-শক্তি দিন দিন প্রসার লাভ করিতে লাগিল। যিনি এক দিন তাঁহার নিকট মন খুলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সহানুভূতিতে তিনি তাহাকেই আপনার করিয়া লইতেন। দিন দিন প্রিয়নাথের প্রিয়-জন-গণ সংখ্যা বাড়িতেই লাগিল। তিনি চারিদিকে পরিচিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্যামবাজারের ঐ সংকীর্ণ গৃহ হইতেই তাহার প্রধান গ্রন্থ "জীবন পরীক্ষা" লেখা আরম্ভ। সেখানে যখন সকল রকমেই অসুবিধা হইতে লাগিল, তারপর দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে মোহনবাগানের পরলোক গত কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্রের পুত্র, বাবু প্রিয়নাথ মিত্রের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের একটি সজ্জিত কক্ষ প্রিয়নাথের অবস্থিতির জন্য সাদরে প্রদত্ত হইল। আমরা সদলে সেই কক্ষে প্রিয়নাথের প্রিয়-সঙ্গে অনেক সময় কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু অল্প দিনে ঐ ঐশ্বর্য্য-মণ্ডীত গৃহ আমাদের পক্ষে কেমন অসচ্ছন্দতা আনয়ন করিল। প্রিয়নাথ ইহা আগেই অনুভব করিয়া বাহির বাড়ির একটি ঘরের জন্যই প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু বাবু প্রিয়নাথের অনিচ্ছায় তিনি তখন আর কিছু বলিতে পারেন নাই, যাহা হউক শেষ আমরা বাহির বাড়ির এক দ্বিতল প্রকোষ্ঠে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এই সময় আমার সাংসারিক এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ সহসা হাঁপ, কাশী, জ্বর ইত্যাদি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল। বলরাম দের ষ্ট্রীটে বন্ধুবর হরিবিহারী সেনের বাসায় তেতলায় একটি ঘর ভাড়া লইয়া, শুশ্রূসার জন্য মাতাঠাকুরাণীকে আনা হইল। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। রোগীর তত্ত্বাবধান, ঔষধ পথ্যাদি আহরণ করিয়া দেওয়া এবং দুই বেলা দু'টি আহার করা মাত্র বাসার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, বাকি সময়

প্রিয়নাথের সঙ্গে বেড়াইয়া, রাত্রে বন্ধুগণ মিলিয়া আনন্দেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভ্রাতার পীড়ায় কোনো রূপ দুশ্চিন্তা উদ্‌বেগ আমার মনে আসিতে পারিত না, এমনই সৎ সঙ্গে ভুলিয়া থাকিতাম।

আমাদের এই দলের মধ্যে অনেকেই আসিতেন। প্রিয়নাথ সকলকেই একটা না একটা ভাবের দিক্‌ দিয়া আকর্ষণ করিতেন। আমরা আবার ২।৪ টিতে অনেকটা বেশি রকম মিশিতাম, তার মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ঘোষ একজন। নগেন আজো সেই নগেন, একই ভাব মনে হয়। নিঃস্বার্থ প্রেমের এম্‌নি অদ্ভুত শক্তি। বস্তুতঃ মানবের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেমেই অমৃত রসে প্রাণ শক্তির প্রবাহ। মানুষ সঙ্কীর্ণ মায়া দৃষ্টিতে তাহাকে দেখে। জ্ঞানীগণ প্রেমের মধ্যেই জগ-জীবন প্রেমময়কে দর্শন করেন।

আমাদের এই দলের মধ্যে অনেকেরই একটা সাময়িক আকর্ষণের সাধারণ ভাব ছিল মাত্র, তথাপি ভিতরে ভিতরে একটা তত্ত্ব-ভাব, ধর্ম্মচিন্তার ভাবও অল্পের মধ্যে ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিলাম প্রিয়নাথের ধর্ম্ম মত এবং তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রণালী ভিন্ন। আমার তাহাতে সম্পূর্ণরূপে যোগ হওয়া অসম্ভব। তবে তাঁহার জীবনের মূলেও সদুদ্দেশ্য আছে। এই সময় ইহাও বুঝিলাম, কেবল ধর্ম্মভাব লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে কিছু হইবে না। নিজের বিশ্বাস, নিজের আদর্শ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সাধন ভজন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবে যদি বিধাতার কৃপায় এ জীবন জন সমাজের কিছু কাজে আসে।

কয়েক মাস প্রিয়নাথের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আমার অনেক উপকার হইল, নিদ্রিতভাব অনেকটা খুলিয়া গেল। আমাদের ভালোবাসার যোগ চির দিন অক্ষুণ্ণই ছিল। আমি যখন প্রিয়দর্শন ধর্ম্মবন্ধু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে নিবিষ্ট-ভাবে মিলিয়াছিলাম তখনো মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতাম। প্রিয়নাথ প্রথমেই আমাকে ব্রাহ্ম বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন। আমাদের এই দলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা হইত। যে কারণেই হউক প্রিয়নাথের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্যের প্রভাব অনেক কাজ করিয়াছিল। তাহা তাঁহার "জীবন পরীক্ষা" গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার গ্রন্থে পুরাতণ রক্ষণ-শীলতার অনুসরণ করিয়াও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় অনেক দিয়াছেন।

তিনি একবার আমাদের দেশে খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আমার বিশ্বাস

আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস, সূচনা হইতে এখন প্রায় দুই বৎসর গত হইয়া গেল। এখন মনে হয়, মূলে এমন একটি ভাব ছিল যাহার বিকাশ ঠিক তাহার অনুরূপই হইয়াছে; মূলের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। যতই প্রতিকূল ভাবের সংঘর্ষে গিয়াছি ততই পরিস্ফুট হইয়াছে, মূলের কোনো ক্ষতি হয় নাই।

আমার বিশ্বাসের একটি লক্ষণ প্রথমেই দেখা গিয়াছিল, সেটি সংস্কারের ভাব। কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক বিষয়, প্রচলিত অনেক মত ও বিশ্বাসে আমার একবারে অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিল। এ যে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের দ্বারা হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি সে পর্য্যন্ত ঐরূপ কোনো উপদিষ্ট হই নাই। যে বিবেক-বাণীর দ্বারা আমি সর্ব্ব প্রথমে ভৎর্সিত হইলাম, সেই বিবেক দ্বারাই স্বভাবত সংস্কারের জ্ঞান পাইলাম। দেখিলাম যে পাপ করিয়া আমি আমার নিজ সমাজে নিন্দনীয় নই, বরং ইহা অপেক্ষাও বিবেক বিরুদ্ধ কাজে অগ্রসর হইতেও স্থান পাইতেছি, তখনি বুঝিলাম, হিন্দু ধর্ম্মে যাহাই থাক্ সমাজের বড়ই পতন হইয়াছে। সুতরাং এ অবস্থার অতীত না হইলে কখনই শক্তি লাভ হইতে পারে না, অতএব বিবেক-বিরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেই হইবে। ভগবানের কৃপায় সে পথে অগ্রসর হইতে আমার কোনো ভয় বা সঙ্কোচ আসিল না, বরং এমন একটা অদম্য তেজ আসিল যে, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারি না। সামাজিক অঙ্গে জাতিভেদ, আধ্যাত্মিক অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পূজা, এই দুই বিষয় যেন সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র প্রতিবাদের বিষয় হইয়াছিল।

সহজ জ্ঞানেই বুঝিলাম, এত অন্যায় পোষণ করিয়া চিত্ত কখনো স্বাধীন ভাবে দাঁড়াইতে পারে না, ধর্ম্ম সাধন তো দূরের কথা। অন্ধ বিশ্বাসে জনসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সৎসাহস, মনের বল যেখানে নাই সেখানে ধর্ম্মের ধ-ও দাঁড়াইতে পারে না। অন্যায় অসত্যের প্রশ্রয় কখনোই দেওয়া হইবে না। কোনো সত্বগুণ নাই, নীচতাতে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে,—মুখে যাহাদিগকে শূদ্র বলিতেছে উদরান্নের জন্য তাহাদের উপাসনা করিতেছে! তাহারাই ব্রাহ্মণ? এই কি ব্রাহ্মণের লক্ষণ? ব্রাহ্মণের হৃদয় এমনি নীচ? কখনোই না; ইহাদিগকে যদি আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রণাম করি, আর আমার ব্রাহ্মণ বলিয়া যদি কিছু ধারণা হইয়া থাকে, তবে যে, সেই জ্ঞানকে

অবমাননা করা হয়। ইহাতে যে জন-সমাজের ভয়ানক অকল্যাণ হইতেছে, আজ যদি অধিকাংশ লোকের চোখ্ ফোটে তবে কখনোই এই মিথ্যা প্রথা সমাজে টিকিবে না। ইহা কখনোই হইতে পারে না, মানুষের গুণেরই আদর করিতে হইবে, সে যে জাতিই হউক না কেন? জাতি আবার কি? যার ভক্তি, বিশ্বাস আছে—ত্যাগ বৈরাগ্য, তপস্যা আছে, জ্ঞান আছে, সেই নমস্য! এই তো মানব-জাতির উন্নতির প্রকৃত পথ। জন সমাজ এখন আত্ম-সম্মান, এবং প্রকৃত গুণের আদর ভুলিয়াছে। এই প্রকাণ্ড মোহ নিদ্রা ভঙ্গের জন্য যাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, সেই মহা কার্য্যে আমারও ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিব। দেশের সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কারে বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। এই রূপে সংস্কারের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম এবং সমাজ উভয় দিকেই সংস্কারের ভাব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু ধর্ম্মের জন্যই সমাজ সংস্কারের আবশ্যক বোধ হইল।

গোবরডাঙ্গায়

বারাঙ্গনা থিয়েটার

দেশের রুচী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পল্লীগ্রামেও পুস্তকালয়, বা পাঠাগার এবং পল্লী-সমিতি বা সেবা-সমিতি স্থাপন করিয়া যুবকগণ জ্ঞান চর্চ্চা এবং জন-সেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু গোবরডাঙ্গা গ্রামে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যুবকগণ অসার আমোদের জন্য থিয়েটারের সূচনা করিয়াছিল। ইহাতেই বোঝা যায় এখানকার ধাত্ কি রকম। যাহা হউক প্রথমে যাহা সখের দলে চলিয়াছিল, তারপর ২।৩ বৎসর হইতে তাহা সাধারণ পেশাদারি দলে পরিণত হইয়াছে। দস্তুর মতো ষ্টেজ বাঁধিয়া, টিকিট করিয়া নিয়মিতভাবে অভিনয় করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে গত বৈশাখের "কুশদহে" আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পর সম্প্রতি ইহার অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। কলিকাতার রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী লইয়া গিয়া অভিনয় করা হইয়াছে। আর কি চান! চূড়ান্ত উন্নতি নয় কি? থিয়েটারের বিজ্ঞাপনীতেও এই অতুলনীয় উন্নতির জয়ধ্বনী করা হইয়াছে। না হইবে কেন? যেখানে নৈতিক জীবনের সমাদর পদদলিত, সেখানে কেন এরূপ হইবে না। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে

এই যে বারাঙ্গনা অভিনেত্রীর সমাগম, ইহাতে কিশোর বালকগণ হইতে যুবকদিগের চিত্তের অবস্থা কত কলুষিত হইল, অপবিত্রতার সমাদরে দেশের নৈতিক হাওয়া কতদূর দূষিত হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কি দেশে কেহ নাই। জমিদার বাবুরাই বা এ বিষয়ে এত উদাসীন কেন? এইরূপ থিয়েটার, দেশের পক্ষে একটি অত্যন্ত অনিষ্টজনক কার্য্য, এ কথা কি তাঁহারা বিশ্বাস করেন না? তাঁহারা যদি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটু ইঙ্গিত করেন তবে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেশের কাহারো সাধ্য হয় কি? গ্রামে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য ভদ্রলোক আছেন তাঁহারাই বা এ কার্য্যে বাধা দেন না কেন? তাঁহাদের পুত্র পৌত্রেরা অধঃপাতের পথে যাইবে আর তাঁহারা নির্ব্বাক্ থাকিবেন? এ কেমন অস্বাভাবিক অবস্থা। যাহাতে গ্রাম মধ্যে অতঃপর এই দুর্নীতির কার্য্য অবাধে না চলে সকলে তাহা করুন।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গোবরডাঙ্গার দেওয়ান বাটির বাবু যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার কলিকাতা শ্যামবাজার অপার সারকুলার রোডস্থ ১৮৮ সংখ্যক নিজ বাসভবনের সম্মুখে দুইটি ইলেক্ট্রো মেসিন বসাইয়া খাঁটি সরিষার তৈল প্রস্তুত করাইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহার এই কার্য্যের উদ্দেশ্যে ও ভাবে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমর অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা জন সমাজেরও কিছু উপকার হয়—অন্ততঃ কোনো অপকার না হয়, এ কথাটা ভাবিয়া আমরা আজো ব্যবসা করিতে শিখি নাই,—যদি শিখিতাম তবে আজ আমাদের মুখশ্রী ভিন্নরূপ দেখা যাইত। আমাদের মূলমন্ত্র "যেন তেন প্রকারে" আমার দু'পয়সা হইলেই হইল, কিন্তু এভাব কার্য্যক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয় না।

আমরা বিশেষভাবে অবগত আছি, এই 'অয়েল মেসিনে' কেবল উৎকৃষ্ট সরিষাই পেসাই হয়,—ইহার সহিত অন্য কোনো দ্রব্য মিশ্রিত থাকে না। যদিও এই অনুষ্ঠানটি আপাততঃ অতি ক্ষুদ্র কিন্তু সমগ্র দেশের বক্ষে এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং ভাব অতি মহৎ! আমাদের বিশ্বাস এই ভাব যতই কার্য্যে পরিণত হইবে ততই আমরা ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিব।

যতীন্দ্রবাবুর অর্থোপার্জ্জন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকের অনেক কথা শিখিবার আছে। প্রয়োজন মতে বারান্তরে তাহা বলিতে ইচ্ছা রহিল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

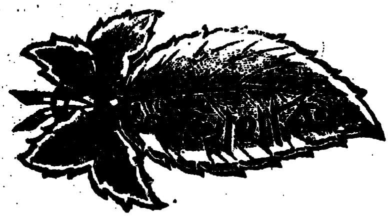
:০:

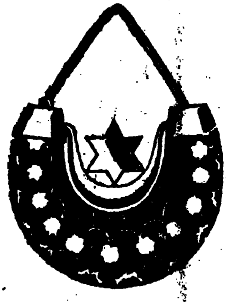
মৃত্যু-রহস্য—ডিমাই ১২ পেজী ৭৪ পৃষ্ঠা পরিমিত এই পুস্তকখানি পরিব্রাজক শ্রীমৎ সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত ও বিনামূল্যে বিতরিত। ২৭ নং ইষ্ট ক্যানেল রোড দেরাদুন, গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার প্রায় অশীতি পর বৃদ্ধ। আমরা তাঁহার নিকট মৃত্যু-রহস্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। "মৃত্যু" এই শব্দ শ্রবণেই জীব সন্ত্রস্ত, অথচ জীব মাত্রেই মরিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে। সেই মরণে ভয়! এ সংসারে এমন বন্ধু কে আছেন, যিনি নিজ জীবনে শরীর মনের 'সাম্য' সাধন দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিয়া, বিশ্বাস ভক্তি যোগে মৃত্যুভয়াতীত হইয়া বিনামূল্যে "মৃত্যু-রহস্য" বিতরণ করিয়া জীবকে অভয়বাণী শোনান?—এই গ্রন্থে মৃত্যু সম্বন্ধে যত রকমের দিক্ ধরিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অন্তত সকলেরই একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত। আমরা বাংলা ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই এইটুকু অনুরোধ করি যে, পত্র মধ্যে ১০ দুই পয়সার একখানি টিকিট পাঠাইয়া একখানি উক্ত পুস্তক আনাইয়া পাঠ করুন;—প্রবৃত্তি হইবে কি? পরিব্রাজক মহাশয় আরো অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসি—ইহাতে জানা যায় যে, মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রীর, বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা, বম্বে, পুণা, মান্দ্রাজ, করাচি, রেঙ্গুন এবং কলম্বো এই সাত স্থানে বিস্তৃত ঔষধালয়গুলি চলিতেছে। ঐ দ্যাখো একটি ক্ষুদ্র বটবীজই প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। আবার ইহাও দেখো, যাহার মধ্যে জীবনী শক্তি আছে তাহারই সাধ্য। প্রাণহীন কর্ম্ম কখনই কল্যাণপ্রদ হয় না। প্রাণে একাগ্র সদিচ্ছা লইয়া যিনি জীবন যাত্রায় যাত্রী হন, তিনি কখনো বিফল কাম হন না। কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজীর কার্য্য প্রণালী তাহার একটি সাক্ষী-স্বরূপ।—এই ক্যাটলগে, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর এবং শাস্ত্রীজীর ও অন্যান্য চিত্রগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার হইয়াছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।







নূতন জুয়েলারি ক্যাটালগ।





এ বৎসর আমাদের ৩ প্রকার ক্যাটালগ ছাপানো হইয়াছে। ১নং সুবৃহৎ ক্যাটলগের মূল্য ৫৲ টাকা। পুরাতন গ্রাহকগণ মায় মাশুলাদি ১৷৵০ সিকায় পাইবেন। ২নং মাশুলাদি সহ ॥৵০ ৩নং ৵০ আনা মূল্যে পাইবেন।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৪০নং গরাণহাটা, কলিকাতা।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা।

৪০ বৎসরের আবিষ্কৃত লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত, বিশ্ববিখ্যাত

মায়াপুর রসায়ন।

বিনামূল্যে "মায়াপুর রসায়নের" ব্যবস্থাপত্র ও "বৃহৎ ভারত সঙ্গীত" পুস্তক বিনামাশুলে পাইবেন।

৴১০ টিকিট পাঠাইলে ।০ আনা মূল্যের "বৃহৎ কবিরাজী শিক্ষা" বিনামূল্যে পাইবেন।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ম্যানেজার—আর ব্যানার্জ্জি।

১১৪ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।







পঞ্চম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২০ [৭ম সংখ্যা

কুশদহ

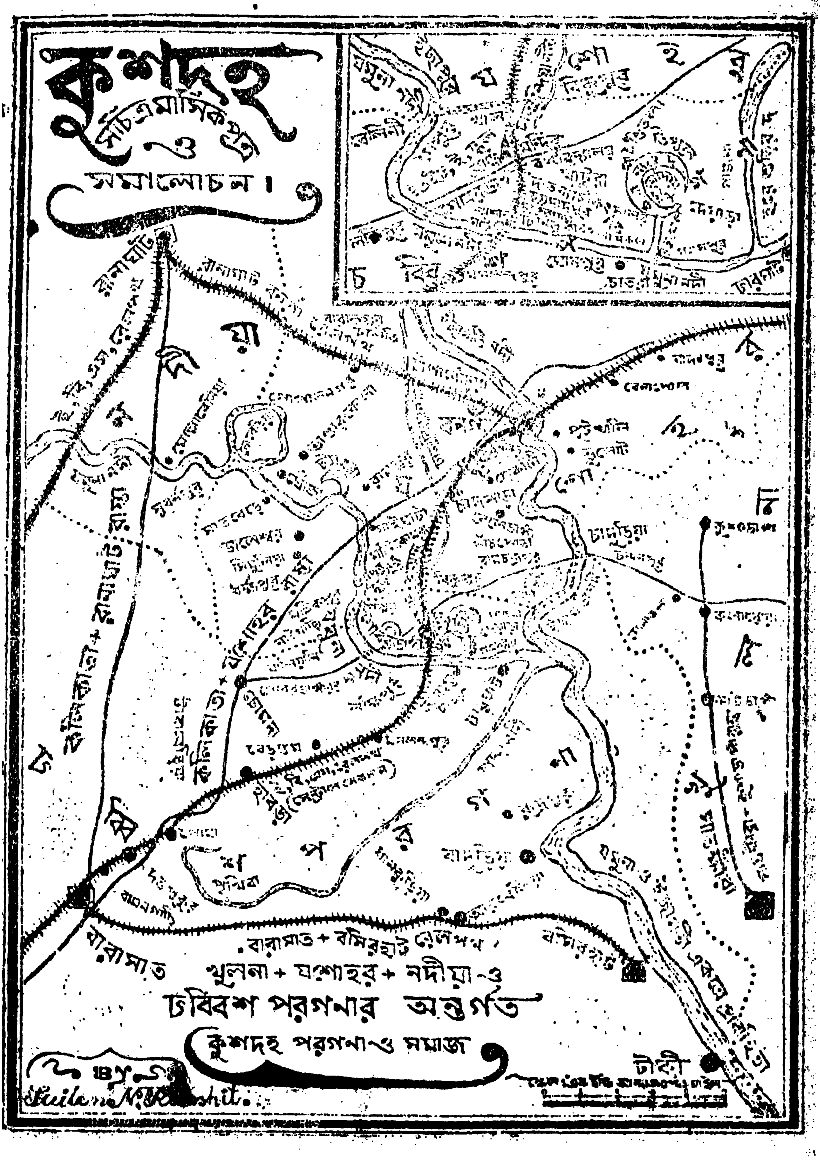
সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

কার্য্যালয় :—

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

কুশদহ-মানচিত্র


কুশদহ
সচিত্র মাসিকপত্র
ও
সমালোচনা।
বারাসাত + বসিরহাট রেলপথ
বারাসাত
খুলনা + যশোহর + নদীয়া ও
চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত
কুশদহ পরগনা ও সমাজ
টাকী

কুশদহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী

—:০:—

১। ১৩২০ সালের "কুশদহ" সচিত্র মাসিক পত্র আকারে ডিমাই আট পেজী ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা কিন্তু অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা মায় ডাকমাশুল ১৲ এক টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ নমুনার জন্য ৵০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। কেবল পোষ্টকার্ড লিখিলে বা আধ আনার টিকিট পাঠাইলে কোনোরূপ নমুনা পাঠানো যায় না।

২। "কুশদহ" প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ ২রা ৩রা নাগাদ কাগজ না পাইলে পোষ্ট আপিষে খোঁজ লইবেন। ১০ই পর্য্যন্ত কাগজ না পৌঁছিলে আমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ই এর পর আমরা দায়ী হইতে পারিব না, অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য ৵০ মূল্য লাগিবে। যথাসময়ে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দেওয়ায় কাগজ খোয়া গেলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধের কারণ দেখানো অথবা ফেরত দেওয়া কিম্বা অধিক দিন কাপী রাখা হয় না। ফেরত পাইতে হইলে ৵০ টিকিট পাঠাইতে হয়। মনোনীত প্রবন্ধ কোন মাসে বাহির হইবে, তাহা অগ্রে বলা যায় না।

৪। রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট না পাঠাইলে কোনো পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৫। কুপনে পরিষ্কাররূপে পুরা নাম ও ঠিকানা না দিলে হিসাবে গোল হইবে, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন।

৬। বৈশাখ হইতে চৈত্র, বৎসর পূর্ণ রূপে গ্রাহক হইতে হয়।

৭। প্রবন্ধ, বিনিময়-পত্রিকাদি, সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে, মনিঅর্ডার ও অন্যান্য বিষয়ের পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কুশদহে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম—দীর্ঘ সময়ের জন্য,—কভারের ১ম পেজ ৬৲, ৪র্থ পেজ ৫৲, ২য় পেজ ৪৲, ৩য় পেজ ৩৲, রিডিং শেষ পেজ ৪৲, ফর্ম্মায় ১ পেজ ৩৲ টাকা, আধপেজ ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বন্দোবস্ত আমাদের এজেন্ট, ক্যালকাটা এডভার্টাইজিং এজেন্সী, ১১ নং ক্লাইভ রো, এবং কুশদহ-কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত স্থির করিতে হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা হয়।

কার্ত্তিকের "কুশদহ" ২০এ বাহির হইল। অগ্রহায়ণ সংখ্যা
১০ই এর মধ্যে ও পৌষ হইতে পূর্ব্ববৎ ১ লা বাহির হইবে।

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)



স্বর্গীয় রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

K. V. Seyne & Bros.

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩২০ সাল। | সপ্তম সংখ্যা

সঙ্গীত

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

হেরি তব বিমলমুখ-ভাতি,
দূর হ'ল গহন দুখরাতি।
ফুটিল মনপ্রাণ মম তব চরণ-লালসে,
দিনু হৃদয়-কমল-দল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতিঃকণ লাগি,
তরুণ রবি কিরণ উঠে জাগি;
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,
তব দরশ পরশ সুখ লাগি।
গগন-তল মগন হ'ল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুম-পাতি।
ধ্বনিত বন-বিহগ কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে;
পূর্ব্বগগনে জগত জাগি উঠি গাহিল,
প্রেম রসপান করি গান করি কাননে,
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।

(ব্রহ্ম-সঙ্গীত)

স্বর্গীয়

রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

:o:

কুশদহের মধ্যে বনগ্রামের কায়স্থ দত্তবংশ বিশেষ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। দত্ত গোষ্ঠী মধ্যে প্রাচীন ও প্রবীন লোক আর অধিক বিদ্যমান নাই। কিন্তু যে সকল যুবক আছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ও দেশের হিতে মনোযোগী। অন্যান্য ভদ্রগ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহারা ম্যালেরিয়া ভয়ে দেশত্যাগ করেন নাই। বরং দেশের উন্নতিসাধনে যত্নবান।

এই বংশ প্রায় তিনশত বর্ষ হইতে বনগ্রামে বসতি করিতেছেন। বিষ্ণুচন্দ্র এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষ কালনীয় দত্ত প্রথমে বনগাম আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে রাজস্ববিভাগে কাজ করিতেন, প্রভুর পরাজয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি প্রাণপনে প্রভুকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি অবরুদ্ধ ঈশ্বরীপুরে, খাদ্যাভাব ঘটিলে নিজ বাসগ্রাম বাগাঁচাড়া হইতে ঈশ্বরীপুরে রসদ পাঠাইতেন। কাজেই প্রতাপের পরাজয়ের পর তাঁহার আর বাগাঁচাড়ায় বসতি হইল না। তিনি কচুরায়ের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া বাসগ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সপ্তগ্রাম যখন চতুর্দ্দশ শতাব্দের মধ্যভাগে পাঠানেরা স্বহস্তে পাইয়া শাসন করিতে থাকেন তখন কালনীয়ের পূর্ব্বপুরুষ পলায়ন করিয়া কপোতাক্ষী নদীতীরে ব্রাহ্মণরাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুতরাং পাঁচশত বৎসরের অধিককাল হইতে বিষ্ণুবাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা যশোহর জেলায় বসতি করিতেছেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুবাবুর জন্ম হয়। তিনি মাতার অষ্টমগর্ভের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বরূপনারায়ন টাকীর জমিদার বাবুদের সরকারে আমিনের কাজ করিতেন। ঐ কার্য্যে যথেষ্ঠ উপার্জ্জন থাকিলেও তিনি কখনও অন্যায়রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহা দরিদ্র পালনে ব্যয় করিতেন। তাঁহার মন এত উদার ছিল যে, কোন সময়ে তাঁহার মনিবেরা নিজ ব্যয়ে তাঁহার ইষ্টক নির্ম্মিত আবাসবাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিলে তিনি মনিবদিগকে বলিয়া সে টাকা দরিদ্রদিগকে দেওয়াইয়া ছিলেন।

বাল্যকালে বিষ্ণুচন্দ্র গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি

শৈশব হইতে পর দুঃখকাতর ছিলেন। সঙ্গীগণের উপর তাঁহার অসীম প্রভুতা ছিল। বিদ্যালয়ে তিনি সকলের উপর হইলেও তাঁহার ব্যবহারে সকলেই তাঁহারদিকে অকৃষ্ট হইত। সকলেই বলিত কালে তিনি মানুষ হইবেন। বিষ্ণুবাবু যখন ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারলের পদে অধিষ্ঠিত তখনও বাল্যবন্ধুগণের সহিত পূর্ব্ব সৌহৃদ্য বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত অমায়িক ব্যবহার করিতে কখনও তাঁহার ঔদাস্য ছিল না। পাঠশালায় পড়িবার সময় তিনি সময় পাইলেই নিভৃতে বসিয়া ইছামতীনদীর তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে ভাল বাসিতেন।

বার বৎসর বয়সে বিষ্ণুচন্দ্র পিতৃ হীন হইলেন। পিতা স্বরূপনারায়ণ কয়েকটি অদত্তা কন্যা ও নাবালক পুত্র রাখিয়া স্বর্গ গমন করিলেন। পরিবারের ভরণপোষণের উপায় কিছুই করেন নাই। তাঁহার বিধবা পত্নীর যা দু একখানি গহনা ছিল তাহা স্বরূপের শ্রাদ্ধে নিঃশেষিত হইল। বালক বিষ্ণুচন্দ্রকে নিরূপায় দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় (মাতুল পুত্র) তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই আত্মীয়ের নাম বাবু রামগোপাল মিত্র। রামগোপাল বাবু কৃষ্ণনগরের একজন নামজাদা উকিল ছিলেন। তাঁহার বাসাটি যেন একটি অতিথিশালা বিশেষ। সুতরাং সেরূপস্থানে মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাসের অনুকূল না হইলেও বিষ্ণুচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় নিজশ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তখন জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিষ্ণুচন্দ্র যথাসময়ে সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন ও কলিকাতায় আইন পড়িতে গেলেন। বৃত্তির টাকা হইতে মাতাকে মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিতেন।

বিষ্ণুচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব—বিশেষতঃ তাঁহার অধ্যাপকগণ আশা করিয়াছিলেন যে তিনি আইন পাশ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বনে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক ভগবান করেন আর। আইনের পুস্তক সংগ্রহ করিতে দেড়শত টাকার প্রয়োজন। কিছুতেই সে অর্থ সংগ্রহের উপায় হইল না। আত্মীয় স্বজন কেহই সাহায্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে রায় দীনবন্ধু মিত্রের অনুরোধে ও দারিদ্রের নিষ্পেষনে বিষ্ণুচন্দ্র ডাক বিভাগে একশত টাকা বেতনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তখন বিষ্ণুচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র।

বিষ্ণুচন্দ্রকে চাকুরীতে প্রবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতা ও আত্মীয় স্বজন আহ্লাদিত হইলেন। বিষন্ন হইলেন তাঁহার ইংরাজ অধ্যাপকগণ। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন স্বাধীনভাবে স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুচন্দ্র দেশের এক প্রধান ব্যক্তি হইবেন। চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইলেও বিষ্ণুচন্দ্র "দশমান্য" ও দশজনের প্রতিপালক হইয়াছিলেন। দরিদ্রের দুঃখ দেখিলেই তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইত। সকল সময় সকল অবস্থাতে তিনি পরদুঃখ নিবারণে যত্নশীল ছিলেন! কিন্তু কপটতা ও মিথ্যা ব্যবহারে তিনি বড়ই বিরক্ত হইতেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী অপরাধ করিয়া অকপটে স্বীকার করিলে তাঁহার সহানুভূতি পাইত কিন্তু কপট ব্যবহারের উপযুক্ত শাস্তি দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। দয়াশীল ও ক্ষমাশীল জানিলেও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী-গণ সর্ব্বদা তাঁহাকে রীতিমত ভয় ও সম্মান করিত।

যতদিন বিষ্ণুচন্দ্র নিজে উপার্জ্জন ক্ষম হন নাই, ততদিন বিবাহ করেন নাই। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন, কিন্তু বিবাহ বিষয়ে মাতাকে স্তোক দিতেন। যে দারিদ্রের নিষ্পেষণে ভূদেব বাবু আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন; যাহার নিষ্পেষণে বিষ্ণুচন্দ্রকে লেখাপড়া ছাড়িয়া চাকুরী স্বীকার করিতে হয়, তাহার হাত হইতে উদ্ধার না পাইয়া যে তিনি বিবাহ করেন নাই তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট চরিত্রবল প্রদর্শিত হইয়াছে। বিষ্ণুচন্দ্র আমাদের গৈপুরের স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা সিংহবাহিনীকে বিবাহ করেন। সিংহবাহিনীর ন্যায় পরমা সুন্দরী কন্যা আর খুঁজিয়া মিলে নাই, কিন্তু কেবল রূপে নহে গুণেও তিনি অতুলনীয়া। বিষ্ণুবাবুর যখন মাসিক আয় প্রায় সহস্র মুদ্রা কিন্তু ব্যয় তাহার অধিক তখন সিংহবাহিনী কখনও স্বামীকে দরিদ্র-সেবা ছাড়িয়া নিজের পুত্র-কন্যাগণের মুখের দিকে তাকাইতে বলেন নাই। যে চাকুরী করিয়া অন্যান্য ভদ্রলোক লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়াওবিষ্ণুবাবু মৃত্যুকালে ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দেশহিতকর কার্য্যে ও দরিদ্র-সেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। নিজ গ্রামে উচ্চ ইংরাজ' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কাজ। যদিও এই কার্য্যে স্থানীয় ভদ্রমহাশয়েরা ও তাৎকালিক মুন্সেফ গোপাল বাবু এবং মোক্তার গঙ্গাচরণ বাবু তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন, তথাপি বিষ্ণুচন্দ্রের যত্নেই গবর্ণমেণ্ট সাহায্য, আসবাব সংগ্রহ প্রভৃতি হইয়াছিল। তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তিনি মাসিক সাহায্যদানে স্কুলের অভাব মোচন করিতেন। তিনি এই বিদ্যালয়

স্থাপনে যত্নশীল হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ অনেক দরিদ্র ছাত্র, এবং তাঁহার গোষ্ঠীর অনেক বালক অনায়াসে উচ্চশিক্ষা পাইতেছে। বনগাঁর হাকিম ও উকিল মোক্তারগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সকলেই তাঁহার পরামর্শ পাইতেন। তিনিও সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দেশের উন্নতি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর আর কেহ উক্ত নীতির অনুসরণ করেন না। সুতরাং আশানুরূপ ফললাভও করিতে পারেন না।

বিষ্ণু বাবুর উপরিতন কর্ম্মচারীগণ বরাবর তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। সকলেই তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। ডাকবিভাগের ডিরেক্টার Fanshawe সাহেবের অনুগ্রহে তিনি স্থায়ীরূপে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারল ও রায় বাহাদুর হইয়াছিলেন। ঐ সাহেব তাঁহার গুণের এতই আদর করিতেন যে, অন্যান্য অনেক কর্ম্মচারী তাহাতে ডিরেক্টর জেনারেলকে দেশীয় ভক্ত বলিতেন ইহাও বলা আবশ্যক যে, তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। কোন সময়ে উত্তর পশ্চিমের ছোটলাটের পুত্র ও বাংলার তাৎকালিক ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলীর জামাতা কলবিন সাহেব বাংলার পোষ্টমাষ্টার জেনারল হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কোন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর নিকট কাজ না শিখিয়া বিষ্ণুবাবুর নিকট কাজ শিক্ষা সম্মানজনক মনে করিয়াছিলেন। সাহেবেরা অতি অল্প বাঙালী কর্ম্মচারীর প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

অস্থায়ীভাবে বেহারে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের কাজ করিবার সময় বিষ্ণুবাবু বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু অবধূত মতে চিকিৎসিত হইয়া সে যাত্রা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন। অবশেষে ঢাকায় কাজ করিবার সময় সন্ন্যাসীদত্ত মাদুলী হারাইয়া যায় ও পুনরায় তিনি রোগাক্রান্ত হন। ১৮৯১ সালের আষাঢ়মাসে রথযাত্রার দিন তাঁহার পরলোক গমন ঘটে। বিষ্ণুবাবু স্বধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বিস্তর লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার পুত্রগণ এক্ষণে সকলেই কৃতী। কনিষ্ঠ নরেশচন্দ্র ডাক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তৃতীয় সুরেশচন্দ্রও উচ্চপদস্থ। জ্যেষ্ঠ হেমচন্দ্র স্বনামধন্য লেখক।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুবালার অপরাধ

(গল্প)

১

"এরকেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বিধাতার ভবিতব্য। তা' না হ'লে ভুবন মিত্রের মেয়ের সঙ্গে নরেনের বিয়ে হবে, এই কথাই তো জানা ছিল, বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্‌ হয়েছে, এমন কি আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে, কেবল বিয়েটা মাত্র বাকি—এমন সময় কিনা সব উলটে গেল, ছেলে বেঁকে বস্‌ল—"ও মেয়ে বিয়ে করব না।" আহা! ভুবনবাবু মাথায় হাত দিয়ে পড়েচে। বেচারি নিজে এসে কত বোঝালে, কত সাধলে, তবু ছেলের মন ফিরল না! ধন্যি যা হোক আজ কালকার ছেলে! একটু লজ্জা সরমও নেই! হ'লোই বা খুব সুন্দরী মেয়ে, তা' বলে' অমনিতরই কি করতে হয়? একেবারে বড় ভায়ের মুখের উপর বল্লে কিনা—"বিয়ে যদি করতে হয় ত বিনোদ ঘোষের মেয়েকে, নইলে এজন্মে আর বিয়ে করব না। ছিঃ ছিঃ শুনে ঘেন্নায় মরি আর কি!"

উপরোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে সুধাময়ী তাঁহার বিশাল দেহখানি মাদুরের উপর বিস্তৃত করিয়া দিলেন। রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে, তাঁহার ভ্রাতৃবধু বলিলেন—"বলিস্‌ কি ঠাকুঝি! তবে সত্যি সত্যিই নরেন ভুবন মিত্রের মেয়েকে বিয়ে করবে না? ওমা! এ আবার ছেলের কি খেয়াল গো! সে মেয়েও তো শুনিচি খুব সুন্দরী, তা' ছাড়া ভুবন মিত্র একজন নামজাদা লোক, ওখানে হ'লে তো দেখতে শুনতে সব রকমেই ভাল হ'ত।"

ঠাকুঝি বলিলেন,—"ভাল তো হ'ত, কিন্তু সে কি আর তোমার আমার মতে হবে, আমাদের কোন কথার দরকার কি বোন! যে বিয়ে করবে, যারা বিয়ে দেবে তারাই বোঝা পড়া করুক; আমরা ভাল বললেও হয় তো মন্দ হবে। আমাদের চুপ করে' থাকাই ভাল।"

কেটে পরা, নামাবলী গায়ে, ঝুলি হাতে হরিনামের মালা জপিতে জপিতে ও বাড়ীর ছোট্‌ঠাকরুণ কহিলেন,—"তা' তো বটেই, সে তো ঠিক কথা, আমাদের কোন কথায় দরকার কি; কান আছে শুনি, চোখ আছে দেখি। এখনকার ছেলে পুলে বৌঝিরা কি আর কথার অপেক্ষা রাখে, না পরামর্শ নেয়, যে ভাল মন্দ বুঝিয়ে বলব। তখনকার একদিন গেছে রে মা! সে এক কাল

গেছে! তখন ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলেও কনে লজ্জায় হাঁ না বলতে কাঁদতে পারত না। আর কনে কালো, কুচ্ছিৎ, কানা, কুঁজো হ'লেও গুরুজনের মুখের উপর বর বলতে পারত না যে, 'ও কনেকে বিয়ে করব না'। বাপ মা যা' দেখে দেবে তাতে আবার কেউ কথাটি কইবে? এমন বেহায়া তখনকার কালে ছিল না।"

ছোট্‌ঠাকরুণের কথা আরো কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সুধাময়ীর ছোট খুড়ির বৌ বলিলেন,—"ও সব কথা এখন থাক্। তা' হ'লে ঠাকুঝি বিয়েটা কবে হবে শুনেচ? ঠাকুরপোর মত হ'য়েচে? শুনেছিলাম না মেজবৌ ছোটছেলের বিয়েয় খুব ঘটা করবে, তা কই, এখনও তা' কিছু দেখতে পাচ্চি না।"

সুধাময়ী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিলেন,—"ঘটা খুবই হবে তার কোনও ভুলটি নেই, এক ত মেজ বো'য়ের এই শেষ কাজ, তার উপর আবার নরেনের বিয়ে, রাজেন্, ভূপেনের পর দু' তিন ছেলে মরে তবে ওই নরেন হয়েচে, ওর কি আর বাঁচবার আশা করত, যা হোক শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ওযে আবার বেঁচেচে, বড় হয়েছে, হাজার হোক তিনটে পাসও দিয়েচে, সেই কত ভাগ্যির কথা। ওর বিয়েয় ঘটা হবে না ত, হবে কার?"

সকলে সমস্বরে বলিলেন,—"আহা তা' আর বল্‌তে! যা' হোক হরির ইচ্ছেয় শুভকাজটি ভালোয় ভালোয় হ'য়ে যাক্ আমরাও দেখে সুখী হই।"

সুধাময়ী কহিলেন,—"হ্যাঁ আর ত সবই ঠিক আছে, এখন সেজদাদার মতটা হ'লেই হয়, এক জায়গায় ঠিক্‌ঠাক্ করেছিলেন, আবার সব উল্‌টে দেওয়ায় তিনি একটু চটে গেছেন। তা' ভাই আমার ভোলানাথ, ওঁর মত ফেরাতে বেশী দেরী হবে না; সেজবৌ দু' চার ফোঁটা চোখের জল ফেললেই আর নরেন অসুখী হবে, এই কথাটা ভাল করে' বোঝাতে পারলেই কার্য্য-সিদ্ধি হ'য়ে যাবে।"

চন্দ্রবাবুর পুত্র নরেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ এইরূপ আলাপের পর, সকলের কৌতূহল কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইলে, অন্যান্য আলোচনা চলিতে লাগিল। চন্দ্রবাবুর বাড়ীর তেতলার ছাদ সরগরম করিয়া আজ মেয়েদের একটা সভা বসিয়াছিল। সভার সভাপতি ছিলেন, চন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ ভুবনেশ্বরী। প্রধান বক্তা, তাঁহার ছোট ননদ সুধাময়ী ও সমর্থনকারিণী ওবাড়ীর ছোট্‌ঠাকরুণ ভিন্ন আরো অনেকগুলি শ্রোতা ও বক্তা এই মাঘ মাসের শীতে আহারান্তে রৌদ্রে মাদুর বিছাইয়া দিব্য আরামে বসিয়া, এই

সকল আলোচনায় বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় কেবলমাত্র চন্দ্রবাবুর পত্নী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং আজিকার দ্বিপ্রহর এই জন্যই তাঁহার পুত্রের সমালোচনার স্বর্ণ-সুযোগ স্বরূপ হইয়াছিল।

২

"ওলো মনো! আজ তোর মনমোহিনী নামটা সার্থক হ'ল"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুবালা তাহার কাকিমার মেয়ে মনমোহিনীর পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। মনমোহিনী তখন শিক্ষয়িত্রী আসিবার দেরী দেখিয়া তাহার বড়দিদিকে ধরিয়া খাতায় দুরূহ শব্দের অর্থগুলা লিখাইয়া লইতেছিল। সুবালা আসিতেই দিদি কলম ফেলিয়া হাসিয়া বলিল,—"নামটি সার্থক হ'ল বুঝলুম, কিন্তু মন মোহিত হ'ল কি করে' শুনি? বাঁশী শুনে? না চোখে দেখে?"

"না গো না বাঁশী শুনে' নয়, চোখে দেখে। আমাদের মনমোহিনীকে দেখে বেচারার মাথা ঘুরে' গেছে। সে এখন ওর কাছে বিনামূলে বিকাতে পারলে ধন্য হ'য়ে যায়।"

সুমতি উচ্চহাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া কহিল,—"সত্যি নাকি? বলিস্ কি সুবালা!

সুবালা তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—"সত্যি দিদি তোর দিব্বি, মিথ্যে বলি নি।"

তখন কক্ষ মধ্যে খুব একটা হাসির গর্‌রা উঠিল, সে হাসি বাড়ীর আরো কয়েকটি বধূ ও কন্যাকে সে গৃহে টানিয়া আনিল।

সত্য বটে, বিনোদবাবুর মেয়ে টেঁপিকে যখন তাহার দিদিরা আদর করিয়া মনমোহিনী নাম দিয়াছিল, তখন ভ্রমেও কেহ আশা করে নাই যে, সে কোনও দিন কাহারও মন মোহিত করিয়া তাহার দিদিদের নাম নির্ব্বাচনের সার্থকতা দেখাইতে পারিবে। এমন কি মনোর জননী কখনও আশা করেন নাই যে এত সহজে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন প্রার্থনীয় ঘরে তাঁহার মনোর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যাইবে। তাই যখন সকলে শুনিল, চন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ একবারমাত্র মনোকে দেখিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ভুবনবাবুর পরমাসুন্দরী কন্যা হেমলতার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তখন মনোর অদৃষ্টটা যে খুবই ভাল তাহাতে আর কাহারও সন্দেহমাত্র রহিল না।

পত্নীসহ বিনোদবাবুর যখন দিবারাত্র কন্যার বিবাহের ভাবনা ভাবিতে

ভাবিতে মস্তকের কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হইয়া উঠিতেছিল সেই সময় চন্দ্রবাবু যেদিন আপনি আসিয়া মনোর সহিত পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেনা পাওনার কথা চুকাইয়া বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বিনোদবাবু তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত সদয় ব্যবহারে যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলেন এবং সরল হৃদয় বৃদ্ধ চন্দ্রকুমার বসুও তাঁহার ভাবী বৈবাহিক বিনোদ বাবুর বিনয় ও শিষ্টাচারে পরম সন্তোষলাভ করিলেন, আর পাত্রী যখন পুত্রের মনোনীত হইয়াছে তখন নিজের দেখা বাহুল্য বোধে বিনোদবাবুর আগ্রহ সত্বেও চন্দ্রবাবু পাত্রী না দেখিয়াই গৃহে ফিরিলেন।

যথাসময়ে বৌদিদির মুখে এ শুভ সংবাদ নরেন্দ্রের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল। সে আজ প্রায় তিন সপ্তাহের কথা, তখন ভুবনবাবুর কন্যার সহিত তাহার বিবাহের আর সপ্তাহ মাত্র বাকি ছিল, নরেন্দ্র তাহার এক বন্ধুর বাড়ী ভ্রাতার সহিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেইদিন, জানিনা কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে দৈবাৎ সেই অবিবাহিতা বালিকা মনমোহিনী, যুবক নরেন্দ্র নাথের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নরেন্দ্র সেই অতুলনা সুন্দরীকে দেখিয়া আত্মহারা হইল, মুহূর্ত্তের দর্শন তাহার অন্তরে কুমারীর মধুময়ী মূর্ত্তি চিরাঙ্কিত করিয়া দিল। তারপর কৌশলে বালিকার পরিচয় সংগ্রহ করিয়া বন্ধুর সহায়তায় তাহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নয়নগোচর করিল। অনুপম লাবণ্যের সহিত বালিকার নম্র মধুর ভাবটি প্রত্যক্ষ করিয়া রাজেন্দ্র ভ্রাতাকে স্পষ্টই বলিলেন—"এরূপ স্ত্রীরত্ন লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়।"

নরেন্দ্র সেদিন এই বালিকাকেই আপন জীবন সঙ্গিনী কবিতে কৃতসংকল্প হইয়া গভীর রাত্রে গৃহে ফিরিল।

কথাটা নরেন্দ্র নিজে কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও দাদা ও বৌদিদির অনুকম্পায় প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না, এবং তাহারই ফলে অবশেষে চন্দ্রবাবুকে তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্প পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

* * * * *

চন্দ্রবাবুকে হঠাৎ একটি মকদ্দমায় কয়েক দিনের জন্য মফস্বলে যাইতে হইল। গমনকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর তাঁহার ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবার ভার দিয়া গেলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র তখন ভ্রাতার বিবাহে যে বিপুল সমারোহ হইবে তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত, সুতরাং কুলপুরোহিত বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর এ ভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা

নিশ্চিন্ত হইলেন। বিবাহের অল্পদিন থাকিলেও নরেনের ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের আগ্রহাতিশয়ে পূর্ণিমা তিথিতে যে লগ্ন ছিল, সেই লগ্নেই বিবাহ স্থির হইল।

(৩)

ক্রমে বিনোদবাবুর ভবন আলোক-সুশোভিত, সঙ্গীত-মুখরিত ও পুষ্পসুবাসে সুরভিত করিয়া শুভ বাসন্তী পূর্ণিমা সমাগতা হইল। দেখিতে দেখিতে বালিকা মনোমোহিনীর অন্তর অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ করিয়া বিবাহের শুভ-লগ্নও উপস্থিত হইল। অন্তঃপুর দ্বারে পদার্পণ করিতেই নারীগণের হাস্য কোলাহলের মধ্যে বিবিধ বাদ্যশব্দ অতিক্রম করিয়া মঙ্গল-শঙ্খ মধুর নিনাদে নরেন্দ্রের চিত্ত পুলকিত করিয়া ধ্বনিত হইল।

জামাতার ইন্দুবদন নিরীক্ষণ করিয়া এবং কন্যার সৌভাগ্য কল্পনায় হৃষ্ট হইয়া হাস্যবদনে মনোর জননী জামাতা বরণ করিতে অগ্রসর হইলেন; প্রাচীনা গৃহিণীগণের পশ্চাতে রত্নালঙ্কার ভূষিতা, পুষ্পমালা শোভিতা প্রফুল্লমুখী বধূ ও কন্যাগণ প্রাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন। অবিরাম শঙ্খ ও হুলুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল আচার আরম্ভ হইল। ক্রমে শুভ দৃষ্টির শুভক্ষণ সমাগত হইলে কন্যার বদন হইতে গোলাপী রঙের রেশমী অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইল, পুলক পূরিত অন্তরে সাগ্রহে নরেন্দ্র নববধূর বদনে দৃষ্টি স্থাপিত করিল, কিন্তু এ কি! পর মুহূর্ত্তেই অতিমাত্র বিস্ময়ের বশে একটি অস্ফুট ধ্বনি করিয়া সচকিত নরেন্দ্র বধূর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল! রমণীমণ্ডলীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, মুহূর্ত্তে হুলুধ্বনি থামিয়া গেল, স্ত্রী আচারের দ্রব্য সামগ্রী হস্তে লইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধি বধূ কন্যার দল নির্ব্বাক জড় পুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিল। প্রাচীনার দল "ওমা একি গো!" "হরি নারায়ণ কি কল্লে ঠাকুর!" "গুরু রক্ষা কর,"—প্রভৃতি বলিতে বলিতে কোলাহল শতগুণে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। মনোর জননী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া গেল, বরণডালা ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা-ভাবে বসিয়া পড়িলেন; সুবালা তাঁহাকে, কোমল স্বরে—"ভয় কি কাকিমা ঈশ্বর আছেন"—বলিয়া হাত ধরিয়া উঠাইয়া ঘরে লইয়া চলিল।

পুরুষ মহলেও মহা গোলমাল বাধিল, বিনোদবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি বৈবাহিকের করদ্বয় অশ্রুসিক্ত করিয়া তাঁহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনুনয় করিলেন। সহৃদয় চন্দ্রবাবুর মন সহজেই

করুণায় গলিয়া গেল, কিন্তু নরেন ও তাহার ভ্রাতা বলিল, বিনোদবাবুর এ মেয়ে তাহারা কখনই দেখে নাই, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে, কনে বদল করা হইয়াছে, বিনোদবাবুর যে কন্যা নরেন্দ্রের মনোনীত হইয়া ছিল, এ সে নয়।”

যে বন্ধুর সাহায্যে নরেন্দ্র মনোকে দেখিয়াছিল তিনিও সকলের সম্মুখে শপথ করিয়া বলিলেন “এ কখনই বিনোদবাবুর সে মেয়ে নয়, সে বালিকা অপরূপ লাবণ্যময়ী গৌরাঙ্গিণী। আর এর রংঙের কাছে বুঝি' মিশি মসীও হার মানে! বন্ধু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“কোন মতেই এ সে নয়, একই মানুষে কি এত পার্থক্য সম্ভব হ'তে পারে!” হতবুদ্ধি চন্দ্রবাবু সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বৈবাহিকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—“কি হে ব্যাপার কি? এরা যা বলচে তাই কি সত্য?”

বিনোদবাবু সর্ব্বসমক্ষে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিলেন—মনোই তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাঁহার আর পুত্র বা কন্যা কিছুই নাই। বিনোদবাবুর প্রতিবাসী ও বন্ধুবর্গ এ বাক্যের সমর্থন করিলেন। চন্দ্রবাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন, এক দিকে বিনোদবাবুর সকাতর অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়া বর ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অর্থাৎ চিরদিনের জন্য একজন ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করা তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, অন্যদিকে যে বিবাহ করিবে তাহাকে সম্মত করা দুরূহ। বর ও বরের ভ্রাতৃদ্বয় বন্ধুবর্গের সহিত বাঁকিয়া বসিল। তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিল—“বিনোদবাবুর এ প্রতারণা তাহারা কখনই নীরবে সহ্য করিবে না, তাঁহার কন্যার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক্ এ বিবাহ কখনই তাহারা হইতে দিবে না।”

বিষম বিভ্রাট বাধিল। অন্তঃপুর হইতে করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হইল, উৎসব মত্ত শিশুদলের আনন্দোৎফুল্ল বদন মলিন, বাদ্যধ্বনি নীরব হইল।

বিনোদবাবু উপায়ন্তর বিহীন হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বৈবাহিকের পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন—“দোহাই ধর্ম্মের, আজিকার মত আমার মান রক্ষা করুন জাতি কুল রক্ষা করুন।”

বিনোদবাবুর ভ্রাতা চন্দ্রবাবুকে অবশেষে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের জন্য বিনোদবাবু প্রথমে আশা করেন নাই, চন্দ্রবাবু নিজেই তাঁহাকে আশা দিয়াছিলেন, এমন কি কন্যা দেখাইতে চাহিলেও তিনি না দেখিয়াই সমস্ত স্থির করিয়াছিলেন, এখন কার্য্যকালে সে কথার অন্যথা করা কি ন্যায় সঙ্গত? না ভদ্রোচিত কার্য্য?

উপস্থিত ভদ্রলোকগণের যুক্তিতর্ক ও বিনোদবাবুর সবিনয় অনুনয়ে, চন্দ্রবাবু তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, গম্ভীর স্বরে পুত্রকে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন। পিতার সে আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নরেন্দ্রর ছিল না, সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া গভীর বিষাদে বিষণ্ণ মুখে অবনত মস্তকে মনমোহিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে দম্পতীর হস্ত পুষ্পমাল্যে বন্ধন করিলেন; একে একে শুভকার্য্য সমস্ত সুসম্পন্ন হইল।

নহবতের মধুর রাগিনী নৈশগগন ধ্বনিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে এ শুভ সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল, সমীরণ ভরে গাছে গাছে ফুলকুল, আনন্দভরে গৃহে আঙিনায় রমণীকুল আবার হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। শেষ রজনীতে মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নাটুকুর মত সে পুলক হাস্যে মনোর জনক-জননীর উদ্বেগ ব্যাকুল অন্তর আবার শান্ত শীতল হইল।

(৪)

উজ্জ্বল আলোকাকীর্ণ সুন্দর বাসরে যখন সাঁচ্চা জরির কাজ করা মনোহর মখমলের শয্যার উপর নরেন্দ্রের পার্শ্বে মনোকে বসাইয়া দেওয়া হইল। মনো তাহার হীরা-মুক্তা-জড়িত-স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত দেহটীকে সোনালি আঁচলে যথাসম্ভব ঢাকিয়া অপরাধীর মত নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিল।

সে গৃহে কতই না আমোদের আয়োজন, কতই না নয়ন তৃপ্তিকর সামগ্রীর সম্মিলন হইয়াছিল। নরেন্দ্রের জলযোগের জন্য কত না সুখাদ্য রৌপ্য থালে রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু নরেন্দ্রের মন সেদিকে নাই, তাহার মনে একই চিন্তা, সে কোথা গেল? এ ত সে নয়!

শ্যালিরা চারিদিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি নরেন্দ্র! ভাবচ কি?" কেহ কহিল,—"এত ভাবনা কেন; শেষে দেখো ওই কালোই তোমার হৃদয় আলো করিবে। জাননা কি কালোরূপে ভুবন ভোলে?"

নরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আচ্ছা বলুন দেখি এঁর নাম কি?" উত্তরে জানিল—মনমোহিনী। "মনমোহিনী? তা হ'তে পারে, এক নাম অনেকেরই থাকে কিন্তু আমি যাঁকে দেখেছিলুম—।" সকলকে সরাইয়া দিয়া সুবালা নরেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া বলিল—হাঁ নরেন এই সেই, যাকে দেখে তুমি মোহিত হয়েছিলে।"

"কেন আর আমায় ভোলান ?"

সুবালা কহিল—"আচ্ছা যদি আমি প্রমাণ করতে পারি এই সেই, তা হলে ? তাহলে কিন্তু বোনটিকে আমার আর তাচ্ছিল্য করতে পারবে না।"

নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য আর একবার পার্শ্বোপবিষ্টার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা প্রমাণ করুন যে এই সেই, কিন্তু অন্যস্থানে যেতে পাবেন না, আমার সাম্‌নে ইহাকেই প্রমাণ করুন এই সেই, যদি পারেন তো আমি প্রতিজ্ঞা করচি আমি সন্তুষ্ট মনে ইহাকে গ্রহণ করব কিন্তু যদি না পারেন, বলে রাখ্‌ছি ইহাকে আমি কখনই স্ত্রী বলে স্বীকার করব না। কেমন এ কথা মনে থাকবে তো ?"

সুবালা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ওঃ খুব মনে থাকবে।" তারপর, গৃহস্থিত রমণীগণের প্রতি চাহিয়া সহাস্যে বলিল—তোমরা সকলে শুনে থাক যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তাহলে নরেন মনোর পায়ে দাসখৎ লিখে দেবে।"

সুবালার কথায় নরেন্দ্রের বিষণ্ণমুখে একটু হাসির রেখা পড়িল।

গৃহস্থিতা রমণীগণ বলিয়া উঠিলেন—"কি পাগ্‌লামি করচিস্ সুবালা ?"

সুবালা চোখ ঘুরাইয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"আঃ চুপ করনা। বাঁধন কাটা বন্যটাকে একবার মায়ার ফাঁদে ফেলি, শক্ত হাতে পড়েছেন, এড়িয়ে যাবেন কোথা। দেখিস্ দিদি, একদিন যদি ওই নরেনকে দিয়ে মনোর পায়ে না ধরাই ত আমার নাম সুবালা নয়।"

তারপর মনোর হাত ধরিয়া উঠাইয়া নরেনকে বলিল—"এস নরেন্দ্র আমার সঙ্গে, এই মনোই যে তোমার মনহারিণী—মনমোহিনী তা প্রমাণ করিগে, এস! এখানে এত লোকের মাঝে ঠিক নয়।"

নরেন্দ্র বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

ত্রিতলের সিঁড়ি বাহিয়া সুবালা, নরেন ও মনোকে লইয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল। তারপর গৃহস্থিত দীপটি আর একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেখ ভাই ভাল করে দেখ, ঘরে আমরা তিনজন ভিন্ন আর কেহ বা কিছু আছে কিনা।"

নরেন ইহাতে সঙ্কোচের কোন কারণ না দেখিয়া বেশ একজন নিপুণ ডিটেক্‌টিভের মত গৃহের প্রত্যেক কোনটি নিরীক্ষণ করিল কিন্তু একটি মাত্র ছোট ষ্টীলট্রাঙ্ক, এক সুরাই জল, দুখানি চেয়ার ও একখানি বড় আরসি ভিন্ন সে গৃহে আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

তখন সুবালা তাহার দিকে একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাকে বসিতে বলিল ও ট্রাঙ্ক হইতে একখানা মোটা চাদর বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দিয়া বলিল—"থাক। আধঘণ্টার আগে তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হচ্চেনা তুমি স্থির হয়ে বসে থাক।"

গৃহ নিস্তব্ধ। পরদার এপারে নরেন্দ্র, ওপারে মনোকে লইয়া সুবালা। নরেন ভাবিল—ব্যাপার কি? এ কিছু জানে নাকি? চাদরটা তুলে যে দেখ্‌ব তাও তো সাহস হচ্চে না। এখান থেকে কোন গুপ্ত পথ আছে নাকি? কই তাও তো বোধ হল না। বি, এ, পরীক্ষা পাস করা অপেক্ষাও যেন সম্প্রতি এই রহস্য ভেদ করা নরেন্দ্রের কঠিন মনে হইল।

চিন্তামগ্ন নরেন্দ্রকে চমকিত করিয়া আধ ঘণ্টার কিছু পূর্ব্বেই সুবালা হাসিতে হাসিতে চাদরখানা টানিয়া একপার্শ্বে সরাইয়া বলিল—"দেখ ভাই, এই তোমার মনমোহিনী কিনা? দেখ, ভাল করে মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ ঠিক সেই কিনা?"

নরেন চাহিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত দেখিল—একি! এত সেই! ঠিক সেই গড়ন, সেই ধরন, সেই নয়ন কই একটুও তো বিভিন্নতা নাই! মরি! মরি! কি সুন্দর মনোহারিণী মূর্ত্তি! ব্যাপার কি! এই তো সেই আলুলায়িত কুন্তলা নীলবসনা সুন্দরী, যাহার অপার্থিব রূপ বর্ণনায় আমার খাতার কত পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে, যাহার মধুময়ী চিত্র অন্তরে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে! কিন্তু একি! নরেন ভাবিল—এ সত্য না স্বপ্ন দেখছি? নির্লজ্জের মত অনিমিষ অতৃপ্ত- নয়নে নরেন সে রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল শেষে উদ্‌ভ্রান্তের মত বলিয়া উঠিল—একি কোন প্রহেলিকা? না আমারই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?"

সুবালা এতক্ষণ নিঃশব্দে হাসিতেছিল, এখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীরস্বরে বলিল,—"না নরেন্দ্র এ প্রহেলিকাও নয়, আর, তোমার দৃষ্টি বিভ্রমও ঘটেনি। তোমার ভুল নয় এ বিধাতার ভুল। তিনি বোনটিকে আর সকল সৌন্দর্য্যেই বিভূষিত করেছেন, কেবল জানিনা কি ভুলে রংটাতে কিছু অতিরিক্ত কাল ঢেলে দিয়েছেন, তাই অতটা সৌন্দর্য্য একটুখানি রঙের অভাবে অপূর্ণ থাকে দেখে, একটু কৃত্রিম রঙে সে অভাব মোচন করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের এই ছোট বোনটি যখন ওর কাল রঙের উল্লেখ করে আমাদের সঙ্গে কোন নিমন্ত্রণে যেতে অসম্মত হত, আমার প্রাণে তখন বড় ব্যাথা লাগত; তাই বাবা যখন আমায় পেণ্টিং শেখাবার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিলেন, আমি সেই

আমেরিকান মেমের কাছে ক্যাম্বিসের উপর আঁকা মানুষের সুন্দর রং ফলাবার চেয়ে সজীব মানুষের দেহ কোন্ উপায়ে সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে রং করতে পারা যায় সেইটাই বিশেষভাবে শিখেছিলাম, আর মনোর বেশ বিন্যাসের ভার নিজে নিয়ে ওকে আমি মনের মত করে সাজিয়ে দিতাম এইমাত্র আমার অপরাধ আর কিছুই নয়। কিন্তু কোনো দিন ভাবিনি যে আমার এই খোদার উপর খোদগিরি দেখে কেউ মুগ্ধ হবে বা হঠাৎ এত বড় একটি ভুল করে বসবে।

নরেন্দ্র মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া, একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা। ঠকানটাই ঠকিয়েচেন যা হোক!"

সুবালা ঠোঁট উল্টাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া চাবির রিংটা অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"কি? ঠকিয়েছি আমি? না তুমি? যদি জানতুম তুমি মনোর গুণের দিকে লক্ষ্য না করে শুধু চক্‌চকে চামড়াখানা দেখে ঘুরে পড়েছ তাহলে কাকাবাবুকে এ বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে বল্‌তুম। দেখ, মেয়ে মানুষ আমরা, রূপের চেয়ে গুণের আদর করি, আর যে গুণের আদর জানে তাকেই মানুষ বলে মানি। ছিঃ ছিঃ এতকাল ভক্তিভাবে শিবপূজা করে মনো কিনা শেষে এক অমানুষের হাতে পড়ল!

নরেন মনে মনে ভাবিল—"হাঁ ঠিক কথা; আমি যে মানুষ নই আমার কাজেই তা প্রকাশ পাচ্চে।

* * * * *

পরদিন, বরকন্যা বিদায়ের পূর্ব্বে ক্ষুব্ধ নরেন্দ্রনাথ সুবালাকে একান্তে সানুনয়ে বলিল—"দোহাই আপনার আজিকার মত আমার মান রক্ষা করুন, ঠিক তেমনি ভাবে আপনার বোনটিকে সাজিয়ে পাঠান।"

প্রভাতের নির্ম্মল অরুণালোকে প্রশস্ত রাজপথে পুষ্পশোভিত উন্মুক্ত চতুরশ্ব শকটে, বিবিধরত্নালঙ্কারভূষিতা মুক্তকেশী মনমোহিনীকে যখন সূক্ষ্ম রেশমী ওড়নায় অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে বসাইয়া দেওয়া হইল,—নরেন্দ্রের পূর্ব্বরাত্রের ঘটনায় উৎসাহহীন বন্ধুগণ অতিমাত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাবিলেন—একি ইন্দ্রজাল নাকি!

চন্দ্রবাবুর ভবন দ্বারে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত মধুর রাগিনী নববধূর আগমন সূচনা করিলে নরেন্দ্রের জননী হীরক-বলয়-শোভিত হাত দোলাইয়া বেনারসী সাড়ীর অঞ্চল লুটাইয়া, হাসিমুখে জলের ঝারা দিতে দিতে বধূকোলে লইয়া অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে আসিয়া দুধে আলতার থালে তাহাকে নামাইয়া

তাহার কক্ষে মঙ্গল ঘট ও হস্তে সদ্যধৃত মৎস্য দিয়া নীরব আশীর্ব্বাদের সহিত সস্নেহচুম্বনে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া, বরণের জন্য বয়োঃজ্যেষ্ঠা ননদিনীর হস্তে বরণডালা তুলিয়া দিলেন।

নববধূর প্রতি চাহিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ বউ হবে তো এম্‌নি। আহা! বউ নয় তো যেন পিরতিমেখানি!"

ও বাড়ীর ছোটঠাকরুণ একই মুহূর্ত্তে নববধূ ও নরেনের ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"সেজবোয়ের কোন্ বোউটিই বা মন্দ? বড় মেজ দুইই সুন্দরী, ছোট বৌটি আবার দেখছি নিখুঁত সুন্দরী! যেমন কাঁচা সোনার রং, তেমনি চোখ, মুখ, নাক, গড়ন পিটন সবই সুন্দর, কোথাও একটু খুঁত নেই।" মনোর সুদীর্ঘ সুচিক্কন কেশরাশিরও সকলে প্রশংসা করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া নরেনের বৌদিদি তাহার কানের কাছে মৃদুস্বরে বলিয়া গেলেন—"এইবার বুঝেছি ঠাকুরপো একবার দেখে কেন পাগল হয়েছিলে, মনমোহিনী শুধু নামে নয় রূপেও যথার্থ মনমোহিনী।"

নরেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তোমাদের বরণ কি আর শেষ হবেনা গা? আর যে দাঁড়াতে পারিনা, পা ধরে গেল।"

নরেন্দ্রের কথায় সকলে হাসিল, আর সে দীর্ঘশ্বাসের অর্থ বুঝিয়া ঘোমটার অন্তরালে নববধূর বড় বড় চোখদুটি অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

প্রয়াগ প্রবাসিনী

অভ্যাস

(ছাত্রগণের প্রতি)

বিদেশের একজন পণ্ডিত বলেছেন, অভ্যাস (habit) আমাদের সমস্ত জীবনটাকেই গ'ড়ে তোলে। কারণ, আমাদের সকল শক্তি সকল দুর্ব্বলতার মূলে আছে অভ্যাস। অভ্যাসই জগতের সকল কীর্ত্তি সকল শিক্ষা সমস্ত বিদ্যার জনয়িতা। আবার আর এক দিক দিয়ে দেখলে ব'লতে হয়, সমাজের সকল উন্নতি যে পরিশ্রমের ফল, অভ্যাস বস্তুটি হ'ল সেই শ্রম বাঁচাবার কল স্বরূপ। অভ্যাসের গুণ ঢের। যারা কাজের লোক তারাই বোঝে, অভ্যাস মানুষের কোন কাজে আসে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অভ্যাস, কাজে ভুলচুক হ'তে দেয় না, তানা-নানা করে কাজে সময় নষ্ট হ'তে দেয় না, যে

কাজের যে সময় বাঁধা থাকে, তারই মধ্যে যে কাজটা শেষ করে দেয়, আর কাজের পেছনে খেটে খেটে খুন হ'তে দেয় না। অভ্যাস আমাদিগকে কাজের ঘুণ করে ছাড়ে। যে কাজে যার রপ্ত হয়ে যায়, সে কাজে মন লাগাবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। তখন মনটা অন্য দিকে গেলেও নজরটা সেই কাজের উপরই পড়ে থাকে। অভ্যস্ত কাজ বুঝেনিতে বেগ পেতে হয় না, সে কাজে আর খোঁচ খাঁচ থাকে না, সমস্তই কলে ফেরার মত অক্লেশে হয়ে যায়। যে কাজের ঘাঁত ঘোঁত জানা না থাকলে যে সে তাহাতে হাত দিতে পারে না, অভ্যাসের বলে সে সব কুটকচালে প্যাঁচোয়া কাজও অবলীলাক্রমে হয়ে যায়। বাহিরের লোক তাই দেখে অবাক হয়ে যায় কিন্তু যে করে, তার কিছুই নয়। একই কাজ করতে করতে, দেখতে দেখতে মাথা খুলে যায়, তখন সেই কাজটাই আরও সহজে, আরও অল্প সময়ে করবার উপায়ও বেরিয়ে যায়।

এই অভ্যাসকে ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুলতে হয়, অর্থাৎ অভ্যাস না থাকলে করে নিতে হয়। আর তা করতে গেলে প্রথমেই চাই ঝোঁক। ঝোঁক কি না একটা কিছু করবার বা হবার জন্য সেইদিকে সমস্ত শরীর ও মন দিয়ে ঝুঁকে পড়া। আর সব কাজ ক'রব, কিন্তু ওটাকে ভুলব না, ও কাজটা করবার সময় যাই আসবে, অমনি সব কাজ রেখে ওটাতেই হাত দেব; হচ্চে হবে কচ্চি করব, বলে এক তিলও সময় নষ্ট হতে দেব না। তারপর সে কাজটা হাতে নিয়ে অন্যান্য কাজ পড়ে রৈল বলে যে এটা যো সো করে শেষ করে ফেলব তাও নয়। সে কাজটা করবার যে সব কৌশল, যে সব ধারা আছে তার সমস্তই খুটইয়ে করে যাব। যেটার পর যা, তার কিছুই বাদ দেব না, তাতে প্রথম প্রথম বেশী সময় যায় যাক্ সে দিকে দেখবও না কিন্তু কাজটা যেমন চাই তেমনি হচ্চে কি না সেই দিকেই নজর রাখব। এমনি করে ক্রমাগত লাগতে লাগতে তবে অভ্যাস জন্মে যায়; তখন সেটা আহার নিদ্রার মত হয়ে দাঁড়ায়। যে পাথরখানা হাতুড়ির একঘায়ে ভাঙে না, সেই পাথরে তার উপর, তার উপর ঘা দিতে হয়, পিটতে পিটতে তখন পাথরখানা চূরমার হয়ে যায়। এখন হাতুড়ির কোন ঘায়েতে পাথরখানা ভেঙে গেল বলতে পার? বলতে হবে হাতুড়ির প্রত্যেক ঘায়ে। প্রথম ঘা থেকে আরম্ভ করে, পরে পরে ঘা খেয়ে খেয়ে পাথরখান এমন জখম হয়ে এল যে, শেষ ঘায়ে আর টে'কল না। বুঝতে হবে,

পূর্ব্বের যা ফলো যা আরম্ভ করেছিল, শেষ যা তা সমাপ্ত করলে মাত্র। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোজ একই নিয়মে ক্রমাগত একঘেয়ে ভাবে করতে পারলে তবে কার্য্য-সিদ্ধি হয়। ক্রমাগত একঘেঁয়ে কাজ করায় একটা অভ্যাস জন্মে। এই অভ্যাসই কার্য্য-সিদ্ধির মূল কিন্তু এই বাঁধা নিয়মের অন্যথা করলে, এই একঘেঁয়েত্ব নষ্ট করলে সব কল বিগড়ে যায়—অভ্যাস আর জন্মিতে পায় না। তবেই দেখা যাচ্চে আগে ঝোঁক, তারপর আর সব। এই কাজটা করতেই হবে বা দশজনের মধ্যে একজন হতেই হবে এমন একটা আগ্রহ—একটা প্রতিজ্ঞা থাকা চাই। একটা প্রবল ক্ষুধা হওয়া চাই। এই ক্ষুধা একবার হ'লে তাকে জুড়াতে দিতে নাই—ঝোঁক একবার হ'লে তাকে চলে যেতে দিতে নাই। তখন সেই ঝোঁক থাকতে থাকতেই একঘেঁয়ে নিয়মে ক্রমাগত তাতে লেগে থাকতে হয়, আর তাহলেই কিছুদিন পরে একঘেয়েত্ব নষ্ট হয়, আর ভিতর থেকে অভ্যাস নামক বস্তুটি গড়ে উঠতে উঠতে মানুষের গৌণ স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা তাই বলেন, "habit is second nature!"

অভ্যাস আমাদের জীবনে কৃতকার্য্যতার মূল। যার জীবনের কাজগুলি গুছাইয়া করবার অভ্যাস জন্মে নাই, তার জীবনটা বিশৃঙ্খলার সমষ্টি—অকৃতকার্য্যতার রাশি। এই ধর না, ইস্কুলের পড়া রোজ তয়ের করা যা'র অভ্যাস নয়, আর বুদ্ধি থাকলে কি হবে, একদিনে একগণ্ডা পড়া করতে পারলে কি হবে, পরীক্ষার তিন মাস থাকতে রাতদিন খেটে বইগুলো শেষ করে কি হবে, সে যা চায় তাই সে পারে না, বেশী সম্ভব সে পাশই করতে পারবে না! রোজ একবার করে দশ লাইন দশ দিন পড়লে যেমন মনে গেঁথে যায়, একদিন সেই দশলাইন দশবার পড়লে তা হয় না, হয় ত মুখস্তই হয় না। তেমনি এক বৎসরের পড়া তিন মাসেও তয়ের হয় না। শুধু ঝোঁক ফুরাইয়ে যাওয়াও, যায় কি না সন্দেহ। যে এমন করে পড়ে সে কি, ইস্কুলে যে রোজের পড়া রোজ তয়ের করতে থাকে বৎসরের শেষে পরীক্ষায় তার সঙ্গে পেরে উঠে? যে আমটা ৩০ দিনে গাছপাকা হয়, তাকে তিনদিনে জাগ দিয়ে পাকালে কি সেরকম মিষ্টি লাগে? যা হবার নয় তার আশা একেবারেই যেয়ো না—অভ্যাসে কখন আলস্য কোরো না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

প্রাচীন আর্য্য প্রাধান্য

———:o:———

আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান ঠিক কোন্ স্থানে ছিল তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। মধ্য এসিয়ার তাতার দেশের অন্তর্গত স্থান যে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। আমরা নিম্নে ইহার কয়েকটি প্রমাণ লিখিতেছি।

১। ঋগ্বেদের ১ অষ্টক্, ৬৪ সূক্ত ১৪ ঋকে দেখা যায়—"তোকম্ পুষ্যেম তনয়ম্ শতম্ হিমাঃ" অর্থাৎ শত হিম ঋতু জীবিতবান্ পুত্র ও পৌত্র আমরা যেন পোষণ করি। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যেরা ভারতবর্ষ অপেক্ষা কোন হিমতর প্রদেশে বাস করিতেন।

২। গ্রীক্ ভূগোলবেত্তা টলেমি বলেন—উত্তর কুরু আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। ঐ উত্তরকুরু কোন্ স্থানে? অনেকে অনুমান করেন হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিম দিকস্থ দেশকে উত্তরকুরু বলিত।

৩। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে:—তেনৈত মুত্তরম্ গিরিমতি দুদ্রাব, আর্য্যদিগের আদিপুরুষ মনু স্বদেশ জল দ্বারা প্লাবিত হইলে হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণ দিকে আগমন করেন। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যদিগের আদিম বাস স্থান হিমালয়ের উত্তরে কোন এক স্থানে ছিল। এই জলপ্লাবন সম্বন্ধে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায়।

৪। বেন্দিদাদ নামক প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে:—ঐর্য্যনেম্ বীজোঃ অর্থাৎ যে দেশে দশ মাস অত্যন্ত শীত ও দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাব সেই দেশে আর্য্যেরা বসতি করিত। উক্ত গ্রন্থে পারস্যের উত্তরাঞ্চল অতি পবিত্র ভূমি ও মানুষের আদিম নিবাস বলিয়া উল্লেখ আছে। এক্ষণে ইহা স্থির অবধারিত হইল যে, পারস্য ও ভারতবর্ষের উত্তরে কোন স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন। সেই স্থান বেলুরট্যাগ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বুখারা সমরখন্দ প্রভৃতি স্থান। এই স্থান পশ্চিম ও পূর্ব্ব তাতারের অন্তর্গত। এই স্থান হইতে আর্য্যেরা দক্ষিণ ও পশ্চিমে যাইয়া অপনাদিগের উপনিবেশ স্থাপন করেন। দক্ষিণে যাহারা আসিলেন তাঁহারা পারস্য ও ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তাতে পারসীক জাতি "ঐর্য্য" নামে উল্লেখ আছে। এই "ঐর্য্য" জাতির নাম হইতে পারস্য

দেশের প্রকৃত নাম "ইরাণ" হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন এই ইরাণ হইতে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে ঋগ্বেদ রচিত হয়। ঋগ্বেদে দেখা যায় আর্য্যেরা সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সপ্ত নদী পার হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সপ্ত সিন্ধুকে পারসীরা হপ্ত হিন্দু বলিত। এই সিন্ধু হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হয়। প্রাচীন পারসীকের আচার ব্যবহারের সহিত হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অনেক মিল দেখা যায়।

হিন্দুরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন সে স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। তৎপরে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করেন। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রকে আমরা প্রথমে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাই। তৎপরে পুরাণে পরশুরামের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কেরিফেল্ দেশে ব্রাহ্মণদিগের উপনিবেশের কথা দেখিতে পাই।

তৎপরে লঙ্কায় হিন্দুদিগের প্রাধান্যের কথা জানিতে পারি। তৎপরে লঙ্কা ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা জোহোর দ্বীপশ্রেণী ও সুমাত্রা দ্বীপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

"The natives of ceylon and southern India must have gradually carried civilization in to the interior of southern Sumatra. Ibid.

'এই সুমাত্রা দ্বীপে আমরা হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বাহির হওয়ার প্রমাণ বিশ্বকোষকারের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। এই স্থানের পর সিলিবিস ও বালি দ্বীপে হিন্দু প্রাধান্য পরিব্যাপ্ত হয়।

"Great diverrity of opinion prevails regarding the origin of the Balinese and their conversion to the Hindoo religion in view of a similiarity in morals, Van Eck thinks they originnate from Celebes." W. Cool.

এই স্থান হইতে হিন্দুগণ বোর্ণিও দ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফিলিপাইন দ্বীপ ও সুলু দ্বীপে গিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন।

The Philipine Islands—Their southern half is tenanted by the Visaian, who resemble the Dyak of Borneo.

Quarterly Review No 314 of 1884.

The Sulu Archipelago—"A race is named who are called

Orang Dusan and another as the Orang Sulok or Bisayana. And there are remains of Budhism and Hinduisim.

Cyclopoedia of India by Balfour

সম্ভবতঃ এই ভারতবর্ষীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে হিন্দুপ্রাধান্য আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এই আমেরিকা হিন্দু পুরাণে পাতালপুরী বলিয়া বর্ণিত। আমেরিকা যে মহীরাবণের রাজ্য ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে আমেরিকা "কুমারদ্বীপ" নামে অভিহিত :—

"কুমারাখ্য ইতি গ্রাহ্য দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমঃ।
ডমরু কৃত মধ্যশ্চ দ্বীপো "মাহেয় সংগকঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ ডমরুর ন্যায় মধ্যদেশ ক্ষীণবিশিষ্ট দক্ষিণ ও উত্তর সমানভাগে বিভক্ত দ্বীপ কুমার নামে খ্যাত। মহীরাবণ নাম হইতে ইহার আর একটি নাম মাহেয়। আমেরিকা ডমরুর ন্যায়। এই আমেরিকা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের কুমার দ্বীপ তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল। শুদ্ধ আমেরিকার কুমার দ্বীপ ব্যতীত আমরা মেক্সিকো ও পেরু প্রদেশেও হিন্দুপ্রাধান্যের প্রমাণ পাই।

মাক্ষিক নাম হইতে মেক্সিকো নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে যথেষ্ট স্বর্ণ পাওয়া যাইত বলিয়া হিন্দুগণ ইহার নাম মাক্ষিক রাখিয়াছিলেন।

The name Mexico is probably derived from the ancient tribes of gold miners who called themselves Mexica or Ayteca. Nabinchandra Dass Geography of Asia p. 58.

এই মেক্সিকোর আজটেক্‌দিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিবার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। পেরু প্রদেশের ইঙ্কা নামক রাজারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিত ও রাম সীতোয়া নামে একটি উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিত। আমেরিকায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার সম্বন্ধে আমরা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই।

হিন্দু জাহাজ ইউরোপেও গিয়াছিল। কর্ণিলিয়সনিপস্ নামক এক ব্যক্তি জার্ম্মাণ সমুদ্রে জলমগ্ন হিন্দু জাহাজ পাইয়াছিলেন। (প্রবাসী ১৩১২ আশ্বিন) তৎপরে আফ্রিকায় হিন্দু প্রাধান্য দেখা যায়। মিশর দেশকে পূর্ব্বে মিশ্র দেশ বলিত। এই মিশ্রজাতি ভারতবর্ষ হইতে মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রাচীনকালে মিশরে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার

সহিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। মিশরবাসীদিগের ওসাই-রিস্ নামে এক দেবতা ছিল সেই দেবতার সহিত হিন্দুদিগের শিবের অনেক সাদৃশ্য আছে।

তৎপরে আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সকলের প্রাচীন হিন্দুনামের আভাষ পাওয়া যায়।

মরিশস্—মরীচি দ্বীপ।

মেডেগেস্কর—চন্দ্রদ্বীপ।

সোফেলা—সুফলা দ্বীপ।

শকোট্রা—সুখতরা।

Vide story of Geographical discovery.

মধ্যএসিয়া হইতে যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দু নাম ধারণ করেন, কালে তাঁহাদেরই বংশধরগণ পৃথিবীর চারিমহাখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে আর্য্যগণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ গ্রীক্, রোমাণ, ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি। পুরাকালে এক গ্রীক্ ও রোমাণ ভিন্ন কোন জাতি বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। প্রাচীন হিন্দুরা যেমন পৃথিবীর সকল স্থানে হিন্দু প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনি বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজগণ পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। অনেকে বলেন হিন্দু ও ইংরাজ প্রথমে এক পিতার পুত্র ছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বিরচিত বিবিধ প্রবন্ধ পুস্তক হইতে নিম্নের বিষয়টি উদ্ধৃত করিলাম।

"হিন্দুদিগকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও ইংরাজদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে বর্ণনা করিয়া একজন ইংরাজ লেখক নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন।

পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্রটি অতি শান্ত, ধীর প্রকৃতি ও ধ্যান পরায়ণ ছিলেন এবং অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। দ্বিতীয় পুত্রটি কার্য্যপ্রিয় ও কার্য্যকুশল কিন্তু চপল স্বভাব ছিলেন। তিনি কখন ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, কখন ভগিনীদিগের সঙ্গে দুগ্ধ দোহন করিতেন, কখন বা মৃগয়া করিতেন, কখন বা সামান্য ক্রীড়াতে নিযুক্ত থাকিতেন। কার্য্যকুশল হইলেও পিতা তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন না। শান্ত স্বভাব জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার প্রিয়পুত্র ছিল। একদা কনিষ্ঠ পুত্র মৃগয়া

করিতে করিতে অধিক দূর গমন করিলে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে তাঁহার স্বদেশের প্রান্তে যে পর্ব্বত দূর হইতে মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক বার দেখেন যে তাহার ও পার্শ্বে কি আছে। অনেক কষ্টে সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলেন যে, সে দিকের ভূমি মনোহর শ্যামবর্ণ নবীন তৃণাচ্ছাদিত এবং তাঁহার জন্মভূমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উর্ব্বরা ও সুদৃশ্য। এই স্থানে কিছু দিন বসতি করিবার পর ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দেশে বসতি করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। এইরূপে ক্রমে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তনের পর তিনি গ্রীস দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহা অতি সুন্দর বন, উপবন ও নাতি উচ্চ নাতি নিম্নপর্ব্বত দ্বারা সুশোভিত। সেখানকার আকাশ নির্ম্মল ও পরিষ্কার ও তথায় রমনীয় প্রসন্নাম্বু স্রোতস্বতী সকল সুমধুর কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে।...এইরূপে কনিষ্ঠ পুত্র গ্রীসদেশ হইতে ইটালি দেশে গমন করিয়া সপ্ত পর্ব্বতস্থিত রোম নগর পত্তন করিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইটালি দেশ জয় করিলেন। সৌর্য্য, বীর্য্য, সত্যনিষ্ঠতা ও দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং পৃথিবীর তৃতীয় অংশের এক অংশ জয় করিয়া ইউরোপে বর্ত্তমান রাজ্য সকলের নিয়মের পত্তন ভূমি-স্বরূপ রাজ-নিয়ম প্রচার করিলেন। তিনি ইউরোপের নানা স্থানে এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ইংলণ্ডে গমন করিয়া সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের আদর্শ স্বরূপ হইলেন, অসাধারণ স্বাধীনতা স্পৃহা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিলেন। তিনি সমুদ্ররাজ বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং মেদিনীব্যাপী এক বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন, সে রাজ্যের সম্বন্ধে সূর্য্য অস্তমিত হয় না।

ওদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃভূমির অনুর্ব্বরতা নিবন্ধন স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া স্বদেশ হইতে কিঞ্চিৎদূরে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। ঐ অল্প দূর আসিয়াই তিনি মনে করিলেন যে অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম করি। ভারতবর্ষের ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা তাঁহার বিশ্রাম শক্তির পোষকতা করিল, তিনি আরো ধ্যান পরায়ণ হইলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র আর গমন করিলেন না। ক্রমে তাঁহার আলস্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি ক্রমে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকেরা আসিয়া তাঁহার আবাস স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিল এবং তাঁহার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এমত সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট এক আর্ত্তনাদ সমুদ্রের এপার হইতে গমন করিল। সে আর্ত্তনাদ এই যে

"ভাই! রক্ষা কর"। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঝিতে পারিলেন না যে, কে আর্ত্তনাদ করিল কিন্তু কেবল সেই আর্ত্তনাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেখান হইতে তাহা আসিয়াছিল সেখানে আগমন করিলেন এবং প্রপীড়িত ব্যক্তির শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি প্রথমে সেই ব্যক্তির জীর্ণ, শীর্ণ কলেবর দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না কিন্তু যখন তাঁহারা পিতৃ নিকেতনে একত্রে বাস করিতেন সেই সকল শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ ঐ ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।"

উপরি লিখিত বিষয়ে লেখক যে লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষ হইতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা আর কোন স্থানে গমন করিলেন না" ইহা কতদূর সত্য? হিন্দুর প্রাচীন প্রাধান্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে হিন্দুরা পৃথিবীর চারি খণ্ডেই গমনাগমন করিতেন।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

সরমা

ষটস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার—ডাক্তার!

তখন শিশু সূর্য্যের স্নিগ্ধ মধুর সোনালী কিরণ তরুশিরে ঝিকিমিকি করিতেছিল। বকুল গাছে একটা কালো কোকিল ডাকিয়া উঠিল কুহু-কুহু-কুহু! পথে তখন সবে মাত্র দুই চারিটি লোক বাহির হইয়াছে; কে জানে কোথা হইতে তারানাথ আসিয়া বেলগেছিয়ার এক বাগান বাটীর রুদ্ধ দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল ডাক্তার-ডাক্তার! কে যেন তাহার জন্য দরজার পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল—নিমেষে দরজা খুলিয়া গেল—তারানাথের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের উপর একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আঃ! বাঁচলুম, মনে করে ছিলুম এত সকালে হয়ত তুমি থাকবে না—কত ডাকাডাকি করতে হবে—লোকজন জেগে উঠবে।"

বিনয় চাপা গলায় জোরের সহিত বলিল—"আমি জানি তুমি ঠিক এমনি

সময় এসে পৌঁছবে। দমদম্ থেকে এখানে আসতে এক ঘণ্টার বেশী লাগেনা। ট্রেণখানা যেম্নি দমদম্ ছেড়ে কলকাতার দিকে চলে গেল, আমি অম্নি এসে দরজার কাছে তোমার অপেক্ষায় বসে রইলুম। তুমি কি মনে কর আমার একটু কাণ্ড জ্ঞান নেই। তুমি যে চিনে এসেছ এই ঢের!"

"তা আর চিন্তে পারব না। তোমার এই মামার বাগানে আর বৎসরে মাছ ধরতে এসেছিলুম মনে নেই, এরি মধ্যে কি ভুলে যাব? তার পর এখন খবর কি?"

বিনয় উৎসাহের সহিত বলিল "সব ঠিকঠাক; এখন তোমার কি খবর, কতদূর কি করলে বল দেখি।"

তারানাথ মৃদু হাসিয়া কহিল "সে জন্যে ভাবনা কি, হয়েছে কিছু!"

"কত?"

"হাজার!"

"নগদ!"

"না গহনা পত্রে।"

দেখি বলিয়া বিনয় তাড়াতাড়ী তারানাথের হস্ত হইতে ব্যাগটি টানিয়া লইল এবং তারানাথ ভিতরে আসিলে বিনয় দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বিনয়ের মাতুলের এই প্রকাণ্ড সখের বাগানটি আজ যত্নাভাবে শ্রীহীন মলিন। আগে যাহা ছিল তাহা আর এখন নাই, আছে শুধু তাহার কঙ্কালটা! যেখানে গোলাপের কেয়ারি ছিল, সেখানে এখন কাঁটানটে রাজত্ব করিতেছে। যেখানে অজস্র বেল জুঁই মল্লিকা ফুটিয়া এক স্বর্গীয় সৌরভে সমস্ত বাগানটা বিভোর করিয়া তুলিত, আজ সেখানে ঘেঁটুফুলের ঝাড় আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত হেম সরোবরের সোপানগুলি সেওলায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জলটুকু আজ বায়ু হিল্লোলে মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলে না। আজ তাহা অব্যবহার্য্য, দূষিত! পানা ঝাঁজি ও আগাছায় পুষ্করিণীটি একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। বড় বড় আম্র বৃক্ষের আড়ালে উত্তর দিকে এক দ্বিতল বাটি। বাড়িটি মাথা তুলিয়া এখনও তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু উহার অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া কয়েকটি অশথ ও বটবৃক্ষ উহাকে আপনার ভাবিয়া স্বজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। বাটি হইতে বাগানের খানিকটা অংশ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। বাকি অংশটা আম্রবৃক্ষে ঢাকা পড়িয়া যায়। বাগানে এক পুরাতন বিশ্বাসী

মালী আছে, সে কখনও তাহার প্রভুর নিকট মাহিনার জন্য তাগাদা করেনা। মাহিনা তাহার কি হইবে? সে যে আম কাঁটাল, লিচু নারিকেল বেচিয়া মাহিনার দশগুণ তুলিয়া লয়! প্রভু সে খবর রাখেন না।

বিনয় তারানাথকে লইয়া এক ঝোপের মধ্যে আসিয়া ব্যাগটি খুলিল। ব্যাগ খুলিয়া প্রথমেই টাকাগুলি গনিয়া দেখিল চার'শ পনের টাকা দশ আনা। তারপর গহনাগুলি হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল সব কখানাই বেশ ভারি, মনে মনে বুঝিল দাম তিন হাজার টাকার কম নহে।

টাকা ও গহনাগুলি যথাস্থানে রাখিয়া বিনয় ব্যাগ বন্ধ করিল। তারানাথ আগ্রহের সহিত বলিল "কেমন, কি বুঝলে এখন কিছু দিন চল্‌বে তো?" বিনয় গম্ভীর ভাবে কহিল "গহনাগুলো বিক্রি করলে পাঁচশ টাকা আন্দাজ হতে পারে, তা হ'লে এই হাজার টাকায় কোন রকমে পাঁচ ছয় মাস কেটে যেতে পারে।"

তারানাথ উৎসাহের সহিত বলিল "ব্যস্—তারপর অন্য উপায় করা যাবে। সে কথা এখন যাক্, আমিও সেদিন টাকার জন্যে বাড়িতে চলে এলুম। তার পর তুমি কি করে হাত করলে বল দেখি, নবীন মণ্ডলকেই বা সরালে কি করে?"

"বলচি, এখন বোঝ কেমন চাল চেলে ছিলুম। এসব চাল কি তোমাদের কচি মাথায় ঢোকে, এর জন্যে আমাকে কি thanks দেওয়া উচিৎ নয়?"

তারানাথ মাটিতে মুষ্টাঘাত করিয়া বলিল, হু'শ thanks my dear doctor তোমার হাড়ে ভেল্কি খেলে।"

"ঐ শুধু একখানা টেলিগ্রাম করবার জন্যে আমাকে কলকাতায় লোক পাঠাতে হয়েছিল। তাতে আমার বেশ হু'পয়সা খরচ হয়েচে।"

"এইবার তোমার সব খরচ উঠে যাবে।"

"না আমি সে জন্যে বলচি না, খরচ করতে তো নেমেছি এখনও অনেক খরচ করতে হবে, মাছতো এখন জালে, হাতে না এলে তো বিশ্বাস নেই।"

"সে কি এখনও হাতে আসে নি? আমাকে সব খুলে বল না। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে নাকি?"

বিনয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল "আমার এ জগৎ-বেড় জাল ছেঁড়ে কে! তবে হাতে আস্‌তে না হয় হুদিন দেরি হ'ল; তাড়াতাড়ী করলে সব কেঁসে যাবে যে।"

"না—না তুমি যেমন বুঝবে তেমনি করবে। সেদিনকার ব্যাপারটা সব খুলে বল না, শোনবার জন্যে যে প্রাণটা আই-ঢাই করচে।"

"হুঁ, বল্‌চি, নবিন মণ্ডল গঙ্গাধর ঠাকুরের সঙ্গে চলে গেলে মাঝি ব্যাটাকে টাকা দিয়ে রাজি করলুম, সে কোন একটা ছুতো করে আমার জন্যে কালীগঞ্জের ঘাটে রাত্রে নৌকা বেঁধে রাখবে—এটা বোধ হয় তুমি জান।"

"এ বন্দবস্ত তো আমার সামনেই হ'ল, তার পর ?"

"তার পর তুমিও চলে গেলে আমিও চলে গেলুম! আমি বাড়ী গিয়েই কিছু টাকা আর কয়েকটা বিশেষ দরকারী জিনিস একটা ছোট ব্যাগের ভেতর পুরে নিয়ে ঝাঁ করে বেরিয়ে পড়লুম। ঘাটে এসে দেখি নবীন মণ্ডলের নৌকা ছেড়ে দিয়েচে। আমি তাড়াতাড়ি পেসন্নর নৌকাখানা কালীগঞ্জ অবধি ভাড়া ক'রে উঠে পড়লুম।"

"তার পর কালীগঞ্জে কখন পৌছিলে ?"

"বলচি, রাত্রি আন্দাজ ১০টার সময় আকাশ বেশ অন্ধকার ক'রে এল, সঙ্গে সঙ্গে টিপ্‌ টিপ্‌নো বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল, এই সময় আমার নৌকাখানা কালীগঞ্জের ঘাটে এসে ভিড়ল।"

তারানাথ আগ্রহসহকারে কহিল "আচ্ছা ঘাটে তো অনেক নৌকা থাকে, এই অন্ধকার রাত্রে তাদের নৌকাটা চিনে নিলে কি করে।"

"চিনে নিতে আমার এক মিনিটও দেরি হয় নি, কারণ সে আমার কথামত তার লাল কাঁচে ঘেরা ছোট হাতলণ্ঠনটী জালিয়ে রেখেছিল। আমি নিঃশব্দে নৌকায় এসে দেখলুম দাঁড়ী মাঝিরা সব হোগলার ছৈয়ের নিচে তেরপল মুড়ী দিয়ে মড়ার মত পড়ে আছে। তার পর আলোটি নিবিয়ে দিয়ে নৌকার ভেতর এসে দেখলুম কোন সাড়া শব্দ নেই সকলেই বেশ অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তখন আমি সুবিধা পেয়ে আমার ডাক্তারি অভিজ্ঞতার একটু পরিচয় দিলুম।"

তারানাথ উৎসুকভাবে কহিল, "তার পর ?"

"তার পর সব কাজ রফা। ঘুমে একেবারে অচেতন!"

"তখন তুমি কি করলে ?"

"তখন আমি নঙর বাঁধা দড়ি খানিকটা কেটে নিয়ে নবীন মণ্ডলের হাত পা বেধে রেখে, কিনারা থেকে একখান ভারি পাথর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসে, ঐ দড়ীর সঙ্গে বেশ করে বেঁধে রাখলুম কেহ কিছুই জানতে পারলে না।"

"তার পর ?"

তারপর মাঝিকে জাগিয়ে তার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লুম নৌকা খুলে দাও, নবীন মণ্ডল নেবে গেছে। মাঝি টাকা কটা পেয়ে দুহাতে আমাকে সেলাম করে হৈ হৈ শব্দে দাঁড়ীদের জাগিয়ে তুল্লে, পরে কড়া করে এক কল্কে গাঁজা সেজে খুব একটা দম দিয়ে আমার দিকে কল্কেটা এগিয়ে দিয়ে বল্লে বাবু—"আমি গাঁজা খাই না শুনে দাঁড়ীদের কল্কেটা দিয়ে, নঙ্গরটা তুলে নিয়ে নৌকো খুলে দিলে। আমি পরদা তুলে ভেতরে এসে বসলুম। নৌকো যখন মাঝ গঙ্গায় এল, তখন আমি আস্তে আস্তে জানালাটী খুলে "মা তুমি ধর" বলে নবীন মণ্ডলকে ঐ খোলা জানালার ভেতর দিয়ে গঙ্গার উপর শুইয়ে দিলুম, সে নিমেশে নিচেয় চলে গেল, কোন সাড়া নেই কোন শব্দ নেই, অন্ধকারে কেউ কিছু দেখতে পেল না, কারুর কিছু সন্দেহ করবার রইল না।"

তারানাথের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, সে কি বলিতে যাইতেছিল মুখে আটকাইয়া গেল, মাটির দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় তারানাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেমন হে তুমি হ'লে পারতে ?"

তারানাথ কি ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "না পারতুম না। তার পর কি করলে ?"

"তোমরা পাড়াগেঁয়ে ভূত তোমাদের একটু সাহস নেই; আমরা মেডিকেল কলেজের ফেরত, মড়া কেটে কেটে প্রাণটা কঠিন হয়ে গেছে, এখন আর এসব কাজে ভয় হয় না। হ্যাঁ—তারপর রাত্রি আন্দাজ চারিটার সময় কমলার নাকের কাছে একটা শিশি ধরলুম, তাতে তার চেতনা ফিরে এল। ঘণ্টা খানেক পরে সে চোখ চেয়ে দেখলে, আমি একটু তফাতে সরে বসলুম। সে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে মাথার কাপড়টা একটু ভাল করে দিয়ে, উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চারি দিকে চাইতে লাগল। তখন জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো নৌকার ভেতরে এসে পড়েছিল, সে সেই আলোতে অপরিচিত আমাকে দেখে সহসা বিবর্ণ হয়ে গেল, তার গোলাপের মত মুখ খানা সাদা হয়ে এল, সে হঠাৎ ভয় পেয়ে "মাঝি মাঝি, নবীন কোথায় ?" বলে চীৎকার করে উঠল। মাঝি বল্লে, "নবীন এই বাবুকে রেখে কালীগঞ্জের ঘাটে নেমে গেছে ?" আমি তখন সুযোগ বুঝে বল্লুম, "নবীন একটা বিশেষ দরকারে আমাকে এখানে রেখে কালীগঞ্জের ঘাটে নেমে গেছে। সে আমাকে সব বলে গেছে, আমি মেডিকেল কলেজে পড়ে ডাক্তার হয়েছি, আমি মেডিকেল কলেজে সকলকে জানি। কলকাতায় পৌছেই আমি আপনাকে হরিপদ বাবুর কাছে নিয়ে যাব। যাতে

তাঁর চিকিৎসা হয়, সে বন্দবস্তও করে দেব। আপনার কোন চিন্তা নাই, নবীন মণ্ডল ভুএক দিনের মধ্যে হাঁসপাতালে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে।"

"তারানাথ বিস্মিত ভাবে কহিল "তোমার কথা সে বিশ্বাস করলে ?"

"বিশ্বাস করবে না তো কি। তখন যেন তার ভয় ভেঙে গেল, আড়ষ্ট ভাবটা যেন কেটে গেল, মুখখানা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সে নতমুখে ধীরে ধীরে কহিল "আমি একলা মেয়ে মানুষ, দেখবেন আমার যেন কোন বিপদ না হয়।"

"তুমি কি বল্লে ?"

আমি বল্লাম "আমি থাকতে আপনার বিপদ ? সে কথা মনেও ভাববেন না। আমি কলকাতায় ডাক্তারি করি, কালীগঞ্জে রুগী দেখতে গিছলুম, এখন ফিরে আস্‌চি। হাঁসপাতালে আপনার একা থাকা সুবিদে হবে না। আপনি চাই কি এখন আমার বাড়ীতে থাকতে পারেন, আর রোজ সকাল বিকাল হরিপদ বাবুকে দেখতে আসবেন—কেমন ?"

"তোমার কথা শুনে কমলা কি বল্‌লে ?"

"কি আর বল্‌বে, মৌনং সম্মতি লক্ষণং জানিয়ে চুপ করে বসে রইল।"

"তার পর তুমি কি কর্‌লে ?"

"আমি এক পাশে চুপ করে রইলুম। খানিক পরে মাণিকলাল খিদে পেয়েছে বলে কেঁদে উঠল, আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে ভুখানা বিস্কুট বার করে তার হাতে দিয়ে কোলে করে নৌকার বাহিরে এলুম। সেও আমার সঙ্গে বেশ মিশে গেল, যেন কত দিনের চেনা।"

"হ্যাঁ, ছেলেদের স্বভাবই এই রকম, খাবার পেলে সব ভুলে যায়, চেনা অচেনা বাছেনা। তার পর ?"

"বেলা আন্দাজ একটার সময় আমাদের নৌকা বড় বাজারের ঘাটে ভীড়ল্। সেখান থেকে এক খান ভাড়াটে গাড়ী করে মেডিকেল কলেজের ফটকে এসে নামলুম। কমলা মাণিককে নিয়ে গাড়ীতেই বসে রইল। আমি কোয়ার্টার খানেক ঘুরে এসে বললুম। "হরিপদ বাবু বেশ ভালই আছেন, আমি তাঁকে আপনার এখানে আসবার সংবাদ জানিয়েছি, তিনিও খুব খুসি হয়েচেন। তবে আজ দেখা করবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আজ আর হবে না। কাল সকাল করে আপনাকে আন্‌ব। তারপর বেলা তিনটার সময় আমাদের গাড়ী এসে এই বাগানে পৌছিল, ভাগ্যিস শামবাজার থেকে এক চোবড়া খাবার কিনে এনেছিলুম, তা না হলে ডাহা উপবাসে মরতে হত।"

তারানাথ মৃদু হাসিয়া বিনয়ের পিঠে চাপড়াইয়া কহিল, "দাদার কি বুদ্ধি বাবা বলিহারি যাই। তবে এখানে এমন করে কদিন থাকা যাবে, যদি তোমার মামা বাগানে আসেন তাহলেই তো সর্ব্বনাশ!"

"মামার বাগানে আসা বোধ হয় আর ঘটে উঠবে না। তিনি আজ বছর দুই বাতে শয্যাগত ছিলেন! তার পর এক পৃষ্ঠব্রণ নিয়ে আজ ছমাস বিছানায় পড়ে আছেন, এ যাত্রা বুঝি আর ট্যাকেন না। যদি ভগবানের ইচ্ছায় টেঁসে যান, বুঝলে কিনা ভাই, এই বাগান বাড়ী, বিষয় আশয়, টাকা কড়ি আমার—মামার ছেলে পুলে নেই! তখন তোমায় আমায় দিন কতক স্ফূর্ত্তী করা যাবে, কেমন হে?"

"তা আর বলতে, তবে সে তো এখন দূরের কথা। এখানে থেকে স্ফূর্ত্তী করা আমার তো খুব সেফ্ বলে মনে হয় না। আর এমন করে স্তোক বাক্য দিয়েই বা ক'দিন রাখবে? এখন তো আমাদের হাতে, স্পষ্ট কথা খুলেই বল না।"

বিনয় চাপা গলায় কহিল—"কি বল্‌ব? চুপ কর, সইয়ে সইয়ে হাতে আনতে হবে, এখনি সব কথা খুলে বললে আমাদের এতটা পরিশ্রম সব মাটী হয়ে যাবে। একটা মহা হৈ চৈ করে কেঁদে উঠবে। বোধ হয় কাল রাত্রে কিছু খায় নি!"

"তবে এখন উপায়? আজ যখন হাঁসপাতালে যেতে চাইবে তখনই বা কি বলবে?"

"যা বলব তা আমি ঠিক করে রেখেছি। এখানে থাকাটাও যে সেফ্ নয় তাও আমি ভেবেচি। মনে করেচি কাশী যাওয়া যাগ্—কি বল?"

তারানাথ হাসিমুখে বলিল "বেশতো, কিন্তু নিয়ে যাবে কি করে?"

বিনয় গাঢ়স্বরে কহিল "সে ভার আমার। এখন বেলা হয়ে উঠল, মালিটাকে ডেকে মাণিকের দুধের বন্দবস্ত করে দিই। তুমি একটা কাজ কর, এখন শামবাজারে গিয়ে একটা হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে, দশটার মধ্যে একখানা গাড়ী নিয়ে এখানে ফিরে এস!"

তারানাথ বিরক্তির সহিত কহিল, বা, "তোমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া হবে আর আমি যাব কিনা শামবাজারে, কেন?"

বিনয় মিনতি সহকারে কহিল "আমি বলচি তুমি যাও, তোমাকে দেখলে এখনি সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

তারানাথ আর কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। বিনয়কুমার

মাতুলালয়ে থাকিয়া তাঁহারই ব্যয়ে মেডিকেল কলেজে পড়া শুনা করিত। ছেলেটি পরীক্ষায় ফেল করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। দেশে আসিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিল যে, পরীক্ষক মহাশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া সিকি নম্বরের জন্য তাহাকে ফেল করিয়াছে, তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। যদিও তাহাকে এল-এম্-এস অক্ষরে দাগিয়া দেওয়া হয় নাই তথাপি সে উক্ত উপাধি ধারি ডাক্তার অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সে বিনা ভিজিটে রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা পত্রাদি লিখিতে লাগিল, ইহাতে রোগীর রোগ সারুক, আর নাই সারুক সে কিন্তু একজন ডাক্তার বলিয়া জাহির হইল!

উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও নানা দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া কমলা সেই পরিত্যক্ত বাগান-বাটীর নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে সমস্ত রাত্রিটা অনিদ্রায় কাটাইয়া দিল। প্রভাতে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নিকটে কাহারও ঘর বাড়ী কিছুই দেখিতে পাইল না—দেখিল শুধু অগণিত শ্যাম তরু একটির পর একটি করিয়া বহুদূর অবধি চলিয়া গিয়াছে—আর সেই তরু শাখায় মুক্ত বিহঙ্গমের কলকণ্ঠ মধুর ঝঙ্কার! কমলা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহার তাপিত প্রাণটা যেন একটু শীতল হইয়া আসিল। সে ভাবিল ডাক্তার বাবু কেন তাহাকে আপনার বাটীতে না লইয়া গিয়া এই বাগান বাটীতে আনিলেন। তাঁহার কি কোন দুরভিসন্ধি আছে? না, না তাহাও কি হ'তে পারে, ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাকে কালীগঞ্জে পাঠাইয়াছিলেন তাই সে এখানে আসিতে সমর্থ হ'য়েচে। আজ তিনি আমার স্বামির সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। ভগবান্ ডাক্তার বাবুর মঙ্গল করুন! স্বামী সন্দর্শনের প্রবল আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা আজ কমলার সমস্ত হৃদয়টা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার নিদ্রা সে ভুলিয়া গিয়াছে, সে কেবলই ভাবিতেছে কি করিয়া সে তাহার স্বামীর সেবা করিবে। তিনি যে বড় বিপদে পড়িয়া তাহাকে স্মরণ করিয়াছে। সে কি তাঁহার সেবার যোগ্যা হইবে? তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে সে কি অধিকার পাইবে! কমলার প্রাণটা বিচলিত হইয়া উঠিল, চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। সে যে আজ হেয়া—পরিত্যক্তা! তাহার ব্যাকুল হৃদয়ে বড় ব্যথা বাজিতে লাগিল। সে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া খানিক কাঁদিয়া লইল। পরে আপনাকে একটু সংযত করিয়া, চঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল এবং যুক্ত করে ঊর্দ্ধে চাহিয়া কি জানি কোন্ দেবতার নিকট তাহার স্বামীর মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল।

বিনয় উপরে আসিয়া দেখিল মাণিকলাল গত রাত্রের পরিত্যক্ত খাবারগুলি আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে—একটা কিছু গালেও পুরিয়াছে। বিনয়কে দেখিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "খাবাল খাবাল!" কমলা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া মুখ খানা জানালার দিকে ফিরাইয়া লইল। বিনয় মাণিকলালকে কোলে লইয়া ধীর ভাবে কহিল "আপনার চোখ দু'ট লাল হয়ে উঠেচে দেখচি, আপনি কেঁদেচেন নাকি? ভয় কি হরিপদ বাবু শিগ্‌গির সেরে উঠবেন, আমি তো কাল তাঁকে ভালই দেখে এসেচি। আপনি গিয়ে দেখবেন আসুন, আমি গাড়ী আস্তে পাঠিয়েছি। পশ্চিমের বারাণ্ডায় মালি স্নানের জল রেখে গেছে, আর একটু পরে ঠাকুর ভাত দিয়ে আসবে, আপনি দু'ট খেয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে থাকুন, আমি একটু পরে আসচি।"

কমলা মনে মনে বিনয়কে শত ধন্যবাদ দিয়া কহিল "আপনি আমাদের জন্য যে পরিশ্রম করচেন—লোকে তা করে না, আশা করি ভগবান আপনাকে সুখী করবেন।"

বিনয় হাসিয়া কহিল "আমি আর কি করচি, মানুষে যদি এটুকুও না করে তবে আর মনুষ্যত্ব থাকে কৈ!"

কমলার মনটা তখন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল সে কহিল "ক'জন লোক পরের জন্যে এতটা করে! নবীন মণ্ডলের কোন খবর পেলেন কি? সে এলে আর আপনাকে এতটা কষ্ট করতে হবে না, গঙ্গাধর ঠাকুর আমার জন্য তার হাতে কিছু টাকাও দিয়েছেন!"

বিনয় বিস্মিতভাবে কহিল "তবেই হয়েছে, সে আর এসেছে। ছোট লোক ব্যাটা টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়েছে। সেইজন্য রাতারাতি কালিগঞ্জে নেমে পড়ল, আপনাকে একবার বলেও গেল না।"

"এমনিই কি হবে?"

"এমনিই হয়ে থাকে। বেলা হয়ে উঠল, আপনি চট্‌পট্ স্নানটান সেরে নিন, আমি একটু পরে আস্‌চি" বলিয়া বিনয়কুমার বিদায় হইল।

যথা সময়ে তারানাথ গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিল। বিনয় তাহাকে বাগানের একটি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া কমলা ও মাণিকলালকে লইয়া হাঁসপাতাল অভিমুখে যাত্রা করিল। হাঁসপাতালের পশ্চাতে গাড়ী রাখিয়া বিনয় কি একটা ভাবিতে ভাবিতে হাঁসপাতালে প্রবেশ করিল এবং খানিকটা

ঘুরিয়া ফিরিয়া গাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কেমন আছেন? আমি কি এখানে নামব?"

"না, নামতে হবে না।"

কথাটা যেন কমলার প্রাণে সূচিকা বিদ্ধ করিল। সে যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

বিনয় গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া কহিল "আপনি অত কাতর হবেন না। আমি এখন গিয়ে শুনলুম, কাল আমি দেখে আসবার পর বেলা পাঁচটার সময় তাঁকে পাগলা কুকুরে কামড়াবার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই দেখে তখুনি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কাসৌলি পাঠান হয়েছে।"

কমলা মুখ তুলিয়া কহিল, "কোথায়, কাশী?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ খানে।"

"কেন, গোঁদল পাড়ার ওষুধ তো খুব বিখ্যাত!"

"সাহেবরা ওসব মানে না। কুকুরে কামড়ান রুগীর চিকিৎসার জন্যে সেখানে মস্ত এক হাঁসপাতাল খোলা হয়েছে। অনেক রুগী সেখানে যাচ্চে, ভালও হচ্চে। কোনও ভয় নেই হরিপদ বাবু সেরে উঠবেন।"

কমলা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় ধীরে ধীরে কহিল, "যাবার সময় তিনি ব'লে গেছেন, যদি তাঁর স্ত্রী দেখতে আসেন, তাহলে যেন সেখানে যেতে বলা হয়। সেখানে স্ত্রীলোকদের থাকবার বেশ বন্দবস্ত আছে।"

"কমলা ব্যাকুল স্বরে কহিল, সেখানে কে আমাকে নিয়ে যাবে। সে যে অনেক টাকার খেলা! সরলকে একবার খবর দিতে পারেন?

"সরল কে তা তো আমি জানি না। তবে এর জন্যে আপনার কুণ্ঠিত হ'বার কোন দরকার নেই! আপনি যখন আমার আশ্রয়ে আছেন, তখন আমিই আপনাকে নিয়ে যাব। খরচের জন্যে আপনি কিছুই ভাববেন না। আমারও একটু বেড়িয়ে আসা হবে।"

স্বামীকে দেখিবার জন্য কমলার প্রাণটা তখন বেগবান অশ্বের ন্যায় চারি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার চিন্তা করিবার সময় ছিল না—ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতাও ছিল না। সে কৃতজ্ঞতা সহকারে আদ্রকণ্ঠে কহিল "আপনার ঋ"—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই "বিনয় কহিল "ওসব কথা এখন থাক্। আজকের

মেলে আমাদের রওনা হ'তে হবে, এখনি গিয়ে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেওয়া যাক্।"

বিনয়ের ইঙ্গিতে কোচম্যান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কমলা ভাবিতে লাগিল, সংসারে এমন ডাক্তার ক'জন আছে, যাহার প্রাণটা পরের দুঃখে কাঁদিয়া উঠে। পরের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

—— ০ঃ০ ——

অবিশ্বাস

গতবারে আমার বিশ্বাস সম্বন্ধে দু'একটি মূল কথা মাত্র বলিয়াছিলাম, এবার অবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। কোন বিষয়ে 'হাঁ' বলিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বে একটা 'না' থাকে। কিছু গড়িবার জন্য কিছু ভাঙিবার আবশ্যক হয়। কতকগুলিতে নূতন বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর কতকগুলি অবিশ্বাস উপস্থিত হইল। ইহা স্বাভাবিক।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এ বিশ্বাস অবিশ্বাস কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের সঙ্গে মিশিয়া হইয়াছিল তাহা নহে। অপ্রত্যক্ষভাবে যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা বিচারের এ স্থান নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিলাম, আমার এক স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিতে সমাজে কোন বাধা হয় না। যদিও তিনি রুগ্না ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন সুস্থ ছিল। সুতরাং তাঁহার মনকষ্টের কারণ না হইত এমন নহে। তথাপি আমি এই কার্য্যে অগ্রসর। আমার চরিত্র থাক না থাক, অর্থ থাকিলে সমাজে আমি প্রতিষ্ঠাবান। যিনি হয়তো সমস্ত জীবন ব্যাভিচারে লিপ্ত, ব্যবসায়ে অতি অসৎ পথাবলম্বী, তিনিও পূজা অনুষ্ঠানে এবং দান খয়রাতে অর্থ ব্যয় করিয়া সমাজে যশস্বী। এই সকল অবস্থা দেখিয়া সমাজের প্রতি আমার আস্থা একেবারে চলিয়া গেল। অবশ্য দ্বিতীয় বার বিবাহ না করিয়া সদোপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াও তো আমি হিন্দু সমাজে থাকিতে পারিতাম। কিন্তু যে দিকে অধিকাংশের গতি, তাহা হইতে ভিন্ন পথে চলিতে

গেলেই তদ্রূপ সৎ সঙ্গের প্রয়োজন। তাছাড়া আরো অনেক বিষয়ে অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিল।

হিন্দুধর্ম্মের প্রধান বন্ধন জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার মনে একেবারে অবিশ্বাস হইয়া পড়িল। আমি দেখিলাম শ্রেষ্ঠ জাতির দোহাই দিয়া অযোগ্যের পূজা অবাধে চলিয়াছে। জাত্যাভিমান যেন সম্পত্তি বিশেষ হইয়াছে। মানুষ মানুষের মাথায় পা দিয়া অযথা প্রভুত্ব করিতেছে। এই অন্যায় আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া সত্যের প্রতি অনুরাগ রক্ষা করা যায় না! যাঁহারা মনে মনে জাতিভেদ মানেন না, অথচ সমাজ ভয়ে বাহিরে জাতিভেদ রক্ষা করেন, আমি তখন সেই কপট ব্যবহার অনুচিত মনে করিলাম। আমার মনে হইল, কেন, কি জন্য আমি এ অন্যায় পোষণ করিব। মানুষ মাত্রেই এক মনুষ্যজাতি। সকলের মধ্যেই ভিন্নতা আছে বটে, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ভাবেই গুণ, এবং জ্ঞান ধর্ম্মের আদর করিতে হইবে; তেমনি পাপের প্রতি ঘৃণা করিতে হইবে। তারমধ্যে আবার জাতিভেদ কেন? ইহাতে বঙ্গ-সমাজের বা বাঙালী জাতির অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে। সমস্ত বঙ্গ—সমস্ত ভারত এক জাতীয়ভাবে একতা বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে কখনই দেশের দুর্গতি ঘুচিবে না। অবাধে মুক্তভাবে মানুষ আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে এত বাধা কেন? এ সমস্ত মানুষের মোহজাল মাত্র। ঈশ্বর মানুষকে কি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন? অচিরাৎ এই মোহজাল ছিন্ন করিতে হইবে। যাঁহারা এই পথে অগ্রসর তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে।

তারপর আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা মূর্ত্তি পূজা, বলিদান ও তাহার সঙ্গে বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ হইল। তাহাতে কোন কালে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। ঐ বিশ্বাসে আরো জড়তা ও কুসংস্কার জন্মায়। কেন না, উহা প্রকৃত বিশ্বাস নহে। উহা ধর্ম্মান্ধতা মাত্র।

পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় নিরাকার-জ্ঞানময়, চৈতন্যময়, মঙ্গলময়, পবিত্রস্বরূপ, ইচ্ছাময়। তিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন। ইহাই সৃষ্টি; সমস্ত সৃষ্টির পরতে পরতে তাঁহারই রূপ গুণ জড়িত; অন্তর বাহ্য পূর্ণ করিয়া তিনি আছেন। জ্ঞান চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে হয়। বহুর মধ্যে তিনি এক, এবং সেই একের মধ্যেই বহু বিদ্যমান। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী এবং পুরুষ মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা ভ্রম মাত্র। তাঁহাকে কেহ গঠন করিতে পারে না তিনি আমাদিগকে নিয়ত গঠন

করিতেছেন। তাঁহাকে গঠন না করিয়া নিজেকে তাঁহার হাতে গঠন হইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই পথেই জ্ঞান বিবেক লাভ হয়।

তারপর বলিদান সম্বন্ধে মনে হইল, ইহা একটি নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার। শাস্ত্রের দোহাই দিলে কি হইবে? শান্ত চিত্ত হইয়া বিনয় ক্ষমা দয়া ভক্তি গুণ যেখানে সাধন করিতে হইবে, সেখানে পশু হউক আর যাহাই হউক—প্রাণীবধ! এই কি উপাসনার অঙ্গ! এমন আসুরিক সাধন কোন্ সাধক-দিগের জন্য? বাহ্যিক পূজার সকলই ভাবুকতা মাত্র। ইহাতে আন্তরিকতা কতটুক? চরিত্রই বা গড়ে কই? এই তো কতস্থানে দেখিতেছি, দালানে প্রতিমা, বৈটকখানায় বাই নাচ! কোন বাধা হয় না। এই কি সাধনার আদর্শ!

তারপর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই আমার মনে অবিশ্বাস হইল। পৌরাণিক ধর্ম্মে আদৌ আস্থা রহিল না। রামায়ণের সীতা, মহাভারতের ব্যাস ও পাণ্ডবগণের অনৈসর্গীক, অস্বাভাবিক জন্ম বৃত্তান্তে এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ য়ত অলৌকিক আখ্যায়িকা বর্ণনায় অবিশ্বাস হইল। ঐ সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে হইলে জ্ঞানের মস্তকে পদাঘাৎ করিতে হয়। শাস্ত্রে যে টুকু ভাল কথা আছে, তার জন্য সমস্তটাই মানিতে হইবে, তার অর্থ কি?

সহজ জ্ঞানে আমার মনে হইল, শাস্ত্রে কোথায় কি আছে তাহা উদ্ধার করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সহজ নহে। আমি যখন প্রত্যক্ষ সাধকদিগের জীবনী দেখিতেছি, তখন কবে কোন যুগে কি হইয়াছিল না হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া আমার কি হইবে? আর ঐ সকল জীবন কাহিনীর অপ্রাকৃত ঘটনায় আমার বিশ্বাসই হয় না। বুঝি বা নাই বুঝি, শাস্ত্রের শাসন মানিলেই আমার ধর্ম্ম হইবে, নচেৎ হইবে না, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। কৌলিকগুরু সাধক, ত্যাগী, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, জ্ঞানী-ভক্ত নাই বা হউন, তিনিই আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, মুক্তিদাতা, এমন অস্বাভাবিক বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যেখানে জ্ঞানের স্বাধীনতা নাই, হৃদ্‌গত বিশ্বাসের কার্য্যক্ষেত্র নাই, সেখানে কোন দিন জীবন্ত সত্যধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না। আমি ঈশ্বরকে চাই, এই আমার মূলমন্ত্র। তিনিই শাস্ত্র, বিধি, গুরু হইয়া আমাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিবেন। আমি শাস্ত্র জানিনা; শাস্ত্র পড়িয়া ধর্ম্মসাধন করা আমার পক্ষে কোন দিন সম্ভব নয়। তবে কি আমার ধর্ম্মসাধনের পথ নাই! যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে ভাল লোক হইলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে অনেকে এনেক দরিদ্র্য। আধ্যাত্মিক রত্ন অনেক উপার্জ্জিত না হইলে

পাপ যায় না। ভাল লোক হওয়া আর নিষ্পাপ হওয়া এক কথা নয়। এই যে চখের সামনে জল্ জল্ করিতেছে নিরক্ষর রামকৃষ্ণ-চরিত ; তিনি তো পণ্ডিত ছিলেন না, তবে কোন বলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মস্তক তাঁহার নিকট নত হইয়াছিল ?

এক দিকে যেমন অবিশ্বাস হইয়া পড়িল, তার সঙ্গে সঙ্গে সহজ জ্ঞানে কতকগুলি বিশ্বাসের বলে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মধ্যে প্রধানত— ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতি, আত্মা স্বাধীন ও নিজ পাপ অপরাধের জন্য মানুষ নিজে দায়ী। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, মানুষ ঈশ্বর-বাণী শ্রবণ করিতে পায়। জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব স্বাভাবিক ব্যাপার। জ্ঞান, কর্ম্ম, ইচ্ছা যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের যোগ হয়। তাঁহার যোগ সম্ভোগই স্বর্গসুখ। স্বর্গ বলিয়া কোন স্থানের কল্পনা মাত্র, নির্ম্মল চিত্তই স্বর্গ; তদ্রূপ কলুষিত অন্তকরণ নরক বিশেষ। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কড়ি উৎসর্গ করিলে কিছুই হয় না, গঙ্গাস্নান, করিলে শরীরের মলিনতা যায় কিন্তু মনের যায় না। তীর্থে ঘুরিলে কিছুই হয় না। জ্ঞানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু। বিষয়াশক্তি ছাড়িয়া এক মনে একমাত্র পরমেশ্বরের ভজনাতেই সেই জ্ঞান লাভ হয়। আবার জ্ঞানেই বিষয়াশক্তি ও সকল প্রকার পাপ দূর হয়। যখন এই সকল তত্ত্বে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, তখন প্রাণের অন্তস্তল হইতে এক নব শক্তি জাগিয়া উঠিল। সমস্ত প্রাণ মন দেহ-শক্তি পর্য্যন্ত হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া উঠিল! রোমাঞ্চ দেহে-প্রাণ, মন, হৃদয়, আত্মা এক যোগে বলিল—"হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।"

কাসে ব্রাকস

পূর্ব্বকালে কাস-শ্বাস-ক্ষয়াদি জরার সহচর ছিল। তখন তরুণারুণ সদৃশ যুবাদিগের মধ্যে এই সকল খল ব্যাধির আধিপত্য অল্পই দৃষ্ট হইত। এখন আমাদের ভাগ্যদোষেই বলুন, অথবা কর্ম্মদোষেই বলুন, অনেক বাল-কিশোর-যুবা অনুদিন ইহাদিগের কবলে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছেন। কাস কৃচ্ছ্রসাধ্য পীড়া; সুতরাং সামান্য কাসিও উপেক্ষণীয় নহে। শ্বাস প্রশ্বাসই আমাদের জীবন রক্ষা করে। সেই শ্বাস প্রশ্বাসের মূলযন্ত্র ফুসফুসই কাসের আশ্রয় স্থান।

সামান্য সর্দ্দি কাসি হইলে অবিলম্বে তাহার বিহিত ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষলতা যেমন মহাবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে ধ্বংশ করে, সামান্য কাসিও তদ্রূপ অনেক সময় শ্বাস কাসাদিতে পরিণত হইয়া আমাদিগকে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে লইয়া যায়। কাসে বাকসের শক্তি অসীম। তাই আজ বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। এই প্রবন্ধ পাঠে কেহ সামান্য উপকার প্রাপ্ত হইলেও সফলশ্রম হইব।

বাকস আকেন্থেসী জাতীয় আধাটোডা ভেসিকা (Adhatoda vasica) নামক বৃক্ষ। এই বৃক্ষ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। বঙ্গের প্রতি পল্লীতে ইহা বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা কাস রোগের মহৌষধ। কফ নাশক ঔষধ শ্রেণীর মধ্যে ইহাকে উচ্চাসন দেওয়া যাইতে পারে। বিধি পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে ইহা দ্বারা সামান্য কাসি হইতে শ্বাস কাস পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলেন—

"বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ, রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি"।

বাকস বর্ত্তমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক এই শাস্ত্র বাক্য সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্য ঔষধ-প্লাবিত বঙ্গদেশ হইতে এবম্বিধ অমূল্য ভেষজগুলির পসার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। একদিন যাহারা আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে, আজ নূতনে মজিয়া আমরা তাহাদেরই অবজ্ঞা করিতেছি। সে কালে এতদ্দেশ জাত শস্প-তৃণ-বৃক্ষ-গুল্মাদির সাহায্যে গৃহস্থগণ নিজেরাই পরিজনবর্গের কত কত ব্যাধি আরোগ্য করিতেন। তখনকার গৃহলক্ষ্মীরাও সযত্নে এই সকল গাছ গাছড়ার গুণাগুণ শিখিয়া রাখিতেন। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি পল্লীর কোন গৃহে কাহার পীড়া হইলে কুলবধূরা বর্ষীয়সী রমণীদিগের নিকট আসিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে রোগীর ধন-প্রাণ বাঁচিয়া যাইত। কালচক্রের আবর্ত্তনে দেশের গতি এখন ভিন্নমুখী। বর্ত্তমান কালের কুলাঙ্গনাগণ এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করিয়া তাঁহাদের স্নিগ্ধ মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিতে রাজী নহেন। যে সময়-ক্ষেপ করিয়া তাঁহারা এতদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন, সেই সময়টুকু সহচরিগণের কাছে নিজ নিজ পতি-পুত্র-বসন-ভূষণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া কাটাইতে পারিলেই

তাঁহারা সুখী। ইহার ফলও ফলিতেছে। গৃহস্থ অন্নে দন্তে না দিয়া যে অর্থ ব্যয় করেন তাহার অধিকাংশই চিকিৎসকের চর্ম্ম পেটিকার মধ্যে চলিয়া যায়।

বাকসের পত্র পুষ্প, ত্বক্ মূল সমস্তই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা অম্ল তিক্ত ও সদ্গন্ধযুক্ত। "ভাব প্রকাশের" মতে বাকস কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, জ্বর, সর্দ্দি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগনাশক। শাস্ত্রে ইহার বহুবিধ ক্রিয়ার কথা লিখিত থাকিলেও ইহা কফ নিঃসারক ও আক্ষেপ নিবারক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাকসের আক্ষেপ নিবারক গুণ থাকায় ইহা শ্বাস-কাস রোগীর শ্বাসবেগ শীঘ্রই নিবারণ করে। রক্ত নিষ্ঠীবন যুক্ত ক্ষয়কাসেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পত্রের রস এক ড্রাম অর্থাৎ ৬০ ফোঁটা মাত্রায় দৈনিক ২ বার সেবন করিলে শীঘ্রই কাসের প্রাখার্য্য হ্রাস হয়। ছালের রস পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলেও কাসির উপশম হইয়া থাকে। বাকস পুষ্প গরম জলে অর্দ্ধঘণ্টা ভিজাইয়া ঐ কাথ্ পান করিলে, কাস, শ্বাস ও পার্শ্বশূলও আরোগ্য হয়। কাস রোগে বাকসের আরো বহুবিধ প্রয়োগরূপ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে সকল উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে। সাধারণের অবগতির জন্য আমি এই স্থলে বাকসের একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রয়োগরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। এই প্রয়োগরূপ আমার বিশেষ পরীক্ষিত। যে সকল ব্যক্তি কাস রোগে কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। ইহা দ্বারা সামান্য কাসি হইতে পুরাতন দীর্ঘকাল স্থায়ী কাসি, শ্বাসকাস, পার্শ্ববেদনা সমস্তই আরোগ্য হইবে। অল্প বয়স্ক বালকদিগের প্রতিশ্যায় হইতে এক প্রকার সাক্ষেপ কাসি হইয়া থাকে। ইহা সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগে কাসাবেগ এতাদৃশ প্রবল হয় যে, রোগী সময়ে সময়ে মূর্চ্ছাভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই কাসির স্বরের সহিত "হুপ" শব্দের ঐক্য থাকায় চিকিৎসকেরা এই রোগকে "হুপিং কাফ্" আখ্যা দিয়া থাকেন। বালকদিগের এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত "হুপিংকাফ্" রোগেও এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ইহা দ্বারা সত্বর কাসির আবেগ ও দ্রুতত্ব উভয়ই হ্রাস হয়। কাহার কাহার প্রতি বৎসর হেমন্ত বা শিশির ঋতুতে এক প্রকার কষ্টজনক শুষ্ক কাসি হইয়া থাকে। কাহার কাহার কাসিতে কাসিতে কণ্ঠ-নলী অবরুদ্ধ হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেও এই ঔষধ বিশেষ সুফলপ্রদ হইবে। ইহা গর্ভিনী ও শিশু সকলকেই নিরাপদে সেবন করাইতে পারিবেন।

বাকস মূলের কাঁচা ছাল	৵৷৷০ অর্দ্ধ সের
যষ্টিমধু	৵১০ অর্দ্ধ পোয়া
অনন্ত মূল	৵১০ অর্দ্ধ পোয়া
তেজ পত্র	৵১০ অর্দ্ধ পোয়া
কিস্‌মিস্‌	৵১০ অর্দ্ধ পোয়া

দ্রব্যগুলি ভাল হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় দ্রব্য দোষই ঔষধের যশোহানির কারণ হয়। প্রথমে ঔষধগুলি শিলাতলে কুট্টিত করিয়া ৵৮ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। ঐ সময়ে অপর একটি প্রশস্ত প্রস্তর পাত্রে ৵২৷৷০ সের মিছরি রাখিবেন। যে সময়ে ঐ ৵৮ সের জল সিদ্ধ হইয়া ৵২ সেরে পরিণত হইবে, তখন পাত্র নামাইয়া একখানি পরিষ্কৃত কাপড়ে কাথ-জল ছাঁকিয়া, ঐ জল প্রস্তর পাত্রস্থিত মিছরির উপরে ঢালিয়া দিবেন। মিছরি গুলিয়া যাইলে উহা পুনরায় ছাঁকিয়া একটি বোতলে পুরিয়া রাখিবেন। এই ঔষধ দুই তোলা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেব্য। বালকদিগের পক্ষে পূর্ণবয়স্কের অর্দ্ধ মাত্রা প্রয়োজ্য। নিতান্ত শিশুর মাত্রা ৬০ ফোঁটা।

ডাক্তার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
গোবরডাঙ্গা।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গোবরডাঙ্গার জমিদার ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বিষয় বিভাগ হইয়াও বড়বাবু ও সেজবাবু এ যাবৎকাল একত্রে সদ্ভাবে চলিয়া আসিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যেও ভিন্নতা উপস্থিত হইয়া উভয় ভ্রাতায় পৃথক হইতেছেন। এই ঘটনায় কুশদহ-বাসি মাত্রেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ যে কোন শক্তি, যতই বিভক্ত হইয়া যায়, ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ভ্রম সংশোধন—আশ্বিন মাসের "কুশদহে" "ধাতুদৌর্ব্বল্য" প্রবন্ধের ২২২ পৃষ্ঠায় ১৯ পংক্তিতে নির্জল দুগ্ধের ক্ষীর ৵৩ সের, স্থলে, ৵৩ সের নির্জল দুগ্ধের ক্ষীর হইবে। পাঠক পাঠিকাগণ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। এই ভ্রম মুদ্রাঙ্কণের জন্য আমরা দুঃখিত হইয়াছি। (কুঃ সঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিনামূল্যে বেগমবাহার

উপহার। 'আমার মালা' নামক ১৬৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ কয়েকখানি হাফটোন ফটোযুক্ত এক খানি মনোরম উপন্যাস ইঁহারা বেগমবাহার তৈলের প্রত্যেক ক্রেতাকে উপহার স্বরূপ দিতেছেন। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।







বেগমবাহার তৈল

বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু আয়াসে, বহু প্রাচীন আশ্চর্য্য হাকিমি প্রণালীর সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা বাদসাহ বেগমদের নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল বলিয়াই তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অটুট থাকিত। যদি যাবতীয় কেশ-রোগ দূর করিয়া সৌন্দর্য্যশালী হইতে চান, 'বেগম বাহার' ব্যবহার করুন; ঘন কৃষ্ণ কোমল মসৃণ শোভাময়, অলকদামে মস্তক পরিপূর্ণ হইবে। যদি যাবতীয় শিরোরোগ দূর করিয়া মস্তিষ্কের শক্তি লাভ করিতে চান, 'বেগম বাহার' ব্যবহার করুন; সৌরভে মন মাতিবে, মাথা ধরা দূর হইবে, সুনিদ্রা হইবে, মস্তিষ্ক শীতল ও শক্তিশালী হইবে।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ।৵০।

হাকিম মজিবর রহমান

১১৩।১১৫ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

পঞ্চম বর্ষ । অগ্রহায়ণ, ১৩২০ । ৮ম সংখ্যা

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

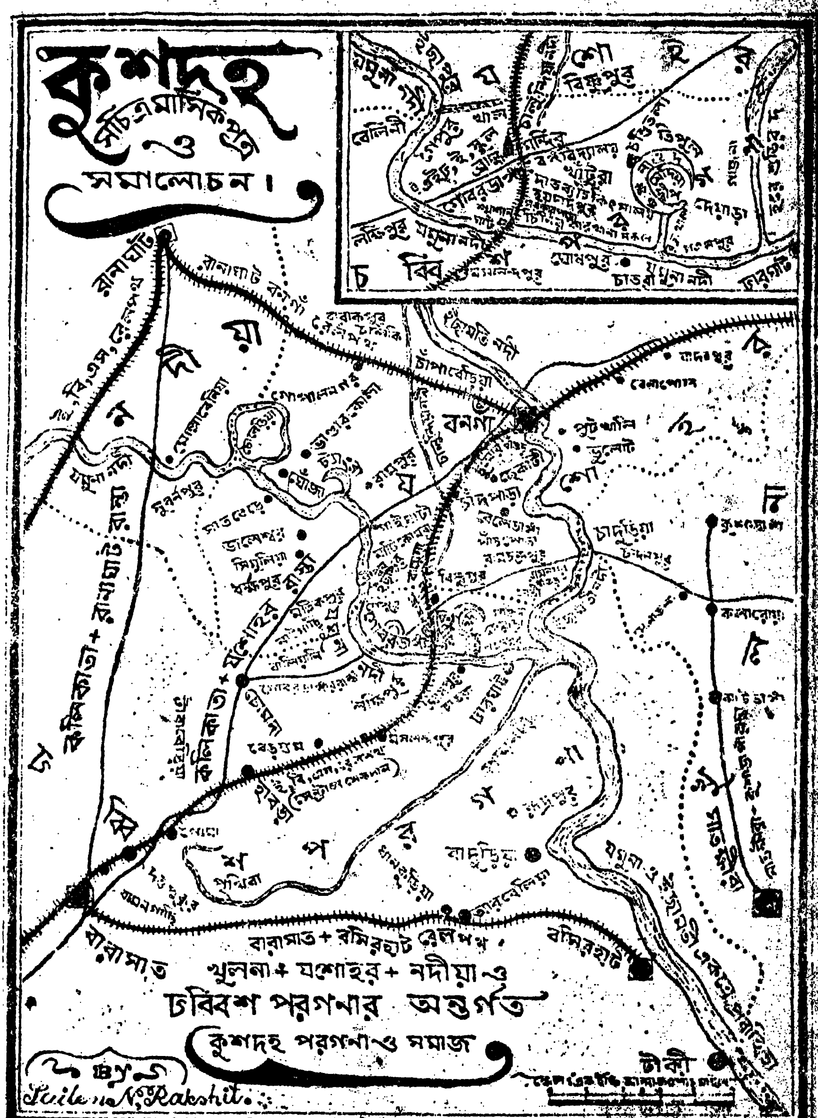
কার্য্যালয় :—

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা

এই সংখ্যার মূল্য ৴১০ দেড় আনা

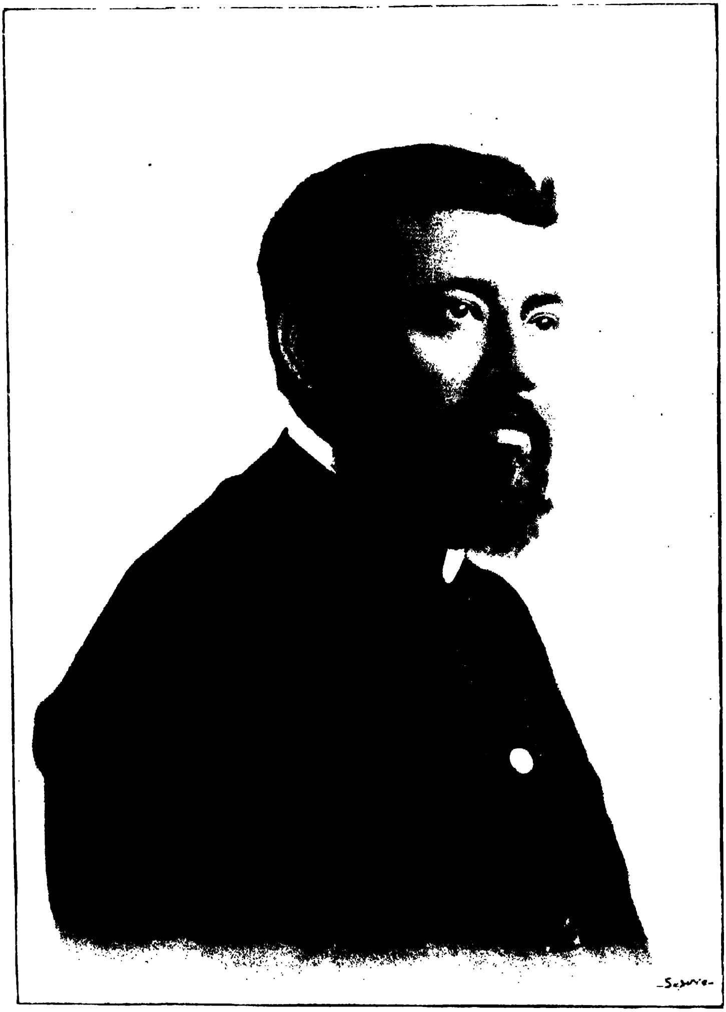
কুশদহ-মানচিত্র


কুশদহ
সচিত্র মাসিকপত্র
ও
সমালোচনা।
বনগাঁ
বারাসাত + বসিরহাট রেলপথ
বারাসাত
বসিরহাট
খুলনা + যশোহর + নদীয়া ও
চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত
কুশদহ পরগণা ও সমাজ
টাকী
Sailen N. Rakshit

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কুশদহ।



শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী

K. V. SEYNE & BROS

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"প্রভু পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩২০ সাল। { অষ্টম সংখ্যা

চিত্র পরিচয়

এবার 'কুশদহে'র মুখপত্রে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীর চিত্র প্রকাশিত হইল। এই চিত্রের ফটো ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় গৃহীত। বর্ত্তমান অবয়ব এবং ভাবের সহিত ইহার অনেক অনৈক দৃষ্ট হয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দের পূর্ব্বনাম শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সাবডিভিসন বনগ্রামের অন্তর্গত চাঁপাবাড়িয়া গ্রাম, মতিলালের জন্ম স্থান। বঙ্গাব্দ ১২৭৮, বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জুলাই ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। স্কুল কলেজের শিক্ষায় ইনি একজন ভাল ছেলে ছিলেন। প্রথমে বারাশাত স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় ২০৲ টাকা, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ফাষ্টআর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঐ কলেজ হইতে বি-এ, ও সায়েন্সে ডবল অনারে পাশ হন। ইনি এম-এ ও পড়িয়াছিলেন কিন্তু পাশ হন নাই, এবং ল পড়িয়াও উকীল হন নাই। যাহা হউক ইহাঁর উচ্চ শিক্ষার অবস্থাতেই মনে ধর্ম্মচিন্তার উদয় হয়। তৎপরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইনি প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন।

ইতিপূর্ব্বে ইনি গোবরডাঙ্গা গ্রামের স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার একটি মাত্র পুত্রের জন্ম হয়। বাহ্যভাবে তিনি স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ও প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন।

প্রথমত ইনি সাড়েপাঁচ বৎসরকাল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তৎপরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমেরিকার লস্এঞ্জিওনিসে গমণ করিয়া রামকৃষ্ণ-মিসনের অধীনে থাকিয়া তিন বৎসরকাল ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে মিসনের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় স্বাধীনভাবে আর ছয় বৎসর কাল ঐ স্থানেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি ইনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি ইচ্ছা করিতেছেন যে, ভারতবর্ষেই তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিবেন।

ইঁহার পিতৃ নিবাস যশোহর জেলার দেঁতো কুমড়ে গ্রামে। তথা হইতে তিনি বালিয়ানি গ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করেন। মতিলালের মাতুলালয় গোবরডাঙ্গার নিকট ইছাপুর গ্রামে। তাহার মাতা নিস্তারিণী দেবী ও মাতামহ স্বর্গীয় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

এমন ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ আমাদের কুশদহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়।

প্রসঙ্গ

সত্য—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, এই ছিল প্রথম কথা। এখন সত্যের আর একদিক প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে দেখা যায় ধন, জন, সৌভাগ্য এবং দুঃখ বিপদ এ সকলও সত্য। অর্থাৎ এগুলিও সত্যের প্রকাশ এবং মানব জীবনের উপর ইহারাও কাজ করিতেছে। সম্পদে যখন মগ্ন থাকি, তখন মৃত্যু আসিয়া দেখাইয়া দেয়, এই জীবনই যথেষ্ট নয়, ইহ জীবনের পরপারেও জীবন আছে। ইহ জগতে মানবের জন্য ভগবান্ অনেক সুখের বস্তু দিয়াছেন কিন্তু তাহা দিয়াই দেওয়া শেষ করেন নাই, তিনি আপনাকেও দিয়াছেন,—সেইটাই চরম সত্য—পরম সুখ। যিনি তাঁহাকে লাভ করেন, তিনি ইহ জগতের সুখও সম্ভোগ করেন, কেবল তাহা নহে, দুঃখ ক্লেশ মৃত্যুতেও তাঁহার সুখ

শান্তি নষ্ট হয় না। এই অবস্থায় বোঝা যায় ভগবানের দেওয়া এই যে সংসার ইহাও মিথ্যা নয় এবং তিনিই চরম সত্য ও পরম সুখকর।

জড় ও চৈতন্য—বিজ্ঞান প্রশ্ন করেন, যদি পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ ভগবান্ এই জগতের স্রষ্টা হন, তবে পাপ অজ্ঞানতা এবং জড় বস্তু সকল আসিল কোথা হইতে? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার মধ্যে পাপ অজ্ঞানতার বীজ এবং জড়ত্বও আছে। ধর্ম্ম বিজ্ঞান বলেন, ঐ দেখ, যে রক্ত বিন্দু জড় পদার্থ, যাহা হইতে এই দেহের উৎপত্তি, সেই দেহে আবার কোথা হইতে চৈতন্য-যুক্ত প্রাণের সঞ্চার হইতেছে। অথচ জড় হইতে চৈতন্য জন্মায় এ কথা বলা চলে না। অতএব এ রহস্য আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তত্ত্ব নির্ণয়ে বিজ্ঞান আমাদের সহায়তা করে বটে, কিন্তু পরম তত্ত্বের চরম নির্ণয় করা বিজ্ঞানের অতীত। তাহা যদি না হইত তবে বিজ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-তর্কের দ্বারাই আমরা ভগবানকে আয়ত্ত করিতে পারিতাম; তাহা হইলে তাঁহা হইতে বিজ্ঞান বড় হইত। চৈতন্যময়ের ইচ্ছাতেই জড় অজড় সকলই সৃষ্ট হইয়াছে। এই সৃষ্টি অপূর্ণ বস্তু, ইহার ক্রমোবিকাশ দেখা যাইতেছে, সে বিকাশ পূর্ণতাকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছে। সৃষ্টির অপূর্ণতাই অজ্ঞান ও পাপের কারণ। জ্ঞান নিজেকেও জানেন এবং অজ্ঞানকেও জানেন, সুতরাং জানেন বলিয়াই যে, তিনিও অজ্ঞান,—তাঁহার মধ্যে অজ্ঞানতার বীজ আছে এ কথা বলা যায় না। সর্ব্বজ্ঞ সকলই জানিতেছেন, সর্ব্ব শক্তিমান সকলই করিতে সক্ষম।

পাপ—যে পাপের নামে মানুষ মাত্রেই ভীত, সেই পাপে মানুষের ভয় চলিয়া যায়, মানুষের পক্ষে এমনও একটা অবস্থা আছে। যে, পাপে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে তখন পাপে ভয় করে না। জগতের যত দুঃখ ক্লেশের কারণ পাপ, কিন্তু এই পাপের মূল কারণ কি? একমাত্র ভ্রান্তিই পাপের মূল। ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতাই সকল পাপের মূল, কিন্তু এই অজ্ঞানতা নিশ্চয়ই অবস্তু। আলোকই একমাত্র বস্তু, অন্ধকার অবস্তু, আলোকের অভাব মাত্র, তদ্রূপ জ্ঞানই বস্তু, অজ্ঞানতা অবস্তু। অবস্তু কখন চিরস্থায়ী হয় না, এই জন্য যথা সময়ে মানুষের মধ্য হইতে পাপ বিদূরিত হয়। পাপ প্রবৃত্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কিন্তু ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্রমশ বলবতী হইতে দেখা যায়। আজ দেখি

যে, পাপ কাজে মহা উৎসাহী, আবার কিছুদিন বাদে সেই সে কাজের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া অনুতাপী হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে। অতএব আমরা আশা করিতে পারি মানবজীবন কখনই চিরদিন পাপে মগ্ন থাকিবে না। কোন দিন সে ধর্ম্ম এবং পবিত্রতা অন্বেষণ করিবেই।

হ্যালির ধূমকেতু

(গল্প)

সেদিন রাত্রে বেণীপ্রসাদের সঙ্গে রামদুলারীর বেশ একটা রীতিমত কলহ হইয়া গেল। এতটা যে হইবে তাহা কাহারই জানা ছিল না, প্রথমে একটা সামান্য বিষয় লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে করিতে ক্রমে কলহটা গুরুতর রকমের হইয়া পড়িল। রাগের মাথায় রামদুলারী বলিয়া বসিল—"কল্যাণী মায়ি করুন তোমার মুখ যেন আর আমায় দেখ্‌তে না হয়, আজকের ঝগড়াই যেন আমাদের শেষ ঝগড়া হয়।" বেণীপ্রসাদও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তরে বলিল—"আহা তাই হোক্, কল্যাণী মায়ি তোমার মন্‌সা পুরা করুন। আর আমিও যদি যথার্থ পুরুষ হই তোমার মুখ আর দেখ্‌ব না। তোমার ভারি তেজ কিন্তু জেনে রেখ, মনে করলে তোমার ও তেজ আমি একদিনে ভাঙতে পারি; তোমার মত দশটা বড় মানুষের মেয়ে বিয়ে করে এনে তোমাকে তাঁ'দের দাসী করে রাখতে পারি।"

স্বামীর কথায় রামদুলারীর ক্রোধ দ্বিগুণ হইল,—অ্যাঁ, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার বাপের খেয়ে মানুষ উনি, দশটা বিয়ে করে এনে আমাকে তাঁ'দের দাসী করে রাখতে পারেন! এমন কথা রামদুলারীর মুখের উপর বলিতে বেণীপ্রসাদের সাহস হইল! সে ভাবিল স্বামীর মুখে এমন কথা শোন্‌বার চেয়ে আমার মরণ হ'ল না কেন? রাগে অভিমানে রামদুলারী ফুলিতে লাগিল, তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া শয্যায় গিয়া ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

বেণীপ্রসাদ গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেল। রামদুলারীর অভিমান চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল; তাহার নয়নে বান ডাকিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, জীবনে আর বেণীপ্রসাদের সঙ্গে

কথা কহিবে না। পূর্ব্বাপর সকল কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া যতই তাহার অভিমান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রতিজ্ঞাটা দৃঢ় করিবার জন্য ততই সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল কথা কহিব না,—না, কখনই না,—কোনমতেই না,—কিছুতেই না,—পায়ে ধরিয়া সাধিলেও না।

কাঁদিতে কাঁদিতে রামদুলারী ক্লান্ত হইয়া পড়িল, রাগও কতক পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিল কিন্তু তখনও বেণীপ্রসাদ ফিরিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি হইতে ওড়না সরাইয়া, আদর করিয়া তাহার রোদন স্ফীত আঁখি দুটি নিজের রুমালে মুছাইতে আসিল না! একে একে ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল তবুও বেণীপ্রসাদ তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, অন্যদিনের মত সাদরে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া মুখের উপর হইতে চূর্ণকুন্তলগুলি সরাইতে সরাইতে কোমল কণ্ঠে "আওর মত রোও পিয়ারি—" বলিয়া তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইবার সহস্র চেষ্টা করিল না। রামদুলারী বিস্মিতা হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই বেণীপ্রসাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কে জানে কোন্ সময় ক্লান্ত দেহ মন লইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(২)

গৃহের বাহির হইয়া বেণীপ্রসাদ একেবারে বাহির বাটীর ছাদে আসিয়া চতুর্দ্দিকব্যাপী অন্ধকারের মাঝে ভারাক্রান্ত হৃদয় ও চিন্তাকুল মস্তিষ্ক লইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া ছাদ হইতে নামিয়া নিজের পাঠগৃহের দ্বার খুলিয়া বাতি জ্বালিয়া টেবিলের উপর হইতে খানকতক সংবাদপত্র লইয়া আগ্রহের সহিত তাহার বিজ্ঞাপন গুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একসময় তাহার মুখ কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া আসিল, সংবাদ পত্র যথাস্থানে রাখিয়া বাতি নিবাইয়া আবার ছাদে গিয়া অশান্ত-চিত্তে সেই অন্ধকারের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আজ তাহার প্রাণে এক নূতন সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল, পত্নীর প্রতি বিরক্তি বশতঃ গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।

বেণীপ্রসাদ সদ্বংশের কিন্তু নিতান্তই দরিদ্রের সন্তান। তাহার শশুর স্বর্গীয় লালা শঙ্করনারায়ণ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র ত্রিবেণীনারায়ণকে যেমন অত্যধিক আদরে লালন পালন করিয়া ছিলেন, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষাও দিয়াছিলেন। বেণীপ্রসাদকেও তিনি শৈশবাবধি আপন গৃহে রাখিয়া পুত্রাধিক স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। পিতামাতার অবর্ত্তমানে পুত্র ত্রিবেণীনারায়ণও আপন কনিষ্ঠের ন্যায় পরম যত্নে বেণীপ্রসাদকে রাখিয়াছেন

ও সুশিক্ষা দিতেছেন। ত্রিবেণীনারায়ণ এখানকার একজন মান্যগণ্য উকিল ; ইচ্ছা বেণীপ্রসাদও আইন পরীক্ষা দিয়া তাঁহারই ব্যবসায় অবলম্বন করে, ভাই নাই, ভাইয়ের স্থান অধিকার করিয়া চিরদিন তাঁহার সহিত একগৃহেই অবস্থান করে। বেণীপ্রসাদেরও ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু পিতৃ ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা রামদুলারীর আচরণ, সময়ে সময়ে তাহাকে বড়ই মর্ম্মাহত করে। বেণীপ্রসাদ রামদুলারী অপেক্ষা তিন বৎসরের মাত্র বড় ছিল, সেইজন্য স্বামী বলিয়া রামদুলারী তাহাকে বড় একটা সম্মান দেখাইত না। তাহা ভিন্ন শৈশব হইতে একস্থানে পালিত হওয়ায় তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার যেমন বাহুল্য ছিল বিবাদ বিসংবাদেরও তেমনি অপ্রতুল ছিল না। অধিকাংশ স্থলে তাহাদের কলহের মূলে রামদুলারীরই দোষ থাকিত কিন্তু সকলেই তাহার সকলকার্য্য চিরদিন বড় স্নেহের চক্ষে দেখিত, এমন কি বেণীপ্রসাদ নিজে তাহার নিকট লাঞ্ছিত হইয়াও কোনদিন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া থাকিতে পারিত না। অনেক সময় তাহার সুন্দর মুখের রূঢ় কথা গুলা অসহনীয় হইলেও বেণীপ্রসাদ শশুরালয়ের সুখ সৌভাগ্যের সহিত পিতৃভবনের দুঃখময় অবস্থা ও বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারের তুলনা করিয়া সহ্য করিয়া যাইত। বেণীপ্রসাদের সঙ্গে রামদুলারীর কলহ ক্রমে নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, খুটি নাটি লইয়া তাহাদের ঝগড়াও যেমন শীঘ্র হইত আবার ভাব হইতেও দেরী লাগিত না, রাগের সময় যাহা মুখে আসিত রামদুলারী তাহাই শুনাইয়া দিত, আবার একটু পরেই হয়তো রাগ শান্ত হইলে, স্বামীকে সাধ্যসাধনা করিয়া কথা কহাইত, বেণীপ্রসাদও তাহার সুরমা রঞ্জিত মনোমোহন আখিদুটি, টিকুলি ও নথনি শোভিত গোলগাল হাসি হাসি মুখখানি দেখিলে তাহার শত অপরাধ ভুলিয়া যাইত; কিন্তু আজিকার কলহের পূর্ব্বাপর সকল কথা তাহাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়াছিল, তাহার নিদ্রিত আত্ম-সম্মান বোধ জাগাইয়া দিয়া ছিল, তাই অন্যদিনের মত আজ আর সহ্য করিতে পারিল না।

(৩)

প্রভাতে বেণীপ্রসাদ রাত্রের ঘটনা মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া ত্রিবেণীনারায়ণের নিকট সংবাদ পত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখাইয়া ও আপনার সঙ্কল্প জানাইয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ত্রিবেণীনারায়ণ বিজ্ঞাপনটা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন—চাকরীটা মন্দনয় বটে, উন্নতিরও বিশেষ আশা আছে, তবে দূরে অনেকটা. চাকরীর অনুরোধে সম্প্রতি অত দূরদেশে যাওয়ার

কোন প্রয়োজন দেখি না। আরও দু'টো বছর কলেজে থেকে ওকালতি পাশ করে আমার কাছে থেকেই এখানকার কোর্টে ওকালতি করতে পারে, তাতে উপার্জ্জন এর চেয়ে বেশী বই কম হবে না। সেই ভাল, ত্রিবেণীনারায়ণ বলিলেন—"সেই ভাল বেণী! যেমন কলেজে পড়চ তেমনি পড়। মিছামিছি এত দূরে চাকরী করতে যাবার আবশ্যক নাই। আমার কাছে থেকে ওকালতিতে পরে তুমি ঢের বেশী উপার্জ্জন করতে পারবে। এরই মধ্যে এত তাড়া কিসের? সংসারের ভারতো আমার উপর, সে জন্য তো তোমায় কিছু ভাবতে হচ্চে না।"

বেণীপ্রসাদ সকলি বুঝিল, কিন্তু পত্নীর ব্যবহার তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, গতরাত্রের রামদুলারীর প্রত্যেক বাক্য আজ এখন পর্য্যন্ত তাহার অন্তরকে বিদ্ধ করিতেছিল। গর্ব্বিতা পত্নীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার বাসনা তাহার মনে প্রবল হইয়াছিল। ত্রিবেণীনারায়ণের অসম্মতি আজি তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। ক্রমে বহু তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে তাঁহার সম্মতি লইয়া কর্ম্মের জন্য আবেদন পত্র পাঠাইয়া বেণীপ্রসাদ কর্ম্মস্থলে যাইবার আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

সপ্তাহ মধ্যে বেণীপ্রসাদ বিদেশে চাকরী করিতে যাইবে, ইহা সকলেই জানিতে পারিল, একথা রামদুলারীরও কর্ণে গেল; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিল না, এবারকার কলহের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না, কেবল আপন মনেই রাগে ও অভিমানে ফুলিতে লাগিল। বেণীপ্রসাদ ব্যস্ততার ভান করিয়া বাহিরে বাহিরে ফিরিতে লাগিল তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

প্রবাস যাত্রার পূর্ব্বে বাটীর সকলের নিকট বিদায় লইয়া বেণীপ্রসাদ একবার শয়ন কক্ষে আসিল, রামদুলারী পুত্রকে কোলে লইয়া দুগ্ধপান করাইতেছিল। কয়দিনের পর স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভিমানিনীর অভিমান উথলিয়া উঠিল, নয়ন কোনে অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু পাছে তাহার চোখের জল ধরা পড়ে, বেণীপ্রসাদের অনাদরে রামদুলারী মরমে মরিয়া আছে, পাছে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কোলের ছেলে দোলায় শোয়াইয়া, অন্যদ্বার দিয়া দ্রুতগতিতে গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

স্বামীর প্রতি তাচ্ছল্য দেখাইবার জন্য রামদুলারী চঞ্চল পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু বেণীপ্রসাদের নিকট তাহার মনোভাব গোপন রহিল না, তাহার বিষণ্ন মুখচ্ছবি, অসংস্কৃত বেশ ভূষা, অবিন্যস্ত কেশপাশ তাহার

অন্তরস্থ ক্ষোভের সাক্ষ্য দিয়া গেল। নিমিষের জন্য বেণীপ্রসাদের প্রাণে ব্যথা লাগিল, সকল মান অপমান বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া তাহাকে সাদরে ফিরাইয়া আনিবার অভিলাষ হইল। বিদায় মুহূর্ত্তে প্রিয়ার হাস্যবদন দেখিবার আশা প্রবলতর হইয়া উঠিল, কিন্তু মনে পড়িল "হাঁথী কা দাঁত আউর মরদ কা বাত ;" বেণীপ্রসাদকে আত্ম-সম্বরণ করিতে হইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। ফিরিয়া দোলনা হইতে পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আদর করিল, হাসাইয়া, নাচাইয়া তাহার কচিমুখে শত চুম্বন দিয়া, স্নেহভরে তাহাকে বহুক্ষণ নীরিক্ষণ করিয়া, পুনরায় দোলনায় শয়ন করাইয়া বৃথা রামদুলারীর দর্শনাশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বহির্ব্বাটীতে আসিল।

বেণীপ্রসাদ চলিয়া গেলে রামদুলারী গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবার ওড়নায় মুখ ঢাকিল।

(৪)

বেণীপ্রসাদের প্রবাস গমনের পরদিনই আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিল। ছোট বড় অনেকেই বলিল "এবার লক্ষণ বড় ভাল নয়।" চাকরাণী মহলে কথা উঠিল আকাশে যখন "বঢ়ানি" * উঠিয়াছে তখন এ বৎসর লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হইবে ; ওই বঢ়ানি যখন দেশের আনাজ (ধান, গম, জনারি, বজারি, মুগ, কড়াই প্রভৃতি) ঝাড়ু দিয়া লইয়া যাইবে তখন কি আর দেশে কিছু থাকিবে, সকলে না খাইয়া মারা যাইবে। অনেকেই একথা শুনিল, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে ধূমকেতু পৃথিবী হইতে যায় তাহার জন্য অনেকেই দেবীর পূজা মানিল। সকলেরই মনে অল্প বিস্তর ত্রাসের সঞ্চার হইল। বাড়ীর চাকর দাসীদের মুখে রামদুলারীও শুনিল কিন্তু তাহার মনে বিশেষ কোন ভাবের উদয় হইল না, কথাটি বেশীক্ষণ মনেও রহিল না। আজকাল তাহার মনে বেণী প্রসাদের চিন্তাই প্রবল হইয়াছে, তাহার অদর্শনের কষ্টই তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে, অন্য কিছু ভাবিবার তাহার অবসর নাই। পাঁচ বৎসর বয়সে বেণী প্রসাদের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে আর এখন তাহার বয়স বাইস বৎসর, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও তাহাকে বেণীপ্রসাদের বিচ্ছেদ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, একটি দিনও তাহাকে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়

* পশ্চিমে সাধারণ অশিক্ষিত লোক ধূমকেতুকে বঢ়ানি অর্থাৎ ঝাঁটা বলিয়া থাকে, প্রকৃত নাম জানে না।

নাই। শিশুকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বেণীপ্রসাদ তাহার শত অপরাধ ভুলিয়া সকল বিরোধ ঘুচাইয়া, নিত্য নিয়মিত সময়ে হাসিমুখে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কতদিন কত খুঁটি নাটি লইয়া তাহাদের কত ঝগড়া হইয়াছে, কখন বেণীপ্রসাদ তাহাকে, কখন সে বেণীপ্রসাদকে সাধিয়া কথা কহাইয়াছে। মান অভিমান হাসি কান্না তাহাদের নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল কিন্তু কেহ কাহারও প্রতি রাগ করিয়া এক বেলা কাটাইতে পারিত না, একদিন কেহ কাহারও অদর্শন সহিতে পারিত না। কিন্তু এবার একি হইল! একটু নির্জ্জন পাই-লেই রামদুলারী বসিয়া ভাবিত এমন কেন হইল? "দোহাই মা কল্যাণী! আমার অপরাধ নিওনা, দয়া করে তাঁকে ফিরিয়ে এনে দাও। এমন কাজ আর করব না। তেমন কথা আর বলব না।"

স্বামী চলিয়া গেলে, রাগ অভিমানে বিদায় দিয়া স্থির মনে রামদুলারী সমস্ত ভাবিয়া দেখিয়াছিল যে, বলিতে গেলে দোষটি তাহার নিজেরই সম্পূর্ণ। চির ক্ষমাশীল, চির প্রেমময় স্বামী তাহার অনুচিত ব্যবহার এ পর্য্যন্ত অনেক সহিয়া আসিয়াছেন। অনুতাপে রামদুলারীর হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, নির্জ্জনে চোখের জল মুছিয়া দিনের পর দিন গুণিতে লাগিল। ভ্রাতার নিকট স্বামীর নিরাপদে পৌঁছান সংবাদ আসিল, আরও কয়েক খানা পত্র আসিল কিন্তু তাহার নামে কোন পত্র আসিল না। রামদুলারী লেখা পড়া জানেনা নিজেও কোন পত্র দিতে পারিল না। ভউজি (ভায়ের স্ত্রী) বেশ লেখাপড়া জানেন, পিত্রালয়ে থাকিতে মিশন স্কুলে পড়িয়াছেন এখানেও ত্রিবেণীনারায়ণের নিকট বিশেষ ভাবে শিক্ষা পাইয়াছেন। তিনি অনায়াসেই পত্রাদি লিখিয়া দিতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা জানাইবার সাহস তাহার নাই। জগতের মধ্যে সে ভউজিকে যত ভয় করে এত আর কাহাকেও নয়, তাই তাঁহার কাছে অনেক কথাই তাহাকে গোপন রাখিতে হয়। আবার ভউজি ভিন্ন তাহার এমন আপনার লোকই বা কে আছে যাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলে বা কোন সুখ দুঃখের কথা জানাইতে পারে। তাই মনের দুঃখ মনে রাখিয়া রামদুলারী দিন কাটাইতে লাগিল।

(৫)

মে মাসের দিন। কখন্ ভোর হইয়াছে কিন্তু বেলা যেন আর ফুরাইতে চাহিতেছে না, রোদও কমে না দিনও শেষ হয় না। ঘরের বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ

ঝাঁ করিতেছে, হু হু শব্দে 'লু' চলিতেছে, ঘরের মাঝে পাখার তলে বসিয়াও গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে।

বাবু ত্রিবেণীনারায়ণের বাড়ীর চাকর বাকর অনেকেই এখনও দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে নাই। পত্নী মোহনী ছেলে মেয়ে কয়টীকে লইয়া ঘরের মধ্যেই শয়ন করিয়া আছেন। মহারাজিন্ নীচের ঘরে বুঢ়িয়ার সহিত গল্প করিতে করিতে পুদিনার চাটনি প্রস্তুত করিতেছে। আর রামদুলারী নিজের শয়ন গৃহে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে জাগরিত পুত্রকে পুনঃনিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। শিশুপুত্র সুখলালকে কোলে লইয়া শিরে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে সুর করিয়া রামদুলারী বলিতেছে—

"আজারী নিদিয়া তু আজারী আ!
মেরে বালে কী আঁখোঁ মে ঘুম মিল যা।
হাট বাট্ মে গলি গলি মে, নীদ করে চক্ ফেরে;
সাম কো আওয়ে পুত সুলাওয়ে উঠ যায় বড়ে সবেরে।
আ জা নিদিয়া আ জা! তেরী বালা জোহে বাট্,
সোনে কা হ্যাঁয় পায়ে জিস্কে রূপে কী হ্যায় খাট,
মখ্মল্ কা হ্যায় লাল বিছৌনা, তাকিয়া ঝালরদার,
সওয়া লাখ হ্যাঁয় মোতি জিস্‌মে, লটকেঁ লাল হাজার।
চার বহু আওয়ে বালে কে, দো গোরী দো কালী,
দো ঝুলাওয়ে দো খিলাওয়েঁ লে সোনে কী থালী।"

এমন সময়ে আপাদ মস্তক রৌপ্যালঙ্কার ভূষিতা ফুললতা চিত্রিত রঙ্গিন সাড়ী পরিহিতা পঞ্চাশোর্দ্ধ বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা পৈরাগিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রামদুলারীর গৃহে উপস্থিত হইল।

রামদুলারী ঘুম পাড়ানিয়া গীত বন্ধ করিয়া সহর্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"আরে! মেরী বুয়া! এতনা রোজ কেঁও নহি আয়ো বুয়া?"

কপালের ঘাম মুছিয়া পিসি পৈরাগিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

বুয়াকে ক্লান্ত দেখিয়া রামদুলারী একটু অপেক্ষা করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল, নানাকথার মাঝে সে অনুরোধ করিল—"দু এক ভজন শুনায় দেও বুয়া।"

বুয়ার মুখে ভজন শুনিতে রামদুলারীর ভারি ভাল লাগে; কত লোক কত ভজন গাহে কিন্তু পৈরাগিয়ার মত এমন সুন্দর করিয়া খুব অল্প লোকই ভজন

গাহিতে পারে, সে জন্য শুধু রামদুলারী নহে অনেকেই তাহার গানের ভক্ত। যে একবার শুনিয়াছে সে বারবার শুনিতে চায়। ভজন গাহিতেও পৈরাগিয়ার আলস্য নাই, ভোর পাঁচটা হইতে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত, খাইতে, শুইতে, কর্ম্ম করিতে, পথ চলিতে আপন মনে পৈরাগিয়া ভজন গাহিয়া নিজের মনের প্রসন্নতা রক্ষা করে। পৃথিবীতে তাহার আপন বলিতে কেহ নাই; সকলি বিসর্জ্জন দিয়া একটি মাত্র পুত্র লইয়া পৈরাগিয়া সংসারে দাঁড়াইয়াছিল; কয়েক বৎসর হইল তাহাকেও বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। পুত্রবধূ পিত্রালয়ে গিয়া আবার বিবাহ করিয়াছে, তাহার সহিতও পৈরাগিয়ার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। সকলে ভাবিয়াছিল এইবার বুঝি পৈরাগিয়া পাগল হইয়া যাইবে কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহাকে পাগল হইতে হয় নাই. পাড়ার লোকের কাহারও বুয়া, কাহার মউসি, কাহারও চাচী অথবা দাদী হইয়া তাহাদের বাড়ী যাওয়া আসা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া, ভজন গাহিয়া কোন রকমে দিন কাটাইয়া দেয়।

রামদুলারী ভজন শুনিতে চাহিলে অন্যদিনের মত গান আরম্ভ না করিয়া পৈরাগিয়া সবিষাদে কহিল—"ভজন কেয়া শুনোগী বেটী, হাঁসনে বোলনে কো দিন বিতা, আব জান্ সামহালনে কি দিন আ গিয়া।"

রামদুলারী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কৈঁও বুয়া? অ্যায়সা কৈঁও বোলতী হো? হুয়া কেয়া?"

পৈরাগিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কেয়া বতাঁউ বেটি তুমহে? তুম তো শুনতেহী কাঁপ উঠোগী।"

রামদুলারী কোলের ছেলে ভূমে নামাইয়া পৈরাগিয়ার হাত দুটি ধরিয়া, সানুনয়ে ব্যাপার কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে বলিল। কোন অজানিত বিপদাশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল।

পৈরাগিয়া তখন ধূমকেতুর উল্লেখ করিয়া বলিল— "সতরা তারিখ কো ভো সূরজ নারায়ণ সে আউর বঢ়ানি সে বড়ি লড়াই হই; উস্‌কে পিছে আঠারা তারিখ কো ভুঁইডোল (ভূমিকম্প) আওয়েগা, জিস্‌মে নীচে পৃথ্বী উপ্পর হোগা, উপ্পর পৃথ্বী নীচে হোগা। মানাই (মানুষ) হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে রহে যায়েগা, শোতে শোতে (ঘুমাইতে ঘুমাইতে) রহে যায়েগা, বৈঠে বৈঠে রহে যায়েগা; কেহ্‌কা বোল চাল কো ফুরসৎ না মিলেগা, যো যাঁহা রহেগা তাঁহাই জান নিকাল যায়েগা।"

রামদুলারী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"ইয়ে তো বড়ি ডর কি বাত হ্যায় বুয়া? কেয়া; সচ্ য়্যায়সা হই?"

পৈরাগিয়া বলিল—"আরে! দেখো তামাসা! সচ্ নহে তো কেয়া ঝুঠ বাতাওয়েকে রহা! বেটী ইয়ে তুমহারী হামারী বাত থোড়াই হ্যায়, ইয়ে তো সব পত্রি মে লিখে গিয়ে হ্যাঁয়। মেরি ক্যা? যাঁহা রহেঙ্গী হুঁয়াই জান নিকল যায়েগা, কোই ডর কে বাত নহি হ্যায়। ড'র তো বেটা তুহী লোগ কা হ্যায়!"

বুয়ার উপর তো রামদুলারীর দৃঢ় বিশ্বাস আছেই, তাহা ভিন্ন পত্রি অর্থাৎ পঞ্জিকাতে যখন লিখিয়াছে; খোদ পণ্ডিতজীর মুখে বুয়া স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছে তখন তো আর ইহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। রামদুলারী তখন বিষণ্ণ মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আপন মনে বলিল—উপ্পর পৃথ্বী নীচে আওয়েগা নীচে পৃথ্বী উপ্পর যায়েগা! উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল কণ্ঠে রামদুলারী জিজ্ঞাসা করিল—"মেরি সুখলাল? বুয়া! মেরি সুখলালভী না জিয়েগা? মেরি ভাইয়া—আউর—আউর, "রামদুলারী স্পষ্ট করিয়া বেণীপ্রসাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পৈরাগিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,—"আরে বওরাহি! (পাগলী) ইয়ে নেহি সমঝ্তেহো, পৃথ্বী যব উলট্ পালট্ যায়েগা, তব, কাঁহা রহেগা সুখলাল. তেরী আউর', কাঁহা তেরী ভাইয়া?"

রামদুলারী শিহরিয়া উঠিয়া ক্রোড়স্থিত সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল, ঝর্ ঝর্ করিয়া চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

পৈরাগিয়া ব্যথিত হইয়া আপন অঞ্চলে তাহার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"না রোও বাচ্ছা না রোও। রোয় কে কেয়া করোগী; ইয়ে তো সব নারায়ণকে খেল, ইসমে মানাইকে কিছু হাথ নহি হ্যাঁয়। চুপচাপ রহে যাও, যউন বদা হ্যায় তউন হোয়েই করি, যউন হাল সবকা হোই সো হাল তুমহুকা হোই। নাহক রোয়কে কেয়া করোগী।"

বহুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর পৈরাগিয়া রামদুলারীর নিকট হইতে উঠিয়া গেল।

(৬)

পৈরাগিয়া গৃহে ফিরিলে রামদুলারী ভৌজির নিকট এই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল।

মোহনী বুঝিলেন তাঁহার ক্ষীণ বুদ্ধি ননদটীকে এই আজগুবি সংবাদ শুনাইয়া আবার কে পাগল করিয়া দিয়া গিয়াছে। রঙ্গ দেখিবার জন্য প্রকাশ্যে বলিলেন—"সত্যি নাকি? তবে তো মহা বিপদ দেখচি রামদুলারী! তা হলে কি হবে?"

রামদুলারী উত্তর করিতে পারিল না, হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মোহনী হাস্য গোপন করিয়া কৃত্রিম বিষণ্ণতার সহিত বলিলেন—"আমার তো যাহোক এক প্রকার ভাল, সকলে একস্থানে আছি, কোন ভাবনা নাই; মরি মরব এক সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমারই তো ভাবনা, সুখলালের বাপ বিদেশে, আহা মরতেই যদি হয়, মরণ কালে একবার স্বামীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। কি আপশোষ!"

রামদুলারী নিজের চিন্তায় বিভোর, মোহনীর বিদ্রূপ কিছুই বুঝিলনা, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"নসিব! ভৌজী নসিব! নহিলে এমনই বা হবে কেন, আরও তো কতবার "ভুইডোল" হয়েচে কিন্তু এমন তো কখন হয় নি, এ সুরজ নারায়ণের সঙ্গে বঢ়ানির বিবাদ কিনা, এতে কি আর সৃষ্টি থাকতে পারে?"

মোহনী উচ্ছাসিত হাস্য বেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "তাইত এযে বিষম ব্যাপার!"

ভৌজীর নিকট কোন সান্তনা না পাইয়া রামদুলারী আবার নিজের ঘরে গেল। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিল, ১৯ তারিখের প্রলয়ের পূর্ব্বে বেণীপ্রসাদকে কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে আসিতে টেলিগ্রাম করাই তাহার স্বামীর সহিত শেষ সাক্ষাতের একমাত্র উপায়। কিন্তু টেলিগ্রাম করে কাহার দ্বারা? অশ্রুজলে ভাসিয়া রামদুলারী ভাবিল রাগের মাথায় যাহা বলিয়াছি তাহাই কি সত্য হইবে? এ জীবনে আর কি সে হাসিমুখ দেখিতে পাইব না? হে মা কল্যাণী! হে মায়ি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। মহাপ্রলয়ের আগে একবার তাঁহার নিকট আমার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার সময় দাও।

সে দিন সমস্ত রাত্রি রামদুলারীর চিন্তা ও অশ্রুবর্ষণে অতিবাহিত হইল। গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য গৃহের বাহিরে ছাদের উপর সুখলালকে লইয়া রামদুলারী শয়ন করিয়াছিল। রাত্রি তিনটার সময় পূর্ব্বদিকের আকাশে উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখা দিল; অন্যদিনের ন্যায় কৌতুহলী দৃষ্টিতে আর সে তাহা দেখিতে পারিল

না, সজল নয়নে কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিতে চাহিতে তাহার মনে হইল, সেই ঝাঁটাকৃতি রক্তবর্ণ ধূমকেতু যেন তাহার রক্তজিহ্বা প্রসারণ করিয়া পৃথিবী গ্রাস করিতে আসিতেছে; যেন উজ্জ্বল নয়নে বিশেষ ভাবে তাহারই দিকে চাহিয়া বলিতেছে—"দে রামদুলারী তোর সুখলালকে আমায় দে, একে একে তোর আপনার লোক গুলিকে আমায় সমর্পণ কর, শেষে তুই নিজেও আমার মুখে এই উজ্জ্বল আগুনের মাঝে ঝাঁপ দে।" ধূমকেতুর সে আহ্বান যেন সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, শিহরিয়া রামদুলারী দুইহাতে চোখ ঢাকিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও নিস্তার নাই, মানস-নেত্রে সে সুরজনারায়ণের সহিত বঢ়ানির ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। ছাদে শয়ন করিয়া থাকা তাহার অসাধ্য হইল, সুখলালকে বুকে করিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে সে গৃহের কোণে আসিয়া নিদ্রাহীন চক্ষে বসিয়া রহিল।

* * * * *

প্রভাতে রামদুলারী ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামলালকে বাইসিকেল কিনিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া গোপনে বেণীপ্রসাদকে টেলিগ্রাম করিতে সম্মত করাইল। টেলিগ্রামে লেখা হইল, "পিসিমার সহিত শেস দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে তো অবিলম্বে এলাহাবাদে আসুন," টেলিগ্রামে নিজের নাম সহি করিয়া শ্যামলাল পুরস্কারের লোভে নিজে তার ঘরে গিয়া তার করিয়া আসিল।

রামদুলারী উৎকণ্ঠিত চিত্তে যুগপৎ স্বামীর আগমন ও অনিবার্য্য মহাপ্রলয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৭)

টেলিগ্রাম পাইয়াই বেণীপ্রসাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। রামদুলারীর সঙ্গে শেষ দেখা—সেকি! এই ক'য়দিনের মধ্যে তাহার এমন কি ব্যায়রাম হইল? সবিষাদে বেণীপ্রসাদ ভাবিল তাহার অনাদরে অভিমানিনী রামদুলারী না জানি কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছে। নিজের অবিবেচনায় বেণীপ্রসাদের মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল।

নূতন চাকরী, সহজে ছুটী মিলিল না, কর্ম্মে জবাব দিয়া বেণীপ্রসাদ গৃহে ফিরিল। দেউড়িতে পা দিতে তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, বুঝি বা কি অমঙ্গলের কথা তাহাকে শুনিতে হয়। কাহারও রোদনধ্বনি বুঝি বা তাহার কাণে যায়, উদ্বেগ-ব্যাকুল-চিত্তে বেণীপ্রসাদ অন্তপুর অভিমুখে অগ্রসর হইল, কিন্তু কোন দিকে কোন অশুভ চিহ্ন তাহাকে অধিকতর ব্যথিত করিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিয়া উপরে উঠিতেই ত্রিবেণীনারায়ণ ও মোহনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাঁহারা হঠাৎ বেণীপ্রসাদকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। বেণীপ্রসাদ ত্রিবেণীনারায়ণকে টেলিগ্রাম দেখাইয়া রামদুলারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহার সুস্থ সংবাদ দিয়া শ্যামলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

শ্যামলাল আসিলে তাহার নিকট হইতে অনেক সংবাদ প্রকাশ পাইল, আগাগোড়া সকল কথা পরিষ্কার হইলে মোহনী তো হাসিয়া আকুল। চিন্তার আধিক্যে রামদুলারী যে তারিখ ভুলিয়া গিয়াছে মোহনী ইহাও বুঝিলেন, ঘটনাটা তাহার খুবই আমোদজনক বোধ লইল। ত্রিবেণীনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন "তা বেশ ভালই হয়েছে, বেণীর চাকরী করার সাধটাও খুব অল্পদিনেই মিটে গেল।"

বেণীপ্রসাদ যখন রামদুলারীর ঘরে আসিল কয়দিনের দারুণ উদ্বেগের সহিত যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে রামদুলারী মূর্চ্ছিতা হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। যখন জ্ঞান হইল কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে বলিল "এই শেষ, আর তোমায় দেখ্‌তে পাব না! কাল ১৮ তারিখ এই রাতটুকু শেষ হইলেই বঢ়ানির সঙ্গে সূরজনারায়ণের লড়াই বাধ্‌বে, পৃথিবী উল্‌টে যাবে, বঢ়ানির আগুনে দুনিয়া জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

বেণীপ্রসাদ সাদরে পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া হাসিয়া বলিল—"কাল ১৮ তারিখ তোমায় কে বল্লে, এখন যে ১৯ তারিখের রাত্রি; ভয়ের দিন তো কেটে গেছে। ওই দেখ, আকাশে ধূমকেতু যেমন তেমনি আছে, কেবল তোমার রকম দেখে বাড়ীশুদ্ধ লোক হেসে আকুল হচ্চে।"

* * * * *

প্রভাতে বেণীপ্রসাদ মোহনীকে বলিল—"বহুজী লোকে বলে ধূমকেতু অমঙ্গলের চিহ্ন, আমি তো দেখ্‌চি ধূমকেতুর উদয়ে আমার সুমঙ্গলেরই সূচনা হ'ল।"

প্রয়াগ প্রবাসিনী।

রত্নাকর

প্রবুদ্ধ ঋষি বাল্মীকি

যোগলব্ধ বিমল জ্ঞান বাল্মীকি নারদকে বলিলেন, ঋষি প্রবর, আমার মনে যেন মহাসমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ভাবসাগর স্ফীতমান হইতেছে। যেন বিশ্বে সকলি কবিতাময় চিত্র, সর্ব্বত্র এক মহা সৌন্দর্য্যের মেলা, মানব প্রেমের দিব্যখেলা। মনে হয়, যেন আমি স্বর্গ রাজ্যের সুবিমল সুরতরঙ্গিণীর ধারায়সর্ব্বদা অনুপ্রাণন লাভ করিতেছি, প্রতিকথায় যেন ছন্দ, প্রতি ভাবের সহিত যেন সুমধুর কল্পনা আসিতেছে। আমি যেন সঙ্গীত তরঙ্গে বিচরণ করিতেছি। প্রাণে যেন গোমুখীর ধারার ন্যায় কবিতা তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে। বল দেব, আমি কি লিখিব ?

নারদ বলিলেন, আমার সঙ্গে চল, আমি যে সকল দৃশ্য তোমায় দেখাইব, তাহাই তোমার কল্পনার ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে। তোমার চিত্রের প্রসঙ্গ হইবে। তোমার কবিতামালা নির্ম্মল স্রোতে প্রবাহিত হইয়া জগৎবাসীকে মোহিত করিবে। আমার সহিত চল।

নারদ বীণাধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, বাল্মীকি আনন্দ সঙ্গীত ধারায় জগৎ বিমুগ্ধ করিলেন। নারদ বলিলেন, পতিত পাবন, তোমারই জয়! এক দিন আমি ভাবিয়াছিলাম, যদি এই পাপীকে আমি উদ্ধার করিতে না পারি, তবে হরিনামই বৃথা। আমি বুঝিলাম, হরিনাম সত্য, ধন্য দয়াময় হরি, তোমার মহিমা ধন্য।

প্রকাণ্ড রাজপুরী, রাজর্ষি দশরথ সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছেন। রাজর্ষি সত্যব্রত, পুণ্যকাম, পবিত্র, পরিহাস ছলেও কখন মিথ্যা কথা বলেন নাই। জীবনের মধ্যে বন্য হস্তী ভ্রমে এক ঋষি বালককে বধ করিয়াছিলেন, কত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাঁহার পরিতাপ কিছুতেই দূর হইল না। তাঁহা স্বীয় পত্নীর সেবায় একবার রণস্থলে জীবন লাভ ও ভগ্নস্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা কখনও ভুলেন নাই, কোন সত্য লঙ্ঘন হয় নাই। সেই মহামহিমান্বিত দৃঢ়চিত্ত মহাবীর ইন্দ্রের সহায়। বাল্মীকি তাঁহাকে দেখিলেন। সেই পবিত্র রঘুবংশ শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে রাজ্য ভোগ, বার্দ্ধক্যে মুনীবৃত্তি পরায়ণ। বাল্মীকি এই পবিত্র রাজবংশের ইতিবৃত্ত নারদ মুখে অবগত হইলেন।!

রাজসিংহাসনের পাদদেশে চারিটি বালক খেলিতেছে, তুল্য তেজোময় মহিমাময় ও সুন্দর কান্তি। কিন্তু উহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রামের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সকলেই সুন্দর প্রত্যেকেই যেন বিশেষত্বে পরিপূর্ণ, লক্ষ্মণে তেজ ও ভ্রাতৃভক্তি, ভরতে দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগ, শত্রুঘ্নে বীর্য্য ও বিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু রামের চরিত্র যেন মহাসমুদ্রবৎ, মুখ খানি দেখিলেই যেন অনন্ত ভাবোচ্ছাস প্রাণে প্রতিভাত হয়। মনে হয় যেন পুনঃ পুনঃ সেরূপ দেখি, চক্ষু তৃপ্ত হয় না। কর্ণ সে বাণীর সঙ্গীতে আর ফিরিতে চায় না। বাল্মীকি ভাবিলেন, ইঁহারই আদর্শে, এই রাম চরিত্রে আমি জগৎকে মুগ্ধ করিব।

নারদ ও বাল্মীকি আবার মিথিলায় জনক ভবনে গমন করিলেন। রাজর্ষি জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান যোগ ও ভক্তি, অন্য দিকে রাজত্ব, কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও সুবিচার সমভাবে রক্ষা করিতেছেন, কি সুন্দর গভীর সে চরিত্র, দেব ও মানব যেন একত্র। রাজ ভবনের মনোহর তপোবনে চারিটিমূর্ত্তি দেখিলেন, চারিটি বালিকা, সীতা, উর্ম্মিলা মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি। সীতাকে দেখিয়া বাল্মীকি চমকিয়া উঠিলেন, কি সুন্দর, কোমল, অপূর্ব্বময়ী মূর্ত্তি। যেন লক্ষ্মীদেবী সশরীরে জগতে আগমন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর, সকলেই মনোহর। কল্পনাপ্রিয় বাল্মীকির মনে যেন চারি রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যা চতুষ্টয়ের নিগূঢ় সম্পর্ক মনে হইল। মিথিলা ও কোশল রাজপুরীদ্বয়ের বিমল সৌন্দর্য্যে বাল্মীকির হৃদয় পরিপূর্ণ করিল। নারদ বাল্মীকি গিরি নদী সমুদ্র উপবন সমস্ত প্রদর্শন করিলেন। সৌন্দর্য্যে বাল্মীকির হৃদয় মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্বে কোকিল পাপিয়ার স্বরলহরী বাল্মীকির প্রাণে যে আনন্দরাশি ঢালিত, আজি যেন মূর্ত্তিমতী কবিতাবলী তাহার সহিত গ্রন্থিত হইল। নারদের বীণা যেন তাহার হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল আলোড়িত করিল, বাল্মীকি ক্লান্ত কলেবরে নারদকে বলিলেন, গুরো, আর না, আমি আমার চিত্তরাজ্যের বিলক্ষণ লীলাভূমি পাইয়াছি। আমি আবার যোগস্থ হইয়া চিন্তা করিব। ধন্য ঋষিবর, তুমি আমায় প্রবুদ্ধ করিলে।

নারদ বলিলেন, মহাকবি বাল্মীকি, আমি পরম সুন্দর রাজপুত্র ও রাজকন্যা-গণকে এবং সুন্দর পুরীদ্বয়, লোকপ্রথিত রাজবংশ দ্বয় তোমাকে দেখাইলাম, ভাবিও না, ইহাই যথেষ্ট। ক্রমে ক্রমে এই শ্রেষ্ঠ নরনারীগণের জীবনের বিকাশ লক্ষ্য কর, আর ইহাদিগের চরিত্র অঙ্কিত কর। দয়াময় তোমার জীবনে যে পবিত্র লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার গুণ গান কর। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মহিমায়

পরিপূর্ণ। মহাপুরুষ ও নারীগণ কেন, সমগ্র মানব মণ্ডলী এক সুবিশাল চিত্র। এই চিত্র তুমি সর্ব্বদা অনুধ্যান কর! ইহাদিগের চরিত্র পাঠ কর। আর এই বিশ্বমধ্যে ভগবানের লীলার যে সকল আদর্শ পারিবারিক চিত্র তোমার মনকে মুগ্ধ করিবে, তাহা একত্র সঞ্চিত করিয়া রাখ। ইহার মধ্যে মহামূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, এই আদর্শে তুমি ভাবী নরনারীগণকে চিত্র করিবে। তোমার কবিত্ব পূর্ণ হৃদয়ই এবিষয়ে যথেষ্ট। আমি বিদায় হই।

নারদ আরও সুমধুর কোমল পদাবলী গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। বাল্মীকির প্রাণে কবিত্ব ধারা বহিল। বাল্মীকি যোগস্থ হইলেন। আবার হৃদয় বহুতর আনন্দ ও কবিত্বে পরিপূর্ণ হইল। সেই কবি হৃদয়ে আবার ছন্দ লালিত্য, কল্পনা খেলিতে লাগিল। রসময়ী কবিতায় মনোহর বাদ্যে যেন বর্ষার নির্ম্মল হ্রদস্থিত শফরীর ন্যায় হৃদয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঋষি মনে মনে গভীর উচ্ছ্বাসে সঙ্গীত প্রণয়ন আরম্ভ করিলেন। মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য আজি পবিত্র প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইল। জগৎ উৎকর্ণ হইয়া সেই মধুর ধারা পান করিয়া কৃতার্থ হইল।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

বাসনা

—০—

ধরিয়া বক্ষে লক্ষ কমল
কহ্লার মনোরম,
চাহিনা হইতে রুদ্ধ সরসী
স্নিগ্ধ সুনীল ক্ষম।
হতে চাই আমি ক্ষুদ্র তটিনী
রুদ্র মরুভূপরে;
যোগাতে সলিল তৃষ্ণা আকুল
শ্রান্ত পান্থ তরে।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

খাদ্যের পরিণতি

আমরা খুন্নিবৃত্তির জন্য প্রত্যহ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধান্ন ভোজন করিয়া থাকি। সময় মত ভোজ্য যোগাইতে না পারিলে দেহ-যন্ত্র কথনই সচল থাকে না। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"এই দেহ রেলগাড়ির কল ; ভব পথে ক'চ্চে চলাচল।
কোথা জেমস্ ওয়াটের বুদ্ধি, এ কলের এম্নি কৌশল ;
উদর-বয়লারে জম্‌চে বাষ্প, মিশে সদা আগুন জল।
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়চে তায় অবিরল ;
ভাঙা ফুটো সারা অয়েলকরা, ডাক্তারের কাজ সকল।
সম্মুখেতে লন্ঠন্ তায়, চক্ষুদুটি সমুজ্জল ;
শ্বাস প্রশ্বাসে, হচ্ছে কলের ফোঁস ফোঁসানি অবিরল।
সূক্ষ্ম শিরা দেয় তারা, তারের খবর প্রতিপল ;
ধর্ম্মজ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ দয়া দ্বেষ আরোহিদল।
লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্ট জননীর গর্ভস্থল ;
জন্ম মৃত্যু টারমিনাস্ দুই, ড্রাইভার মন চঞ্চল।"

এই যন্ত্রের যন্ত্রী আমাদের বাধ্য নহেন! তিনি অহর্নিশ এই কল চালাইতে-ছেন। এক তিলের জন্যও কলের বিরাম নাই। কখন কয়লা ফুরাইবে এই চিন্তা করিয়া আমরাও নানা দিক্‌দেশ হইতে নানা উপায়ে আহার্য্যরূপ কয়লা সংগ্রহ করিতেছি! কলের ক্রিয়া অল্প মন্দীভূত হইলেই আমরা খাদ্য দিয়া আবার তাহাকে সতেজ করিয়া তুলি। কিন্তু এত করিয়াও এই কলকে চিরকাল কেহ রাখিতে পারেন না। এক দিন কল বিকল হইবেই হইবে। তখন কয়লা দিলেও আর চলিবে না। যে দেহ-যন্ত্র রক্ষার জন্য আমাদের এত চেষ্টা, এত যত্ন, তাহা বাল্যে মূত্রপুরীষ লিপ্ত, যৌবনে কামক্রীড়াদিতে দূষিত এবং বার্দ্ধক্যে জরা প্রভাবে অবসাদিত হইয়া যথা কালে কাল কবলে নিপতিত হয়।

এই মানব দেহ অসংখ্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। দৈহিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষ সকল অহরহঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা যে সকল মিশ্র খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকি তদ্দ্বারা এই ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্য পরি-পাক প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে শোণিতে পরিণত হয়। এই শোণিতের মধ্যে অস্থি মাংসাদি গঠনোপযোগী উপকরণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে। সেই মহাশিল্পীর শিল্প

কৌশলে শোণিত রাশি শিরা প্রশিরার মধ্য দিয়া দেহের সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হয় এবং যে স্থানে যে দ্রব্যের অভাব ঘটে সেই স্থানে সেই দ্রব্য বিতরণ করিয়া থাকে।

খাদ্যের পরিণতি সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই নীরস বিষয় সরস করিয়া লিখিতে না পারিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আমার দুর্ব্বল লেখনী কতদূর সমর্থ হইবে, বলিতে পারি না। আমাদের ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতসার, প্রোটীড্, মাখন, লবণ ও জল এই পঞ্চবিধ সামগ্রী থাকা অত্যাবশ্যক। এক জাতীয় খাদ্যগ্রহণ করিয়া মনুষ্য কখনই জীবন ধারণ করিতে পারে না। ভাত, আলু, ময়দা, এরারুট প্রভৃতি খাদ্যে শ্বেতসার যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই শ্বেতসারই আমাদের শরীরের শক্তি ও তাপোৎপাদন করিয়া থাকে। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ডাউল প্রভৃতিতে প্রোটীড্ জাতীয় খাদ্যই অধিক। প্রোটীড্ হইতেই আমাদের মাংস পেশী গঠিত হয়। ঘৃত, মাখন, তৈল প্রভৃতি পদার্থ সকল মাখন জাতীয় খাদ্য মধ্যে গণনীয়। ইহারা দৈহিক তাপোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে চর্ব্বি বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে স্থূলতনু করিয়া দেয়। লবণ দ্বারা অস্থি সকলের পুষ্টি সাধন হয়। ফল, তরকারী প্রভৃতির মধ্যে লবণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দুগ্ধে সর্ব্ববিধ খাদ্যই বর্ত্তমান আছে। এ জন্য মনুষ্য কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই দীর্ঘকাল সুস্থ থাকিতে পারে।

পাক-যন্ত্র সমষ্টির মধ্যে দন্তই অগ্রগণ্য। অনেকে মনে করেন পাকস্থলী সবল থাকিলেই আর পরিপাক বিকার ঘটে না; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সুচর্ব্বিত না হইলে কোন খাদ্যই সুচারুরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। আমরা 'দন্ত থাকিতে দন্তের মর্য্যাদা বুঝি না' কিন্তু এই দন্তই চর্ব্বণের সাহায্য করিয়া প্রকারান্তরে খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে। অতএব পরিপাক প্রার্থিজনগণ সর্ব্ব প্রযত্নে দন্ত পংক্তি সুদৃঢ় রাখিবার চেষ্টা করিবেন। মনুষ্য মাত্রেরই দুইবার দন্ত উঠিয়া থাকে। এই জন্যই দন্তের আর একটি নাম দ্বিজ। দুগ্ধ-দন্ত সংখ্যায় ২০টি এবং স্থায়ী-দন্ত সংখ্যায় ৩২টি হইয়া থাকে। মনুষ্যের সকল দন্তের গঠন এক প্রকার নহে। এই গঠন বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের কার্য্যেরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। আমাদের প্রত্যেক পাটির সম্মুখ ভাগে চারিটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও ধারাল দন্ত থাকে। এই দন্তের সাহায্যে আমরা খাদ্য দ্রব্য কর্ত্তন করিয়া লইতে পারি। এই কর্ত্তনকারি দন্তের ইংরাজী নাম Incisors। উক্ত দন্ত চতুষ্টয়ের দুই পার্শ্বে দুইটি তীক্ষ্ণধার দন্ত আছে। কুকুরের দন্তের সহিত ইহা-

দিগের সাদৃশ্য থাকায় ইহারা Canine teeth বা শ্ব-দন্ত নামে কথিত হয়। শ্ব দন্তের সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য সহজেই বিদ্ধ করা যায়। এই দুই দন্তের উভয় পার্শ্বে আবার দুইটি করিয়া চারিটি দ্বিশল্য দন্ত ও তৎপশ্চাতে তিনটি করিয়া ছয়টি পেষক দন্ত বাহির হয়। দ্বিশল্য ও পেষক দন্তগুলির উপরিভাগ বন্ধুর। ইহারা খাদ্য সামগ্রীকে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়। সর্ব্বশেষ পেষক দন্ত সাধারণতঃ অধিক বয়সেই নির্গত হয়। এই জন্য লোকে ইহাকে "জ্ঞান দন্ত" (Wisdom tooth) বলিয়া থাকে।

খাদ্য সামগ্রী কবলিত হইবামাত্রই দন্ত উহাদিগকে নিষ্পেষিত করিতে আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে লালা বাহির হইয়া ঐ চূর্ণ খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। মুখ-গহ্বর মধ্যে অনেকগুলি লালাগ্রন্থি বর্ত্তমান আছে। ঐ গ্রন্থি নিঃসৃত রসের মিশ্রকে লালা কহে। সুস্থাবস্থায় ইহা ক্ষারগুণ বিশিষ্ট এবং দেখিতে অস্তলালের ন্যায় অল্প পরিমাণে সফেন। আমরা যে সকল সামগ্রী সম্ভার আহার করিয়া থাকি, তন্মধ্যে ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্য সকল এই লালার সাহায্যে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। লালার মধ্যে টায়ালিন্ (Ptyalin) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। এই টায়ালিন্ শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করিয়া পরিপাকোপযোগী করিয়া দেয়। আমরা খাদ্য সামগ্রী যতই চর্ব্বণ করিতে থাকি, ততই উহা সুচূর্ণিত ও লালাদ্বারা সংমিশ্রিত হইতে থাকে। এইরূপে ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে ভুক্ত দ্রব্য সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়। খাদ্য সম্যক্‌রূপে চর্ব্বিত না হইলে সুকোমল হয় না এবং উহাতে লালাও যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইতে পারে না। অর্দ্ধ চর্ব্বিত উদর রোগকে সাদরে আহ্বান করে। দ্রুত ভোজী ও দন্তহীনগণের উদরাময় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও লালা শ্বেতসার ভিন্ন মৎস্য মাংসাদি অন্য জাতীয় খাদ্য সকলকে পরিপাক করিতে পারে না, তথাপি ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে দন্ত দ্বারা চূর্ণীকৃত হইলে পাকস্থলী কর্ত্তৃক সহজেই গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা কার্য্যানুরোধে অনেক সময় খাদ্য দ্রব্য সুচর্ব্বিত না করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। ইহার ফল যে বিষময় তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রশান্ত-চিত্তে ধীরে ধীরে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়া আহার করাই সুব্যবস্থা। কর্ম্মে ব্যস্ত লোকদিগের পক্ষে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজিয়া চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা কার্য্যান্তে দিবাশেষে নিশ্চিন্ত মনে আহার করাই বিধি "Unquiet meals make ill digistions"—এই মহাজন বাক্যটি স্মরণ রাখিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি প্রত্যহ দুই বেলা মুখ প্রক্ষালন ও দন্ত মার্জ্জন করিবেন। উভয় দন্তের মধ্যে খাদ্যের সূক্ষ্মাংশ অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া অনেক সময় পচিতে থাকে এবং তথায় এক প্রকার রোগোৎপাদক জীবাণুর উৎপত্তি হয়। এই সকল পচা দ্রব্য বা জীবাণু উদরস্থ হইলে অজীর্ণ রোগ জন্মে। অতএব দন্ত মার্জ্জন কালে উভয় দন্তের মধ্যস্থিত খাদ্যাংশগুলি বাহির করিয়া ফেলিবেন। পল্লীগ্রামের লোকেরা ভেরেণ্ডা, নিম প্রভৃতির দাঁতন করিয়া থাকেন। ইহাতে দন্ত বেশ সুদৃঢ় ও পরিস্কৃত হয়। নিম সঙ্কোচক ও জীবানুনাশক ; সুতরাং নিমের দাঁতনের দ্বারা দ্বিবিধ উপকারই সাধিত হয়। আমাদের দেহই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লাভের মূল যন্ত্র। বাইবেলে উক্ত আছে,—

"Know ye not that you are the temple of god ; and that the spirit of God dwelleth in you ?"

তোমরা কি জাননা যে এই দেহ গেহই ভগবানের মন্দির এবং সেই ভগবৎ সত্বাই তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে ?"

দেবালয় রক্ষক যেমন দেব-মন্দির পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিয়া থাকেন, তেমনই আমরাও নিজ নিজ দেহ-মন্দির নির্ম্মল রাখিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কবির হাঁচি

চতুর্দ্দশপদী

এস গো মা বীণাপাণি, কল্পনার সনে,
নাসারন্ধ্রে আসি মম হও অধিষ্ঠিত।
হাঁচিব কবির হাঁচি ছন্দেতে মার্জ্জিত!
অমর হইয়ে র'ব মানবের মনে!
কাব্য লিখে কবি হ'তে সহজ সাধনে
সকলে সফল হয়! কাব্য সংযোজিত
হাঁচি,কাশি নিশ্বাসের হইয়ে আশ্রিত,
ক'জন যশস্বী হয় সংসার প্রাঙ্গনে?
দাও শক্তি হাঁচিবারে হেন কায়দায়,
সজোরে একটি হাঁচি হাঁচিলে যেমন

শত "বিষবৃক্ষ" রস তাহাতে গড়ায় !
ধরাতলে "কবি" নাম করিতে অর্জ্জন,
মহানন্দে সংসারের অবধানতায়,
দেখিবে, চরণাঘাতে করিব বর্জ্জন !

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ

জীবন-চরিতে পাশ্চাত্য আদর্শ

যাঁহার জীবনচরিত লিখিতে হইবে, তিনি প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন, কিভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক তাহা বৈজ্ঞানিকের দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ সাহায্যে এবং সুদক্ষ শিল্পীর তুলিকাপাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করেন। তিনি নৈষ্ঠিক সাধকের মত সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি, পান হইতে চুণ খসিতে দেন না। তাঁহার কলম দিয়া "ঠিক" জীবনী খানি প্রস্তুত হইল কিনা, তাহা তাঁহার সংগ্রহশক্তি ও প্রতিভার উপর নির্ভর করে। তিনি ঐতিহাসিক; তাঁহার উহাই লক্ষ্য, উহাই তাঁহার আদর্শ। কিন্তু যাঁহার জীবন শত চক্ষুর লক্ষ্যস্থল, যিনি সংসার ভবার্ণবে শত শত জীবনতরীর কর্ণধার, ঐতিহাসিককে দিয়া তাঁহার জীবনচরিত লেখান হইবে না। যদি এমন কোন অপরিনামদর্শী ঐতিহাসিক এরূপ পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান যুগের সাম্প্রদায়িক দরবারে হাজির করিতে হইবে এবং আধুনিক ধর্ম্মসংস্কার, সভ্যতা, উন্নত সার্ব্বভৌম নীতি ও মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে তাহাকে তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। তাহাতে যাহা অতিরিক্ত, যাহা দূষিত, ক্ষত, পাওয়া যাইবে তাহা কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, যাহা নাই বা কম পড়িবে তাহা জুড়িয়া দিতে হইবে। তাহার যেখানটা তোমার আমার ভাল লাগিবে না তাহাতে এমন মসলা দিতে হইবে, এবং যাহা দেখিতে পারা যায় না তাহাকে এমনি সুদৃশ্য করিয়া সাজাইতে হইবে, তাহার অভাব এমন করিয়া পূরণ করিতে হইবে, ত্রুটি এমন করিয়া সংশোধন করিতে হইবে যে, তাহা সকলেরই ভাল লাগে, সকলের নয়নরঞ্জন করে।

যাঁহার নাম শত শত নর নারীর মুখে ভক্তিভরে উচ্চারিত, যাঁহার লীলা শত মুখে কীর্ত্তিত, সহস্র কণ্ঠে গীত এবং লক্ষহৃদয় তন্ত্রীতে ঝংকৃত হইবে, যাঁহার নাম জপ করিয়া লোকে পরিত্রাণের উপায় করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিবে, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সকলে এক-তন্ত্র একাভিমুখী সমবেদনাকুল আত্মীয়ভাবে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ও শক্তিশালি হইয়া উঠিবে, তাঁহার জীবনী আদর্শ জীবনী হওয়াই চাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের সঙ্গে ও তাঁহার উদ্ভাবিত নীতির সঙ্গে তাঁহার জীবনের সঙ্গতি দেখিতে সকলেই চায়। সুতরাং এ সামঞ্জস্য যেমন করিয়া হউক দেখাইতেই হইবে। জীবনের যে স্থান সমাজ গঠনের পরিপন্থী দেখা যাইবে, যে অংশে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে বাধা জন্মাইবে, তাহা তুলিয়া দিয়া, যেখানে কলঙ্ক পড়িয়াছে সেখানটা ধুইয়া দিয়া, যে অংশ ধূলায় ধূসর হইয়া আছে তাহা ঝাড়িয়া মুছিয়া দিয়া জীবনটীকে ঝরঝরে, তক্‌তকে করিয়া দেখাইতে হইবে। ধুইয়া মুছিয়া দেওয়া অর্থাৎ সাফাই করা এককালে অসম্ভব হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। তখন, অঙ্গারের মধ্য হইতে হীরক বাছিয়া লইবার মত, তিমিরগর্ভ খনির ভিতর হইতে মণি বাহির করার মত, শব্দ সমুদ্র মন্থন করিয়া, ভাষার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া ভাবের রাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া কোন লুকান অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, লৌকিক অভিধানের ভিতর হইতে আধ্যাত্মিক তথ্য টানিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহাই করিতে হইবে, যাহাতে মত প্রবর্ত্তক জন-নায়কের জীবনটি তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতের সহিত, তাঁহার উক্তির ভিতর দিয়া সুষ্ঠুভাবে সমঞ্জসীভূত হয়—কাজে ও কথায় থাপ খাইয়া যায়।

ধর্ম্মকে রাজনৈতিক বা ব্যবহারিক করিয়া গড়িতে হইলে, তাহাকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহাসভায় দাঁড় করাইতে হইলে, অবতার বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের জীবনী এমন করিয়াই গড়িতে হয়, এমনই ছাঁচে ঢালিতে হয়। তিনি যাহা ছিলেন, ঠিক তাঁহাকে চিত্রিত করিলে, তাঁহার জীবনকে সার্ব্বজনীনতা, অপূর্ব্বতা, সর্ব্বকালের অনতিক্রমনীয়তা বা স্থায়িত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, জীবনীর উদ্দেশ্য বজায় থাকে না। জননায়কে আদর্শ দেবচরিত্র আরোপ করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্যাবলী মানববুদ্ধি ও মনুষ্য শক্তির অগম্য অপার্থিব রাজ্যের লীলায় পরিণত করিতে হইবে, তাঁহার মুখমণ্ডলে হৃদয় উন্মাদনরূপের জ্যোতিঃ পাতিত করিতে হইবে। যেরূপ নরনারীর চক্ষু ঝলসিত ও হৃদয় বিমোহিত করিতে পারে, যে বাণীর উদার গম্ভীর ভাবে বিশ্বকে একবারে স্তম্ভিত

একবারে উন্মত্ত করিতে পারে। যে লীলা জন-মণ্ডলীকে বিস্ময়পুলকে, ভয় ভক্তিতে তাঁহার চরণতলে আনিয়া পাতিত করিতে পারে পাশ্চাত্য আদর্শ-বাদী, ব্যবহারিক ধর্ম্মমতাবলম্বীর তাহাই জীবনী লেখার লক্ষ্য, তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ।

সেদিন তাই জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক "ইসলামের মতবাদে উদারনীতি ও মহত্ব" প্রতিপাদক একটি প্রবন্ধে যখন দেখাইয়াছিলেন যে, "তরবারীর জোরে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, মহম্মদ স্বয়ং একমাত্র বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন" ইত্যাদি—তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ইংরাজ সাহিত্যাচার্য্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া ফেলেন ;—

"From the point of the student of history, these propositions are indefensible ; but where a biography is what is called dogmatic, where the actions of a man are regarded as the pattern for other men and where reverence for a particular name constitutes a mass of political capital, it is more important for the race that his life should be really Exemplary than that it should be faithfully recorded. What shocks us about the earliest biographies of the prophet is that they are so truthful * * * The newer biographer who has learned from Europe what a pattern of conduct should be like, paints his prophet in a style that brings him near that pattern, he hopes to make him the patron of the newly discovered virtues, just as moral and metaphysical speculators of earlier time made Mahomed the patron of their business. These efforts at rewriting history are not to be discouraged, though with advancing years men choose living models of conduct rather than those of which the traits are blarred by antiquity."

তালি-দেওয়া জীবনচরিত লিখিবার এই যে নূতন ধারা বাহির হইয়াছে ইহা সমাজের হৃদয় হইতে যেন সত্যতা সততা, আন্তরিকতা এবং সজীবতা, ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতেছে। তাহার কৃতিত্ব পুরুষকার ক্রমে লোপ পাইয়া সমাজ

কলকবজায় চালিত যন্ত্রবৎ হইয়া পড়িতেছে। উহা যেন বাস্তবের পরিবর্ত্তে মায়িক আদর্শের পশ্চাতে ছুটিতেছে। সমাজের মানুষগুলা কলেফেরা কলের মানুষের মত ফিরিতেছে। তথায় আনন্দ, হাস্য, কৌতুক, নাই এমন নয়, কিন্তু যেন তাহার পিছনে কান্নার সুর চাপা আছে। তাহার এখন না হাসিলেই নয়, সে হৃদয়ের সব বেদনা, মর্ম্মের সব যাতনা চাপিয়া, সে দিকে পিছন করিয়া, সমাজের হর্ষ কোলাহলে যোগ দিতে বসিয়াছে। ঈর্ষায় সন্দেহে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার ঈর্ষার পাত্র ও চক্ষের শূলকে কোল দিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে, তাহার সহিত হাসিমুখে আলাপ করিতে হইতেছে। যাহা আমার কর্ত্তব্য নয় বলিয়া বুঝিতেছি তাহাও আমায় করিতে হইবে। সমাজ তাহা চায় সুতরাং না করিলে সমাজ আমায় দুই হাতে ঠেলিয়া আমায় পিছনে ফেলিয়া আগে যাইবে ; আমাকে দাঁড়াইতে দিবে না। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে না চলিলে আমার সামাজিক জীবন টিকিবে না। আমায় সমাজে আদর্শ রাখিয়া যাইতে হইবে—কিন্তু কি দিয়া আদর্শ রাখিব ? আমার জীবন দিয়া ? না তাহা হইবে না ; সমাজ আমার সে আদর্শ লইবে না। তবে কি ? আমার 'জীবনী' দিয়া—সে জীবনীর টীকা ভাষ্য দিয়া। জীবনীর সমালোচনা দ্বারা আমায় জগতকে বুঝাইতে হইবে তোমরা আমায় যেরূপ দেখিয়াছ আমি তাহা ছিলাম না। আমি যে উদ্দেশ্যে যাহা করিয়াছি বলিয়া ভাবিয়াছিলে, আমার উদ্দেশ্য তাহা ছিল না। ইহার অর্থ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য গূঢ়, সর্ব্বজন হিতকর এবং পবিত্র। এই ভাবে যিনি স্বরচিত জীবন-চরিত বা আত্মজীবনের সমালোচনা নিজেই ছাড়িয়া যাইতে পারেন তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনচরিত লেখকের মাথা ঘামাইবার বড় বেশী কিছু রাখিয়া যান না।

কলকজার দেশের কলেফেরা সমাজ তথায় বাস্তব জীবনের আদর্শ প্রাপ্তির দুরাশা হইতে মায়িক আদর্শের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে এবং অধ্যাত্ম জগতে চির পশ্চাৎপদ্ পাশ্চাত্যজগত আজি নবজাগরণের যুগে মানবচরিত্রের নবাবিষ্কৃত গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া প্রাচীন ভারতের তিলোত্তমার মত সর্ব্বত্র হইতে আদর্শ চয়ন করত বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌম চরিত্রনীতি ও আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে জীবনী লিখিবার সনাতন ধারার পরিবর্ত্তে এই অভিনব পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আর কিছু দিন পরে হয়ত জীবন, ধর্ম্ম ও নীতি, সত্য সত্যই তথায় কাব্য ও উপন্যাসেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা ভয়াবহ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সরমা

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে বিনয়ের গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। বিনয় কোচম্যানকে ভাড়া দিয়া কমলা ও মাণিককে স্ত্রীলোকদের বিশ্রামাগারে রাখিয়া টিকিট কিনিয়া আনিল। তখন পাঞ্জাব মেল ছাড়িতে কিছু বিলম্ব ছিল। বিনয় তাহার সোনার চশমা রুমালে মাজিয়া ঘসিয়া একটু পরিষ্কার করিয়া নাকের উপর চাপাইয়া দিল। তারপর একটি চুরুট ধরাইয়া টানিতে টানিতে পদচারণ করিতে করিতে এক একবার আড় নয়নে কমলার দিকে চাহিতে লাগিল। কমলা তখন মাটির দিকে মুখ করিয়া মাণিকের হাত ধরিয়া বসিয়াছিল। এই সময় (বিনয়ের শিক্ষামত) হটাৎ কোথা হইতে তারানাথ আসিয়া কহিল "এই যে ডাক্তার, তুমি এখানে ? কোথাও যাচ্চ নাকি ?"

বিনয় কথাটা উল্টাইয়া বলিল "তারানাথ যে, তুমি এখানে ; কোথায় যাচ্চ নাকি ?"

তারানাথ তাহার রিষ্ট ওয়াচের দিকে একবার চাহিয়া কহিল "হাঁ—যাচ্চি বৈকি ?"

বিনয় গম্ভীরভাবে কহিল কতদূর ?

"আপাততঃ কাশী অবধি—তারপর কোথায় যাই তার ঠিক নেই ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে আর কি—বেড়াতে বেরিয়েচি—যেখানে ইচ্ছে হবে সেইখানে যাব। তুমি কতদূর যাচ্চ ?"

"আমিও এখন কাশী পর্য্যন্ত !

"তবে তো ভাল, বেশ তুজনে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি ?"

"একটি অসহায়া স্ত্রীলোক আছেন, তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছে পৌছে দিতে হবে।"

"তা বেশ তবে চল, এদিকে যে সময় হয়ে এল—একটু আগে গিয়ে একটা ভাল যায়গা দেখে বসতে হবে।"

তারানাথের প্রথম কথাতেই কমলার চমক ভাঙিয়াছিল। সে পরিচিত স্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং সম্মুখে তারানাথকে দেখিয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে ভাবিল এ কি বিপদ, কি সে মনে করিবে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুতের শিখা ছুটিয়া গেল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, ললাটে বিণ্ বিণ্ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। কমলা আপনাকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া ভাবিল সে এখন উপেক্ষিতা, তাড়িতা, তারানাথের কিছু মনে করায় তাহার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। যাহার আশায় এখন সে যাইতেছে যদি একবার সে তাহাকে দেখিতে পায়, যদি ভগবান একবার মুখ তুলিয়া চান, তাহা হইলেই তাহার সকল দুঃখ কষ্টের অবসান হইবে। নচেৎ সে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে।

বিনয় কমলার দিকে চাহিয়া কহিল "আসুন গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে।"

কমলা মাথার কাপড়টা একটু বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া মাণিককে ক্রোড়ে লইয়া বিনয়ের পশ্চাতে অগ্রসর হইল, একটা কুলি বিনয়ের লগেজটা মাথায় লইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। ষ্টেসনের সাগর কোলাহলের মধ্য দিয়া জনতার ভীষণ ভীড় ঠেলিয়া বিনয়, তারানাথ ও কমলা প্লাটফ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুলিটা একখানা গাড়ীর নিকট যাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল "ইয়ে জানানাকা গাড়ী হ্যায় বাবু সাব্।"

বিনয় কমলাকে স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীতে তুলিয়া দিল। মাণিককে ক্রোড়ে লইয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় কমলার অবগুণ্ঠনটা ঈষৎ সরিয়া পড়িয়াছিল, সেই অবসরে তারানাথ যেন তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল এইরূপ ভান করিয়া তখন সে বিস্মিতভাবে কহিল "ডাক্তার ইনি যে আমার পরিচিতা, আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, নামটা কমলা, না!"

বিনয় মুখ খানা বিকৃত করিয়া কহিল "তা হবে এখন থাক!"

তারানাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কমলার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখুন, আপনার কোন ভয় নেই, ডাক্তার আমার বিশেষ বন্ধু খুব ভাল লোক, আর আমি যখন সঙ্গে আছি"—

তারানাথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিনয় তাহার হাত ধরিয়া একটু তফাতে টানিয়া আনিয়া কহিল "থাম, থাম, আর কাজ নেই।"

তারানাথ বিরক্তির সহিত কহিল "তুমি যে আমাকে কথাই কৈতে দেবে না দেখছি, কেন মন্দ কি বলছিলুম।"

বিনয় তারানাথের গা টিপিয়া কহিল "এখন একটু সবুর কর, এর পর প্রাণ ভরে কথা কয়ো, তোমার সম্পত্তি তুমিই দখল কোরো।"

"কেন ভাই রাগ করলে, আর আমি কোন কথা কইব না।"

"না রাগ কিসের" বলিয়া বিনয় তারানাথের হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকদের গাড়ীর পার্শ্বের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। এঞ্জিনটা তখন তাহার বিপুল উদর খালি করিয়া ধুম্র উদ্গিরণ করিতেছিল, ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, গার্ড সবুজ নিশান দেখাইল, একটা জোর হুইসিল দিয়া এঞ্জিনটা ভস্ ভস্ শব্দে ষ্টেসন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যে গাড়ীতে বিনয় ও তারানাথ উঠিয়াছিল, সেই গাড়ীর অপর কামরায় কয়েকটী ভদ্রলোক বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন একখানি বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল, বাকি কয়জন তাহা শুনিয়া আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাঠক স্বরটা একটু কড়া করিয়া কহিল, "ওহে নিবারণ ডিটেক্‌টিভ হতে পারবে?"

"কেন কি হয়েছে?"

"নগদ একশ টাকা পুরস্কার।"

"ব্যাপারটা কি শুনি।"

"শোন।"

এক'শ টাকা পুরস্কার।

গত রবিবার রাত্রে আমার পুত্র শ্রীমান তারানাথ রায় চৌধুরী, বিনয়কুমার সরকারের সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যে কেহ উহাদের ধরিয়া দিতে পারিবে কিম্বা উহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে উপরোক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। তারানাথ গৌরবর্ণ, বয়স কুড়ি বৎসর, দেখিতে বেশ সুশ্রী, বাম বাহুতে T. N. C. লেখা আছে। বিনয় শ্যামবর্ণ, বয়স আন্দাজ বাইশ বৎসর, সর্ব্বদাই বেশ ফিট ফাট, সোণার চশমা, ছাঁটা দাড়ী, মাথায় টেরি। বাম কর্ণে একটি ছোট জড়ুল চিহ্ন আছে, লোকে তাহাকে ডাক্তার বলিয়া ডাকে।

শ্রীকালীশঙ্কর রায় চৌধুরী
সাং বিলাসপুর

যতক্ষণ বিজ্ঞাপনটি পাঠ হইতে ছিল, ততক্ষণ বিনয় ও তারানাথ কাণ খাড়া করিয়া শুনিতে ছিল। পাঠ শেষ হইলে উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কেহ তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে কি না, কেহ তাহাদের ধরিবার জন্য উঠিয়াছে কি না। তারানাথ সকলের অলক্ষ্যে

কামিজের আস্তিন গুটাইয়া আপনার বাম বাহুর প্রতি চাহিয়া দেখিল, দেখিল চিনা কালীতে লেখা অক্ষর গুলা হাতের উপর জ্বল জ্বল করিতেছে। এক দিন যাহাদিগকে সে স্বযত্নে আপনার অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল, আজ যেন তাহারা তাহার বিষম শত্রু হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। হায় সে যে মুছিয়া ফেলিবার নয়—সঙ্গের সাথি! তারানাথের প্রাণের ভিতর যেন একটা দারুণ ঝড় বহিতে লাগিল, হৃদয়টা গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কে যেন এখনি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে, হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দিবে। সে একবার ভীতি-চকিত-নেত্রে গাড়ীর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পরে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া খোলা আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

বিনয় তখন ভাবিতে ছিল, কি বিপদ! সে যে খুনী আসামী, একবার যদি ধরা পড়ে, তাহা হইলেত আর বাঁচিবার আশা নাই! মাথা মুড়াইয়া গোঁফ ফেলিয়া সে চেহারাটা বিগড়াইয়া দিতে পারে কিন্তু কানের জড়ুল চিহ্নটা সে যে যাইবার নহে, কাণটা কি সে কাটিয়া ফেলিবে! কি সর্ব্বনাশ. কমলা যদি জানিতে পারে—বিনয় আর ভাবিতে পারিল না, তাহার প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল যেন তাহার পশ্চাতে ডিটেকটিভ ঘুরিতেছে, এখনি ধরিবে, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। সে মনের আবেগে চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

তারানাথ বিনয়ের হস্ত ধরিয়া বলিল, "কিহে ডাক্তার, হঠাৎ দাঁড়ালে যে?"

বিনয় একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "দেখছিলুম ষ্টেসনের কাছে এসেছি কিনা।"

"কেন?"

"একটা পানি পাঁড়ে ডেকে একটু জল খেতে হবে।"

"হ্যাঁ ভাই আমারও বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

এই সময় নিবারণ তাহার মুখ হইতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বেঞ্চেতে একটি মুষ্টাঘাত করিয়া কহিল, "ডিটেকটিভ আমি ঠিক হতে পারব, ভায়া যদি একটু help কর?"

খবরের কাগজ হইতে চসমা সংযুক্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া নিবারণের মুখের পানে চাহিয়া উমেশ গম্ভির ভাবে কহিল "কি help করব বল?"

"কি করে ধরব সেই উপায়টা বলে দিতে হবে।"

উমেশ একগাল হাসিয়া বলিল, "সে খুব সহজ, হাতে T. N. C. মার্কা আর

কানে জড়ুল মার্কা লোক দেখবে আর ঝাপটে ধরবে, তারপর পুলিস পুলিস বলে চ্যাঁচাবে—ব্যস।"

নিবারণ একটু বিমর্ষভাবে কহিল, "হ'ল না দাদা হলনা, দেখতে পেলে যে কি করে ধরতে হয় তা আমার জানা আছে, তবে দেখতে পাই কি করে সেইটে বলে দিতে হবে।"

উমেশ চক্ষু হইতে চশমা খানি নামাইয়া ধীরে ধীরে কহিল "তবেত ভাই আমাকে জানের বাড়ী যেতে হয় দেখচি।"

এতক্ষণ বিনয় ও তারানাথ স্তব্ধ হইয়াছিল কাহারও কথা কহিবার সাহস হয় নাই, এইবার তারানাথ অস্ফুট স্বরে কহিল "শুনচ ডাক্তার ব্যাটারা কি বলে।"

বিনয় মৃদুস্বরে কহিল "চুপ কর, ডাক্তার ডাক্তার কর না, নাম বদলে ফেল, আমার নাম কিরণ, তোমার নাম কানাই বুঝলে, মনে থাকবে ?"

তারানাথ একটি হুঁ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নিমাই এতক্ষণ আফিমের মৌতাতে ঝিমাইতেছিল, এইবার সে চখের পরদা তুলিয়া নিবারণকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "ভেবনা নিবারণ ভায়া, আমি তোমায় একটা উপায় ক'রে দেব।"

নিবারণ এক মুখ হাসিয়া বলিল "খুড়া না হ'লে কি মৎলব দিতে পারে, কালাচাঁদের পিরিতে পড়ে খুড়ার বুদ্ধিটা কিন্তু বেশ পেকে গেছে, বলত খুড়া করতে হবে কি ?"

রোসো বাবা, বুদ্ধির গোড়ায় আগে একটু ধোঁয়া দিয়ে নিই, বলিয়া নিমাই একটি সিগার ধরাইয়া এক টান টানিয়া বলিল "দেখ বাবা, এতে কিছু খরচ আছে, তবে এক'শ টাকা পাবে, না হয় দু'টাকা খরচই করলে ?"

নিবারণ জোরের সহিত হাসিয়া বলিল, "নিশ্চই করব।"

"তবে কাল সকালে একশখানি পোষ্টকার্ড কিনে নিয়ে আমার বাড়ী যাবে, সেখানে আমার টাইপ রাইটিং মেসিন আছে, পোষ্টকার্ডগুলি প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেসনের ষ্টেশন মাষ্টারের নামে পাঠাতে হবে, আর তাতে লেখা থাকবে যে, ষ্টেসনে গাড়ী থাম্‌লেই একবার পরীক্ষা করিবে যে, সে ট্রেণে হাতে T. N. C. ও কাণে জড়ুল মার্কা লোক আছে কিনা, যদি থাকে তা হ'লে তাদের ধরে রেখে তোমায় টেলিগ্রাম করবে। তাহলেই তোমার কাজ মিটে যাবে, কি বল ?"

"ঠিক বলেছ খুড়ো," বলিয়া নিবারণ লাফাইয়া উঠিল।" নিমাই গম্ভীরভাবে

বলিল "আমরা যে ভুক্তভুগি সব জানি, বাপমার বাক্স প্যাঁড়া ভেঙে টাকা কড়ি নিয়ে প্রথমেই কলকাতায় আসতে হয়, সেখানে কয়েক দিন নবাবি করে কাশী, গয়া, আগ্রা, বৃন্দাবন, দিল্লী, লাহোর ঘুরে বেড়াতে হয়, তার পর সব টাকা নিঃশেষ হ'য়ে গেলে "পুনর্মুসীকো ভব।"

তারানাথ ভাঙা গলায় মৃদুস্বরে কহিল ডাক্তার যদি বেটারা—

বিনয় মৃদু অথচ রুক্ষস্বরে কহিল "আবার"।

"হ্যাঁ হ্যাঁ কিরণ, যদি বেটারা কোষ্টকার্ড ছাপায় তাহলে কি হবে?"

"তা হলে তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা!"

"আমার বড় ভয় করচে ডাক্তার!"

"আবার ডাক্তার!"

"না কিরণ।"

"তুমি সব মাটি করবে দেখচি, নামটা মনে মনে মুখস্ত কর! তোমার ভয় করচে, আমার কি আর করচে না, কি করা যাবে বল?"

"মাগীটাকে ট্রেণে ছেড়ে দিয়ে, আমরা এস দুজনে এক জায়গায় নেমে পড়ি। মাগীটা শুদ্ধ আমরা ধরা পড়লে আরও মুস্কিল হবে।"

"তা আর আমি বুঝি না, তবে ওকে এতদূর যখন আনা হ'য়েছে এখন আর ছাড়া যেতে পারে না।"

"তবে তুমি যাও, আমি বাড়ীতে ফিরে যাই!"

বিনয় তারানাথের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "আমি বলচি কোন ভয় নেই, বেটারা যদি ষ্টেসন মাষ্টারদের পোষ্টকার্ড পাঠায়, তাহলে কি তুমি মনে কর তারা গাড়ী থামিয়ে মানুষ চেক্ করবে,—বয়ে গিয়েছে তাদের। কাশীতেত আগে যাওয়া যাক, তার পর যা ভাল হয় তাই করা করা যাবে। এখন এত উতলা হবার দরকার নেই।"

বিনয় সাহসে ভর করিয়া অনেক কথা কহিল বটে; কিন্তু তাহার প্রাণটা তখনও পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় ছটফট্ করিতেছিল।

এই সময় ট্রেণখানি বর্দ্ধমানে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোক কয়টী তাহাদের তল্পি তল্পা লইয়া নামিয়া গেল। বিনয় ও তারানাথের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

পর দিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় ট্রেণ আসিয়া রাজঘাটে পৌছিল, সম্মুখে অর্দ্ধোদয় যোগ। যাত্রীর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছিল। বিনয় দ্বিগুণ মূল্যে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া কমলা, মাণিক ও তারানাথকে লইয়া তুমুল

জনতার ভিতর দিয়া বাঙালি টোলায় প্রবেশ করিয়া খালি বাটীর সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না, যে সমস্ত বাড়ী খালি ছিল, তাহা পূর্ব্বেই দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে ভাড়া হইয়া গিয়াছে। অবশেষে দশশ্বমেধের ঘাটে আসিয়া একটি ত্রিতল বাটীর উপরের দুইটি কক্ষ ভাড়া মিলিল, বাড়ীটি যাত্রীতে পরিপূর্ণ। সে দিন আহারাদি সারিতেই বেলা একটা বাজিয়া গেল। বিনয় কমলাকে বুঝাইল আজ সকলেই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, রাত্রিটা একটু বিশ্রাম করিয়া পর দিন প্রভাতে উঠিয়াই সে কমলাকে লইয়া হাঁসপাতালে যাইবে। কমলাও তাহাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত রহিল।

সন্ধ্যা সমাগমে যখন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন কে জানে কাহার আহ্বানে সমগ্র যাত্রি সেই দিকে ছুটিল, সে কি মহা আকর্ষণ! কি গভীর আহ্বান!

কমলা গলায় অঞ্চল দিয়া যুক্ত করে সেই ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কমলা মানিককে ক্রোড়ে লইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে, সে ভাবনার কূল নাই, কিনারা নাই, কখন প্রভাত হইবে, কখন সে হরিপদকে দেখিতে পাইবে। অপর কক্ষে বিনয় ও তারানাথ এক খানি কম্বলের উপর বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে, সম্মুখে একটি বাতি জ্বলিতেছে। এমন সময় বেনারাস পুলিশের রাইটার কনষ্টেবল বেনয়ারিলাল মস্ মস্ শব্দে বিনয় ও তারানাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে এক জন কনষ্টেবল, তাহার এক হস্তে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন অপর হস্তে দোয়াত কলম ও এক বাণ্ডিল কাগজ। সহসা পুলিসের uniform পরা কনষ্টেবল দ্বয়কে দেখিয়া বিনয় ও তারানাথ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, প্রাণের একটা অব্যক্ত বেদনা যেন মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল, তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, উহারা তেমনি করিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল।

বেনোয়ারিলাল উহাদের অবস্থা দেখিয়া কহিল "মহাশয় আমরা পুলিশের লোক বটে, কিন্তু বাঘও নই ভাল্লুকও নই, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনারা আমার গোটা দুচ্চার কথার উত্তর দিয়ে এখন সচ্ছন্দে ঘুমুন।"

বিনয় তখন শুইয়া কাঁপিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল হায় হায়, কেন সে মরিবার জন্য কাশীতে আসিল, কেন সে কমলার জন্য পাগল হইয়া উঠিল,

কেন সে নবীন মণ্ডলকে ডুবাইয়া মারিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিণ্ বিণ্ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। সে যেন তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখে ফাঁসি কাষ্ঠের রজ্জু দোদুল্যমান দেখিতে পাইল। তাহার মুখ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না।

তারানাথ সাহসে ভর করিয়া কহিল "মহাশয় আপনার কি চাই বলুন।"

বেনোয়ারিলাল কনষ্টেবলের হস্ত হইতে কয়েক খানা কাগজ ও কলমটা লইয়া কহিল "আপনারা কি এ বাসায় আজ এসেছেন?"

তারানাথ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাদের নাম, পিতার নাম ও নিবাস কোথায়?"

তারানাথ মহাবিপদে পড়িল, কি যে বলিবে, তাহার বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠিতেছিল না, বিনয়ের গা টিপিল কিন্তু কোন ফল হইল না—সে যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মড়ার মত কাট হইয়া পড়িয়া ছিল।

তারানাথকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বেনোয়ারিলাল রুক্ষ স্বরে কহিল "দেরি করেন কেন, আপনারা কি আপনাদের নাম জানেন না—শিগ্‌গির বলে ফেলুন, আমার এখন অনেক যায়গা ঘুরতে হবে।"

তারানাথ বিনিত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে সে জন্যে নয়, তবে এত কথা জিজ্ঞাসা করচেন কেন জানতে পারি কি?"

অবশ্য, বলিয়া বেনোয়ারিলাল কহিল—"প্রত্যেক যাত্রির সঠিক সংবাদ রাখবার জন্যে পুলিশের উপর হুকুম হয়েচে, [যদি কোন যাত্রি মরে যায় তার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাবার সুবিধা হবে, যদি কোন চুরি চামারি হয়, তাহলে ধরবার সুবিধা হবে, এই রকম নানা কারণ?"

তারানাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমার নাম তারানাথ রায় চৌধুরী, আমার পিতার নাম কালীশঙ্কর রায় চৌধুরী, আমার বন্ধুর নাম বিনয় কুমার সরকার, বন্ধুর পিতার নাম ৺হরিশচন্দ্র সরকার। নিবাস বিলাসপুর।"

বিনয় এতক্ষণ নিঃশব্দে মড়ার মত পড়িয়াছিল, তারানাথের কথা কটা যেন তাহার কর্ণে অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, সে সহসা উঠিয়া বসিল কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে ভাবিল কি সর্ব্বনাশ! এত ভুল, আমার নাম কিরণ ওর নাম কানাই এরি মধ্যে ভুলিয়া গেল, ছি-ছি!

বেনোয়ারিলাল কহিল "এখানে ক'দিন থাকবেন, তারপর কোথায় যাবেন; আপনাদের বয়স কত?"

তারানাথ কিছু না ভাবিয়া বলিয়া দিল "এখানে তিন দিন থাকৃব, তারপর এলাহাবাদ যাব। আমার বয়স কুড়ি, বন্ধুর বয়স বাইস।"

"সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক আছেন কি?"

"আছেন"

"বলুন কি নাম, বয়স কত, আপনাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ?"

তারানাথ মহা ফাঁপরে পড়িল, কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বিনয়ের দিকে চাহিল, বিনয় সে চাহনীর অর্থ বুঝিল, সে বলিল "স্ত্রীলোকটী আমার স্ত্রী, বয়স ষোল—নাম উর্ম্মিলা।"

বেনোয়ারিলাল form fillup করিয়া চলিয়া গেল।

বিনয় তাড়াতাড়ী উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। পরে তারানাথের হাত ধরিয়া একেবারে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া কহিল "তোমার সঙ্গে যে এক বাসায় থাকৃবে সে ছোট লোক!"

তারানাথ বিনীত ভাবে কহিল "কেন ভাই কি হয়েছে?"

বিনয় চাপাগলায় "কহিল, কি হয়েছে, সর্ব্বনাশ করেছ! কালই আমাদের হাতে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে। নামটা পর্য্যন্ত মনে রাখ্‌তে পারলে না, তোমার নাম কানাই, আমার নাম কিরণ!"

"ভুলে গেছি ভাই কি করব, তুমিও তো কোন কথা কইলে না।"

"এমন কি ভুল, তারপর কিনা বাপের নাম বাড়ীর ঠিকানা সব বলে ফেল্লে—এখন উপায়?"

"মিথ্যে কথাগুলো চট্ করে মনে এলনা ভাই, প্রাণে একটা বড় ভয়ও হয়েছিল, তাই এমন হয়ে গেছে। এখন যা হয় একটা উপায় কর।"

"উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু।" বলিয়া বিনয় গম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

তারানাথের অনেক সাধ্য সাধনায় বিনয় কহিল "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

তারপর উভয়ে ফিস্ ফিস্ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি একটা পরামর্শ আঁটিল, কমলা তার কিছুই জানিল না।

পরদিন প্রভাতে বিনয় ও তারানাথকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না, একাকিনী কমলা মাণিককে লইয়া সেই সাগর তরঙ্গের ন্যায় জনতার মাঝে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

সংস্কার ছেদ

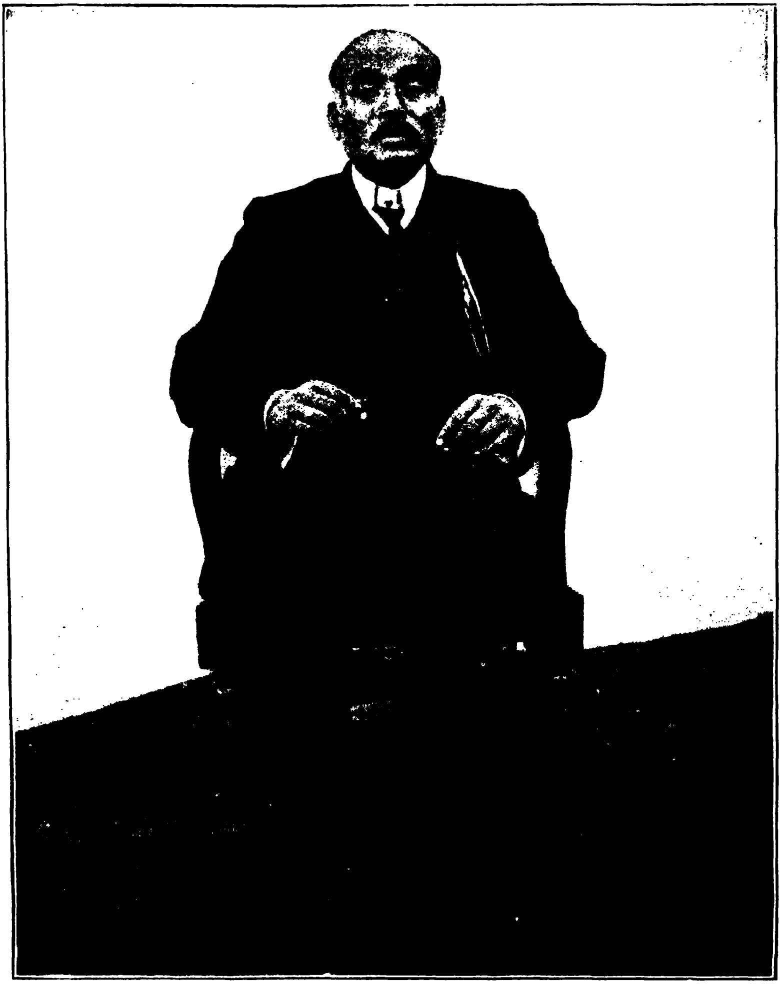
ক্রমে ক্রমে উপেন্দ্র আরোগ্য হইতে লাগিল। এই সময় সুরেন্দ্রের এক পত্র পাইলাম তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"যোগীন্দ্র! আমি শীঘ্র বনগাঁয় যাইব; এক দিনের জন্য গোবরডাঙ্গায়ও যাইতে পারি, যদি তুমি বাড়ী এস দেখা হইবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনের আগেই আমি গোবরডাঙ্গায় গেলাম, সুরেন্দ্রও আসিল, কথায় বার্ত্তায় সে দিন যেন শীঘ্র শীঘ্র কাটিয়া গেল। তার মধ্যে বনগ্রামের ডাক্তার হরিচরণ সিংহের কথা হইল; হরি, সুরেন্দ্রের বন্ধু, এক সঙ্গে ডাক্তারী পড়া। কথা হইল আমি বনগায় গিয়া হরির সঙ্গে আলাপ করিব।

পর দিন সুরেন্দ্রের সঙ্গে বনগ্রামে ডাক্তার হরিচরণ সিংহের বাড়ি গেলাম। হরির সঙ্গে কি এমন কথা হইল, কিন্তু কি রকম একটা সরলতার ভাব খেলিতে লাগিল, মনে হইল, হরি যেন কতদিনের পরিচিত। ঠিক যেন ভায়ের মত।

আহারের সময় হইল; হরির মা আমাদের তিন জনকে একত্রে ভাত দিলেন। আমরা পরমানন্দে আহার করিলাম। আমি বোধ হয় ইতি পূর্ব্বে আর কখন ভিন্ন জাতির অন্ন খাই নাই। যেমন এই সময় আমার মনে জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল, তেমন আজ এই প্রথম দিন, সেই বিশ্বাস অনুরূপ কাজ করিয়া একটা আন্তরিক প্রফুল্লতা, মনের মুক্তভাব এবং স্বচ্ছ আনন্দ পাইলাম। এ কেবল জাত ভাঙা নয়, এ যে সরল প্রাণের মিলন। বহু দিনের বদ্ধ প্রাণ আজ যেন মুক্তভাবে পথ পাইল। চির সংস্কারের ছেদন হইল। এই দিন হইতে বুঝিলাম জ্ঞানের বিষয় কেবল মনের কল্পনায় থাকিলে কতটুকু আনন্দ! সে জ্ঞানের সার্থকতা কি! কিন্তু জ্ঞান যদি কার্য্যে পরিণত করা যায় তবে তাহাতে কতই আনন্দ! আরো বুঝিলাম একই গ্রাম, একই দেশবাসিকে এই জাতিভেদের আবরণে ভেদভাবে ও তাহার ফলে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। সুখের বিষয়, ২৭ বৎসর পূর্ব্বের আমার এই কথিত বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা-এ সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। ঈশ্বর-কৃপায় যে সত্যটি প্রত্যক্ষ করিয়া, এই দিনে যাহাতে জীবন সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলাম, আজ তাহা জন সমাজের বক্ষে প্রসার লাভ করিতেছে।



ডাক্তার হরিচরণ সিংহ।

New Artistic Press, Calcutta.

জাতিভেদের বন্ধন ক্রমেই শিথিল দেখা যাইতেছে। তবে আমি এখানে এ কথাও বলিতে চাই যে, কেবল ছোঁয়া, খাওয়ার ভেদ ত্যাগ করিলেই জাতিভেদ ত্যাগ করা হয় না। মানবের সঙ্গে মানবের যে অভেদ ভাব সেইটিই ইহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক জ্ঞান ও প্রেমের প্রকাশে যেমন আন্তরিক কোন ভেদ বুদ্ধি থাকিতে পারে না, তদ্রূপ বাহিরেও ভেদ সংস্কার থাকিতে পারে না; এক করা, এক ভাবা জ্ঞান, প্রেমের স্বভাব।

বনগ্রামে হরির বাড়িতে সে দিন অতি আনন্দে কাটিয়াছিল। ঐ দিনের ভাব আমার হৃদয়ে চির দিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

এখানে ডাক্তার হরিচরণ সিংহের একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না!

বাবু হরিচরণ সিংহ, ১২৬৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বনগ্রামের বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র সিংহ। ইহাঁরা পূর্ব্ব হইতে বনগ্রামে ব্যবসায় কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, অদ্যাপি "বনগাঁর সিঙ্গীরদের দোকান" বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বাবু হরিচরণ সিংহ বাল্য-কালে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়া তথা হইতে এন্‌ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পড়িয়া ১৮৮৩ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে প্রায় ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের ডাক্তার হইয়া কার্য্য করেন এবং বনগ্রামে ডিস্‌পেন্‌সারী করিয়া কয়েক বৎসর প্রাকৃটিস করেন। তৎপরে ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় মুঙ্গের জেলায় কিছু দিন কার্য্য করিয়া সম্প্রতি দিনাজপুর সিতাবগঞ্জে রায় সিতাবচাঁদ নাহর বাহাদুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ভেটারনরি ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়াছেন।

বাবু হরিচরণ সিংহ নিতান্ত শান্ত প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি, তাঁহার মধ্যে অন্যান্য গুণের সহিত সরল ভাবটি অত্যন্ত মিষ্টরূপে প্রকাশিত। তিনি আমা অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সকল রকমে শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি আমার নিকট এমন একটি বিনীত সারল্য ভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন যে, চির দিন আমি তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভায়ের মত জ্ঞান করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখানে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার একখানি চিত্রও প্রদত্ত হইল।

মৃত্যু

—০—

তোমারে স্মরিয়া আমি কেন পাই ভয়
তুমি কি তাঁহার নহ দান স্নেহময় ?
যবে আমি শোক তাপ, বিয়োগ ব্যথায়,
আকুল হইয়া যাচি তোমার আশ্রয়
তুমি কি সান্তনা মোরে কর নাক দান ?
মহা সাগরের পারে কুল দীপ্তমান
তুমি যে দেখাও মোরে অঙ্গুলী সঙ্কেতে,
আনি দাও স্বরগের বারতা মরতে,
আমার বিষাক্ত বক্ষে কর বহমান
মলয় হিল্লোল মৃদু, শুনাও সে গান।
যারা গো অকালে ছাড়ি চলে গেছে মোরে
এ সসীম কারা ত্যজি অসীমের পারে,
মিলন বারতা নব তুমি দাও আনি।
হে মৃত্যু, সে আনন্দের তুমিত শরণী !

শ্রীসুকুমারী দেবী

য়্যাসিওরেন্স কোং

আজকাল জীবন বিমার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া, প্রায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জীবন বিমা করিতেছেন। সুতরাং দিন দিন নূতন নূতন লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোংর সৃষ্টি হইতে দেখা যাইতেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আবার কোন কোন কোম্পানির অন্তর্দ্ধানও ঘটিতে দেখা যাইতেছে। আমরা কয়েকটী কোম্পানির অসত্যতার পরিচয়ও পাইয়াছি ; এজন্য সাধারণ ভাবে সকলকে সতর্ক করিতেছি। যেন, বিশেষ জানিয়া শুনিয়া যে সকল বিখ্যাত কোম্পানি, যাঁহাদের কার্য্যের পরিচয় ভাল, তাহাতে বিমা করা হয়। আমরা সম্প্রতি হাওড়ার "বেঙ্গল য়্যাসিওরেন্স কোং'র কার্য্য প্রণালীর পরিচয় পাইয়া ভালই মনে করিয়াছি।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গোবরডাঙ্গার জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সাবেক বাড়ির অংশ পরিত্যাগ করিয়া যমুনা-তীরবর্ত্তী ফেয়ারিহলের ভূমিতে নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। আমরা বিশস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, ইছাপুরের বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুর্গাদাস বাবু এ কার্য্যে অভিজ্ঞ অথচ স্থানীয় ব্যক্তি, সুতরাং ইহা ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিছু দিন গত হইল, গোবরডাঙ্গার প্রবীন ডাক্তার বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সহসা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন সংশয় অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় তিনি আবার পুনঃ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমরা ঈশ্বর সন্নিধানে কামনা করি, তিনি আরো দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বিগুমান থাকুন।

খাঁটুরার স্বর্গীয় রামগোপাল রক্ষিত মহাশয়, তাঁহার জীবিতকালে গোবরডাঙ্গা ষ্টেশণ সন্নিহিত স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সে কার্য্য স্থায়ী ভাবে চলিবার জন্য কোন সুব্যবস্থা না করায়, তাঁহার অবর্ত্তমানে সে কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। ইতি পূর্ব্বে তৎপার্শ্বে স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়, আর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করায় এই জনহিতকর কার্য্যটি একেবারে বন্ধ হইতে পারে তাই। সম্প্রতি ঐ রামগোপাল-দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুন্দর সুদৃশ্য উদ্যান-বাটিকা হইতে গৈপুর নিবাসী হোমিওপ্যাথিক প্রাক্‌টিসনার বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও গরীবদিগকে ঔষধ প্রদান করিতেছেন। স্বর্গীয় রামগোপাল বাবুর পুত্র শ্রীমান হরিনারায়ণ বাবু এক্ষণে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি চিহ্ন ও তাঁহার হৃদগত শুভ ইচ্ছাটি বজায় করিবার জন্য চেষ্টা করিলে বড় ভাল হয়। আমরা জানি জ্ঞানেন্দ্র বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অনেক কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম নহে। সুতরাং তিনি যাহাতে এই স্থানে স্থায়ী ভাবে বসিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিলে বোধ হয় উভয় পক্ষেরই সুবিধা হইতে পারে।

গৈপুর গ্রাম হইতে গোবরডাঙ্গা ষ্টেসনে আসিতে যে পাকা রাস্তা আছে, তাহার সম্মুখের বাকী রাস্তাটুকুর জন্য মিউনিসিপালিটী জমি খরিদ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ রাস্তা আজো হয় নাই; আমরা আশা করি গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য ভাইসচেয়ার ম্যান ডাক্তার সুরেশ বাবুর উদ্‌যোগে রাস্তাটুকু প্রস্তুত হইতে আর বিলম্ব হইবে না।

ইছাপুর গ্রামে মধ্যে মধ্যে বাঘ আসার কথা শুনা যায়। ঈশ্বর-কৃপায় গৈপুর গ্রামখানি আজো তদ্রূপ হয় নাই; তবে মিত্র পাড়ার পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড জঙ্গল ক্রমেই বাড়িতেছে; এখন হইতে গ্রামবাসীগণ উদ্‌যোগী হইয়া হইয়া মিউনিসিপালিটির যোগে অথবা নিজেরাই ঐ জঙ্গল কাটাইবার চেষ্টা করিলে হয় না কি?

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, যথা,—১। মহারাণা প্রতাপসিংহ, ২। রাধা, ৩। ধ্রুব, ৪। রত্নাকর, ৫। গার্গী, ৬। ফুল ও মুকুল। কিন্তু সময় ও স্থানাভাবে সকলগুলির সমালোচনা করা সম্ভবপর হইল না, তবে "গার্গী" পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। বয়স্থা কন্যাগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব কেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয় ইহাতে তাহার একটী সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজে এই আদর্শের অভাব দেখা যায়। শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মভাব গঠিত না হইলে সম্যক শিক্ষার ফল হয় না। আমরা অসঙ্কোচে অভিভাবকদিগকে অনুরোধ করিতে পারি যে, নিজ নিজ কন্যাগণের হাতে এক এক খানি "গার্গী" প্রদান করুন।

প্রাপ্তিস্থান বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও মজুমদার লাইব্রেরী, কলিকাতা।

মূল্য ১০ আনা মাত্র।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১ নং রামকিষণ দাসের লেন,
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

পঞ্চম বর্ষ] মাঘ, ১৩[illegible] [১০ম সংখ্যা

কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

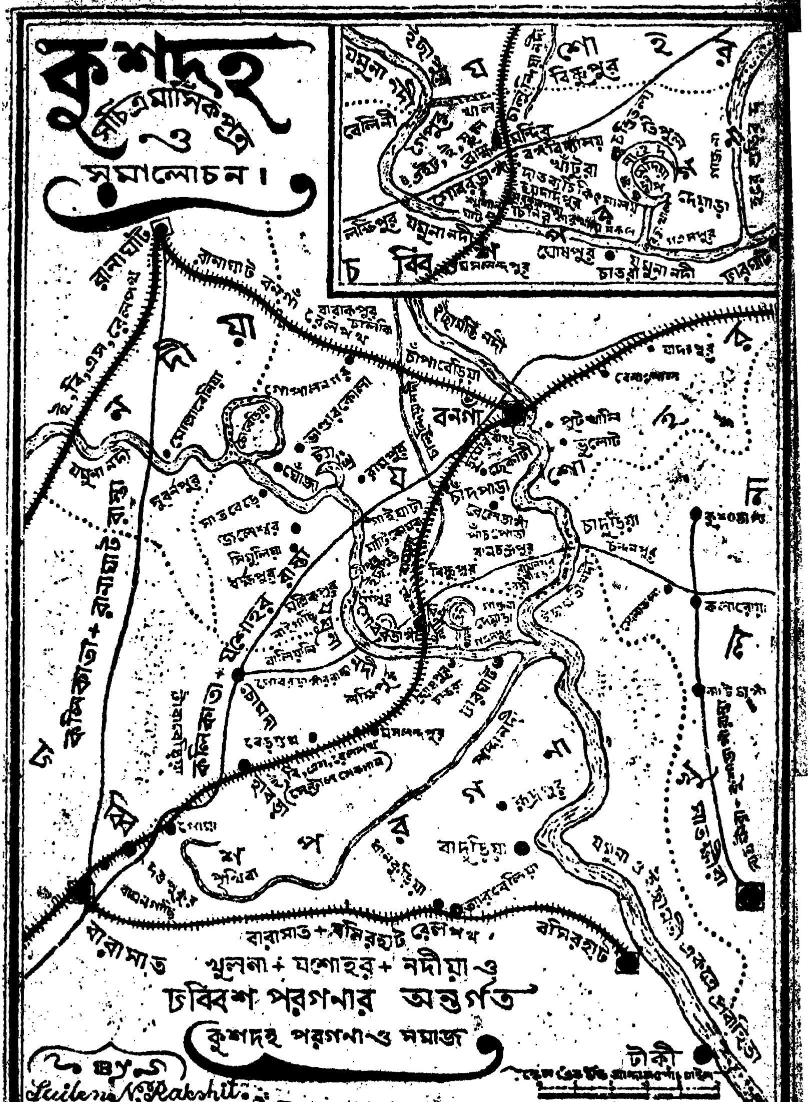
দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত

কার্য্যালয় :—

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক টাকা এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা

কুশদহ-মানচিত্র


কুশদহ
সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।
বনগাঁ
বারাসাত + বসিরহাট রেলপথ
বসিরহাট
বারাসাত
খুলনা + যশোহর + নদীয়া ও
চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত
কুশদহ পরগনা ও সমাজ
টাকী

Theistic and Vedantic works

BY

Pandit Sitanath Tattvabhushan.

1. **The Philosophy of Brahmaism**—Expounded with reference to its History : Being twelve lectures on Brahma doctrine, sadhans and social ideas. Rs. 2-8.

2. **The Vedanta and its Relation to Modern Thought:**—Twelve lectures on all aspects of the Vedantic religion and philosophy. Rs. 2-4.

3. **Krishna and the Gita :**—Twelve lectures the authorship, philosophy and religion of the **Bhagawadgita.** Rs. 2-8.

Opinions.

The Bengali :—No fitter man than Pandit Sitanath Tattvabhushan could be found to fill the office (Vedanta Lectureship) and the manner in which he has acquitted himself justifies popular expectation.

৩। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রমাণ ও ব্যাখ্যা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ১৲ এক টাকা।

৪। উপনিষদ্—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, এই নয়খানা প্রধান উপনিষদ্ সরল সংস্কৃত টীকা, অবিকল বঙ্গানুবাদ ও অনুক্রমণিকা সহ। টীকা ও অনুবাদ স্বর্গীয় বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমি কর্ত্তৃক সংশোধিত। কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

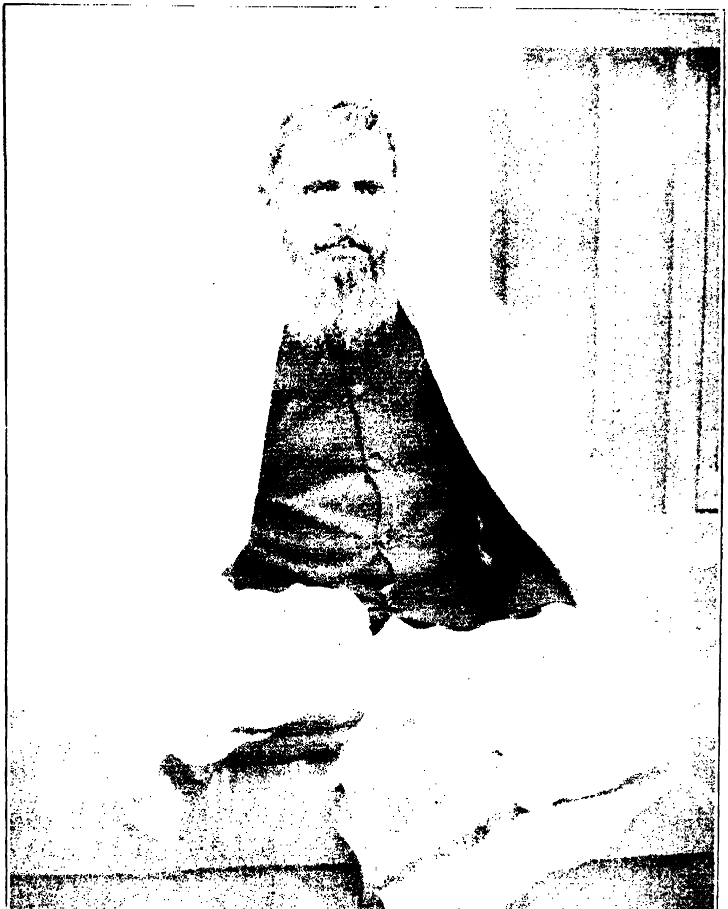
নব্যভারত—"শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করিয়া সীতানাথ বাবু অতি সুখবোধ্য 'শঙ্করকৃপা' নামে একটী নূতন টীকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা অনুবাদ যথাযথ এবং এমন সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে যাঁহারা কিছুমাত্র সংস্কৃত না জানেন তাঁহারাও উপনিষদের মতামত সহজে বুঝিতে পারিবেন।"

All these are to be had of the author at 210/3/2, Cornwallis Street, Calcutta. For his other works, please call for a list.

সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কুশদহ।



স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"প্রভু-পদ সেবা সম আর কি সুখ আছে রে—"

পঞ্চম বর্ষ | মাঘ, ১৩২০ সাল | দশম সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের একটি আন্দোলন চলিয়াছে। বোলপুর শান্তি-নিকেতনে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে নাকি অধিকাংশ লোকে দুঃখিত হইয়াছেন; অন্তত কয়েকখানা বাংলা সংবাদ-পত্রে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যাঁহাদের যেমন বিভিন্ন অভিমত ও ভাব, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কথার সেইরূপই অর্থ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব হইতে রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যাঁহারা নানাপ্রকার ব্যঙ্গ ও শ্লেষ উক্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধেও তাঁহাদের লেখা পাঠ করিলে রবীন্দ্রবাবুর প্রতি জনসাধারণের ভাব ভালো থাকে না।

আমরা রবীন্দ্রনাথের গোঁড়া নহি, তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহাও আমরা জানি, তাঁহার ভাব-স্বভাবও আমরা অবগত আছি; অন্তত সত্যের অনুরোধে নিতান্ত দুঃখিতভাবে তাই আমরা এই কয়েকটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই, "আজ আপনারা আমাকে যে দেশব্যাপী সম্মান দান করিতেছেন, তাহা আমার প্রাপ্য নহে, আমি

দেশনায়ক নেতাও নহি, আমি কবি, কবি এক রকম পাখীর জাতি, সে তাহার গান আপন মনেই করে, ভাল মন্দ বিচার করে না; তাহার গান যে সকলেরই সমানভাবে ভাল লাগে তাহাও নহে, ইত্যাদি ইত্যাদি, অতএব এ সম্মান আমার পক্ষে অভিমানের বিষয়, আমি ইহা কেমন করিয়া অন্তরে গ্রহণ করিব?" ইত্যাদি—

এ তো তাঁহার ঠিক কথা, তিনি বিনীতভাবেই আপন অন্তরের কথা বলিয়াছেন; ইহার অর্থ কি তিনি সকলকে অপমান করিবার জন্য অহঙ্কারীর ন্যায় কথাগুলি বলিয়াছিলেন? তবে এত বিদ্রূপ এত শ্লেষ প্রকাশ করা কেন? এর অর্থ কি কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন?

রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য যাঁহাদের ভালো লাগে না, প্রাণে সহ্য হয় না, তাই সাধ্যানুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করাই কি তাঁহাদের উদ্দেশ্য? কিম্বা আরো কোনো গূঢ় কারণ আছে? অথবা দেশ-বিখ্যাত কোনো বড় লোকের বিরুদ্ধে জোর-কলমের লেখা পড়িয়া সাধারণে আমোদ বোধ করে; কাগজেরও পসার বাড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ প্রচারের যে কি বিষময় ফল, তাহা কি বাংলা কাগজের গণ্য মান্য সম্পাদকগণ স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যাহা মনে আসে তাহাই লিখিয়া যাওয়াই কি সম্পাদকীয় শক্তির সদ্ব্যবহার?

প্রসঙ্গ

প্রমাণ—বহির্জগতেও ঈশ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁহারই নিদর্শন। ফলে ফুলে, বৃক্ষ লতায়, পশু পক্ষী, প্রাণী এবং মানবমণ্ডলী নিয়ত তাঁহার পরিচয় দিতেছে। বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অন্তর্জগতে তাঁহার প্রমাণ আরো স্পষ্ট; মানব-জীবনের নিগূঢ় স্থানে তাঁহার মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেক-কর্ণে মানুষ তাঁহার বাণী শুনিতে পায়; ইহা কল্পনা নহে কিন্তু অতি সত্য। কোটী কোটী নরনারী তাঁহার ডাক শুনিয়া তাঁহারই অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন, অন্তরে অন্তরে তাঁহার নিদর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা ভগবানের উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি আছে?

শান্তি—মুসা ঈশ্বর-সন্নিধানে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, জগতের অধিকাংশ নরনারী এত অসুখী কেন ?" ঈশ্বর বলিলেন, "মুসা, আমি জগতে পাঁচ বস্তু পাঁচ স্থানে রাখিয়াছি, লোকে তাহা সেই সেই স্থানে অন্বেষণ না করিয়া অন্যত্র আকাঙ্ক্ষা করে, তাই তাহা না পাইয়া অসুখী হয়। প্রথম, শান্তিকে আমি একমাত্র ধর্ম্মের মধ্যেই রাখিয়াছি, মানুষ তাহাকে সংসারে অন্বেষণ করে, তাই তাহার সন্ধান পায় না ; দ্বিতীয়, আমি বলকে রাখিয়াছি পুণ্যের মধ্যে, মানুষ তাহাকে খাদ্যের মধ্যে অন্বেষণ করে ; তৃতীয়, জ্ঞানকে রাখিয়াছি ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে, মানুষ তাহাকে পুস্তকের মধ্যে অন্বেষণ করে ; চতুর্থ, আমি তৃপ্তিকে রাখিয়াছি ত্যাগের মধ্যে, মানুষ তাহাকে অন্বেষণ করে ভোগের মধ্যে। পঞ্চম, আমি সৌভাগ্য সম্মানকে রাখিয়াছি সেবার মধ্যে, মানুষ তাহাকে ধন-সম্পদের মধ্যে অন্বেষণ করে, তাই তাহা না পাইয়া অসুখী হয়। মানুষ, ঈশ্বর-বিশ্বাসে, জ্ঞানে, সেবায়, পুণ্যে—এক কথায় ধর্ম্মেই কেবল সুখী হইতে পারে, কিন্তু অন্য কিছুতেই নহে।

হিংসা—মানব-অন্তরে হিংসা এমনই মন্দ ভাব যে, তাহাতে অন্যের আংশিক গুণও স্বীকার করিতে চায় না, তাহার ভালোটুকু দেখিয়া সুখী হইতে পারে না। কেবল দোষের অংশই প্রকাশ করে। হে মানব, হিংসা পরিত্যাগ কর, এ পথে তুমি কোনো দিন সুখী হইতে পারিবে না। এ জগৎ পূর্ণতার স্থান নহে, এখানে সম্পূর্ণতা কোথাও দেখিতে পাইবে না, আলোর সঙ্গে অন্ধকার আছেই, ভালোটুকু দেখিয়াই সুখী হও, নচেৎ অন্য আর পথ নাই।

কৃপায় ভ্রান্তি—সাধন ভজন, দয়া দান, ত্যাগ তপস্যা, প্রভৃতি কোনো পুরুষকার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না ; একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, এ কথা অতি সত্য। জগতের সকল সাধু মহাজন এই কথাই বলিয়া গেলেন ; গৌরাঙ্গচন্দ্র বলিলেন, "সে বস্তু অহেতুকী," কেহ বলিলেন, "ভগবৎ কৃপা," কেহ বলিলেন "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" ইত্যাদি ইত্যাদি ; এমত অবস্থায় সাধকের মনে হইতে পারে "যখন ভগবৎ কৃপা ভিন্ন কিছুতেই ভগবানকে পাওয়া যায় না, তখন ধর্ম্ম-সাধনায় বৃথা কালক্ষেপ করিয়া ফল কি ? অতএব ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সুখ শান্তি এবং মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় তাহারই চেষ্টা

করা কর্ত্তব্য। এরূপ নিরাশার ভাব সাধকের মনে হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সংসার-কামনায় সুখ শান্তি লাভ এবং মনুষ্যত্ব সাধন হইতে পারে না, ঈশ্বর-বিশ্বাস—গভীর ভক্তি নিষ্ঠা ভিন্ন কখনো মনুষ্যত্ব এবং শান্তি লাভ করা যায় না। বিশ্বাস ভক্তি সজীব রাখিতে ও বৃদ্ধি করিতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে পাইবার জন্য, তাঁহার ভজনাতে যে প্রবৃত্তি হয়, সেও তো তাঁহারই কৃপা; ভজনাতেও তো আনন্দ আছে, সে আনন্দ তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কি বলিব? তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায় একথা সত্য হইলেও আমাদের যাহা করিবার,—যাহা দিবার আছে, তাহা না করিয়া, না দিয়া, কৃপার ভিখারীই হইতে পারি না; যাহা করিবার করিয়া, যাহা দিবার দিয়াও কৃপার ভিখারী হইতে হইবে, একদিন না একদিন সে কৃপার উদয় হইবেই। কিছু না করিয়াও কৃপা পাইলেও পাইতে পারি, কিন্তু তাহার কোনো আশা নাই, যেখানে আশা নাই, সেখানে আনন্দও নাই।

প্রত্যাবর্ত্তন—সাধক ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হন, ইহাই বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থা, তাহার পর সাধকের আবার প্রত্যাবর্ত্তন হয়; তবে তাহা দুইভাবে হইতে দেখা যায়। প্রথম, সাধারণত মানুষ ধর্ম্মার্থী হইলেও কোনো না কোনো অভিমান-প্রণোদিত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহার মধ্যে সাধন ভজনের একটি প্রধান অভিমান, অর্থাৎ সাধন ভজন করিয়া ভগবানকে পাইব এই যে একটি ধারণা, ইহার মূলেও যে গূঢ়রূপে অভিমান থাকে তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সেই অভিমানে অলভ্য সর্ব্ববিধ হেতুরহিত পরম বস্তুকে যখন সাধন ভজনেও লাভ করা যায় না, তখন সাধকের মনে একটি নিরাশার ভাব আসে, সাধক তখন আবার পরিত্যক্ত সংসারের অতৃপ্ত বাসনায় গূঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন, অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের কথাও মনে পড়ে; অগঠিতচরিত্র সাধক তখন সেই কর্ত্তব্যপালনই ধর্ম্ম মনে করিয়া ধীরে ধীরে আবার সংসার-মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বিতীয় অবস্থার সাধক, ভগবানের কৃপাতেই তাঁহার কণামাত্র ভাব দর্শন করিয়াই মোহিত হইয়া পড়েন;—অগ্নি অনেক আছে কিন্তু মানুষ তাহার তাপ কতটুকু সহ্য করিতে পারে, মধুও যথেষ্ট আছে কিন্তু পিপাসু কতটুকু তাহা পান করিতে সক্ষম হয়? তদ্রূপ অনন্ত ভগবানের ভাব সাধকের পক্ষে কণামাত্রই যথেষ্ট, তিনি তাহা দান করিয়াই বলেন, "বৎস, দেখিলে তো আমার ভাব, এখন যাও সংসারে তোমার

যে সকল অসমাপ্ত কর্ত্তব্য বাকী আছে, তাহা আমার নামে—আমার ভাবে, আমার সেবার কার্য্য কর। আমার অমুক কার্য্যের ভিতর দিয়া তোমার জীবনে আমার বিশেষ অভিপ্রায় সাধন ও সিদ্ধ কর; তাহাতেই আমার মহিমা আরো বুঝিতে সক্ষম হইবে এবং জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া পরম শান্তি ভোগ করিবে।" প্রথম প্রত্যাবর্ত্তনকে পতন, শেষ প্রত্যাবর্ত্তনকে সৌভাগ্য-মুক্তি বলিতে হইবে।

মৃত্যু-চিন্তা

সেই দিনের কথাটি এখন
　　মাঝে মাঝে ভাবি,
জগৎ ছেড়ে যাব যেদিন
　　পড়ে রবে সবই।
কাজের ভিড় সব থেমে যাবে
　　নীথর হবে দেহ,
তখন আমার মনের ভাবটি
　　জানবে নাকো কেহ।
আমার কাছে "আমি" তখন
　　হ'ব কেমন ধারা,
সেইটি হচ্চে শেষের কথা
　　সকল কথার সেরা।
দীন-দেহটি লুটিয়ে পড়বে
　　যেমন ধরাতলে,
মনটি আমার নীরব হ'য়ে
　　মিশবে ইষ্টমূলে।
মৃত্যু-চিন্তা নাই বা করি
　　সেইটি ভাবতে চাই,
চরম কালে পরম শান্তি
　　ঠিকটি যেন পাই।

সতুর মা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

গৃহের বাহিরে আসিতেই মনে হইল, অন্ধকারে কে যেন সরিয়া গেল। পঙ্কজিনী বিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিন্দী ও বিন্দী, দেখ তো ওপরে কে এয়েচে, মনে হ'ল কে যেন সরে গেল।"

বিন্দুবাসিনীর নয়নে নিদ্রাদেবী তখন অচলা হইয়া বসিয়াছেন, পাঁচ সাত ডাকেও তাহার সাড়া মিলিল না, সে যেমন ছিল—বৃহৎ লেপের তলে তেমনি আপাদমস্তক আবৃত হইয়া পড়িয়া রহিল ; কর্ত্রীঠাকুরাণীর ডাকাডাকি ঠেলা-ঠেলিতেও তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। নাসিকা-ধ্বনি না থাকিলে, সে জীবিত কি মৃত তাহাও বুঝি জানিবার উপায় ছিল না।

বিন্দু যখন উঠিল না, পঙ্কজিনী নিজেই সাহসে ভর করিয়া আলো হাতে লইয়া ঘর-বাহিরের চতুর্দ্দিকে একবার দেখিয়া লইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ; কাহারও কথার শব্দ শুনিলেন না, কেবল যেদিকে যান তাহার বিপরীত দিকে যেন পদশব্দ,—শেষে মনে হইল সে শব্দ সিঁড়ির দিকে গেল। কে যেন দ্রুত অথচ সতর্কতার সহিত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। পঙ্কজিনী একা দ্বিতলে নামিতে সাহস না করিয়া ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কেমন একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল।

পরদিনও ঠিক ঐরূপ মনে হইল, কিন্তু লোক দেখিতে পাওয়া গেল না। প্রভাতে সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। রাত্রে বিন্দুকে ডাকিয়া পঙ্কজিনী বলিয়াছিলেন—"আজ একটু সজাগ থাকবি ডাকলে উঠে আমার সঙ্গে চারিদিক দেখবি, একলা আমার ভয় করে।" বিন্দু উত্তর করিল—"কেন মা আমি তো সজাগই থাকি, তুমি ডাকলেই উঠি, চুপি চুপি ডাকলে কি ঘুমন্ত মানুষ শুনতে পায় ?"

পঙ্কজিনী অপেক্ষাকৃত রুষ্টস্বরে বলিলেন—"চুপি চুপি ডাকি বৈকি, ওকে বলে সজাগ ঘুম ! পোড়ারমুখী যেন মরে ঘুমোয়।"

বিন্দু বলিল—"না গো না, আজ খুব সজাগ থাকব, একটু জোরে ডেকো।"

পঙ্কজিনী বলিলেন—"শুধু জোরে ডাকা নয়, ঘুম না ভাংলে আজ তোর পিটে ঠেঙা লাঠি ভেঙে ওঠাবো।"

বিন্দু সেদিন সজাগ হইয়া রহিল। গৃহিণী নিদ্রাহীন-চক্ষে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কিন্তু সে রাত্রে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না; ত্রিতলের কোনও স্থানে কাহারও আগমন অনুভূত হইল না। পরদিনও সেইরূপ একবার একটু সন্দেহ হইয়াছিল কিন্তু সে কিছু নয়। আলো হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিন্দু বিরক্ত হইয়া স্বস্থানে আসিয়া শয়ন করিল।

দুই একদিন ছাড়া প্রায় প্রত্যহই এইরূপ মনে হইতে লাগিল, কিন্তু অনুসন্ধানে কোনো ফল হইল না। গৃহিণীর কথা অনুসারে দুই চারিদিন বিন্দু তাঁহার সহিত জাগিয়া বসিয়া রাত কাটাইল, তারপর আর বড় ও বিষয়ে মন দিল না। স্বয়ং কর্ত্তা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ও কিছু নয় গো। কিছু নয়, তা নইলে কেউ কিছু দেখে না শোনে না, তুমিই কেবল পাও, রাত জেগে জেগে তোমার ও একটা বাই হয়েছে, বল্লুম পারবে না, তোমার অত কষ্ট সহ্য হবে না, একজন নর্স রেখে দিই, তাও তো দিলে না, ছেলের শুশ্রূষার ভার আর কারও হাতে দিয়েও তো বিশ্বাস নেই।"

গৃহিণী বলিলেন,—"না গো না ঠাট্টা নয়, সত্যিই শুনতে পাই, কাকেও দেখতে পাই নে, কিন্তু মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পাই, কে যেন সরে গেল মনে হয়, আচ্ছা তুমি এই ঘরেই থেকো—আমার যখন সন্দেহ হবে তোমাকেও শোনাব।"

কর্ত্তা একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া নীরব রহিলেন, পঙ্কজিনী চিন্তিত মনে ছেলের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

পূর্ণিমার রাত্রি—গভীর নিশীথ। ঘর দ্বার ছাদ প্রাঙ্গণ বিমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত,—ধীরে ধীরে শীতের শীতল বায়ু প্রবাহিত,—সুবৃহৎ মজুমদার-ভবন নীরব নিস্তব্ধ,—অন্দর-বাহিরে সকলে গভীর নিদ্রায় অচেতন। ছাদের সম্মুখে বারান্দার দিকের বড় ঘরে পালঙ্কের উপর সুকোমল শয্যায় রোগক্লিষ্ট রাজেন শায়িত, দূরে বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছে, চারি কোণে চারিখানি টেবিল, রোগীর ঔষধ পথ্য ও নানা আবশ্যক দ্রব্যে পূর্ণ, পালঙ্কের নিকটে টিপায়ে ফুটন্ত ফুলের দুইটি গুচ্ছ, তাহাতে নানা জাতীয় গোলাপের সুগন্ধে টার্পিন লিনিমেন্ট প্রভৃতির গন্ধের তীব্রতা হ্রাস করিতেছে। অল্পক্ষণ বিশ্রামের জন্য পুত্রের নিকট একজন দাসীকে বসাইয়া রাজেন্দ্রের জননী পালঙ্ক হইতে একটু দূরে একখানা আরাম-কেদারায় শয়ন মাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন, দাসী রাজেন্দ্রের মস্তক

ধীরে ধীরে বাতাস করিবার উপদেশ পাইয়া পাখা-হস্তে মস্তকের নিকট বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে অবশেষে ভূমিশয্যায় পড়িয়া ঘুমাইয়াছে, চতুর্দ্দিকের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্র্যাকেটের উপর ক্লকটা কেবল টিক্ টিক্ শব্দে অবিরাম চলিতেছে।

অতি ধীরে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পশ্চাতে বারান্দার দিকের ক্ষুদ্র দ্বারটি খুলিয়া নবদুর্গা শয্যার উপর রাজেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। বাতির আলোকে উজ্জ্বল গৃহে মশারি ও লেপ বালিশের অন্তরালে বসিয়া, অঞ্চল হইতে দেবতার নির্ম্মাল্য খুলিয়া রাজেন্দ্রের ললাটে স্পর্শ করাইয়া উর্দ্ধমুখে যুক্তকরে নীরবে কি প্রার্থনা করিল, তারপর আত্ম-গোপন চেষ্টায় বাতির আলো যথাসম্ভব অনুজ্জ্বল করিয়া সেই স্বল্পালোকে তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব সতুর মুখ-প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অতি ধীরে অতি সাবধানে বাতাস করিতে করিতে তাহার জ্বরতপ্ত দেহের উপর জননী-হৃদয়ের অনন্ত শুভ ইচ্ছার সহিত স্নেহহস্ত বুলাইতে লাগিল।

রোগের ঘোরে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া রাজেন ডাকিল—'মা'—'মা'। সে ধ্বনি নিদ্রিত পঙ্কজিনীর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই ত্রস্তে ব্যস্তে পীড়িতের মুখের কাছে অবনতা হইয়া নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা ?"

মুদ্রিতনয়নে রাজেন্দ্র উত্তর করিল—"জল, মা—বড় কষ্ট"—নবদুর্গা অতি সাবধানে উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে সোডার জল আনিয়া খাওয়াইল, রোগী তৃপ্তিবোধ করিয়া বলিল—"আঃ।"

নবদুর্গার সযত্ন শুশ্রূষায় রোগের কষ্টের মধ্যেও রাজেন্দ্র ঘুমাইতে লাগিল। দিবারাত্রি একা অনবরত পীড়িত পুত্রের শুশ্রূষায় ক্লান্ত পঙ্কজিনী, আর প্রভুপত্নীর মনোরঞ্জন-হেতু প্রভু-পুত্রের প্রতি মমতা প্রদর্শন-তৎপরা পরিচারিকা উভয়েরই কিছুক্ষণ নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

রাজেন্দ্র হাতটি নাড়ে, পাটি সরায়, মাঝে মাঝে উঃ আঃ করে, আর নবদুর্গা শিহরিয়া উঠে—ঐ বুঝি পঙ্কজিনীর ঘুম ভাঙিয়া যায়, ঐ বুঝি আসিয়া পড়ে! নবদুর্গা আরো প্রাণপণে তাহার সতুর রোগ-যাতনা দূর করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করে, আর সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—হে দেব দয়াময়, সতুর সকল রোগ বালাই, কষ্ট যন্ত্রণা আমায় দাও, সতুকে আমার সুস্থ কর, নীরোগ কর, বাঁচাও, রক্ষা কর!

প্রায় তিন কোয়ার্টার কাটিয়া গেল, নিস্তব্ধ গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল, পঙ্কজিনীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইল, তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলেন—একি বাতিটা যে একেবারে নিবে যাবার মত হয়েচে! আঃ একটু চোখ বুজিছি, মাগী এইটুকু সময় আর রাজেনকে আমার দেখতে পারে নি, ঘুমিয়েচে! কর্ত্তা আবার বলেন একজন নার্স রেখে দিই, সে তোমার রাজেনের সেবা করবে, তারা তোমার চেয়ে আরও ভাল সেবা জানে। জানবে না কেন, মাইনে করা লোক জানে সবই, ভাল করে' করে কই?

আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া ফিরিয়াছেন, এমন সময় পঙ্কজিনীর মনে হইল বারান্দার দিকের দ্বারটা যেন একটু নড়িল! কেন? কেউ ঘর থেকে বাহির হয়ে গেল নাকি? পঙ্কজিনীর মনে সন্দেহ জাগিল। দাসীর ঘুম ভাঙাইয়া সঙ্গে লইবার দেরী সহিল না। গৃহের বাহির জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল—ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করিয়া পঙ্কজিনী একাই ত্বরিতপদে গৃহের বাহিরে আসিলেন। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, কে একটি স্ত্রীলোক দ্রুত ছাদ পার হইয়া সিঁড়ীর দিকে যাইতেছে।

স্ত্রীলোক?—স্পষ্ট দেখিলেন—স্ত্রীলোক! তবে অন্যের সাহায্যের আবশ্যক কি? রুদ্ধনিশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া পঙ্কজিনী স্ত্রীলোকটির কাপড় টানিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। নিরুপায় নবদুর্গা কম্পিতদেহে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কর্ত্রীর চরণ-প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

পঙ্কজিনী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"কি? নবদুর্গা তুই? তোর এই কাজ? এত সাহস তোর? শুধু আজ নয় তবে রোজই তুই চোরের মত আমার রাজেনের কাছেঁ এসে বসে থাকিস্! তাই রোজ আমি পায়ের শব্দ শুনি। মিথ্যুক, তোর এক কথা আর কাজ! কি প্রতিজ্ঞা করেছিলি মনে নেই?"

ধীর মন্থরগতি অশ্ব যেমন চালকের উপর্য্যুপরি কশাঘাতে উদ্ধত অসহিষ্ণু হইয়া লাফাইয়া উঠে, নবদুর্গা তেমনি অসহিষ্ণু হইয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল! তাহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ওষ্ঠ কম্পিত হইল, দৃঢ়স্বরে সতুর মা উত্তর করিল,—"হাঁ, আমি। দিনে দেখবার হুকুম পাই নে বলে রোজ রাত্রে লুকিয়ে চোরের মত এসে আমি আমার সতুকে দেখে ঠাকুরের মালা তার কপালে ছুঁইয়ে যাই। দিদিঠাকরুণ, আর কেহ নয় আমিই। আমি দুঃখিনী—যথার্থ ই এ অসীম জগতে এ বিপুল বিশ্বে আমি নিতান্তই ভাগ্যহীনা দুঃখিনী। দুঃখিনী—কিন্তু মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসিনী নই।"

ক্ষুব্ধা মর্ম্মাহতা নবদুর্গার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। মর্ম্মব্যথা অশ্রুবিন্দুতে পরিণত হইয়া মাটিতে মিশিল।

অপ্রতিভ হইয়া পঙ্কজিনী বলিলেন—"রাগ কোরো না সতুর মা, আমি বুঝতে পারি নি। দেখ, তোমার উপরে আসায়, সতুর সঙ্গে কথা কওয়ায় আমার আর কোনো আপত্তি নেই, কেবল—"নিতান্ত কোমল করুণকণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিলেন—"তোমায় আর কি বোলবো নবদুর্গা সকলি তো তুমি জান। আচ্ছা কাল থেকে যখন ইচ্ছা তুমি উপরে এসো সতুর সঙ্গে কথা বোলো, কেবল মনে রেখো, সতু যেন না জানতে পারে তুমি—"

পঙ্কজিনীর কথায় বাধা দিয়া নবদুর্গা ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল—"ভয় নেই দিদিঠাকরুণ, মনে সে ভয় সে ভাবনা রাখবেন না, এমন অধর্ম্ম আমা হতে হবে না, যা প্রতিজ্ঞা করেছি প্রাণ দিয়ে তা পালন কোরবো। সতু আপনার, চিরদিন আপনারই থাকবে, আমি তার কাছ থেকে কোনো কিছুরই আশা রাখবো না, কেবল—"নবদুর্গা সহসা পঙ্কজিনীর পদদ্বয় উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া অনুনয়স্বরে বলিল—"আর কিছু নয় কেবল সতুকে সাধ মিটায়ে দেখতে, তার কাছে থাকতে দেবেন, দয়া করে আমায় সতুর কাছ থেকে কোনো দিন দূরে সরাবেন না; আর সতুকে যে নামই দিন আমার মরণ পর্য্যন্ত সকলে আমাকে সতুর মা বলেই ডাকবেন।"

নবদুর্গা নীরব হইল—অনাথার অশ্রুবারি নীরবে সৌভাগ্যবতীর চরণ ধৌত করিতে লাগিল।

(৭)

পরদিন হইতে, নবদুর্গার দুঃখ না ঘুচিলেও তাহার জীবন-যাত্রার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইল। তাহার গণ্ডী-ঘেরা কর্ম্মক্ষেত্রটুকু বিস্তৃত আকার ধারণ করিল। দুঃখিনীর দুঃখের রাতে বুঝি সুখের জ্যোৎস্না উঁকি দিল।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, দেবতার বরে ক্রমে সতু তাহার রোগমুক্ত সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন, মাস, বৎসর, দশ বৎসর কাটিল। ক্রমে সতু তাহার রূপে গুণে জ্ঞানে সম্মানে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। নবদুর্গার, মজুমদার-দম্পতির হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল! মজুমদার-দম্পতির সে আনন্দ, হাস্যে মুখর, গর্ব্বে দীপ্ত, বাসনায় অতৃপ্ত! নবদুর্গার সে হর্ষ, অশ্রুতে স্নিগ্ধ, কৃতজ্ঞতায় নির্ম্মল, তৃপ্তিতে মধুর!

যথাসময়ে রাজেন্দ্রের বিবাহ হইল। পুত্রের অনুরূপ লাবণ্যময়ী নববধূ আসিয়া মজুমদার-ভবন উজ্জ্বল করিল।

নবদম্পতি মজুমদার-গৃহিণীর চরণ বন্দনা করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া

স্মিতমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বারের পার্শ্বে পাচিকা পরিচারিকা ও বাহিরের পাঁচজনের সহিত দাঁড়াইয়া নবদুর্গা সে আনন্দ দৃশ্য দেখিয়া অন্তরে অপূর্ব্ব পুলকস্পন্দন অনুভব করিল! জগদীশ্বর-চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া বার বার—শত সহস্রবার অনিমেষ-অতৃপ্ত-নয়নে সে মুখ-ইন্দু নিরীক্ষণ করিল।

রাজেন্দ্রের ন্যায় বধূমাতা রতনবালাও নবদুর্গাকে একজন দাসী বলিয়াই চিনিয়া রাখিল।

* * * * * *

রাজেন্দ্র এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ধনীর গৃহিণী—ম্যাজিষ্ট্রেটের জননী পঙ্কজিনী, তাঁহার সুখের সীমা—ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট, সুখ নিরবচ্ছিন্ন, গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ। সকল সৌভাগ্য লাভ করিয়া মনের সাধে পঙ্কজিনী সংসারে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। আর নবদুর্গা আত্মগোপন করিয়া নিতান্ত দীনভাবে দাসী-মহলে দাসীরূপে দিনাতিপাত করিতে লাগিল!

কিন্তু হায়! পঙ্কজিনীর এত সাবধানতা সতর্কতা সকলি বৃথা হইল! এত সুখ বেশী দিন তাঁহার ভাগ্যে সহিল না! রাজেন্দ্রের বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যু হইল। পঙ্কজিনীর সকল আশা ভরসা আনন্দ যেন সেই সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইল। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শোকের তীব্রতার মধ্যেই পঙ্কজিনী আপন বর্ত্তমান অবস্থা ও নবদুর্গার প্রতি নিজের সুদীর্ঘ কালের অনুচিত আচরণ স্মরণ করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এখন? এখন যদি নবদুর্গা সেই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লয়?

নবদুর্গার প্রতি কতদিনের কত নির্ম্মম ব্যবহার এক সময় যাহা উচিত ভাবিয়াই করিয়াছিলেন আজ একে একে সেই সকল স্মরণ করিয়া পঙ্কজিনী মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিলেন! তাইত, এখন যে নবদুর্গার প্রতিশোধ লইবার স্বর্ণ সুযোগ! একটি—এখন একটি মাত্র গোপন কথা তাঁহার রাজেনকে—তাঁহার প্রাণের প্রাণ নয়নের মণি আনন্দ আশা— তাঁহার ইহ জীবনের একমাত্র সম্বল রাজেনকে যদি নবদুর্গা বলিয়া দেয়,—"পঙ্কজিনী তোমার—পঙ্কজিনীর গর্ভে তুমি—"

ওঃ! পঙ্কজিনী আর পারিলেন না! এ চিন্তা তাঁহার অসহনীয় হইল! ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিশ্বাস রোধপ্রায় হইল! চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার মনে হইল—"না দেরি নয়, এখনই এর উপায় করিতে

না পারিলে সত্য প্রকাশ পাইবে, পুত্র আপন গর্ভধারিণীকে চিনিয়া লইবে, কাঙালিনী রাজ-জননী হইবে, পতি-পুত্রহীনা দুর্ভাগা আমি অসহ্য কষ্টে নীরবে কর্ম্মফল ভোগ করিব! হায়, এই কি আমার নিয়তি! এই কি বিধিলিপি! না, কখনই না!"

পঙ্কজিনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—দিবসের নিরূপিত কর্ম্মগুলির অবসানে রান্নাঘরের পার্শ্বের ক্ষুদ্র ঘরখানিতে, যেখানে নবদুর্গা ভূমিশয্যায় বিশ্রাম করিতেছিল—দ্রুতপদে সেখানে উপস্থিত হইয়া উন্মত্তার মত তাহার পদদ্বয় উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিলেন—"ক্ষমা কর বোন্ আজ আমায় ক্ষমা কর, আমার সকল অপরাধ সমস্ত দুর্ব্যবহার ভুলে যাও।"

নবদুর্গা এই অসম্ভাবিত ঘটনায় অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া ত্রস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া পঙ্কজিনীর হস্ত হইতে আপন চরণ মুক্ত করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একি! দিদিঠাকরুণ, একি! হয়েচে কি?" পঙ্কজিনী উত্তর দিবেন কি, আশঙ্কা উদ্বেগ ও অনুতাপে আজ তাঁহার হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ! অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন হৃদয়ভাব প্রকাশ করিবার এখন আর তাঁহার সামর্থ্য কোথায়!

নবদুর্গা আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরাধিক পঙ্কজিনীর সহিত একগৃহে বাস করিতেছে কিন্তু তাঁহার এ ভাব কখনও দেখে নাই। আজ সে তাহার ধনগর্ব্বিতা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহসা এই ভাবান্তর দেখিয়া উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিল। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত—অসম্ভব হইলেও নবদুর্গার মনে হইল বুঝি বা তাহার সতুরই কোনো অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া পঙ্কজিনী যখন নবদুর্গার ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া আবার ক্ষমা প্রার্থনার উপক্রম করিলেন, নবদুর্গা তখন প্রকৃতই ভগ্নীস্নেহে পঙ্কজিনীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া সানন্দচিত্তে সহাস্যমুখে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিল—"সতু আমার নয়—তোমার, চিরদিনই তোমার, তুমিই সতুর মা, আমি কেবল তোমার দাসী মাত্র, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার বড় আশার, বড় সাধের রাজেনকে নিয়ে তুমি সুখী হও; তোমার এক বউ-বেটা এক শো হোক্, নাতি নাতনীতে তোমার সুখের সংসার পূর্ণ হোক! আর কিছুই আশা আকাঙ্ক্ষা আমার নেই, কেবল আশীর্ব্বাদ কর যেন সতুর মুখ দেখতে দেখতে মরতে পাই।"

আপনার প্রকৃতি দিয়া মানুষ অন্যের বিচার করে! অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া

সে অন্যের হৃদয় চিনিবার চেষ্টা করিয়া ভ্রমে পড়ে, তাই এত বৎসর এক স্থানে এক সংসারে থাকিয়াও—পঙ্কজিনী নবদুর্গাকে চিনিতে পারেন নাই ; তাহার অন্তরের প্রকৃত পরিচয় পান নাই। তিনি নবদুর্গার প্রতি নিজের দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ভ্রমেও এ ব্যবহার আশা করেন নাই। আজ বিস্মিত-স্তম্ভিত-মুগ্ধচিত্তে নবদুর্গাকে বলিলেন—"না দিদি না, দাসী নও তুমি আজ থেকে আমার দিদি, আমার বড় বোন্, আমি তোমার ছোট বোন্, রাজেন আমার বড় বোনের স্নেহের দান। তোমার আশীর্ব্বাদেই আজ আমি রাজেনকে নিয়ে সুখী, এ সুখে—এ সুখের সংসারে তোমার আমার সমান অধিকার, রাজেনকে যেভাবে দেখে শুনে যত্ন করে তৃপ্তি পাও, তাই কর, কোনো বাধা দেব না—ভয় ভাবনা রাখবো না। চল দিদি চল, আজ থেকে এ ঘর ছেড়ে আমার তেতলার ঘরে থাকবে চল ; দুজনের যদি তুল্য অধিকার, তবে একজনের তেতলার ঘরে রূপার পালঙ্কে মখমলের বিছানায়, আর একজনের একতলায় মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকা মানায় না।"

নবদুর্গার মুখে আনন্দের হাস্যজ্যোতি, নয়নে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল! তাহার কৃতজ্ঞ অন্তর বিভুপাদপদ্মে নত হইয়া বলিল—"হে প্রভু, করুণাময়, তোমারই এ দান ; দুঃখিনীর দুঃখমোচনে তোমারই এ কৌশল! ধন্য পিতা, ধন্য তুমি! তোমার মহিমা অনন্ত! করুণা অসীম!

(৮)

পঙ্কজিনীর আগ্রহ সত্ত্বেও নবদুর্গা তাহার বাস-গৃহখানি ত্যাগ করিয়া ত্রিতলে গমনের ব্যবস্থা করিল না। হঠাৎ এতটা বাড়াবাড়িতে অপর দাস-দাসীদের মনে, এমন কি স্বয়ং রাজেন্দ্রের মনেও সন্দেহ জাগিতে পারে, এ কথা পঙ্কজিনীকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলে তিনি নিরস্ত হইলেন ; তবে রাজেন্দ্রকে দেখিবার তাহার নিকটে যাইবার, সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় তাহার যত্ন-শুশ্রূষা করিবার আর কোনো বিধি নিষেধ রহিল না।

নবদুর্গার হৃদয়ের ভার যেন একটু একটু করিয়া লঘু হইতে লাগিল! তাহার চিরবিষণ্ন মুখ আনন্দের রেখাপাতে উজ্জ্বল হইল, নয়নের কালিমা ঘুচিয়া একটা দীপ্তি প্রকাশিত হইল! আনন্দ-উৎসাহে তাহার গত বিশ বৎসর পূর্ব্বের সামর্থ্য আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। পতি-বিয়োগ-কাতরা নারীহৃদয় পুত্র-মুখ চাহিয়া শোক তাপ ভুলিয়া সুখী হইল।

কিন্তু নিরন্তর সুখ ভোগ করিতে দেওয়া বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়! এক

ভাবে একটানা স্রোতে সংসার-তরণী বুঝি চলে না—চলিতে পারে না। পঙ্কজিনী ভাবিয়াছিলেন, এমনি ভাবেই বুঝি আমার দিন কাটিবে,—এ সুখের এ জীবনের বুঝি শীঘ্র অবসান হইবে না! কিন্তু তাহা হইল না! পরিপূর্ণ সুখের মাঝে সহসা পঙ্কজিনীর ভরা-ডুবি হইল। রাজেন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র পূর্ণচন্দ্রের জন্মের তিন সপ্তাহ পরে হঠাৎ প্লেগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পঙ্কজিনীর মৃত্যু হইল। এত যত্নের—এত সাধের সংসারের কাছে একবার বিদায় লইবার পর্য্যন্ত অবসরও তাঁহার মিলিল না! বড় তাড়াতাড়ি পঙ্কজিনীকে যাইতে হইল।

* * * * * *

পঙ্কজিনীর মৃত্যুর সময় রাজেন্দ্রের বড় খোকার বয়স পাঁচ বৎসর, কন্যাটির তিন। তাহারা দুটি ভ্রাতা ভগিনী তাহাদের ঠাকুরমার সহসা অন্তর্দ্ধানে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। নবদুর্গা সস্নেহে রোরুদ্যমান শিশুদুটিকে আপন বক্ষে তুলিয়া লইল—আদরে সোহাগে স্নেহে যত্নে তাহাদের ঠাকুরমার অভাব ভুলাইয়া দিল।

দুটিতে সতুর মায়ের অঞ্চলের নিধি হইল। আশৈশব পিতা মাতার অত্যধিক স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত রাজেন্দ্র জনক-জননীর অভাবে বড়ই দুঃখ অনুভব করিলেন। বধূ জননীসমা শ্বশ্রূর বিয়োগে মর্ম্মাহতা হইলেন। সে গভীর শোকে নবদুর্গা উভয়কে সান্ত্বনা দিল। অল্পে অল্পে তাঁহাদেরও যত্নের ভার সে নিজের হাতে লইল। নবদুর্গার স্নেহ যত্নের মধ্যে মাতৃস্নেহের বিকাশ দেখিয়া উভয়ে তৃপ্তিবোধ করিলেন। সতুর মায়ের স্নেহ যত্নে—সতুর মায়ের কর্ম্ম-দক্ষতায়, সতুর মায়ের তৎপরতায় অল্পে অল্পে পঙ্কজিনীর শূন্য স্থান যেন ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। পঙ্কজিনীর স্মৃতি যেন সতুর মায়ের মাঝে শ্রান্তদেহে আশ্রয় লইল! পঙ্কজিনীর নাম লুপ্তপ্রায় হইল! সারা সংসারটি ব্যাপিয়া রহিল কেবল—সতুর মা! সংসারের সকল অন্তরগুলি ব্যাপিয়া রহিল কেবল—সতুর মায়ের অতুল স্নেহ!

(৯)

কিন্তু এ ভাবে বেশী দিন কাটিল না, নবদুর্গার ভাগ্যে দুদিনের সুখ দুদিনেই ফুরাইল। সতুর মা যে তিমিরে ছিল আবার সেই তিমিরেই আসিয়া পড়িল।

একবার প্রসবের পর সূতিকাগৃহে বধূমাতা রতনবালার মরণাপন্ন পীড়ার সময়ে কন্যার যত্ন-শুশ্রূষা করিতে আসিয়া রাজেন্দ্রের শাশুড়ী সংসারের কর্ত্তৃত্ব এবং কন্যা জামাতা ও নাতি নাতিনীগুলির যত্নের ভার নিজে লইয়া নবদুর্গাকে অব্যাহতি দিলেন। সতুর মায়ের হস্ত হইতে একে একে সকল অধিকার

রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর হস্তে গেল। ধীরে ধীরে বৎসর কয়েকের মধ্যেই রাজেন্দ্রের শাশুড়ী এই সংসারের প্রকৃত গৃহিণী, যথার্থ শুভানুধ্যায়িনী হইয়া উঠিলেন! আর সতুর মার দুরদৃষ্ট সতুর মাকে আবার তাহার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিল! কেবল দীর্ঘ কালের অধীনতার পর স্বাধীনতাটুকু পাইয়া তাহার অন্তরের যে মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা আর গেল না। তাহার বহু আয়াসলব্ধ পূর্ব্ব অভ্যাস আর ফিরিল না! সতুর মা পঙ্কজিনীর নিকট যেমন পারিয়াছিল রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর নিকট ততটা অধীনতা স্বীকার করিতে পারিল না। পঙ্কজিনীর আদেশ নিষেধ বিধি ব্যবস্থা যেভাবে মান্য করিয়া চলিয়াছিল, রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর নিষেধ আজ্ঞা বিধি ব্যবস্থা সেরূপভাবে মানিয়া চলিতে পারিল না। দুঃখ অভিমান ও আত্মসম্মান-বোধে জলাঞ্জলি দিয়া অন্যান্য দাস দাসীর অনুকরণে তোষামোদাদি দ্বারা নবগৃহিণীর প্রিয় হইতে পারিল না। ফলে প্রথম হইতেই উভয়ের মধ্যে অপ্রীতির ভাব বদ্ধমূল হইয়া ক্রমে রাজেন্দ্রের শাশুড়ীর রোষদৃষ্টি কুগ্রহের ন্যায় শত দিক হইতে শত প্রকারে সতুর মায়ের অনিষ্ট সাধন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

সতুর মা শান্তি হারাইল, স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিল, কিন্তু ভয়ে ভীত হইয়া আপন কর্ত্তব্য ভুলিল না, অসহিষ্ণু হইল না! ভগবৎ-চরণে মতি স্থির রাখিয়া নীরবে সে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিল। জননীর শিক্ষাক্রমে বধূমাতার ব্যবহার অসহ্যপ্রায় হইলে অন্যের অলক্ষ্যে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া সতুর মা ভাবিল—"দোষ কারও নয় গো মা, আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

অভাবের দিনে সতুর মায়ের স্নেহাশ্রয়, সংসার-পরিচালনায় সতুর মায়ের বিবেচনা বুদ্ধির সহায়তা, রাজেন্দ্র বধূমাতা হইতে নব প্রসূত শিশুটির পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল বটে কিন্তু সে অভাবের দিন কাটিয়াছে—সে প্রয়োজন ঘুচিয়াছে, সুতরাং কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে সকলে সতুর মায়ের স্নেহাশ্রয় করিয়া শান্তি তৃপ্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেই ভবনে একটি বৃদ্ধ ও একটি বালিকা ব্যতীত সতুর মায়ের ব্যথার ব্যথী আর কেহ জুটিল না।

মজুমদার-পরিবারের চির হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয় ও রাজেন্দ্রের স্নেহময়ী কন্যা বালিকা সন্তোষিনী। সতুর মাকে সকলেই ভুলিয়াছে, কেবল এই বালিকাই ভুলে নাই, একমাত্র সে-ই সতুর মায়ের অগাধ স্নেহ উপেক্ষা করিয়া 'দিদিমায়ের' অঞ্চলে বাঁধা থাকিতে পারে নাই!

(আগামীবারে সমাপ্য)

মুগ্ধা

(একখানি চিত্র দর্শনে)

শ্যাম তৃণরাজি' পরে আধেক শুইয়া,
কি দেখ চাহিয়া ?
তোমার কমল আঁখি কার তরে চেয়ে থাকি'
উঠিছে ভরিয়া ?
চাঁদে ঢাকিয়াছে রাহু ! যুগল মৃণাল-বাহু
রয়েছে উঠিয়া,
যেন কোন্ প্রেমময়ে হৃদয়ে তুলিয়ে ল'য়ে
রহিবে ধরিয়া !
আহতা ফণিনী—কাম সুঠাম অলকদাম
পড়েছে এলিয়া !
ক্লান্ত অভিমান-ভরে ফুকারিছ কারে স্মরে'
বুকটি চিরিয়া !
কপোল শোণিত-হারা ! সেই হাসি মাতোয়ারা
গিয়েছে চলিয়া !
বল, অয়ি স্বপ্ন-বালে ! চিন্তা-রেখা তব ভালে
কাহার লাগিয়া ?

শ্রীবিনোদচন্দ্র বসু ।

সরমা

ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

মাণিকের জলযোগ শেষ হইলে, কমলা ঘরের জানালা খুলিয়া বারান্দার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত সুন্দরী বেলার কেশ বিন্যাস করিতেছে। বেলা, সুন্দরীর পার্শ্বের কক্ষে থাকে ; তাহাকে সহসা দেখিলে হিন্দুস্থানী রমণী বলিয়াই বোধ হয়, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদের ঢং, হাব-ভাব কথাবার্ত্তা ঠিক হিন্দুস্থানীরই মত। দেখিতেও মন্দ নহে, মুখখানি

সদাই হাস হাস। আর সুন্দরা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া কে যে তাহার সুন্দরী নাম রাখিয়াছিল তাহা সেই অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। বোধ হয় মনের দুঃখে আপনি আপনার নাম সুন্দরী রাখিয়াছিল! সুন্দরীকে হটাৎ দেখিলে মনে যুগপৎ ভয় ও হর্ষের সঞ্চার হয়। তাহার নিকষার ন্যায় কালো গোলাকার মুখখানির উপর দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু—তাহার উপর একটি চীন জাতীয় নাসিকা, সেই নাসিকার এক দিকে একটি চক্রের ন্যায় নথ, সূক্ষ্ম সুবর্ণ-শৃঙ্খলে কর্ণের সহিত সংযুক্ত। অপর দিকে একটি নাকচাবি যেন অন্ধকারে জ্বল-জ্বল করিতেছে। সুন্দরীর সম্মুখের দুইটি দন্ত সদাই বিকশিত—দেখিলেই মনে হয়, সে যেন সদ্য খৈ খাইয়া আসিতেছে, এখনো মুখে দুই চারিটি লাগিয়া আছে! বয়সে সুন্দরী মোক্ষদা অপেক্ষা কয়েক বৎসরের মাত্র ছোট হইবে, তাই সে তাহাকে মোক্ষদাদিদি বলিয়া ডাকে। কিন্তু স্থূলতায় মোক্ষদা, সুন্দরীর নিকট হার মানিয়া যায়। গলাটিও বেশ শান দেওয়া, সর্ব্বাই যেন খন্ খন্ করিতেছে! সুন্দরীর যৌবন যদিও তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি সে জোর জুলুম করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা প্রত্যহই করিয়া থাকে!

বেলার কেশ-রচনা শেষ হইলে, একরাশ দড়ি ও ফিতার সাহায্যে সুন্দরীর কেশবিরল মস্তকে বেলা এক অপূর্ব্ব বেণীবন্ধ করিয়া উহাতে একখানি চিরুণী আঁটিয়া দিল। পরে সাবান লইয়া উভয়ে গাত্র ধৌত করিবার মানসে চলিয়া গেল। কমলা জানালাটি বন্ধ করিয়া মাণিককে কোলে লইয়া আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিচিত্র বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া একে একে রাণী, গুলজার, বেলা ও সুন্দরী ছাদে আসিয়া দেখা দিল। গুলজার কমলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"কি ভাই মজলিস, আমরা ছাদে এলুম আমাদের সঙ্গে কি দুটো কথাও বলতে নেই?"

রাণী কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"বাঃ বেশ গালভরা নাম—এনাম কে দিলে ভাই?"

গুলজার রাণীর সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"স্বয়ং গুলজার!" রাণী মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া কহিল,—"তাই ভাবছিলুম গুলজার না হলে এমন নাম দেয় কে?"

সুন্দরী তাহার অন্ধকার মুখখানা কমলার মুখের কাছে আনিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"হ্যাঁ ভাই, গান টান গাইতে জানো?"

কমলা যেন আকাশ হইতে পড়িল—তাহাকে যে এমন একটা অস্বাভাবিক কথা জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—মনে করিল সুন্দরী তাহাকে ঠাট্টা করিতেছে।

কমলার অবস্থা দেখিয়া সুন্দরী কহিল,—"তার জন্যে ভাবনা কি ; না জানো শিখলেই হবে—বয়স তো এখনো যায় নি !"

গুলজার রাণীর চিবুক ধরিয়া কহিল,—"সে দিন তোর বাবু যে গানটি গাইছিল, সেইটি একবার গা না ভাই, আমার শুনতে বড় ভালো লাগে।"

রাণী গুলজারের হাত ধরিয়া কহিল,—"কোনটি ?"

"সেই,—"ভালোবাসা।"

"আমার কি ছাই সব মনে আছে ?"

"যা আছে তাই গা।"

রাণী গুলজারের স্কন্ধে ভর দিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিল :—

ভালোবাসা চোখের নেসা,
প্রেমের হাসি, পরায় ফাঁসি, দুদণ্ডের মেলা মেশা !
ধরা-মাঝে সুখ ভুলিতে পারা,
নিমিষে নিমিষে, নূতন যে হয়,
সে কভু কি জানে নয়ন-ঝরা !

গুলজার কহিল, "তার পর ?"

"তারপর আর মনে নেই।"

"তোর বাবু এলে আজ রাত্রে শিখে নিস, কাল আবার শুন্‌বো।"

"আয় ভাই, এই বেলা নেমে যাই, সন্ধ্যে হয়ে এলো—তোর বাবু এসে আবার ঘরে দেখতে না পেলে রাগ করবে" বলিয়া সুন্দরী বেলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

গুলজার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তবে ভাই মজলিস, আমরাও আসি, কাল সকালবেলা আবার দেখা হবে।"

কমলা গুলজারের হাত ধরিয়া কহিল,—"একটি কথা বল—"কমলার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গুলজার কহিল,—"কি বল্‌বে বল না ভাই।"

"তোমারা তবে কথা কও আমার একটু কাজ আছে" বলিয়া রাণী সত্বর চলিয়া গেল।

কমলা কহিল,—"এখানে এমন কোনো হাঁসপাতাল আছে, যেখানে কুকুরে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসা হয় ?"

"তা তো জানি নে ভাই, তবে আমার বাবু এলে জিজ্ঞাসা কোরবো। তোমার ছেলেকে কি—?"

কমলা কিছুই না বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "তবে এখন আসি ভাই, সন্ধ্যে হয়ে এলো, ঘরে ধূনো গঙ্গাজল দিতে হবে" বলিয়া গুলজার তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

কমলা ভাবিল, বাবু অর্থে স্বামী। ইহারা আপনাদের স্বামীর আগমনের পূর্ব্বে তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহই বুঝি সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকে। হইতে পারে, বড় লোকের বড় কথা—ইহাদের তো কাজ কর্ম্ম কিছু করিতে হয় না, সাজ-গোজই একটা কাজ! ইহাদের স্বামীরাও বোধ হয় ইহাদের বেশ একটু স্বাধীনতা দিয়াছেন—তাই ইহারা গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না।

এই সময় লছমীর মা আসিয়া একটি কেরোসিন তৈলের টিনের ল্যাম্প জ্বালিয়া দিয়া গেল। উহা আলো অপেক্ষা ধূম্রই অধিক পরিমাণে উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কমলা ল্যাম্পটিকে বাহিরে রাখিয়া শয্যার উপর আসিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মোক্ষদা আসিয়া কহিল,—"দেখ বাছা, তোমাকে আর রাত্রে নীচে নাম্‌তে হবে না—মহারাজকে বলে দিয়েছি, সে এইখানে তোমাদের খাবার দিয়ে যাবে। আর আজ না হয় তোমার মাণিক তোমার কাছেই শুক্ কাল থেকে আমার কাছে শোবে, কি বলো ?"

কথাটা কমলার বড়ই কঠোর লাগিল, তাহার ইচ্ছা নয় যে, সে এক দণ্ডের জন্যও মাণিককে তাহার কাছ-ছাড়া করে, কিন্তু ভরসা করিয়া সে কথা বলিতে পারিল না। ভাবিল, বোধ হয় মাণিকের উপর তাহার মাসীর আন্তরিক স্নেহ জন্মাইয়াছে। সে মুখে বলিল,—"বেশ তো কিন্তু—"মোক্ষদা তাড়াতাড়ি বলিল. "কিন্তু আবার কি, মাণিক যদি আমার কাছে না শোয়, তোমার ঘরেই শোবে, আর একটা বিছানা বৈত না, তা হবে। তবে তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ো, আমি এখন যাই" বলিয়া মোক্ষদা চলিয়া গেল।

কমলা ভাবিল, মোক্ষদা কেন মাণিকের জন্য স্বতন্ত্র বিছানার কথা বলিল। মাণিক তাহার বুকের ধন—সে তাহার বুকের উপর শুইয়া থাকিবে, তাহার স্বতন্ত্র বিছানার দরকার কি ? কথাটা সে অনেকবার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়াও

কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ভাবিল বোধ হয় এখানকার এই রকমই নিয়ম।

যথা সময়ে আহারাদি সারিয়া কমলা দরজা বন্ধ করিয়া মাণিককে লইয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর হইতেই বাড়িটি বেশ শর-গরম হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি ঘরে গান বাজনা হাস্যালাপের তুমুল তুফান উঠিতেছিল। কমলা শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, এ বাড়িতে কি ভাসুর ভাদ্রবধূ নাই! সকলেই গলা ছাড়িয়া গান গাহে? হাসির রোলে বাড়ি ফাটিয়া যায়। কে জানে হেথাকার কি রকম রীতি!

রাত্রি আন্দাজ দুইটার সময় একটা আকস্মিক গোলমালে কমলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার ফাঁক দিয়া বারান্দার দিকে চাহিল—দেখিল সুন্দরীর ঘরের দরজা বন্ধ, দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন অশ্রাব্য ভাষায় অবিরাম গালাগালি করিতেছে, আর তাহাকে নীচে লইয়া যাইবার জন্য তিন জনে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। লোকটির দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই, সর্ব্বশরীর টলটলায়মান, তবুও সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাত পা ছুঁড়িয়া তাহার বলের পরিচয় দিতে ত্রুটি করিতেছে না! বারান্দার উপর এত বড় একটা গোলমাল হইতেছে সে দিকে যেন কাহারো ভ্রুক্ষেপ নাই—কেহই দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল না। এমন যেন প্রায়ই হইয়া থাকে।

কমলা ভাবিল, হয়তো সুন্দরীর স্বামী মদ খাইয়া আসিয়াছিল—তাই সুন্দরী তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহার ভ্রাতারা তাহাকে নীচে লইয়া গিয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেছে। কমলা ইহার অধিক আর কিছু ভাবিতে পারিল না! সে পুনরায় তাহার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল।

কমলার যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন জানালার ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া প্রাতঃসূর্য্যের সোনালী রশ্মিগুলি গৃহমধ্যে আসিয়া বিস্ফারিত হইতেছিল! কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখে মুখে জল দিয়া বাহিরে আসিল; ভাবিল পরের বাড়িতে থাকিয়া এত বেলা অবধি ঘুমানো ভালো নয়, মাসীমা কি মনে করিবেন? কিন্তু সে দেখিল, বাড়িটি তখনো স্তব্ধ নীরব, কাহারো সাড়া শব্দ নাই। কমলার প্রাণটা তখন গুলজারের মুখের একটি কথা শুনিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—যদি তাহার স্বামী বলিয়া থাকে—এখানে কুকুরে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসার হাঁসপাতাল আছে। সে গুলজারের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। সে একবার ভাবিল, ছুটিয়া গিয়া গুলজারকে একবার ডাকে—কিন্তু তাহা সে

পারিল না, বুঝিল তাহার স্বামী নিশ্চয়ই গৃহ-মধ্যে আছে, সে ডাকিবে কি করিয়া! কমলা আরো একটু অপেক্ষা করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। তখন কমলা যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মাণিককে কোলে লইয়া বারান্দায় নামিয়া আসিল—যদি সে কাহাকেও দেখিতে পায়, তাহা হইলে একবার গুলজারকে ডাকিয়া দিতে বলিবে। দুই পা চলিয়া কমলার আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না। সে দেখিল, পাঁটার হাড়, পিঁয়াজের খোলা, সালপাতে মোড়া উচ্ছিষ্ট পুরি তরকারি প্রভৃতিতে বারান্দাটি এক-হাঁটু হইয়া রহিয়াছে! চারিদিকে মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে—কেমন একটা দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। কমলা নাকে কাপড় দিয়া পুনরায় উপরে আসিয়া উঠিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে লছমীর মা সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে সমস্ত বারান্দাটি জল দিয়া ধুইয়া পরিস্কার করিয়া ফেলিল। তার পর কমলার ঘর হইতে পূর্ব্বরাত্রের ভোজন-পাত্রগুলি লইয়া যাইবার জন্য উপরে আসিল। কমলা তাহাকে বলিয়া দিল, গুলজার উঠিলেই সে যেন তাহাকে একবার ডাকিয়া দেয়।

লছমীর মা চলিয়া যাইবার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে গুলজার কমলার ঘরে আসিয়া কহিল,—"কি ভাই মজলিস্, সকাল বেলাই ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কোনো কথা আছে নাকি?"

গুলজারের চেহারা দেখিয়া কমলা ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—হঠাৎ কিছু বলিতে সাহস করিল না! ঝড়ের পর পত্রশূন্য গাছগুলি যেমন শীর্ণ শুষ্ক মলিনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, গুলজারও ঠিক সেইভাবে আসিয়া দাঁড়াইল! সে দেখিল, তাহার কবরী শ্লথ হইয়া মাথার নীচে নামিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখের চুলগুলো উস্কো-খুস্কো হইয়া কপালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে! চোখদুটো যেন ভিতরে বসিয়া গিয়াছে! চোখের কোণে কালিমা পড়িয়াছে—মুখখানা শুষ্ক বিবর্ণ—আর সেই মুখ হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে! কমলা দুইপদ পিছাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমলাকে নীরব দেখিয়া গুলজার কহিল,—"কি বল্‌বে চট্ করে বল না ভাই, আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই।"

কমলা কহিল,—"না এমন কিছু নয়—তবে আমার কথাটা কি মনে ছিল? তোমার কোনো অসুখ করেনি তো? মুখখানা বড় শুখ্‌নো শুখ্‌নো দেখ্‌চি!"

গুলজার শুষ্কমুখে একটুখানি হাঁসি ফুটাইয়া কহিল, "না ও কিছু নয়, নাইলে খেলে সেরে যাবে—তোমার কথাটা বাবুকে বলেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি বল্লেন,

এখানে সে রকম হাঁসপাতাল কিছু নেই তবে বদ্দিনাথ তেওয়ারির ওষুধটা খুব ভালো—যদি দরকার হয় তো আনিয়ে দিতে পারেন, তোমার চাই কি?"

কমলা জড়িতকণ্ঠে কহিল,—"না, দরকার হলে বোল্‌বো।"

"তবে এখন যাই ভাই" বলিয়া গুলজার চলিয়া গেল।

কমলার প্রাণের মধ্যে যে আশার বাতিটুকু মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, হঠাৎ যেন কাহার নির্ম্মম ফুৎকারে তাহা নিভিয়া গেল! হৃদয়ের যে আকুলতা লইয়া সে গুলজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, কে যেন সহসা তাহা পদদলিত করিয়া চলিয়া গেল! কমলা কাট হইয়া দাঁড়াইয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিল, তাহার ভাসা-ভাসা চোখ্‌দুটো জলে ভরিয়া উঠিল; সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। মাণিককে কোলে লইয়া আপনার শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। কমলা ভাবিল, কেনই বা বিনয় তাহাকে এখানে আনিল, কেনই বা ফেলিয়া পলাইল! তাহার উদ্দেশ্যই বা কী ছিল! সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সমস্ত ব্যাপারটা যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে ছায়াবাজির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল! মানুষের যখন সকল আশা ভরসা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, অদৃষ্টের নির্ম্মম পীড়নে ভাঙিয়া চূরিয়া বাঁধ-ভাঙা নদীর স্রোতে কুটাটির মত একদিকে ভাসিয়া যায়, তখন তাহার প্রাণটা আপনা হইতেই স্থির হইয়া আইসে; এবং ধীরে ধীরে ভগবানের চরণ-প্রান্তে আপনাকে লুটাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হয়; কমলারও ঠিক তাহাই হইল। তাহার ব্যাকুল প্রাণটা শান্ত হইয়া আসিল! সে ভাবিল, তাহার মাসীমার স্নেহ-শীতল ছায়াতে থাকিয়া সে প্রত্যহ বিশ্বেশ্বর দর্শন করিবে—আর কোথাও যাইবে না।

সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কমলার দিনটা বেশ একরূপ কাটিয়া গেল। গুলজারকে তাহার বড়ই ভালো লাগিতে লাগিল, কিন্তু রাণীর মনে যেন একটু অহঙ্কার আছে। বেলা বড় একটা কাহারো সঙ্গে মেসে না—তাহার যা কিছু কথাবার্ত্তা কেবল সুন্দরীর সঙ্গে।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় গুলজার আসিয়া ডাকিল,—"মজলিস, একা বসে কি ভাবচ ভাই?"

গুলজার কথাটি এমনভাবে কহিল, যাহাতে কমলা হাসিয়া ফেলিল।

গুলজার আবার কহিল,—"দেখ ভাই কেমন গালভরা নাম দিয়েছি, এখন বল তো ভাবছিলে কি?"

"ভাববো আর কি ভাই, ভাববার আর আমার কি আছে? তবে ছেলেটা—"

"যার ছেলে তাকে কেন দিয়ে এলে না? এর জন্যে কি কিছু খোরপোষ পাও?"

কথাটা কমলা তলাইয়া বুঝিল না—এরূপ কথা সে পূর্ব্বে কখনো শুনে নাই সে সহসা জবাব দিতে পারিল না, মাণিকের মাথাটা আপনার ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গুলজার কমলাকে নীরব দেখিয়া ভাবিল কথাটা তাহার প্রাণে লাগিয়াছে। সে কথাটা চাপা দিয়া কহিল,—"তোমার কোনো ভালোবাসার লোক নেই ভাই?"

কমলা এবার কহিল, "আছে বৈকি!"

"নামটি কি শুনতে পারি?"

কমলা গম্ভীরভাবে কহিল, "না।"

"বলবে না?—আমার মাথা খাও বলতে হবে।"

"না ভাই দিব্বি দাও কেন?"

"তবে বল।"

"তার—নাম, যম।"

"বালাই—ষাঠ, তোমার কেন হতে যাবে শত্রুর হোক। এস ভাই গা ধুতে যাই," বলিয়া গুলজার কমলার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, এবং লছমীর মাকে ডাকিয়া তাহার কোলে মাণিককে দিয়া গুলজার কমলাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

কমলা গাত্র ধৌত করিয়া উপরে আসিলে মোক্ষদা তাহাকে আপনার ঘরে আনিয়া স্বহস্তে তাহার কেশ-রচনা করিয়া কবরীতে একখানি সোনার চিরুণী গুঁজিয়া দিল। পরে একখানি ফিরোজা রঙের পার্শীসাড়ী আনিয়া কহিল, "পরতো বাছা, দেখি কেমন মানায়।"

কমলা যেন আকাশ হইতে পড়িল, সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

মোক্ষদা ইতিমধ্যে বাক্স খুলিয়া একছড়া দড়া হার ও দুইগাছি অনন্ত বাহির করিয়া স্বহস্তে কমলাকে পরাইতে গেল। কমলা বাধা দিয়া কহিল,—"আমাকে এ সব কেন মাসীমা আমি আপনাদের কে? আর আমার এখন এসব পরে সাধ আহ্লাদ করবার দিন নেই, আমাকে দয়া করে এক মুটো খে"—

কথায় বাধা দিয়া মোক্ষদা কহিল—"সে কি বাছা, এই বয়সে সাধ আহ্লাদ যাবে কেন? কিসের বয়স তোমার? যখন তুমি আমার হিল্লেয় এসেচ, তখন যাতে তোমার ভালো হয় আমার তাই আগে করা উচিত, "বলিয়া মোক্ষদা হার ও অনন্ত পরাইয়া দিল।

কমলা বিনীতভাবে কহিল,—"থাক্ মাসীমা, আমার ও সবে কাজ নেই, আমি বেশ আছি।"

মোক্ষদা মৃদু মধুর ভৎর্সনা-সূচক স্বরে কহিল,—"নাও কাপড়খানা টেনে নিয়ে পর, এখানে থাকতে হ'লে এ সব পরতে হবে; একটু ভদ্দর হয়ে থাকতে হবে।"

কমলা তাহার মাসীমার কথার উপর আর কথা কহিতে সাহস করিল না। কাপড়খানি টানিয়া লইয়া পরিতে পরিতে সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মাসীমার কী দয়ার শরীর? কী অপরিসীম স্নেহ? বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সে তাহার মেয়েগুলির মতো তাহাকেও সাজাইয়া বড়লোকের মতো রাখিতে চাহে? সে তাহাকে এমন দীনভাবে দেখিতে চাহে না!

কমলার সমস্ত হৃদয়টা তথন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল? সে কাপড়খানি পরিয়া তাহার মাসীমার চরণে প্রণাম করিল।

মোক্ষদা কমলার হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিল,—"বাঃ বেশ মানিয়েচে, যেমন রং তেমনি কাপড়! একবার আরসীর কাছে গিয়ে দেখ দেখি!"

কমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণে এ রাজবেশ ছাড়িয়া রাখালবেশ পরিবার অনুমতি পাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপভাবে সজ্জিত হইয়া থাকা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। কিন্তু করে কি, তাহার মাসীমার কথা তো রাখিতে হইবে!

মোক্ষদা কমলাকে লইয়া তাহার ঘরে আসিল। পথে গুলজারের সহিত দেখা হওয়ায় সে তাহার উপর একবার বিলোল কটাক্ষপাত করিয়া—একবার মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল।

মোক্ষদা মাণিকের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিছানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং সন্ধ্যার পর পুনরায় আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

যাহারা ছাদে আসিয়াছিল, তাহারা কমলার হারের সোনাটা তাহাদের হারের সোনা অপেক্ষা কত নিরেশ ও কাপড়খানা কত খেলো তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমলার রূপ-যৌবন ও বস্ত্রালঙ্কার দেখিয়া দুই একজনের মনে যে ঈর্ষার সঞ্চার না হইয়াছিল এমন নহে। রাণী কহিল,—"আমার বাবু মনে করলে হীরের বালা গড়িয়ে দিতে পারেন।"

সুন্দরী অনেক গৌরচন্দ্রিকা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিল যে, যখন তাহার

কমলার মতো বয়স ছিল তখন তাহার বাবু তাহাকে সোনার মুকুট পরাইয়াছিল।

বেলা একটু হাসিয়া কহিল,—"ও আমার পরা গহনা।"

সন্ধ্যা সমাগমে সকলে একে একে চলিয়া গেল। গুলজার মুখে কিছু বলিল না—যাইবার সময় কমলাকে একটি চিমটি কাটিয়া চলিয়া গেল। কমলা উহার বিনিময়ে গুলজারকে কিছু দিবার সুযোগ পাইল না।

দেখিতে দেখিতে বাড়িখানি আবার সরগরম হইয়া উঠিল। গান বাজনা হাসি তামাসায় বাড়িটি ভরপূর—যেন প্রতি মুহূর্ত্তে রঙ্গমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

তখন রাত্রি নয়টা। মাণিক আপন শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এতক্ষণে কমলাও দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িত, কিন্তু একটু আগে লছমীর মা আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, আর খানিক পরে মোক্ষদা তাহাকে দেখিতে আসিবে। কমলা সেই জন্য তাহার মাসীমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

কমলা সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল, তাহার মাসীমা আসিতেছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু একি! মোক্ষদার পরিবর্ত্তে এক সুন্দর যুবক আসিয়া কমলার সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবকের কুঞ্চিত কেশগুলি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মাথার উপর দিয়া একটি সূক্ষ্ম রেখা চলিয়া গিয়াছে—চোখে সোনার চশমা, সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর গার্ডচেন-সংযুক্ত সোনার ঘড়ি, পায়ে পম্প্ সু, হাতে ছড়ি। যুবককে দেখিয়া কমলা ভয়ে জড়োসড়ো হইয়া মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের ভিতর তখন গুর গুর করিতেছিল! যুবক ক্ষণেকের জন্য কমলার দিকে নির্ণিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে কহিল,—"মজলিস, আমি যে তোমার নাম শুনে এখানে এসেছি—তোমার বাড়িওয়ালী যে আমাকে ডাকিয়ে এনেছে,আমাকে দেখে সরে গেলে কেন ভাই—আমি কি তোমার উপযুক্ত নই?" যুবকের কথায় জড়তা প্রকাশ পাইতে লাগিল!

কমলা তেজের সহিত কহিল,—"আপনি কে, কেন এখানে এসেছেন—বাড়ীওয়ালী কে আমি জানি না।"

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল,—"বাড়িওয়ালীকে তুমি জানো না? তোমার মাসীমা মোক্ষদা। আমি কে সেটা তোমার মাসীমার মুখেই শুনো। কেন এসেছি? তোমাকে পাবার জন্যে—বুঝলে?"

বায়ুবিতাড়িতা লতিকার ন্যায় কমলা কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু পড়িল না, সে দৃঢ়স্বরে কহিল—"আপনি ভুল করেছেন, এটা বেশ্যালয় নয়—শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যান বলচি।"

যুবক উচ্চহাস্য করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—"না—না—না—তাকি হতে পারে? এটা ভাটপাড়ার মাঠাক্‌রুণদের ভদ্রাসন! তোমার কি সেই থান থেকে আসা হচ্ছে?"

কমলার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একখানা কুয়াসার যবনিকা রবিকর, স্পর্শে সহসা সরিয়া গেল। সে বুঝিল এখন সে কোথায় আসিয়াছে, তাহার পরিণাম কি হইবে!

কমলাকে নীরব দেখিয়া যুবক কহিল,—"ছিঃ ভাই মজলিস, রাগ কোরোনা আমি তোমার পায়ের গোলাম হয়ে থাকবো—তোমার গা সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো। মাসে তোমার কত টাকা চাই ভাই? এক'শো, দু'শো, তিনশো, চারশো বল—মজলিস বল!"

কমলা ভাবিল,ভগবানের এ কী লীলা,এ কী মহা প্রলোভন! তাহার একবার পদস্খলনে যাহা হইয়াছে তাহার ফল সে এখনো ভুগিতেছে—আজীবন ভোগ করিবে। সে পাপের পথে আর যাইবে না। মাণিককে লইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় সেও ভালো, তথাপি আর সে পাপের পথে যাইবে না। কমলা অটল সাহসে রুক্ষস্বরে কহিল,—"আপনার টাকার বড়াই অন্য কাউকে দেখান গিয়ে, আপনি এখান থেকে শীগ্‌গির চলে যান বলচি—না গেলে অপমান হবেন।"

যুবক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—"কী, অপমান! মজলিস্, তুমি আমাকে অপমান করবে? বাড়িতে ডেকে এনে অপমান! এমন ছোট লোকের জায়গা জানলে আমি আসতুম না। টাকা দিলে অমন ঢের মজলিস পাওয়া যায়। দেখি এখন বাড়িওয়ালী কি বলে!" বলিয়া যুবক মস্ মস্ শব্দে একেবারে মোক্ষদার ঘরে প্রবেশ করিল। কমলা সশব্দে দরজা বন্ধ করিল।

যুবকের মুখে ব্যাপারখানা শুনিয়া মোক্ষদা কহিল,—"অত রাগারাগী করলে কি চলে? দু'টো সইতে হয়, গায়ে হাত বুলিয়ে বশ করতে হয়। বল্লুম না নতুন নতুন!"

"তাই শুনে তো এলুম, এখন দেখি কেমন বেয়াড়া রকমের।"

"আচ্ছা আপনি এখানে একটু বসুন," আমি সব ঠিক করে দিচ্চি, বলিয়া মোক্ষদা উপরে আসিয়া কমলার দরজায় ঘা দিয়া ডাকিল, "মজলিস।"

কমলা এতক্ষণ বালিশে মুখ গুজিয়া কাঁদিতেছিল, মোক্ষদার ডাকাডাকিতে সে চোখ মুছিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

মোক্ষদা ঘরে আসিয়া কহিল,—"দেখ বাছা, তোমাকে আমি খুব ভালো বলেই জানতুম, আমি তোমাকে গয়না-গেঁটে কাপড়-চোপড় দিয়ে সাজিয়ে অতবড় জমিদারের ছেলেকে কত ফিকির করে তোমার ঘরে এনেছিলুম যাতে তোমার ওপর ওর মনটা পড়ে, তুমি কিনা ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে! ছিঃ, সে আমার ঘরে বসে আছে. আমি তাকে পাঠিয়ে দিই, তুমি তার হাত ধরে ঘরে ডেকে নাও। তুমি যদি ওর মন জুগিয়ে থাকতে পারো তো দেখবে এরপর তোমার দু তিন খানা বাড়ি হবে, সোনা-দানা কাপড় চোপড় কত পরবে! তুমি আমার কাছে এসে পড়েছ, যাতে তোমার ভালো হয় তাই করচি—এরপর দেখবে তোমার সুখ ধরবে না!"

মোক্ষদার কথাগুলা যেন কমলার বুকের মাঝে বিষের ছুরি বিঁধাইতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া কহিল,—"আমি পারবো না মাসীমা, আমায় মাপ করুণ, আমি বেশ্যা নই, এটা বেশ্যালয় জানলে আমি এখানে আসতুম না।"

মোক্ষদা মুখভঙ্গী সহকারে রুদ্ধস্বরে কহিল,—"কি আমার সতীরে! যাদের সঙ্গে এসেছিলে তারা তোমায় দুদিন খাওয়া-পরা দিয়ে রাখতে পারলে না—এমনি ভদ্দর লোক তারা, মেয়েমানুষটাকে এনে শেষে পথে ছেড়ে দিয়ে পালালো। আমি যদি না আসতুম তাহ'লে তোমার কী দশা হ'ত বলতো? কলিকাল কিনা ভালো করতে নেই। এখন যা বল্লুম তাই কর, যদি আপনার ভালো চাও।"

আগে কমলার আত্ম-সম্ভ্রমে আঘাত লাগিয়াছিল মাত্র, এখন তাহার ঘাড় ভাঙিয়া গেল। কমলা লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হইয়া গেল। যাহার স্নেহ-শীতল ছায়ার মাঝে কমলা আশ্রয় লইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, আজ তাহা নীরস উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হইল! কে যেন তাহার হাত পা বাঁধিয়া একটা উচ্চ পাহাড় হইতে ফেলিয়া দিল! তাহার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল—সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল! সে কম্পিতকণ্ঠে যুক্তকরে কহিল,—"মাসীমা দয়া করে আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন, আজকের রাতটুকু—কাল যা হয় আমি আপনাকে বলব—আমার মথাটা কেমন করচে আমি আর বসতে পারচি নে।"

মোক্ষদা মুখখানা বিকৃত কয়িয়া কহিল,—"এত ন্যাকামিও জানো—এর আবার ভাবাভাবি কি? কুমার নরেন্দ্রনারাণ কি তোমার যুগ্যি নয়?"

কমলার চক্ষে জল আসিল, সে নিরুপায় হইয়া মোক্ষদার দুটি পা জড়াইয়া ধরিল এবং কাতরকণ্ঠে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"মাসীমা, আজকের রাতটুকু ভাবতে দি——"কমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তখন তাহার তপ্ত অশ্রু টপ টপ করিয়া মোক্ষদার পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মোক্ষদা তাহার যুগল চরণ এমন সজোরে টানিয়া লইল যে, কমলা মুখে একটা বিলক্ষণ আঘাত পাইল; কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর যে আঘাত বাজিতেছিল তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। মোক্ষদা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিরক্তির সহিত কহিল,—"এমন জানলে আমি তোমায় ঘরে আনতুম না, মন পড়ে আছে বুঝি তাদের দিকে? যা' ভাববার ভেবে নাও। আমি না হয় একটা দিন তাকে বুঝিয়ে রাখবো এখন। কিন্তু কাল যেন আর অমত না হয়—বুঝলে?" বলিয়া মোক্ষদা হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

কমলা টলিতে টলিতে উঠিয়া কোনোরূপে দরজাটা বন্ধ করিয়া দরজার নিকট মেঝেতে শুইয়া পড়িল। তাহার বোধ হইতেছিল যেন পৃথিবীটা তাহার সম্মুখে ঘুরিতেছে! সে যেন শূন্যের উপর দুলিতেছে! কখন খসিয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কমলার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া ঘুমন্ত মাণিককে একবার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল,তার পর তাহাকে যথাস্থানে রাখিয়া আপনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহাকে এখনি তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। সে মনে মনে কত ভাঙিল—কত গড়িল—কিছুই স্থির হইল না! তবে কি অদৃষ্টের তাড়নায় আজ সে যেখানে আসিয়াছে সেইখানেই থাকিবে? মনের সহিত তাহার একটা বিপুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কমলা ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দিল। তার পর নিশাশেষে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল; তখন তাহার ক্ষত হৃদয়ের শত জ্বালা যুড়াইয়া গেল। নিষ্ঠুর সংসারের উপর্য্যুপরি দারুণ কষাঘাতের পর যদি নিদ্রার আহ্বান না থাকিত, তাহা হইলে মানুষ পাগল হইয়া যাইত।

(ক্রমশ)

স্বর্গীয়

সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বেগের গঙ্গোপাধ্যায় বংশ বাংলাদেশের মধ্যে সুপরিচিত। সূর্য্যকুমারের আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর মহকুমার অধীন বেগে নামক গ্রামে বসতি করিতেন। পরে ঐ স্থানে বাসের অসুবিধা হওয়ায় তাঁহার সন্ততিগণ কুশদহ-সমাজের মধ্যে বেড়িরামনগর গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্যকুমারের পিতামহ চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মাতুলাশ্রয়ে গৈপুর গ্রামেই বাস করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমার দরিদ্র সন্তান। ইহার পিতা বংশীধর গঙ্গোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদারবাবুদিগের সরকারে একটি সামান্য বেতনের কাজ করিতেন।

বংশীধর মাত্র চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়সে বৃদ্ধা মাতা, অসহায়া স্ত্রী ও চারি বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র সূর্য্যকুমারকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। এই দুর্দ্দিনে ব্রহ্মোত্তরের যৎসামান্য উপস্বত্ব হইতে সূর্য্যকুমারের মাতা কায়ক্লেশে সূর্য্যকুমারকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কালে এই সূর্য্যকুমার নিজ প্রতিভা-বলে, ধনে মানে এতদ্দেশের মধ্যে একজন গণনীয় ব্যক্তি হইয়াছিলেন। ডাক-বিভাগই ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল।

ভারত গভর্ণমেণ্টর যত প্রকার কর্ম্ম বিভাগ আছে, তন্মধ্যে ডাক-বিভাগই সুচারু রূপে পরিচালিত। ইহার কারণ এই যে, যখন এদেশে এই বিভাগ প্রথম স্থাপিত হয়, তখন হইতেই এই বিভাগে অনেক দেশীয় যোগ্য ব্যক্তি দায়িত্ব-পূর্ণ উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি ও পরামর্শানুসারে ঊর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিগণ কার্য্য করিতেন। যদিও বিচার-বিভাগে দেশীয়েরা উচ্চপদ লাভ করিয়া যোগ্যতার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের কার্য্যপরিচালনের প্রথা নির্দ্দেশে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা অল্প থাকায় ঐ বিভাগ আদৌ লোকরঞ্জক নহে। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, রায় বাহাদুর শালীগ্রাম, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, রায় সূর্য্যনারায়ণ ও দুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু সূর্য্যকান্ত মিত্র, ও বাবু সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েরা সকলেই ডাক বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

পদে কর্ম্ম করিয়াছেন। ঐ সকল জনপ্রিয় মহাত্মাগণ দেশের অভাব ও অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, ডাক-বিভাগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া-গিয়াছেন। তখনকার দিনে কার্য্যক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। দেশের লোকের সুবিধা অসুবিধার কথা সরকারকে বুঝাইয়া, থানার চৌকিদার হরকরার পরিবর্ত্তে ইঁহারাই নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পোষ্টাপিস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে গৈপুর গ্রামেই সূর্য্যকুমারের জন্ম হয়। বাল্যকালে, সূর্য্যকুমার গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ অভ্যাস করেন। কিন্তু তখন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তিনি পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদা স্বদেশবৎসল, বিদ্যানুরাগী, প্রাতঃস্মরণীয় জমিদার স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবু স্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিষ্টার সীলের সহিত "প্রসন্নভবনের" সম্মুখস্থ প্রশস্ত ময়দানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যকুমারকে দেখিতে পাইলেন। সূর্য্য-কুমার তখন জমিদার-বাটীর সম্মুখ দিয়া বাজারে যাইতেছিলেন। বালকের চক্ষে প্রতিভার ফুটন্ত চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিয়া সারদাপ্রসন্ন বাবু তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দরিদ্র বালক ম্লানমুখে অবস্থাবৈগুণ্যের কথা জানাইলে দয়ারসাগর জমিদার মহাশয় তদ্দণ্ডেই সীল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বালকের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সূর্য্যকুমারও নিজ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়া অল্পকাল মধ্যে ইস্কুলের উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণনীয় এবং সারদাপ্রসন্ন বাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াই তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন। পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় এই স্থানেই তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবু সূর্য্যকুমারকে কোনো একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কাজকর্ম্ম করিতে পরামর্শ দিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি ও অর্থাগম উভয় কার্য্যই সাধিত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া সূর্য্যকুমার সারদাপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে তখনকার পোষ্টাপিসের সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নামে এক অনুরোধলিপি গ্রহণ করিলেন। ৺শারদীয়া পূজাবকাশে রায় বাহাদুর তাঁহার চৌবেড়িয়ার বাড়ীতে আসিয়াছেন মনে করিয়া সূর্য্যকুমার অনুরোধলিপি লইয়া পদব্রজেই চৌবেড়িয়ায় যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক প্রতিবন্ধক ঘটিল। গাইঘাটার ডাকবাংলায় টেলিগ্রাফ্

বিভাগের এক সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব ছিলেন। পথিক সূর্য্যকুমারের প্লীহা যকৃৎপূর্ণ স্থূলোদর দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষ কৌতুকচ্ছলে হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন। পথক্লিষ্ট রুগ্ন যুবক এই ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সক্রোধে এক ইষ্টক-খণ্ডের দ্বারা তৎক্ষণাৎ সাহেবকে আঘাত করিতে উদ্যত হন। সাহেব ভীত হইয়া অবিলম্বে গৃহাভ্যন্তরে পলায়ন করিলেন এবং নিজ ভৃত্যের দ্বারা সূর্য্যকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নির্ভীক যুবক সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাঁহার সাহসের ভূয়সী প্রসংশা করিয়া তদ্দণ্ডেই ২৫৲ টাকা বেতনের এক চাকরীর নিয়োগ-পত্র প্রদান করেন। পত্র প্রাপ্তে সূর্য্যকুমার চৌবেড়িয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া সাহ্লাদে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রতিপালক জমিদারবাবুর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। সারদাপ্রসন্ন বাবু তাঁহাকে ঐ চাকরী গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দীনবন্ধু বাবুর দ্বারা ডাক বিভাগে এক কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সূর্য্যকুমার ১৫৲ টাকা বেতনে ফরিদপুর পোষ্টাপিসের কেরানীর পদে নিযুক্ত হইলেন। এই তাঁহার সৌভাগ্য-সোপানের প্রথম স্তর।

সূর্য্যকুমারের কার্য্যপটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার আপিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী শীঘ্রই তাঁহাকে ১৫৲ টাকা হইতে একেবারে ৪০৲ টাকার পদে নিযুক্ত করিলেন। পুরাতন কেরানীকুল উপেক্ষিত হওয়ায় তৎকালে আপিসে এক মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবিচারের সুবিচার করিবার জন্য কেরানীগণ এক যোগে Post Master General এর নিকট এক আবেদন করেন। গুণগ্রাহী রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই তদন্তের ভার প্রাপ্ত হইয়া যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"His education is as good as that of a B. A. graduate and he is alone equal to six clerks etc. সূর্য্যবাবু যখন ৭৫৲ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন, তখন কি এক কারণে প্রতাপশালী নীল কুঠিয়াল সাহেবদিগের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে। সাহেবগণ তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য Post Master General এর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে দোষারোপ করিয়া পাঠান এবং পোষ্টাপিস লুণ্ঠন করিবার জন্য সেই সময়ের এক বিষম ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। ধার্ম্মিকপ্রবর মন্‌রো সাহেব তখন স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট্। তিনি সূর্য্যবাবুর সম্বন্ধে উপরে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহাও এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

"He is a square figure in a square hole and all the charges brought against him are false; on the night of the occurance I have visited the post office three times and seen him heroic ally preserving the Government records and the mail was detained by my order."

এই রিপোর্টের বলে সূর্য্যবাবু নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি ৩৫০৲ টাকা বেতনে Examiner of Accounts পদ প্রাপ্ত হন্ এবং ইহার দুই বৎসর পরেই পোষ্টাপিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে Michael Herman Kish M. A. I. C. S officiating Director General of Post offices of India, যখন ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপে Vuna Postal Congressএ যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করেন, তখন তিনি এদেশীয় ডাক-বিভাগে কি কি নূতন প্রথা প্রচলন করা কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয়ে সভাস্থলে কি ভাবে আলোচনা করা যাইবে তাহা সূর্য্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক সময়ে সূর্য্যবাবু এই সাহেবের প্রধান সহকারীরূপে কার্য্য করেন। সেই সময় হইতেই সাহেব তাঁহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। এইরূপ একটি মহৎ কার্য্যে একজন বঙ্গবাসীর পরামর্শ প্রার্থনীয় হওয়া কম গৌরবের কথা নহে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যবাবু প্রথম শ্রেণীর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ হইয়া নিজ বাটী গৈপুর গ্রামেই আপিস করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ ইনি অবকাশ গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বর্ষাধিককাল পেন্‌সন ভোগ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে চারিপুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার পুত্রগণ সকলেই সুশীল ও সচ্চরিত্র।

এই স্বনামধন্য পুরুষ কঠোর পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। ১৫৲ টাকা মাসিক বেতনে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ প্রতিভাবলে ৫০০৲ শত টাকা বেতনের কর্ম্ম করা কম কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক নহে। সকল লোকেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। সাধারণ লোক সদা সর্ব্বদা তাঁহার কাছে গিয়া নানা বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। তিনি যাহাকে যে পরামর্শ দিতেন, লোকে বিশ্বাসের সহিত তাহাই করিত। তাঁহার পরামর্শ কখনও কাহারও পক্ষে অহিতকর বা কুফলপ্রসূ হইত না। শৈশবে দারিদ্র্যের কঠোরতায় লালিত পালিত হওয়ায় তিনি বিলাসশূন্য

সংযমী ও মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া ও দান আড়ম্বর শূন্য ছিল। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ দয়ার্থীকে দান করিতেন। প্রকৃত দুঃস্থজন কখনই বিফল মনোরথ হইয়া তাহার দ্বার হইতে যায় নাই। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য পাড়ায় জনৈক ভদ্রলোক অন্ধ হন্, সূর্য্য বাবু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রতিমাসে গোপনে বিশেষ সাহায্য করিতেন। তাঁহার এরূপ দানের কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি বেদান্তাদি বহুধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান উচ্চ আদর্শের ছিল। গর্ভধারিণীকে মূর্ত্তিমতী দেবী জ্ঞান করিয়া তিনি তাঁহার পদসেবা করিতেন। তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত আজ কাল বিরল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র

দাসের আত্মকথা

—:০:—

স্বদেশ-হিতৈষী

বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ সম্বন্ধে প্রথম কথা

স্নেহময় বন্ধু উমেশদাদার কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। উমেশদাদা চিনির কারখানা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার মূলধন ছিল না, ছিল কেবল একটি কারখানা-বাড়ি। তাই তিনি কোনো ধনীর সাহায্যে অংশীদার হইয়া ঐ কারখানার কার্য্য করিতেন ; মধ্যে মধ্যে তাঁহার অংশীদার পরিবর্ত্তন হইত। শেষে কোনো সময় তিনি এই কার্য্যে স্বদেশহিতৈষী সদাশয় ধর্ম্মানুরাগী ভাবুক-ভক্ত আমাদের পরলোকগত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশের সাহায্যপ্রার্থী হন। প্রথমে তিনি এ কাজে সাহায্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, শেষে উমেশদাদা যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক অনুরাগের সহিত একান্তভাবে ধরিলেন, এবং তিনিও উমেশদাদার ভাব-স্বভাব বুঝিয়া অনেকটা সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার সম্পূর্ণরূপেই সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ আমাদের দেশে সুবিখ্যাত ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে দু' একটি কথা বলা আবশ্যক। গোবরডাঙ্গার অন্তর্গত হয়দাদপুর

গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র আশ অত্যন্ত নিরীহ শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। তিনি এদেশে গণ্যমান্য ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে, তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত এক সময় মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দান করিলে, বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না। গোপনে আন্তরিকভাবে বিপন্নের সাহায্য করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণচন্দ্র ধনীর সন্তান; প্রথম যৌবনেই কলিকাতার আহিরিটোলা বেনেটোলার যুবকদলের সঙ্গে অসৎ পথাবলম্বী হইয়া পড়েন। তাঁহার মাতুল বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত (যিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন) জীবনের প্রথম যাত্রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বদেশ এবং নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের হিতকামনায় রত ছিলেন। তিনি লক্ষ্মণচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাঁহকে সৎপথে আনিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কিছুদিন পরে ভগবানের কৃপায় লক্ষ্মণচন্দ্রের জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইল; তিনি সমস্ত কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের পথাবলম্বী হইয়া এবং মাতুলের প্রদর্শিত নানাপ্রকার জনহিতকর ব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারও একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত প্রচলিত আছে। বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ যখন ধর্ম্মসাধন এবং জীবনের ব্রতপালনে নিজ জমিদারী 'মঙ্গলগঞ্জ' কার্য্যক্ষেত্র গঠন করিয়া চলিয়াছেন, সেই সময়ে উমেশদাদা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার একান্ত সাহায্যপ্রার্থী হন। ইহা বাংলা ১২৯০।৯১ সালের কথা। লক্ষ্মণ বাবুর স্বভাবে আর এক প্রধান ভাব এই ছিল যে, তিনি যখন যে কার্য্য করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিকতার সহিত সম্পন্ন করিতেন, তদ্ভিন্ন প্রায় তিনি কোনো কার্য্য করিতে পারিতেন না, সুতরাং যখন উমেশদাদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখনো তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবেই সে কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমি সর্ব্বপ্রথমে উমেশদাদার মুখেই লক্ষ্মণচন্দ্রের উচ্চান্তঃকরণের কথা শুনিয়াছিলাম, তজ্জন্য অল্পে অল্পে তাঁহার দিকে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়।

যখন আমি বাবু রামকৃষ্ণ রক্ষিতের সহিত বড়বাজারে চিনির কার্য্য করিতে-ছিলাম তখন আর একটি ঘটনা হয়। রামকৃষ্ণবাবু, লক্ষ্মণবাবুর আত্মীয় ছিলেন, সেজন্যও বটে তদ্ভিন্ন আমাদের ফারমের কার্য্য ভালো চলিতেছে বলিয়াও আমরা ফারমের হিসাবে লক্ষ্মণ বাবুর নিকট প্রভূত অর্থ সাহায্য পাইতেছিলাম। এই

সময়ে মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয় পরলোকগত হন। লক্ষ্মণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে নিজ হৃদ্দাদপুরের বাটীতে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। যে দিন তিনি অশৌচ বেশে বড়বাজারে (নিজে ব্রাহ্ম হইয়াও) স্বজাতিবর্গের নিকটস্থ হইয়াছিলেন, সে দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "আমি শ্রাদ্ধে যাইব". তাহার পর আমি আমার আত্মীয় দণ্ডীদাদাকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেখিতে যাই। তখন আমি উঁহার ভাব অবগত না থাকায় আমরা যখন তথায় গেলাম, তখন উপাসনাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি সেই অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রটি দেখিয়া কেমন একটি অভিনব পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসিলাম। আমরা তল্লক্ষণ তথায় ছিলাম, কেবল দেখিয়া শুনিয়াই চলিয়া আসি।

তাহার পর কিছু দিনের মধ্যেই এই ব্রাহ্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাম্বুলি-সমাজের এক প্রধান ব্যক্তি—খাঁটুরার দত্তবাটীর বাবু রাসবিহারী দত্ত তখন বর্ত্তমান, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া, কলিকাতা বরাহনগর এবং খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার সমগ্র তাম্বুলি স্বজাতি বর্গকে আহ্বান করিয়া এক মহতী সভার অধিবেশন করেন।

আমার তাম্বুলি সমাজ ত্যাগ

আমি যখন এই সভার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম তখনই সহজে বুঝিলাম এ সভা প্রধানত ব্রাহ্মবিদ্বেষী সভা, আমার এ সভায় যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই; আরো ভিতরে ভিতরে শুনিলাম, যাঁহারা এই শ্রাদ্ধের সংশ্রবে ছিলেন বা শ্রাদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন, এমন তাম্বুলিদিগের বিচারও এই সভায় উপস্থিত করা হইবে। ইহাতে আমার দণ্ডীদাদা বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন বুঝিলেন এ সভার প্রতি আমি কিছুমাত্র সন্তুষ্ট নহি, এমন কি সভায় যাইতেও ইচ্ছা করি না, তখন তিনি নিতান্ত বিপদ গণনা করিতে লাগিলেন, আমি ছোট ভাই বটে, কিন্তু আমার ভাব বুঝিয়া প্রথমে আমাকে সভায় যাইতে অনুরোধ করিতে পারিলেন না, কিন্তু যখন সভার দিন নিতান্তই নিকট হইল তখন তিনি একদিন কৌশলে আমাকে একান্ত ধরিয়া বসিলেন যে, "সভায় তোমাকে যাইতেই হইবে; আমরা তো সেখানে কোনোরূপ পান ভোজন করি নাই, সুতরাং আমাদের ভয় কি? জাতীয় সভায় যাওয়াই কর্ত্তব্য, না গেলে দোষ হইবে।" আমি আর দাদার

সঙ্গে তর্ক করিয়া আমার হৃদয়ের সমগ্র ভাব তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না, অগত্যা আমরা খাঁটুরা দত্ত-বাটী তাম্বুলি-সভায় গেলাম।

সভার আরম্ভেই বুঝিলাম যে, এখানে আসা আমাদের পক্ষে ভালো হয় নাই, কেন না যাঁহারা গুরুতর সম্পর্কের, যাঁহাদিগকে চিরদিন মান্য করিয়া আসিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই এখানে উপস্থিত, অথচ সভায় যাহা প্রস্তাব হইতে লাগিল, তাহা নিতান্তই আমার ভাবের বিরুদ্ধে!

তখন আমি সহজ জ্ঞানে বুঝিয়াছিলাম ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরপরায়ণ, বিশ্বাসী ধার্ম্মিক লোক, তাঁহারা দেশের হিতে রত, পরোপকারে তাঁহাদের একান্ত প্রবৃত্তি; তাঁহারা যেরূপ আচারানুষ্ঠান করেন, তাহা অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান সমাজের বিরুদ্ধ হইলেও তাহাই হিতকর সংস্কার, তাহা করাই আবশ্যক, সুতরাং ব্রাহ্মগণের প্রতি বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তখন আমার হৃদয়ের ষোলো আনা সহানুভূতি চলিতেছিল, আর এই সভা তাহার বিরোধী, সুতরাং কেমন করিয়া এই সভার কার্য্য আমার ভালো লাগিবে! অথচ তখনো গুরুতর ব্যক্তিগণের দিকে চাহিয়া আমার চক্ষুলজ্জা দূর হয় নাই—কেমন করিয়া এখানে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিব এই ভাবিয়া, একটা অব্যক্ত গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম।

প্রথমে সভায় কথা উঠিল, "আত্মীয়-সম্পর্কের অনুরোধে কেহ পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না; এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আমরা কোনো সহানুভূতি করিব না; ব্রাহ্মদিগের যে একটি বালিকাবিদ্যালয় আছে; তাহার স্থান আমরা কোনো বাড়িতে দিব না, তথায় আমরা মেয়ে পাঠাইব না;" ইত্যাদি। একমাত্র বাবু রাসবিহারী দত্ত এই সকল প্রস্তাবকারী; তাহার প্রস্তাবে বিনা বিচারে সকলেই সায় দিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল; কেমন একটা অশ্রদ্ধা এবং রাগের ভাব হইতে লাগিল।

তারপর আমাদিগের বিচার উপস্থিত হইল, প্রথমে আমার ভগিনীপতি সুরেন্দ্রনাথ আশ সম্বন্ধে কথা উঠিল, তিনি ব্রাহ্ম, শ্বশুরবাড়ি আসেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কেন স্বতন্ত্র হইবেন না? দ্বিতীয় যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু এবং দণ্ডীবর পাল তাঁহারা কেন ব্রাহ্ম-শ্রাদ্ধে গমন করিয়াছিলেন! এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্রই দণ্ডীদাদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতকলেবরে যোড়হস্তে কহিলেন, "মহাশয়গণ, আমরা শ্রাদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু কোনোরূপ পান-ভোজন করি নাই, আর যদি এই যাওয়া দশের বিচারে অন্যায় বোধ হয়

তজ্জন্য আমি (বা আমরা) ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আর কখনো এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না।"

এই কথাগুলি যখন হইল, তখন আমার আপাদমস্তক হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল; দাদা যেমন বসিলেন, আমি অমনি কি এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার সকল চক্ষুলজ্জা জড়তা কাটিয়া গিয়াছে,—অমি বলিলাম,—"দাদা যাহা বলিলেন তাহা তাঁহার নিজের কথা, আমি এই সভায় আসিব না স্থির ছিল, কিন্তু কেবল দাদার অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বে এখানে আসিয়া অবধি আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছি; এই সভা ব্রাহ্মবিরোধী সভামাত্র, আপনারা ব্রাহ্মদিগকে যেরূপ খারাপ মনে করেন, আমি তাহা করি না, বরং ভালোই মনে করি, সুতরাং এরূপ সভার সঙ্গে আমার কোনো সহানুভূতি নাই, এখানে আমি কাহারো নিকট বিচারিত হইতে ইচ্ছা করি না, আপনারা আমার সম্বন্ধে যেমন ইচ্ছা বিচার নিস্পত্তি করিতে পারেন, তাহাতে আমার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, আর আমি এই সভায় ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে ইচ্ছা করি না।"

এই বলিয়া আমি সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। কয়েকটি লোক আমাকে আর কিছুক্ষণ থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তখন তাঁহাদের ও সে কথা রক্ষা করিতে পারি নাই। এই ঘটনা ২৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা, ধন্য ভগবানের নব লীলা, এখন সমাজের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।*

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

যমুনানদী সংস্কারের কি হইল জানিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন, সংস্কারপ্রার্থী জনগণের আবেদন-পত্র (মেমোরিয়াল) অদ্যাবধি প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের দপ্তরে আছে। ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর জেলা-বোর্ড একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই নদীর সংস্কার সুফল-প্রসূ হইবে।

---

* গত দুইবারের 'দাসের আত্ম-কথা' পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজকে আক্রমণ করা হইতেছে; আমি তজ্জন্য বিনীত ভাবে জানাইতেছি যে, বাস্তবিক আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে; আমার মনে যে চিন্তা, যে ভাব হইয়াছিল তাহাই আমি সম্পূর্ণ

এই নদী মাপ করিবার জন্য শীঘ্রই একজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইবেন। মাপ-কার্য্যে অনুমান ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা খরচ পড়িবে, তন্মধ্যে ২৪ পরগণা জেলা-বোর্ড ২৪০০৲ টাকা, নদীয়া বোর্ড ২৪০০৲ টাকা ও যশোহর ৬০০৲ দিতে রাজী হইয়াছেন! বাগেরখাল ও যমুনানদী কি পরিমাণে কাটিতে হইবে এবং তাহার অনুমানিক ব্যয় কত পড়িবে তাহা গভর্ণমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার, স্থির করিবেন। কতগুলি পল্লীর জল এই নদী দিয়া নিকাশ হয় তাহাও স্থিরীকৃত হইবে। স্যানিটারি ড্রেণেজ আইন অনুসারে দেশবাসী কর দিতে স্বীকৃত হইলে এই শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।

—ঃঃ—

সম্প্রতি গৈপুর-নিবাসী দেশহিত-ব্রত শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার রাস্তাটি সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে মেরামত করিয়া সুদৃশ্য আলোক-স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন। এই সদনুষ্ঠানের জন্য তিনি গ্রামবাসীর ধন্যবাদার্হ। পতিরাম বাবুর খুড়ীমাতার নামানুসারে এই রাস্তার নাম "তারামণি রোড্" রাখা হইয়াছে। ভগবান্ পতিরাম বাবুর হৃদয়ে শান্তিদান এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন ইহাই আমাদের কামনা।

—ঃঃ—

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, হয়দাদপুরের জমিদার বাবু গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক মহাশয় খাঁটুরা মধ্য ইংরাজী ইস্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উৎসাহ দানকল্পে মাসিক ২৲ টাকা করিয়া "গুণেন্দ্রনাথ স্কলারসিপ্" নামে একটি বৃত্তি গত মার্চ্চ মাস হইতে ইস্কুলফণ্ডে প্রদান করিতেছেন। বার্ষিক পরীক্ষায় যে দুইটি ছাত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হইতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহার প্রত্যেকে মাসিক ১৲ টাকা করিয়া ঐ বৃত্তি পাইবে। এই দানের জন্য আমারা গুণেন্দ্র বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গত ১৯শে পৌষ অপরাহ্নে কুশদহর ঐতিহাসিক প্রধান "আদি গ্রাম" (mother village) ইছাপুর গ্রামে বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু

বিশ্বাসের সহিত সরল ভাবে বলিতেছি। আমার মত ও ভাবের সহিত সকলের মিল নাও হইতে পারে, যাঁহাদের সহিত হইবে অন্তত তাঁহাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে মনে করি। আমরা পরস্পরে চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করিয়া জীবন-পথে চলিব ইহাই নিয়ম, আমি এই কর্ত্তব্য পালনের জন্যই আত্ম-কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য নহে।

(দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু)

মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রমুখ কতিপয় স্বদেশহিতৈষী উৎসাহী ব্যক্তির উদ্‌যোগে একটি আলোচনা সভা আহুত হইয়াছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ইছাপুর ইস্কুলের উন্নতিসাধন দ্বারা শিক্ষা, তৎপরে ধর্ম্ম, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কিসে হয় সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহার উপায় বিধান করা। এই সভায় ইছাপুর ইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত মাননীয় দয়ালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিয়া এবং বাবু কৈলাসপতি চৌধুরী, বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাবু চুনিলাল মুখোপাধ্যায় ও বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ প্রভৃতি স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ বক্তৃতা দ্বারা সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহ করিতে এবং বিষয়টি বিশদরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন। অবশেষে সভাপতি ও অন্যান্য ব্যক্তির অনুরোধে কুশদহ-সম্পাদক দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডুও এ বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। এই সভায় ধার্য্য হয় যে, গ্রামবাসিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহার্য্য দ্বারাও ইস্কুল রক্ষা করা, এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় আপন আপন বাড়ি বাগান পরিষ্কার করা ও সমবেত চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট সহায্যে জঙ্গল কাটান। আগামী অধিবেশনে ক্যর্যকরী কমিটী গঠন করিয়া এক একটি বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

—:+:—

বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম, সমাজ-শিক্ষা-সংস্কারক প্রধান নেতা মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের একটি স্মৃতি-চিহ্ন "রামমোহন লাইব্রেরী" এই মহানগরী কলিকাতার বক্ষস্থলে এত দিনে প্রতিষ্ঠিত হইল। গত ৯ ডিসেম্বর বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিয়া সার্কুলার রোডে নবনির্ম্মিত সুদৃশ্য লাইব্রেরী-গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাটীর স্বর্গীয় কালী-মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, এই সদনুষ্ঠানের একজন প্রধান উদ্যোগী এবং সম্পাদক। তাঁহার অক্লান্ত দীর্ঘ পরিশ্রম সফল হইল দেখিয়া আজ আমরা আনন্দিত। এই মহৎ কার্য্যে যত উদ্যমশীল সাধুহস্ত—রাজা মহারাজা হইতে ভদ্র মহোদয়গণের দান মিলিত হইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন হইল তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করার আমাদের স্থানাভাব, কেবল এই শুভ ঘটনাটি আমাদের প্রিয় প্রমথ বাবুর নামোল্লেখের সহিত পত্রস্থ করিয়া নিবৃত্তি হইতেছি, প্রমথ বাবুর হৃদয়, দেশহিতকর কার্য্যে

সর্ব্বদা উন্মুখ, এজন্য আমরা আমাদের যমুনা-সংস্কার কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ আকর্ষণ করিতে চাই। কমিটির সম্পাদক মহাশয়কেও অনুরোধ করি, একার্য্যে আমরা প্রমথ বাবুকে যাহাতে পাই, তিনিও যেন সেজন্য সচেষ্ট হন।

—::—

বনগ্রামের অন্তর্গত চাঁপাবাড়িয়ার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় বি-এ, যিনি এক্ষণে সচ্চিদানন্দ স্বামী নামে অভিহিত, তিনি আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি; সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুবিখ্যাত বেঙ্গলিপত্রে ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যা বীরভূমি মাসিকপত্রে ও গত ১১ই পৌষের হিতবাদীতে "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনি তাঁহার মতের সারাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সকল মতের সহিত আমারা একমত না হইলেও তিনি যে একটি অমূল্য সত্য প্রকাশ করিতেছেন তাহা প্রচারিত হউক ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি; তিনি বলিতেছেন; "একমাত্র ভগবানের কৃপায় ভগবৎ লাভ হয়, তদ্ভিন্ন ভগবৎ প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই; পুরুষকার দ্বারা মানুষ আর সব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, কারণ ভগবৎ-প্রাপ্তি সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতি মহান্ ব্যাপার। যদি মানুষের পুরুষকার দ্বারা অলভ্য কিছু থাকে, তবে সে ভগবৎ-প্রাপ্তি" ইত্যাদি—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সাধন ভজনের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, তুমি অসাধু অধম পামরই হও আর জ্ঞানী সাধকই হও, তোমার প্রতি তাঁহার করুণা হইতে পারে, অতএব সাধন ভজন দ্বারা তাঁহাকে পাইব এই ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া বরং পুরুষকার দ্বারা মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন করিয়া ভগবান্ লাভের পথ পরিষ্কার কর। স্বামী সচ্চিদানন্দের পূর্ব্ব নিবাস চাঁপাবাড়িয়া গ্রাম, মাতামহের বাস ইছাপুর, মাতুলালয় বালিয়ানি, শ্বশুরালয় গোবরডাঙ্গা। তিনি নয়বৎসরকাল সুসভ্য দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিলেন, এখন তাঁহার বাণী তাঁহার জন্মভূমির দ্বারে দ্বারে বলুন; তিনি সংযমী সাধু পুরুষ, তিনি সংসারের অসমাপ্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করুন, আর কৃপা-লভ্য ভগবানের কথা বলুন, ইহাই আমরা তাহার নিকট আশা করি।

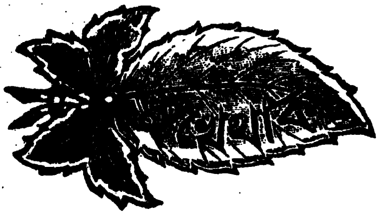
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮৷১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ঘোষ এণ্ড সনস্

জুয়েলার্স এণ্ড অপটিসিয়ানস্,

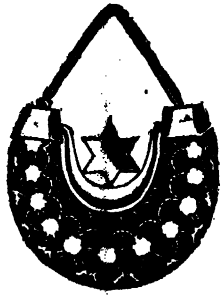
হেড অপিস—৭৮।১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—১৬।১নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



৬১ নং। রূপার ব্রোচ

জারমানীতে প্রস্তুত দাম ২॥৹



১১১ নং মাকড়ি।
ইহুদি মাকড়ি প্রতি
জোড়া গিনি সোনার
দাম ২৫৲ হইতে ২৮৲



কানফুল।
নানারূপ প্যাটার্নের
প্রস্তুত থাকে গিনি
সোনার মূল্য ১৩৲

যমুনা

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বৎসর চলিতেছে

অগ্রিমবার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ চারি আনা প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস ও সৌরীন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণ গল্প, সত্যেন্দ্র দত্ত ও নিরুপমা দেবীর কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য নানাবর্ণের ছবি আছে।

যমুনা-আফিস
ভবানীপুর, কলিকাতা।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ
সম্পাদক

জবাকুসুম তৈল

জগতে অতুলনীয় কেশতৈলের আদর্শ।



মস্তকের য[illegible] দূর করিতে, সুগন্ধে মন হরণ করিতে, আলগা চুল শক্ত করিতে, টাক রোগ দূর করিতে ; পাকা চুল কালো করিতে, কামিনীগণের কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে জবাকুসুম তৈল অদ্বিতীয়। স্বাধীন মহা-রাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

এক শিশির মূল্য ১৲, ডাঃ মাঃ ।৶০ আনা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত ঝালোয়ারাধিপতি মহারাজ রাণা বাহাদুরের অভিমত—

"জবাকুসুম তৈল বড়ই পছন্দ করি, প্রত্যহই এই তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি।"

সুরবল্লী কষায়

(মৃতসঞ্জীবনী সালসা)

এই দেশীয় সালসা ব্যবহারে সর্ব্ব প্রকার কণ্ডু, বাত, উপদংশ, দদ্রু প্রভৃতি যাবতীয় রক্তদুষ্টি জন্য রোগ ত্বরায় দূরীভূত হয়। ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী ও উপযোগী। সুরবল্লীকষায় সেবন করিলে বর্ণ সমুজ্জ্বল এবং কান্তিবিশিষ্ট হয়। সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নতি করিতে ইহার গুণ অব্যর্থ।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা ডাকমাশুলাদি ।৶০ নয় আনা।

তিন শিশির মূল্য ৩৸০ পনেরো সিকা, ডাকমাশুলাদি পনেরো আনা।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।